ফেইস টু facebook

ফেইস টু facebook

অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন

বাঙ্গালা গবেষণা
বাঙালির উন্নত ভবিষ্যৎ

বাঙ্গালা গবেষণা

ফেইস টু facebook
অধ্যাপক ডাঃ খাজা নাজিম উদ্দীন
Face to Facebook
Prof. Dr. Khaza Nazim Uddin

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২৪,
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০২৫
গ্রন্থস্বত্ব ২০২৫//০০০ অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন
সৌজন্যেঃ AQF (aqf-bd.com)

প্রকাশক
আনোয়ারা শিরীন
১৩৭ জাহানারা গার্ডেন গ্রীন রোড ঢাকা ১২১৫
ফোন ৮৮০২-৪৮১২১৪৬৬, ৮৮০১৭১৬১২৭০১০, ৮৮০১৭৫৫৫১৮৭৯১
ইমেইলঃ bangalagobeshona2016@gmail.com

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ফ্রান্সের শিল্পী # Juan_Lucena এঁকেছেন ছবিটি। করোনার এই মহামারীতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বয়স্করা, রেখে যাচ্ছেন শিশুদের। শিশুরা চিৎকার করে ডাকছে তাদের দাদা, দাদী, নানা, নানীদের। কিন্তু তারা ফিরে আসছেন না, চলে যাচ্ছেন, না ফেরার দেশে।

মুদ্রণ : আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, কাঁটাবন, নীলক্ষেত, নিউ মার্কেট, ঢাকা ১২০৫

ISBN : 978-984-----------

মূল্যঃ ৮০০ টাকা, বিদেশে ৪০ ইউএস ডলার

উদ্ধৃতি সুপারিশ :
অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন (২০২৫), ফেইস টু facebook
ঢাকা : বাঙ্গালা গবেষণা

পরিবেশক
বাঙ্গালা গবেষণা
১৩৭ জাহানারা গার্ডেন গ্রিনরোড ঢাকা ১২১৫
ফোনঃ ৮৮০২-৪৮১২১৪৬৬, ৮৮০১৭১৬১২৭০১০, ৮৮০১৭৫৫৫১৮৭৯১

উৎসর্গ

১৯৭১ এর বর্বরতায় নিহত

নিরীহ গ্রামবাসীদের আত্মার স্মরণে

মুখবন্ধ

Facebook-এ কিছু লিখলেই পরিচিতজনরা বলেন ভাল লিখেছেন, লেখাটা ভাল ছিল। আগ বাড়িয়ে কেউ বলতেন বই লিখে ফেলেন। আসলে ফেইসবুকের কল্যাণে বুঝতে পারছি মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ সহজ। অধিকাংশ লেখাই সাবলীল হৃদয়গ্রাহী। গ্রামের বধু, স্কুল শিক্ষক, চাকুরীজীবি – সে যে লেভেলেরই হোক ভাব প্রকাশে ঘাটতি খুব কম। মাতৃভাষা, মায়ের ভাষার উপলব্ধি যে কী আত্মিক সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। একুশে ফেব্রুয়ারির তাগিদ যে কত গভীর ছিল তা প্রতীয়মান হয় অধিকাংশ অভিব্যক্তি থেকে।

ফেইসবুক শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রচারণার সহজ সস্তা মাধ্যম। অতীতকে হুবহু সামনে আনে, বর্তমানকে প্রতিষ্ঠিত করে, মহিমান্বিত করে আর ভবিষ্যতকে উপলব্ধিতে আনে এই ফেইসবুক। ধর্মশিক্ষা, কুরআন, বেদ-বাইবেল শিক্ষা সহজতর করেছে এই ফেইসবুক। ইতিহাসের বৃত্তান্ত, প্রশান্ত ও আটলান্টিকের গভীরতা, আমাজানের আগুন – সবই মুহূর্তে সামনে আনতে পারে Facebook. জ্ঞানের আদান প্রদানের সাবলীল পথ এই মাধ্যম। সাইবার আইনে অপরাধী বাড়তে পারে ঠিকই তবে সত্যকে খুঁজে বের করা খুবই সহজ এখানে। শেখার কোনো শেষ নাই, ফেইসবুক, তাই।

প্রথমে ভেবেছি নিজের ওয়াল থেকে নিজের লেখাগুলো নিয়েই সাজাবো বই। পরে দেখলাম শেয়ার, কালেক্টেড সবগুলোর সম্মিলিত সংকলনই হয়ত ভালো হবে। জ্ঞান অর্জন করার জিনিসই বটে কিন্তু জ্ঞান প্রদান করলেই তো জ্ঞানের কোষ বিকশিত হয়। বই, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা – এক এক জনের উপলব্ধির প্রকাশ; কিন্তু ফেইসবুক হলো এগুলোর সংমিশ্রণ, তারসাথে ক্যামেরা ভিডিওর জীবন্ত ছবি। লেখাগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী ছবি সন্নিবেশিত করতে পারলে ভাল হতো।

ফেইসবুক আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তের বিশ্বস্ত সাথী। স্বাস্থ্য, সম্পদ, দিনপঞ্জি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রিসার্চ, পরিবেশ – সবকিছুতেই আমরা এখন এটার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির চাইতে সমষ্টির facebook wall একসাথে পড়ার চমকই আলাদা। অনেকের facebook wall থেকে সংগ্রহ আছে এ বইতে। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা। একবার হলেও বইটা পড়বেন প্রত্যাশা। পুনশ্চ, আশাকরি অনেকেই তাদের ওয়াল নিয়ে বই লিখবে; বই বানানোর পরিকল্পনা করবে, করতে থাকবে।

সূচীপত্র

রোজা-রায়েদ চলে গেলো ১৯
আমার মা, আমাদের মা, আমাদের ১১ ভাই-বোনের মা ২০
তিনি আমাদের পরিবারের কারো বাবা, কারো ভাই, কারো অভিভাবক ২১
গ্রামে যাই নাড়ীর টানে ২১
Let us share ২২
রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগিরা ২৩
সালোয়া (মাহা) সাদ ২৩
তিনি হাঁটেন ছোট পায়ে ২৪
মা দিবস ২৫
মৃত্যু ২৬
আমাদের সেই গ্রাম, এই গ্রাম ২৭
শহীদ পরিবার ২৮
ডায়াবেটিস ইপিডেমিক/ওবেসিটি প্যানডেমিক ২৮
এই গ্রাম সেই গ্রাম ২৯
এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ৩০
চলুন গ্রামে যাই ৩০
My mother: ROKEYA BEGUM ৩১
পর্যবেক্ষণ ৩৩
রমাদান করিম ৩৩
ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কৌতূহলী বিদেশির দেখা ৩৪
চায়ের রাজধানী ৩৫
একটি শিক্ষণীয় গল্প- হারবেন কেন? ৩৬
ডাক্তার সমাচার ৩৭
ডাক্তারের ফি ৩৭
এবার অন্যভাবে বলি ৩৭
আজ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন দিবস ৩৮
১৯৭৫ সাল, ১৫ই আগস্ট, বঙ্গবন্ধু ৩৮
৪০ বছর পর K31 বন্ধুদের মেডিকেল ক্যাম্পাসে একত্রিত হবার উদ্যোগ ৩৯

ভাবতে কষ্ট হয় ৩৯
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (২০১৫) ৪০
শৌচাগার সমাচার ৪১
Evolution / বিবর্তন ৪২
যাত্রা সংক্ষিপ্ত হোক ৪৫
জ্বর হলে কি করবেন ৪৬
এলামনি (ALUMNI) ৪৭
পান্তা পর্ব ৪৮
২৫ টি প্রশ্ন আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তর ৪৮
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - ৫০
Exclusive jokes ৫১
How to upgrade your esteems (expectations) ৫১
যতদূর মনে পড়ে (হাইস্কুলের পূনর্মিলনীতে দেয়া বক্তৃতা) ৫২
জয় বাংলা শ্লোগান কবি নজরুল ইসলাম থেকে ধার করা ৫৫
দ্রোহী নজরুল ৫৬
নজরুল প্রাণের কবি ৫৭
কচিকাঁচার বিদ্রোহ - এক নতুন ইতিহাস ৫৮
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ৬০
আজ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ৬১
নতুন অভিজ্ঞতা ৬২
প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী পাবনার কৃতি সন্তান ড. অরুণ বসাক ৬৩
করজোড়ে বলছি ... ৬৪
বাঁচতে গেলে ডাক্তারদের জানতে হবে ৬৫
করোনা ও আমরা ৬৭
করোনা ভ্যাকসিন ৬৮
বাঁচার জন্য পড়ি; পড়ার জন্য বাঁচিনা ৬৯
কক্সবাজার-then? ৭০
কক্সবাজার ১২০ কিমি দীর্ঘ বিচ (পৃথিবীর দীর্ঘতম) ৭১
কক্সবাজার নামটা একজন ইংরেজ শাসকের নাম থেকে ৭৩
K-30 আবদুর রহমান সিদ্দিকী ভাইয়ের অসম্ভব সুন্দর একটি লেখা! ৭৩
ভাবুন, ভাবতে থাকুন ৭৫
শীত আর বয়স ৭৬
হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস (ইথেন – মিথেন) ৭৭
ভাওয়াল রিসোর্ট ৭৯

ডা. তামজিদের লেখা প্রাসঙ্গিক অভিব্যক্তি (করোনাকালীন)	৮০
কাদরী স্যার	৮১
আর গল্প নয়	৮২
কথোপকথন	৮৩
ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের নামকরণের ইতিকথা	৮৪
ইতিহাস কখনো ভুলে যাওয়ার নয় – শেরে বাংলা	৮৭
সন্তানের জন্য চমৎকার শিক্ষামূলক উপদেশ	৯৩
Enjoy your moments	৯৪
শম্পা রাণী মণ্ডল- প্রতীকী চিকিৎসক	৯৫
আমাদের শরীর যদি একটা ছোট্ট শহর হয় তবে ...	৯৭
তরুণদের মনের ভাষা	৯৮
পুত্রকে চেনা যায় বিয়ের পর	১০০
এক রোগীর প্রশ্ন	১০০
আগে প্রকাশ না আগে বিকাশ	১০০
মোবাইলটা অসময়ে বেজে উঠল অচেনা নাম্বার	১০১
মুসলিম ফরায়েজ	১০২
শফিকুল ইসলাম (ডিআইজি, বরিশাল রেঞ্জ) প্রেসিডেন্ট পদকে ভূষিত	১০২
রাষ্ট্রপতির হাতের সম্মাননা	১০৩
নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে- কি করে হলো ‘বাংলাদেশ’ নাম	১০৪
দুপুর দুটোয় বাড়ী ছাড়লাম	১০৫
সব অসুখে এ্যান্টিবায়োটিক নয়	১০৬
সেপ্টেম্বর ১৮/২০১৭ ডাক্তার পার্টি	১০৭
বাংলা বর্ষবরণ	১০৮
হু কিল্‌ড্‌ মুজিব	১০৯
৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস “প্রতিপাদ্য”	১১০
যুক্তফ্রন্ট সরকার ও পয়লা বৈশাখ	১১১
লুটপাটের একটি সরল হিসাব	১১২
একটি সরল প্রশ্ন, এর নাম উন্নয়ন নাকি লুণ্ঠন?	১১৩
Islamophobia	১১৩
স্বাস্থ্য সেবা Sale-এ দিয়ে ভারতের আয়	১১৩
Beware / সাবধান	১১৪
আগে রাষ্ট্রকে আইন মানতে হবে	১১৫
বাড়ি যেতে কতক্ষণ লাগে?	১১৬
ছাত্রদের ভাষা খারাপ কেন তার জবাব	১১৭

ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক নয়	১১৮
ডেঙ্গু ও প্লাটিলেট	১১৯
কিছুদিন আগে ড. ইউনূস বলেছিলেন দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠাবেন	১২০
আমাদের ড. মুহাম্মদ ইউনূস	১২১
হুমায়ূন আহমেদ: অসাধারণ প্রতিভাধর বাঙালী	১২৩
ইলিশ-তত্ত্ব	১২৩
ইসলামে স্ত্রী এবং গার্লফ্রেন্ড	১২৪
খুশি / অখুশি	১২৫
Where there's a will, there's a way	১২৭
অনিবার্য পরিণতি আর-বাঁচার জন্য আত্মোপলব্ধি	১২৯
ইসলামের জন্যে	১৩০
ইসলামিক বিধান	১৩১
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ডাক্তার আফজালুন্নেসার স্মৃতিতে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনার	১৩২
আমরা অনেকেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রমজানের কথা জানি না হয়তো	১৩৪
আমার একান্ত কথা ...	১৩৫
এই মসজিদ, মন্দির কি অপূর্ব জায়গা?	১৩৬
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চাকরি করার সময়	১৩৭
কি ভাবছি	১৩৮
করোনা বিপত্তি	১৪০
চেষ্টা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়	১৪১
জীবন চরিত	১৪২
ভাগ্যিস বিজ্ঞান এসব আবিষ্কার করেছিল; নইলে জানাই যেত না যে কুরআনে আগেভাগেই এতকিছু বলা আছে!!!	১৪৩
রিজিক নিয়ে এতো সুন্দর লেখা আগে পড়িনি	১৫৫
শিক্ষাণীয় পোস্ট ...	১৪৬
শুনশান রেল স্টেশন	১৪৭
সময়টা ১৯৮৩ সাল। কফিহাউজের ইতিহাস	১৪৮
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের এমবিবিএস, এফসিপিএস	১৪৯
আল্লাহর দুনিয়ার মানুষ	১৫২
৭১-এর ইন্দিরা	১৫৫
জাফরুল্লাহ চৌধুরী- ভরসার জায়গা	১৫৬
পোর্ট্রেট অব প্রকৃত বাংলাদেশী	১৫৭

নবাব সলিমুল্লাহ ১৫৯
কাগমারী ১৬১
আজ হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেল ১৬২
বজ্রপাত ও বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর
২০টি নির্দেশনা ১৬৩
পদ্মা সেতু ১৬৪
পদ্মা সেতু (জেনে রাখা ভাল) ১৬৬
VALUES are not valued in our society!! ১৬৭
রক্তে চিনি কমাবো কেমনে? ১৬৯
কাপড়ে ১৫% ভ্যাট ১৭১
যারা বাংলাদেশকে পৌঁছে দিচ্ছেন বিশ্বমঞ্চে: ১৭২
সালাম জানাই পৃথিবীর সকল বাবাদেরকে! ১৭৫
ফিরে দেখা ১৭৬
উপলব্ধি ১৮১
শবেকদরের ১টি রাত ১০০০ মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ১৮২
নিজের সাথে সবাই মিলিয়ে নেই ... ১৮৩
২৪ ঘন্টা। মাত্র ২৪ ঘন্টায় বিশ্বকে নাভিশ্বাসে ফেলো দিলো
ড. মোহাম্মদ ইউনূস!’ ১৮৪
ব্যক্তিত্ব ও ইউনূস ১৮৫
আমরা জীবনে প্রথম বারের মত দেখছি ১৮৬
“উচিৎ জবাব” by Dr. Asif Nazrul ১৮৭
তবু আপনি ভালো থাকুন ১৮৮
জিয়া ও বাংলাদেশ ১৮৯
সারা বাংলাদেশ মিলে এই ছবিটার ভার বহন করতে পারবে? ১৯০
উহুদের যুদ্ধে ১৯২
রাষ্ট্র সংস্কারের সুপারিশ: এনসিপি ও বিএনপির তুলনামূলক ১৯৪
দায় ১৯৫
লীগের আমলে ড. ইউনূসকে নিয়ে যা জানতাম: ১৯৬
উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ১৯৮
তামিম ইকবালের কার্ডিয়াক এরেস্ট – গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূল্যায়ন ১৯৯
আমাদের শিক্ষা ২০০
নায়ক মান্না vs ক্রিকেটার তামিম vs কক্সবাজারের অজানা রোগী ২০০
জিল হোসেনের গল্প ২০২
কাজ চলছে, চলতে দেন ২০৪

অনেক হতাশা নিরাশার মধ্যে লাস্ট তিন-চারদিনের কয়েকটা সুখবর
আপনাগো শুনাই। দেশের ভালো শুনাইতে এবং শুনতে ভালোই তো লাগে ২০৬
নবগঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির লিডারশিপ স্ট্রাকচার ২০৭
ড. ইউনূসের Three Zeros থিয়োরি ২০৯
The unsung hero of Bangladesh ২১১
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের অর্জন ২১২
অভিজ্ঞতা অপূর্ব ২১৩
LONDON ২১৪
হো চি মিন ২১৫
(সায়গন কথাটা অনেক প্রতিষ্ঠানের Address-এ লেখা আছে) হো চি মিন সিটি ২১৫
হো চি মিনের ভিয়েতনাম (প্রোফাইল) ২১৬
কুচি টানেল ভিয়েতনাম: Thrilling অভিজ্ঞতা ২১৭
ভুটান : সার্ক প্রতিবেশী ২১৮
কোলকাতা ভ্রমণ ২১৯
ভরসা রাখুন আল্লাহর উপর: সুদিন আসবেই ২২০
Foregiveness : Nelson Mandela ২২১
মালদ্বীপ ২২১
ইন্দিরার পিতা- নেহরু, স্বামী - ফিরোজ খান। তিনি ইন্দিরা গান্ধী হলেন কিভাবে? ২২৩
জাপান : সততাই যার মূল শক্তি ২২৫
শিক্ষণীয় ২২৫
দয়া করে এটি delete করার আগে, Share এ পাঠিয়ে ১৬ কোটি
বাংলাদেশীদের কাছে পৌঁছে দাও ২২৬
প্রধানমন্ত্রী হয়েই ছাড়লেন ইমরান খান। পার্লামেন্টে ১৭ ২২৭
কুচিং (অর্থ বিড়াল) পূর্ব মালয়েশিয়ার শহর ২২৮
ডা. আরিফ (K-২৯) : Arif Bhi ২২৮
মৃত্যুশয্যায় মহাবীর আলেকজান্ডার ২২৯
কিছু তথ্য জেনে নিন ২৩০
শীতের দেশ কানাডায় জীবন যাত্রা ২৩০
উইনিপেগ ম্যানিটোবা প্রদেশের রাজধানী ২৩১
শয়তানকে পাথর মারার প্রতিকী স্তম্ভ : বাঙালী প্রকৌশলী ইব্রাহীম ২৩২
ফ্রান্সের শিল্পী ২৩৩
An Israeli doctor says (Fun!) ২৩৪
আশ্চর্য এবং অসাধারণ একটি দেশ ২৩৫
ইতিহাসের এক আশ্চর্য গল্প ২৩৫

উপলব্ধি ২৩৬
চেন্নাইর চারটা ছদ্মনাম ২৩৮
ডা. বিত্রব্য ২৩৯
নেপথ্যে দায়ী কে? ওয়ারশ নেই, ন্যাটো কেন? ২৪২
মহানবী (সাঃ) ২৪৪
বাস্তবতা ২৪৪
ইউক্রেন ২৪৫
নারী মহীয়সী ২৪৭
দুঃখী কবিগুরু ২৪৭
শতায়ুর ছুঁ মন্ত্র ২৪৯
মনই বড় ২৫০
ভারতের যেসব বিখ্যাত ব্যক্তি বাংলাদেশের সন্তান ২৫১
Senior Citizens - 2022 ২৫৪
বীরের জাতি বাঙালি - ডক্টর পাপার বাংলা অভিযান ২৫৪
হেরে গিয়ে জেতা ২৫৯
শীত কাহাকে বলে (কানাডা) ২৫৯
Morning shows the day – not always ২৬০
মানবতা ২৬১
ফিলিপ মরিস কোম্পানি (মার্লবোরো সিগারেটের উৎপাদক) ২৬২
Cricket news #1983WorldCup ২৬৩
জাপানে – ট্রেনে একদিন ২৬৪
বাটা কোম্পানির বিনিয়োগ ২৬৫
এমন প্রেসিডেন্ট দরকার ২৬৬
টলস্টয় ও তার বই ২৬৭
ক্লিনটন – বারাক ওবামা : দর্শক গ্যালারীতে একসাথে তিন বেকার ২৬৮
শিমলা চুক্তি বাতিল ২৬৮
চার্লি চ্যাপলিন ২৭০
তুমি আদৌ বিষয়টি পরিস্কারভাবে, প্রমাণসহকারে জানো কিনা? ২৭১
মাহমুদ আহমাদিনেজাদ ২৭২
পাকিস্তানের হয়ে জয় বাংলা স্টিকার নিয়ে মাঠে নেমে দুনিয়া চমকে দিলেন ২৭৩
এই বাংলার সন্তান, বাঙালীর সন্তান ১৮ বছরের টগবগে যুবক, ক্রিকেটার ২৭৩
সততার বীজ ২৭৫
Canada welfare state : অটোয়া ২৭৭
বিশ্ব শ্রেষ্ট ২৭৮

আবদুল গাফফর খান ২৮০
সত্য সবসময় সুন্দর ২৮২
উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম ২৮৩
লক্ষ্ণৌ হাসপাতাল ২৮৪
বিদায় হজ্জের ভাষণ ২৮৪
হেনরি কিসিঞ্জার ২৮৭
কেন ক্ষমা চাইবো আমি? বরং রাষ্ট্রপতির উচিৎ আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া ২৮৯
কিয়ার স্টারমারের নৈতিক পরাজয়! ব্রিটেন কেন অধ্যাপক ইউনূসের
সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গেল? ২৯১
বৃদ্ধ বয়সে ভালো থাকার ২০ উপায় : ২৯২
বিশ্বাস করুন আর নাই বা করুন, বাংলাদেশে এই নামের নদীগুলো আছে ২৯৩
উনার নাম সৈয়দ আলী ২৯৫
Knowledge ২৯৫
PK das wall ৩৯৬
Author unknown ২৯৭
সাল-সারা (সিরিয়া) ২৯৮
দালাল ২০০
ইজ-রায়েল স্বীকার করেছে ৩০০
ইরানীর ছাত্রী ৩০৩
ইতিহাস সবার জানা উচিত ৩০৪
জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ফাঁসি দেয়ার জন্য ৩০৮
সন্তানকে না বলা মায়ের কিছু কথা... পুরোটা পড়লে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে৩০৯
– মায়ের ডায়েরি ৩১০
Housewife 311
একজন আমেরিকান পর্যটকের চোখে ইরান ৩১২
শুভ জন্মদিন: প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জন্মদিনের শুভেচ্ছা রইল ৩১৩
পালিয়ে যাওয়া মেয়ের প্রতি বাবার চিঠি ৩১৬
“কালেক্টর ম্যাডাম, আপনি মেকআপ করেন না কেন?” ৩১৭
Steve Jobs ৩২০
দেওয়ালে হাতের ছাপ ৩২১
মনসুর হেলাল, নি-হ-ত শিক্ষিকা মাহেরীন চৌধুরীর স্বামী ৩২২
এ জেড এম শামসুল আলম ৩২৩
বাংলাদেশ : গণ অভ্যুত্থান ২০২৪ স্মরণে জুলাই ২০২৫ ৩২৬
নিখোঁজ নন, গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন জহির রায়হান ৩২৯

From Roots to White Coats: A Father's Silent Sacrifice and the Daughters Who Changed the World. ৩৩২
জেনারেল ডায়ের ৩৩৩
হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর পোস্টার ৩৩৪
মুসলমান হওয়ার অপরাধে ৩৩৫
মসজিদ তো ভাংচুর করছো মন্দিরের কথা কি ভাবছো? ৩৩৮
বাবরী মসজিদ ৩৪২
রুমিন ফারহানা বনাম হাসনাত আব্দুল্লাহ ৩৪৬
হানাদার পাকিস্তানিরা যা করেছিলো ৩৪৬
ইনানি-কক্সবাজার ঘুরতে যাওয়া ৩৫০
কক্সবাজার গেলেন -ইনানি গেলেন না ভ্রমণ অসম্পূর্ণ! ৩৫১
বাস্তবতা-ইতিহাস ৩৫২
সারওয়ার আপনাকে মিস্ করি ৩৫৪
মানুষ কখনো ধর্ম নিরপেক্ষ হয় না ৩৫৫
দুঃখজনক হলেও সত্য ৩৫৬
শেরেবাংলা তখন শিক্ষামন্ত্রী ৩৫৮
এই পোস্ট আপনার পড়া উচিত শেয়ার করা উচিত জানা উচিত ৩৫৯
তাসনিম জারা বাংলাদেশের ইতিহাসে ১ম মেয়ে ৩৬১
যতই পাইক্কারা আসুক : ইন্দিরা ৩৬২
Can u judge who is the better person out of these 3? ৩৬৪
আগামীকাল আপনি মারা যাবেন ৩৬৫
জুলাই সনদ স্বাক্ষর ৩৬৬
আপনি আর বড়োজোর মাত্র ১ বছর বাঁচবেন ৩৬৮
জোহরান মামদানির বিজয় ৩৬৯
ডাঃ মাহাথিরের পূর্ব পুরুষ চট্টগ্রামের ৩৭০
দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রফেসর ৩৭১
হায়দ্রাবাদ একটা মুসলিম রাষ্ট্র ঠিক কিভাবে ৩৭৩

রোজা-রায়েদ চলে গেলো

বাবা,

সকাল ১০টায় ঘুম থেকে উঠে দেখি তোমার মা চোখ মুচ্ছেন। উঠে জিজ্ঞেস করার পর পানিটা গড়িয়ে পড়লো মনে হয়। নিজেকে সামলানোর জন্য দ্রুত washroom এ চলে গেলাম। সকালের chamber শেষে বাড়ী আসলাম (৩টা)। বাড়ী ঠাণ্ডা, নীরব। তোমার মা বিছানার কোনায় ঠায় বসে আছে। চারু কলেজ থেকে এসে ঘুম।

গতকালকের বাসা আর আজকেরটা reverse. তোমাদের উপস্থিতি রোজা-রাইদের স্বশব্দ বিচরণ একটা মাস ভুলিয়ে রেখেছিল সবকিছু থেকে। রোজার demanding জিদ সবাইকে স্বকর্ণ তটস্থ রাখতো। রাইদের দাদার কোলের প্রতি অকৃত্রিম insisting আগ্রহ আর কোল না ছাড়ার স্বশক্তি ইচ্ছা বিমোহিত করত। শুধু আমি নই সবাই বিস্মিত হতাম কিসের এত আকর্ষণ কি উপলব্ধিতে ও করত এটা। ৯ মাসের ছেলে সপ্তাহের মধ্যে চিনে ফেলল আপন জনকে! এখন বাসায় ঢুকলে ফাঁকা লাগে মনে একটা অজানা অনুভূতি জাপটে ধরে। ছোট্ট রাইদের অনুভূতি টের পাই। দরজা খুলেই জোরে "রোজা" ডাকদেবার সে প্রবণতা জেগে উঠে। মনে হয় হারিয়েছি অনেক কিছু, হারাচ্ছি অহর্নিশ। বাবা, মনে পড়ে ছোট বেলায় যখন তোমার মাকে বলতে সবার বাবা সন্ধ্যায় বাসায় থাকে আমার বাবা কেন নাই। ডাক্তার বাবার সকালে বারডেম রাতে চেম্বার উপলব্ধি না থাকলে ও অনুযোগ ছিল যথার্থ। ৪ বছর পর আসলে! আজ এ কাজ, কাল ওটা সর্বক্ষণ ভাবি একান্তে পাব – মন খুলে বলব। ঘর ভরা মানুষ তৃপ্তিহীন থাকি। মাস ফুরিয়ে গেল, না হলো পাশে বসা, না হলো কাছে ঘেঁষা।

আমার involvement কমেছে, ফুরসত বেড়েছে, কিন্তু পরিজন দিয়ে ঘেরা তুমি যে রীশু থেকে রেশাদ হয়ে গেছ! সুযোগ হারিয়ে গেছে। দাদী-খালা-খালু-শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ভাগ করে খেয়ে নিয়েছে আমার, আমাদের সময়। তোমাদের প্রয়োজন আর desire অনুযায়ী বোনের, শ্যালিকার আক্দ attend করলে। আমার কথা শুনে দাদী বাড়ী গেলে AQF দেখলে। যেমনটি বলেছিলাম – পাবনা থেকে ফিরতি পথে রূপপুর পারমানবিক স্থাপনা, দেশের তৃতীয় বৃহত্তম লালন সেতু হয়ে স্বপ্নের পদ্মা সেতু দিয়ে ফিরে আসলাম। তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হলো। পদ্মা পাড়ে "শখের হাঁড়ির হোটেল" এ আয়েশ করে লেজ ভর্তা সহ রকমারী ইলিশ ভক্ষণ was also a long cherished desire. সব জায়গায় remained busy with kiths and kins as well as আপ্যায়ন আর আতিথেয়তা। চেয়ে থাকলাম কিন্তু হারাতে থাকলাম সময় আর আত্মজ করে পাওয়ার wishdoms.! ভাবলাম কক্সবাজার গিয়ে ২-৩ দিন থাকি। একান্তে, আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ থাকবেনা সেখানে। কিন্তু না তৃপ্তি নাই: পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না। বুঝে উঠা হলো

না মন কি চায়। আতাটা (sweet apple) পেকে উঠতে পারলোনা; গাছ পাকা পেঁপেটা কাটা হলো না তোমরা চলে গেলে। তোমার মায়ের nascent খেজুরের গুড়ের পাটালী ও এবারে আর খেতে পারলেনা। কি আর বলবো ক্রোশ, যোজন নয় সহস্র মাইল (৭৩৩৬ মাইল, ১১৭৭৮ কি মি) দূরে সেকেন্ড মিনিট নয় ৪৪ ঘণ্টা ধরে যাই একান্তে থাকার জন্য। টরন্টো, আরবারগ, উইনিপেগ অশোয়া যাই দেখা হয়। টিম হর্টন, বেগেল, ফিলাফিল খাই। কয়েক সপ্তাহ থেকেও হয়না, পুনর্মিলনের প্রত্যাশা নিয়ে চলে আসি। ফেরার সময় সেই অতৃপ্তি, সেই অপূর্ণতা – সেই শূন্যতা, প্লেনে উঠে মনে হয় নেমে যাই, ফিরে যাই। উচ্ছ্বসিত হয়েছি AQF অনুরাগ দেখে। তোমাদের অনুদানে দুজনের চার (৪) চোখের ছানি অপারেশন করে দেয়া যাবে। সৌদীতে থাকাকালীন বাবা বলতেন চিঠি দিও, ফোন করো। যখন বললাম, u have 7 plus children. He told, বাবা হলে বুঝবেঃ Now I really realise what a son what a grand son is!

আমার মা, আমাদের মা, আমাদের ১১ ভাই-বোনের মা

আমার মা, আমাদের মা, আমাদের ১১ ভাই-বোনের মা। সবার কাছেই মা অনন্যা, আমাদের কাছেও আমাদের মা তাই-ই। মার অনেক কথার মধ্যে একটি কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। আমি এস.এস.সি পরীক্ষার পর রেজাল্ট এর জন্য যখন অপেক্ষাতে ছিলাম, তখন দুইজন এস.এস.সি পরীক্ষার্থীর অনুরোধে তাদেরকে অংক পড়িয়েছিলাম। একমাস পর ওরা আমাকে প্রায় একশ টাকা দিয়েছিল, টাকাটা পেয়ে আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, কারণ টাকা দেবে এরকম কোন কথা ছিল না। যাই হোক, টাকাটা পেয়ে আমি জীবনের প্রথম উপার্জন বলে খুশিই হয়েছিলাম এই ভেবে যে মাকে কিছু একটা কিনে দিতে পারব। যথারিতী মাকে যখন টাকাটা দিতে গেলাম, আমি এক অন্য মাকে দেখলাম, আমাকে প্রচণ্ড বকা দিয়ে বললেন, “তোর লজ্জা হলো না টাকাটা নিতে, তোর কি জ্ঞান হয়েছে যা বিক্রি করে তুই টাকা নিলি? আমার প্রায়ই মনে হয় আমার আসলেই কি কোন জ্ঞান হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে আমেরিকাতে এই দীর্ঘ দিন অধ্যাপনার কাজ করছি???। আমার মা এখন প্রায় ৯১ বছর বয়স, আপনাদের দোয়ায় আমার মা ভালো আছেন, আপনার মায়ের সাথে সাথে আমাদের মায়ের জন্যও দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ রাখেন এবং দীর্ঘায়ু দেন (মা দিবসে গোলজার)।

তিনি আমাদের পরিবারের কারো বাবা, কারো ভাই, কারো অভিভাবক

তিনি আমাদের পরিবারের কারো বাবা, কারো ভাই, কারো অভিভাবক, সর্বোপরি

তিনি আমাদের একজন বটবৃক্ষ। যার ছায়ায় আমরা সবাই থাকতে ভালোবাসি। যিনি আমাদের সবাইকে সব দুশ্চিন্তা থেকে আগলে রাখেন, দূর থেকে তাঁর শোনা কণ্ঠস্বর আমাদের জীবনকে উজ্জীবিত করে। আমাদের দুঃসময়ে মনের অজান্তেই তাঁর চেহারা ভেসে উঠে। তিনি আমার ভাসুর ডাঃ খাজা নাজিম উদ্দিন। আজ তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পদকে ভূষিত হয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন ভাই!

প্রায় ২৭ বছর আগে আমি এই পরিবারের বউ হয়ে আসি তখন থেকেই ভাই কে যত দেখেছি অবাক হয়েছি প্রতিনিয়ত। অসাধারণ তার জীবনবোধ। সাফল্যের শীর্ষে থেকেও অতি সাধারণ তাঁর জীবনযাপন, যা সত্যিই অনুকরণীয়। একজন মানুষ তখনই সফল হন যখন তিনি ভাল মানুষ হন। তিনি একজন ভালো ও বড় মনের, বড় মাপের মানুষ। আমাদের চোখে তিনি একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধার আর ভালোবাসার মানুষ। চিকিৎসক হিসেবে তিনি সবার কাছে অনন্য হয়ে থাকবেন এই প্রার্থনা করি। আমাদের ভাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন বেঁচে থাকার প্রতিটি দিন। অনেক অনেক শুভকামনা।

গ্রামে যাই নাড়ীর টানে

গ্রামে যাই নাড়ীর টানে। মাকে দেখা, সাথে সোশ্যাল সার্ভিস। মাসে একবার দুদিনের জন্য ব্যস্ততর জীবনের বিরতি; যদিও বাস্তবে ঐ দুদিন আরো busy থাকি তবু মনের দিক থেকে i feel really relaxed. টাংগাইলের নির্মীয়মান রাস্তার অলংঘনীয় জ্যাম, চারলেন ভবিষ্যত জেনারেশনকে সুবিধা দিবে বৃহত্তর ভবিষ্যতের স্বার্থে ইদানীংকার ভোগান্তি তাই ক্ষুদ্রতর।

আগে রওয়ানা হতাম ৮-৩০/৯টায় এখন ৭-৭.৩০ টায়; টারগেট আসরের নামাজের পর বসা।

উঠেই মাইক্রোর সীট ফেলে দিয়ে পা লম্বা করে দিয়ে ফ্ল্যাট। প্লেনের বিজনেস ক্লাসের মত আরামে চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর প্রয়াস। দুঘন্টা পর (এখন যদিও সময় বেশি লাগে) চন্দ্রা পার হয়ে শিলা বৃষ্টির উল্টো দিকে 'ফাইভ স্টার মায়ের দোয়া' টং চা'র দোকান-গরুর দুধের চা। যাওয়ার সময় গাড়ীর ক্যাসেটে রবীন্দ্র/ নজরুল গীতি তন্দ্রালু করে আমাদের। গাড়ীর মৃদু ঝাঁকিতে সহযাত্রী ঘুমালেও ঘুমানো হয়না প্রায়। তবে ২ ঘন্টার রাস্তা ৫ ঘন্টা লাগলে বিরক্ত লাগে any way forget everything while steps into mother's house/room!

ঢাকায় রাতে ১২টা সাড়ে ১২.৩০ টার আগে বিছানায় যাওয়া হয়না, এখানে টার্গেট সাড়ে দশটা এবং সেটা achievable- সমস্যা হলো সকালে। ভোর ৪টা৩০; কুক্কু কু, মোরগের ডাক, রাত্রির নীরবতা ভেঙ্গে কান ভরে দেয়া শব্দ;

একবার নয়, বারংবার। ৪-৪৫ টা – সব মুরগীগুলো একসাথে ডেকে উঠলো, যেন ওদের বাড়ীতে ডাকাত পরেছে। শুধু তাই নয়, এবার শুরু হলো হংসের রাজা রাজহাঁসের গলাফাটানো ডাক। সেকি ডাক (!), simultaneously মোরগ, মুরগী আর রাজহাঁস। ঘুম নষ্ট করলেও ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা, enjoy করার মত! বিদ্যুত আসার পর গ্রাম তো আর গ্রাম নাই, অনেক দিন পর মনে পড়ল ভোরের কলকাকলি, আগে বাগানের পাখির কিচির-মিচির শুনতাম।

ছোটবেলায় আমরা বলতাম পরভাতে (প্রভাতে) পড়া। রাতের আঁধার ভেঙ্গে মোরগের ডাকই ছিল মাইল ফলক, ডাক শুনেই শুরু করতাম। হারিকেনের আলো/কেরোসিনের টিমটিমে প্রদীপই ছিল light source; আর এখন এত আলো চারিদিকে! ভাবতেই কেমন লাগে। নস্টালজিক হতে হয়; ঐ বাতি/আলো দিয়েই প্রাইমারী, হাই স্কুল; SSC, HSC!

যাই হোক যা বলছিলাম, এরপর সাড়ে পাঁচটায় ফজরের আজান। মোয়াজ্জেম শুরু করল ধর্মীয় শ্লোগান দিয়ে। গ্রামের চার/পাঁচটা মসজিদের আজান মাইকিং প্রায় সমস্বরে, স্ব স্ব ভঙ্গিতে! মোবাইলে স্নুজিং ৬টায় -বাজার আগেই জেগে গেছি। উঠে পড়লাম, ফজরের জন্য।

Let us share

প্রতি মাসেই বাড়ী গিয়েই মায়ের হাতে একটা নির্দিষ্ট টাকা দিই। মা বলায় সামান্য কিছু বেশি দিলাম। আমি যাওয়া আসা হিসেব করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে যাই। হঠাৎ অনেক অতীতের একটা কথা মনে পড়ল। আমি তখন সৌদী আরব। বাবা লিখলেন 'এখন তো আর আমি শুধু কাসেম প্রাং নই, ডা. খাজা নাজিমুদ্দীনের বাবা' – সবাই দাওয়াত টাওয়াত দেয়। ভাবলাম হিসেবের সংসার, অপ্রয়োজনীয় খরচ করা যাবেনা। বাবার চিঠির উত্তরে প্রসংগটা এড়িয়ে গেলাম। সৌদী থেকে চাকুরী ছেড়ে আসলাম জুনে; নীরোগ বাবা রোড এক্সিডেন্টে মারা গেলেন সেপ্টেম্বরে। ঐ চিঠি ঐ লেখা আমার মনের গভীরে বিষফোঁড়া হয়ে রইল; আজ আমাদের সব আছে, আল্লাহর মর্জি হাত খুলে খরচ করার সামর্থ ও আছে, বাবা নাই; বাবাকে আর কোন দিন পাবোও না!

পরের দিন আসার সময় মার হাতে আরো কিছু দিলাম। মার কোন অভিব্যাক্তি নাই, মা এমনই – পরে বললেন তার দুধ দেয়া গাভীটা হঠাৎ করেই মারা গেছে, আমার স্বাবলম্বী মা ১১ সন্তানের দ্বারস্থ হতে চাননা!

শুনলাম মায়ের সেটটা খারাপ, কথা শুনা যায়না। মা আমার কাছে কোন অনুযোগ করলেন না, নতুন সেটও চাইলেননা। বোধকরি কোন সন্তানকেও বলেন নাই; স্বল্পে তুষ্ট মা আমার! ঢাকা এসে নতুন সেট কিনে পাঠালাম।

জানি শেয়ার করতে গিয়ে যাদের মা (জীবিত) আছেন গলা আড়ষ্ট হবে, auto অশ্রু আসবে। যাদের নাই তাদেরকে অনুরোধ please pray for my mom!

রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগিরা

আজ ৩রা সেপ্টম্বর। ১৯৯৪ এর এই দিনে আমার বাবা রোড এক্সিডেন্টে মারা যান। আমরা ১১ ভাইবোন কাছে ছিলাম না, বাবার মুখে এক ফোঁটা পানি দিতে পারি নাই। আমরা তিন ভাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ মোটামুটি এস্টাব্লিষ্ট; একটি পয়সাও খরচ করতে পারিনি বাবার জন্য; এ দুঃখ আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে অহর্নিশ! স্বশিক্ষিত বাবার একদিনের কথা বলি – ইনসার্ভিসের সময় (‘৮০) অঘোষিতভাবে রাতে বাড়ী গেলাম। সাড়ে এগারোটায় খাবার খেয়ে সবে শুয়েছি। বাবা ডাকলেন রোগী দেখতে হবে। ক্লান্তি লাগছিল, এপাশ ওপাশ করছিলাম। পাশের গ্রাম থেকে গরুর গাড়ী করে ওরা এসছে, আসলে আতাইকুলা বাস স্টপেজে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে যখন নামি ওরা দেখেছিল। ওরা রাজশাহী যাবার প্ল্যানে বেরিয়েছিল। আমাকে দেখে রুট চেঞ্জ করে আমাদের বাড়ীতে গেছিল। সকালে জেগে দেখি বাবা বসে আছেন। বললেন রাতে বিরক্ত হয়েছিলে মনে হয়? খেদোক্তি করে বললেন। সারা মাস উঠানে বসে থাকি একটা মাছি ও উঁকি দেয়না, আজ তোমাকে দেখে বৃষ্টি বাদল মাথায় করে মধ্য রাতে ওরা আসলো; তোমার কাছে দরকার, দরকার বলেই এসেছিল। (ততোধিক দৃঢ়তার সাথে) আমি চাইনা আমার কোন লোক তোমার কাছে এসে ফিরে যাক’। That was my learning in initial days of career. এখন বুঝি মানুষকে সার্ভিস দিতে পারা কি সৌভাগ্যের-it came from my father যার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, উনার কোন স্কুলে যাবার সুযোগ হয়ে উঠে নাই জীবনে। আমরা নামীদামি প্রতিষ্ঠানেই পড়াশুনা করেছি। ২৪ বছর আগে হঠাৎ করে মারা গেলেও কেউ বলে নাই তার কাছে টাকা পাবেন। সংসারে স্বাভাবিক ভাবেই টানাটানি ছিল but he didnot have any loan! হয়তোঃ সব বাবাই এমন, ভাবতে কষ্ট লাগে; গলা আটকিয়ে আসে।

সালোয়া (মাহা) সাদ

Osteoporosis 2019 attend করার জন্য অকুস্থল হিথ্রো শেরাটনে বুকিং দেয়া ছিল শেষের দুদিনের। উদ্দেশ্য দুদিন আগে লন্ডনে এসে ভাইয়ের বাসায় থাকব। Last 2 day তে CME শেষ করে চলে যাব। হোটেল যেহেতু বিমান বন্দর compound এর মধ্যে সেহেতু এমন প্ল্যান। প্রথম দিন ভাইয়ের বাসায় গেলাম। স্কুল থেকে ফেরার পর ভাইয়ের wife মেয়েকে বলল “your uncle is here”. মেয়ের উত্তর – আমি আগামী কাল স্কুলে যাচ্ছিনা, according to her she planned it, মা বললেন have exam tomorrow . মেয়ের তড়িৎ উত্তর

“my uncle is more important than exam mum”. Hearing this, its very difficult to leave her behind .আমি আর হোটেলে গেলামনা। সাদ ভাইয়ের প্রাইমারীর ছেলে পড়া শেষ করে আমার ঘরে আসল ঘুরে ঘুরে very fast english বলে; বুঝলাম tube এ আমার ntv programme দেখাবে, শেষ হলো, যায়না? বলল word making খেলবে। বারবার জিজ্ঞেস করছে শুয়ে পড়তে চাই (English শ্রুতিমধুর ছিল!) কিনা। পরদিন বাবার অনুমতি চাচ্ছে আমার সাথে শুতে পারবে কিনা। মহাখুশী আমার পাশে শুয়ে। গলা জড়িয়ে, গায়ের উপর পা দিয়ে কত ভঙ্গিতেই না ঘুমাল! এর মধ্যেই কথা আদায় করে নিয়েছে next day I shall drop him to school; বুঝতে বাকি রইল না উদ্দেশ্য একটাই যতক্ষণ আমার সাথে থাকা যায়! স্কুলে গেট পেরিয়ে ক্লাস রুমে ঢোকার আগে বারংবার ফিরে আসছিল আর হাত তুলে টা টা দিচ্ছিল। dinning table এ আমার ফিরে যাবার কথা উঠলো। দুজনাই আপত্তি করে উঠলো। ওদের বাবার প্রশ্নোত্তরে মেয়ে বলল forever! আর সাদ চায় আমি পাঁচ সপ্তাহ থাকি। দেশে ফিরে পৌঁছানোর খবর দিতে টেলিফোন করার পর ওদের মায়ের কাছে যা শুনলাম ... ছেলে অশ্রু সংবরণ করতে পারে নাই! ৭ বছরের সাদ (ভাতিজা আমার!) এক এক করে তিনবার শ্রেণী কক্ষ থেকে বেরিয়ে চক্ষু মুছে গেছে। ওদের বাবা আমার জন্য কি করে সেটা আর না-ই বললাম! আমার সব ভাইবোনই আমার জন্য নিবেদিত প্রাণ। ওদের বাচ্চারাও যে এতটা? সত্যিই ভাবিনি! সন্তান স্নেহে, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব চিরন্তন, সার্বজনীন; সন্তানের মায়া যে গভীর, মমতা গভীরতর! এখন মনে হচ্ছে গোলাম মোস্তফার ঐ লেখাগুলো ‘মরিতে চাহিনা এ সুন্দর ভূবনে’!

তিনি হাঁটেন ছোট পায়ে

তিনি হাঁটেন ছোট ছোট পায়ে, একেবারে নিঃশব্দে। এ ঘর থেকে ও ঘর, এ উঠান থেকে ওই উঠান, এবাড়ি থেকে ওবাড়ি, কখন ও আবার রাস্তার ওপাশের বাড়ি। ক্লান্ত হলে শুয়ে পড়েন ছোট সোফায়, ফুলীর বিছানায়; মা তুমি এতো গরমে এখানে? গরম কোথায় পাস, তুই ঠাণ্ডার দেশের লোক, তোর যত গরম! শুয়ে পড়লে যে? পিঠটা ব্যথা করছে, তাই শুয়ে। শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা, তবুও সারাক্ষণ হাঁটেন, কাউকে হাঁক ডাক নেই, এটা আনো, ওটা দাও কোনো আদেশ নাই কারো প্রতি। নিজের কাপড় নিজে ধুবেন, নিজের ঘর নিজে গোছান; পারেন না তবুও করবেন! জিদ, না করতে পারার অক্ষমতা কাউকে বলতে চান না; ভীষণ অসম্মানজনক মনে করেন। কখন ঘরে ঢুকছেন, কখন বেরুলেন বোঝা মুস্কিল, দরজাও বন্ধ করেন নিঃশব্দে। গভীর রাতে লাগোয়া বাথরুমে ওযুর আওয়াজ নাই, নামাজেরও শব্দ নাই!

মা, মশারীর ভিতর ঘুমাও, না দম বন্ধ লাগে ; গরম, এসিটা বাড়ায়ে দিই? না তোর গরম লাগলে দে, বলেই দূরে ঘুমাবেন। ভোরে উঠেই রান্নাঘরে, কাউকে কাজে বলে, নিজেও হাত লাগাবেন। নিজেকে কর্মহীন ভাবা এক অসম্ভব ভাবনা ! মা, একটু জিরিয়ে নাও, এখন নয়, ক্লান্ত লাগলে।

এতগুলো ওষুধ লাগে প্রতিদিন, কিভাবে মনে রাখো? কখন কোনটা? এটা তো কঠিন কাজ না!

মা, তোমার এতো ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে নেই, খারাপ লাগেনা ? আবার এই কথা (ধমকে উঠেন)? "বাড়িতে শব্দ কম, শুনশান, দুপুরে আরো চুপচাপ। এ বাড়িতে যখন প্রথম আসি তখন অনেক পোকা-মাকড় আর পাখির আওয়াজ ছিল এখন তাও নাই "তোর মনে নাই? "কাক, হুতুম, ঘুঘু, শিয়াল আর গরু-বাছুরের সাথে মানুষ জনের হই হুল্লোড় ; তোরা সব সাথে করে নিয়ে গেছিস" "তোরা তো না বললে ফোনও করিস না!" "জীবনের সব পেয়েছি, এখন শুধু সক্ষম থাকতে চলে যেতে যাই"। বলা নিষ্প্রয়োজন, এটা আমাদের অশীতিপর (৮৫ বছর) মাকে নিয়ে লেখা। কানাডা প্রবাসী প্রকৌশলী খাজা আঃ লতিফ।

মা দিবস

মার কথা মনে হতেই চোখের সামনে ভেসে উঠে একটি মুখ। নিরহংকার শত সমস্যারও মধ্যে সততা আর কাজই যার জীবনের উপলব্ধি। ১১ সন্তানের টানাপোড়োনের সংসারের চালিকাশক্তি মা আমার কি কষ্টই না করেছেন! রাত সাড়ে এগারটায় শোয়ার পর ভোর সাড়ে চারটায় ধান সিদ্ধ, দিন ভর ধান শুকানো, মাড়ানো ধান উড়িয়ে আবর্জনা পরিষ্কার। চুলা জ্বলানো, রান্না-বান্না খাওয়ান-দাওয়ান কাপড় কাঁচা একই সাথে চলতো। Retrospective ভাবলে বুক আটকিয়ে আসে, চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে, কেমনে পারত! How?

ডাক্তার হলেও মা, প্রকৌশলী হলেও মা, সচিব হলেও মা, প্রধানমন্ত্রী হলেও মা। মা মা ই, মা একজনই হয়, মায়ের কোন বিকল্প হয়না।

মা কথাটা স্বতন্ত্র, মার অভিব্যাক্তি স্বতন্ত্র, (মার অনুভূতি উপলিব্ধ অবশ্যই স্বতন্ত্র, একান্ত তাঁরই)।

সব মায়ের মত আমার কসমোপলিটন মার সুখ ও তার সন্তানেরা Caring. বাড়ীর লোক, পাড়া-প্রতিবেশীর ভরসাস্থল এই মানুষটিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা বলতে গেলেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। চোখ ঝাপসা হতে দেখি। বুঝতে পারি তার বুকের ব্যথার কারণ। সুখ তার হারিয়ে যাওয়ার কারণ আমার বাবা! বাবা গত হয়েছেন ১৯৯৪ সালে।

বিংশ শতাব্দীতে শুরু হওয়া এনা জার্ভিসের মা দিবসে "তাবৎ মা এবং মাতৃত্বকে

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।”

মৃত্যু

ফজলু ভাই আমাদের ৮নং ভাই। আমাদের ৭ ভাইয়ের পরিবারে উনার অবস্থান এ ভাবেই নির্ধারিত ছিল। ঐদিন সকালে (১১টায়) টেলিফোন করে বললেন ঠাণ্ডা লেগেছে, কাশি হচ্ছে, ঔষধ লিখে পাঠান, যেতে পারবনা; SMS করে দিলাম। শুনেছি ভাই দুপুরে আমাদের বাসার নীচতলায় বসে ছোট বোনটার সাথে gossip করেছেন। বিকেল বেলায় improvement না দেখে ভাবী, বড় ছেলে নিয়ে এসেছে ল্যাব এইডের ইমার্জেন্সীতে; (এর মধ্যে they tried inhaler, nebulizer). ১০০% O_2 আর musk দিয়ে ঠেকানো যাচ্ছিল না, ভীষণ ভীষণ রেস্টলেস। নিয়ে গেলাম তিন তলা সিসিইউতে। Opisthotonos হয়ে যাচ্ছিলেন। Earliest possible time এ ventilator লাগান হলো! ভাবীর বড় ছেলেকে বললাম গাজীপুরের SP ছোট ছেলেকে ডেকে আনতে; crossing through the worst time! Schamber গিয়ে বসলাম। ক্ষণিক পরে duty doctor বললেন Sir ECG flat আসছে। মনে মনে ভাবতে থাকলাম inhaler এ হলোনা, নেবুলাইজার পারলোনা; ভেন্টিলেটর -তাও? নিঃশ্বাস ফিরলোনা, শেষ নিঃশ্বাস এত নিষ্ঠুর।

বক্কার ভাই, বাবার খুব ঘনিষ্ট ছিলেন, পরে আমাদের আরেক ভাই হয়ে গেলেন। আপদে বিপদে শত শঙ্কুল, হাজারো প্রতিকূল পরিস্থিতে পাশে এসে দাঁড়াতেন। গ্রাম, সংসার, সমাজ সর্বত্রই উনি ছিলেন সমঝোতার সমার্থক। বুকের ব্যথা -পাবনায় ইসিজি করেছেন; বললাম ইটিটির কথা। strong positive, indication for angio। করা হলো CAG; সবার অভিমত বাইপাস করতে হবে। শুরু হলো fit হবার পালা; Liver kidney পরখ করা। অন্যের বাসায় থাকা। টেলিফোনে বোঝা যেত অপারেশনের ভয়ে নয়, কালক্ষেপণ সইতে পারছিলেন না। সাকসেসফুল বাইপাস সার্জারীর পর ভাই বাড়ী গেলেন। আগের মতই সবার সাথে মিলে মাঠে ঈদের নামাজ পড়লেন। বিদেশ যাবার আগে ৭ তারিখ ফোন করলাম, কুশলাদি জানতে চাইলাম। প্রতিদিনের মত একই কায়দায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। স্মরণ করলেন সবার দোয়া ও চেষ্টার কথা। ২৬ তারিখ ফিরব ২৫ তারিখ শুনলাম বক্কার ভাই মারা গেছেন। বুকের উপর পাথর চেপে বসল।

You can say মৃত্যুটাই সত্য; Prefixed! Predecided!! মানুষ মরণশীল।

ভাবুন তো আপনার অফিস ঘর আছে, নেম প্লেট আছে; আপনার গাড়ী আছে

দোকানে সকালের নাস্তা (পরাটা, ভাজি মাংস, ডিম পাবেন- অতিথি সেবা এখানেই বেশি), হরেক রকম স্ন্যাকস আর অহর্নিশ চা; গরুর দুধের চা স্পেশাল আকর্ষণ। এখানে আড্ডা আর কেবল টিভি এদের নিত্যদিনের রোস্টার। সকালে বেকারির ভ্যান এসে দোকানে দিয়ে যায় স্লাইচ রুটি, পাউরুটি, বোনরুটিসহ রকমারী কোমল পানীয়।

মাকে সকালের ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত আর জমে যাওয়া পুঁটি মাছের ঝোলের কথা বলেছিলাম উৎসাহ দেখাননি। খই/মুড়ি/ছাতু পাটালী গুড়ের সকালের নাস্তার প্রচলন বোধ হয় নেই।

শহীদ পরিবার

২০ শে মার্চ শুক্রবার, ১৯৭১। একবেলায় পাকবাহিনী ঊনত্রিশ জন খুন করে। এত বড় ম্যাসাকার জানামতে অত্র এলাকায় - পাবনা জেলায় হয়নি। না অদ্যাবধি কেউ শহীদ পরিবার সুবিধা পায় নেই!

ডায়াবেটিস ইপিডেমিক/ওবেসিটি প্যানডেমিক

গ্রামে রোগী দেখি ১৮০/১৯০; ৫০% ডায়াবেটিক majority মহিলা। প্রায় সবার সুগার ১৫'র বেশি। কারণ খুঁজে দেখলাম জীবনযাত্রার মহা পরিবর্তন।

১। মাঠ থেকে ধান আনার পর মলন (গাছ থেকে ধান আলাদা করা)। আমরা দিনে তিনটা মলন দিতাম; মলনের পর মায়ের কাজ। ধান রেমন্যান্ট থেকে আলাদা, মা কুলা দিয়ে দিনভর ধান উড়াতেন। এর পর সিদ্ধ করতেন। এখন মেশিনে ধান আলাদা হয়, পরিষ্কারও হয়। বস্তায় ভরে বাজারে বিক্রি করা হয়ে যায়। বদলে ব্যাগের চাল আসে বাজার থেকে।

২। বিকেলে শুকানো ধান ঢেঁকির সহায়তায় রাতের ভাতের জন্য চাল বানাতেন। ঢেঁকি অনেক আগেই মিউজিয়ামে উঠে গেছে।

৩। চুলার খড়ি জোগাতে হয় না, গোবর শুকোনো লাগে না। ভাতের ফ্যান মারতে হয় না, চুলার মাংস ঘোটা লাগে না। রাইচ কুকার, প্রেশার কুকারে দিয়ে সুইচ অন করে টেলিভিশনের সিরিয়াল দেখা।

৪। কুয়ার বা টিউবওয়েলের পানি তুলতে হয় না। লাইনের পানিতে হেসেল, গোঁয়াল সব সাবাড়।

এই গ্রাম সেই গ্রাম

ছোট নদী ইছামতি পার হতে হতো বাঁশের সাঁকো দিয়ে। এই সেদিন (হাই স্কুল

life) পার হতে গিয়ে মাঝ নদীতে পড়ে গেলাম। দুটা সাঁকো এখন দুটা ব্রিজ, যে কোন যানবাহন দিয়ে মুহুর্তে যাওয়া যায় ওপারে। গ্রামের বাতাস আগের মতই হালকা; ভোর বেলা শীতল। পাকা রাস্তা, ধূলার বালাই নেই; (ধানমন্ডি) ২৭ নং বা ৮নং-র মত বৃষ্টিতে পানি জমে না। ছোট শহর বা ঢাকার অলিগলির ড্রেন, ওয়াসা আর বৃষ্টির পানি একাকার হবার ভয় নেই, ভয় নেই লেপ্টোস্পাইরোসিসের। এই রাস্তায় একসময় এ season এ কাদায় একাকার। পানি জমে থাকত upto thigh. এখন দুঃস্বপ্ন।

সব বাড়িতে electricity, (MB কিনলে) net, face book, safari শহরের সব সুবিধাই আছে (হারিকেন বা প্রদীপ এখন দুঃসহ স্মৃতি)। নেই শহরের কোলাহল আর ব্যস্ততা, যানজট। রাস্তায় নিওন নেই, সন্ধ্যা হলেই নিকশ অন্ধকার। বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, প্রকার ভেদে জমির ফসল চোরদের লিজ নেয়ার মত; অস্ত্রধারী আনছার লাগবে বোধ করি!

নদীতে ছেড়ে দেয়া মাছ বড় হয়েছে, ধানমন্ডি লেকের মত স্পট ভাড়া নিয়ে শৌখিন মৎস্য শিকারি সকাল থেকে ছিপ ফেলে বসে আছে (৬৫ বছরের জীবনে স্মরণযোগ্য পরিবর্তন)। আমাদের আদি পুকুর, ভাগ্নের কৃত্রিম পুকুর চাষ করা মাছে সয়লাব। ছিপ ফেললেই এক ওয়াক্তের খাবার হয়ে যায়। প্রাতঃভ্রমণে বেরুলে অনন্য দৃশ্য। মোড়ের দোকানে (বৌবাজার, বাবুবাজার) ভিড়, কলেজ ক্যান্টিনের মত। টংয়ের রেস্টুরেন্ট পরাটা ডিম ভাজির নাস্তা, অতিথি/বন্ধু আপ্যায়ন; আবাল বৃদ্ধ সবাই। গ্রামের লোক এখন পাউরুটি, বনরুটি, স্লাইস রুটি দিয়ে নাস্তা করে সাথে চা (না কফি দেখি নেই)। এ season এ মর্নিং স্কুল থাকত; আমরা অনন্য স্বাদের পান্তা ভাত অথবা আখের গুড় দিয়ে ছাতু (যবের মিহি গুঁড়া) গুড় খেয়ে যেতাম। ছাতু যে একটা খাবার জিনিস public বোধ হয় ভুলে গেছে। আর পান্তা পহেলা বৈশাখের fashion (need less to say)। আমাদের পান্তা ছিল পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে; ইলিশ+ভর্তা+পান্তা ঢাকায় এসে শিখেছি। গ্রামে ভিক্ষুক নেই, খালি গায়ে পায়ে চলা লোক ক্বচিৎ চোখে পড়ে। রাস্তার ধারে মানুষের মলমূত্র নেই, গন্ধ নেই, যেটা সায়েন্স ল্যাবের মোড় দিয়ে যেতে সদাই অনুভূত হবে।

নাই সেই গোধূলী লগ্ন (সন্ধ্যায় মাঠ থেকে শ' শ' গরু কাঁচা রাস্তা দিয়ে ধূলা উড়িয়ে যেত) – শহর হয়ে যাওয়া গ্রামে এটা এখন কবির কল্পনা, প্রকৃতি প্রেমিকের আহাজারি।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা

গম ভেঙ্গে আটা ময়দা করে খাওয়ার চেয়ে গম বিক্রী করে প্যাকেট কিনে খেতে

আগ্রহী গ্রামের মানুষ। ধান বিক্রী করে দিয়ে বস্তার/প্যাকেট চাল কিনে খায়। শিল-পাটার দরকার কি? রাঁধুনীর মসলা থাকতে!

বাসায় কাজের লোক পাওয়া দুষ্কর গার্মেন্টের চেয়ে বেশি বেতন দিলেও; স্বাধীনতা নাকি কম! মালিকের ড্রাইভারি না করে কোম্পানির চাকুরীতে আগ্রহ বেশি, তেল বিক্রীর পয়সা নয় ছুটি ছাটা সহ ব্যক্তি স্বাধীনতা বেশি। মানুষের আয় বেড়েছে দৃষ্টি ভঙ্গি তো বদলাবেই! genuine ইলেকশন হলে ব্যক্তির এই বিচার ক্ষমতা পরখ করা যেত!

গ্রামের বাতাস কত হালকা। দিগন্ত জোড়া মাঠ, পাট আর ধানে ভরা। ভোরে রক্তাভ পূবের আকাশ; পাকা রাস্তার দু'পাশে মেহগিনি আর ইউক্যালিপ্টাস। ছোট বেলার সাথে মিলালে ব্যাপক পার্থক্য; গাছ ছিল প্ল্যান করে লাগানো নয়। জংগল হয়ে বেড়ে উঠা, মেহগিনি নয়। বেত আর বাবলা, শিমূল, তাল আর জাম, মালিকানা দাবি করার মত নয়; পাখীর উচ্ছিষ্ট থেকে গজানো। ঘুঘু, কোকিলের ডাক নেই, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়ানো চড়ুই দোয়েল দেখি কম। চোখে পড়েনি বাবুই পাখির বাসা। মেঠো রাস্তা নেই, কাদাপানির খুব অভাব, যেমন অভাব ক্ষেতমজুরের। আসলে পরিবেশের পরিবর্তনে রুচি, নিয়ম পাল্টে যাচ্ছে!!

চলুন গ্রামে যাই

সকালে উঠে হাঁটতে বেরুবেন। হুডি-কেডস পরে স্বাস্থ্য পিপাসু মহিলা-পুরুষ মর্নিং ওয়াক করছেন। কুয়াশা ঢাকা রাঁস্তা, শিশির ভেজা ঘাস সবই আছে। মেঠো পথ, ঘাসের গন্ধ আগের মত পাবেন না।

মাটির মেঝেতে বসে, উঠানে বসে রোদে পিঠ ঠেকিয়ে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে কড়কড়া ভাত খাবার রেওয়াজ ইতিহাস বিস্মৃত এখন। ডিম /ভাজি /রেডিমেট পরাটা অথবা, পাউরুটি, জ্যামজেলীর স্যান্ডউইচ সাথে চা-কফি এখন অধিকাংশের ব্রেক ফাস্ট মেন্যু।

২৪ ঘণ্টা বিদ্যুত, লাইনের হট ওয়াটার গ্রামে এখন স্বপ্ন নয়। God made the village, man made the town. হারিয়ে যাওয়া গ্রামে প্রযুক্তি এখন প্রতীয়মান।

পেঁয়াজ ৫০০০ টাকা মণ, ২ মাসের ফসল; রসুনের আরও দাম, ২০ মণ পেঁয়াজ ফলানো কঠিন নয়। আগে শুকনা মাটি পিটিয়ে পেঁয়াজ-রসুনের চাষ হতো। কষ্ট লব্ধ তাই বেশি চাষে উৎসাহ ছিল কম; এখন বর্ষার পানি সরার সাথে সাথে নরম মাটির উপর পেঁয়াজ-রসুন লাগানো হয়। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সিজনে পেঁয়াজ রসুন লাগিয়ে পার্ট টাইম আয় রোজগার করছে। আমিও ঐ জীবনে এ কাজ করতাম কিন্তু সেটা ছিল পারিশ্রমিক ছাড়া ameture work!

তিনটা গাভী পুষবেন। তিন থেকে আট লিটার দুধ পাবেন দিনে; দুধের দাম দিয়ে হিসাব করে দেখেন। বেগুন ১২০০ টাকা মণ, জন্মানো কঠিন নয়- ৫ বিঘা ফলান

এক সিজনে কয়েক লক্ষ টাকা! লাউ একটা ৬০ টাকা। বাড়ির কোনায় পরে থাকা (অব্যবহৃত) জায়গায় পুকুর কেটে মাছ চাষ করুন ২ মাসে ৪/৫ গুণ আসবে।

বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া পাকা সড়ক হাইওয়েকে সংযুক্ত করেছে তিন মিনিটে; ১৫-২০ মিনিটে শহরে যেতে পারবেন। সার্বক্ষণিক বিদ্যুত, চাইলে গরম পানিতে গোসল করতে পারবেন, এসিতে থাকতে পারবেন।

শহরে ভাড়া বাড়ি হলে ছোট বাড়ি/সাবলেটের ছোট ঘর। সকালে উঠে স্কুল তারপর কোচিং। ছোট শহর হলে সরু রাস্তা, রিক্সা আর ময়লা পানির ড্রেন। সন্তানের মানসিকতা বড় হবে কি করে? গ্রামে? খোলা বাড়ি, বিরাট উঠান; এখন পাকা, চওড়া রাস্তাই বেশি। স্কুলের মাঠ, বাড়ির পাশের মাঠ। মন বিশাল হবেনা কেন? এখন টিচার নিয়োগ তো কম্পিটিটিভ পরীক্ষায়, সন্তান inferior হওয়ার কথা নয়। হাই স্কুল পর্যন্ত গ্রাম ভাল হবার কথা। ইউনিভার্সিটি লেভেলের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন, মার্কিং ১৯৭২ সালেও যা ছিল এখনও তাই আছে। কোন ছাত্র সিলেবাস ধরে পড়লে, নিজের আউট নলেজ ও ইংরেজিতে সময়োপযোগী হতে পারলে ঈপ্সিত লাইনে চান্স পেয়ে পড়াশুনা করতে পারে।

কেন তাহলে গ্রামের সাথে যোগাযোগ রাখবেন না। বিশ্বের দূষিততম ঢাকা শহরে সংসার করার চেয়ে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা গ্রামে বাস করা লোভনীয় হওয়া উচিত। আয়-রোজগারের জন্য মাসে একদিন ২ দিন গ্রামে যাওয়া কঠিন নয়। টাটকা খাবেন; পরিতৃপ্ত হবেন। শহুরে হয়েই থাকুন but গ্রাম কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা বদলাবেন না।

My mother: ROKEYA BEGUM

DOB:
1938 May 14 (Calculated from circumferential evidences).

Education: She can't read nor write.Tried to teach how to sign. Succeeded partially by her grand daughter finally abandoned. Passport is endorsed with finguretip .This is a shame for we all. We are total 15 of her children (11 surviving) feel ashamed.

Livelihood : মা'র কথা মনে হতেই চোখের সামনে ভেসে উঠে একটি মুখ। নিরহংকার শত সমস্যারও মধ্যে সততা আর কাজই যার জীবনের উপলব্ধি। ১১ সন্তানের টানাপোড়নের সংসারের চালিকাশক্তি মা আমার কি কষ্টই না করেছেন! রাত সাড়ে এগারটায় শোয়ার পর ভোর সাড়ে চারটায় ধান সিদ্ধ, দিন ভর ধান শুকানো, মাড়ানো ধান উড়িয়ে আবর্জনা পরিষ্কার। চুলা জ্বালানো, রান্না-বান্না খাওয়ান-দাওয়ান কাপড় কাঁচা একই সাথে চলতো। Retrospective ভাবলে বুক আটকিয়ে আসে, চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে, কেমনে পারত! how?

She is really a person behind the scene. I can't remember a moment seeing her gossiping/quarreling with neighbours. She had to work, no time to demand, no time to burgain. Simplest of simple lives! She was always more than 50% of our life. She took 100% of the responsibility after my father's demisal. She was never with mind/expression of vanity.

Social mother: We introduced a scholarship in our high school with her money.This money she herited from her parents. Due to unavoidable circumstance I was on the verge of closing construction of our village hospital. It was she who insisted to continue. She observed post death activities of my elder aunt and my youngest uncle on her own initiatives. I gave a concrete wall to complete barricade of my village house but mother kept a door of communication. My neighbour uncles/aunt maintained social relations. She visit them in their ailments and calamities, they come to her.

Exuberant Affection: Once I saw a mentally handicapped boy at home. She told "my children are living out of house, never know how are they there!" That boy stayed till his death and my mother observed all his post death activities. She used to feed beggars whenever got chance, telling same thing 'never know how my children are eating out of my sight.'

Emotional and spiritual: My mother is highly emotional but nonexpressive. Once I asked her about plan of burial after death. She wished to be at her own village with her parents and brothers. I wondered and demanded reconciliation arguing "you spend long time with my father at this home, we are your children here how can you say this". She kept silent. I told her mom we/I also want to stay with my parents here!

She performed pilgrimage with my father, seems still desire to go once again, needless to say never missed daily worships.

Her grievenc: সব মায়ের মত আমার কসমোপলিটন মা'র সুখ ও তার নিজের সন্তানেরা বাড়ির লোক, পাড়া-প্রতিবেশীর ভরসাস্থল এই মানুষটিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলতে গেলেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। চোখ ঝাপসা হতে দেখি। বুঝতে পারি তার বুকের ব্যথার কারণ। সুখ তার হারিয়ে যাওয়ার কারণ আমার বাবা! বাবা গত হয়েছেন ১৯৯৪ সালে।

পর্যবেক্ষণ

১। এক সময় পরীক্ষার হলে নকলের মিছিল যেত ? এখন মাছিও যায় না।

২। আমের সিজনে ইন্ডিয়ান আম এসে বাজার সয়লাব হতো এবার শুধু চাঁপাই/রাজশাহী নয় সারা বাংলাদেশের আম বাজারে উঠেছে সস্তায় বিক্রি হয়েছে।

৩। এবার কোরবানীতে ইন্ডিয়ান গরু আসেনাই। ইন্ডিয়ার এক মন্ত্রী (আহম্মক!) বলেছিল ইন্ডিয়ান গরু না গেলে ক্রাইসিস হবে, মাংসের দাম বাড়বে, মুসলমানরা গরু খাওয়া ছাড়বে। এবার কি দেখলাম দেশী গরু এত বেশি শেষের দিনে সার্প্লাসের মত (what Bengals thinks today india thinks 2moro)

বাংলাদেশের লোক কি না পারে! কেন এমন ড্রাস্টিক change? আমাদের অভিজ্ঞতা কি বলে? যখনই কোন ক্রাইসিস সার্বজনীন হয়ে পড়ে, ১৬ কোটি লোকের দাবিতে পরিণত হয় তখন সেটা চাওয়া অনুসারে পরিণতি পায়। না পেয়ে পারে না- ৫২, ৬৯, ৭১ ও ৮৯ তাই বলে।

নির্বাচন এবার হবে, হতেই হবে। ১৬ কোটি লোক মুখিয়ে আছে নিজের ভোটটা পছন্দমত এবং জায়গামত দেবার জন্য।

পদ্মাসেতু দৃশ্যমান হচ্ছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ যাচ্ছে কার টাকায়? এই দেশের আপামর জনগণের টাকায়; এখন পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা/কাহিনী নেই ভ্যাট বা বিদ্যুৎ বিল দিতে কেউ অস্বীকার করেছে? জনগণ অনুগত থেকেছে তাদের কর্তব্য পালন করেছে। যারা ক্ষমতায় আছে বা যারা ক্ষমতায় যেতে চায় তাদের এখন কি দায়িত্ব? নিঃসন্দেহে জনগণের ইচ্ছার মূল্যায়ন করা, আকাঙ্খা পূরণ করা।

ভোট হচ্ছে, ভোট হবে, এই দেশের মানুষ ভোট দিয়ে ছাড়বে।

রমাদান করিম

একমাস রোজা গেল; ভালোই মানুষের খাই খাই ভাব নেই। প্রফেশনাল কারণে তিনটা জ্বলন্ত প্রশ্ন ১। কাদের রোজা রাখা উচিত না ২। ব্যায়াম করা সম্ভব কিনা ৩। ঔষধ/ইনসুলিনে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় কিনা। ৩য় প্রশ্নের জবাব হলো incidence নগন্য; এবারে পাইনাই।

Suggestion হলো তারাবীকে count এ নিয়ে ব্যায়াম করতে হবে। সাত নং রোডের মসজিদে তারাবী পড়ে অনেক লোক সোৎসাহে লেকে lake breeze ওয়ার্কিং সেরেছে! ৪৫-এর পরিবর্তে ২৫-২০ মি. করেছে এই যা!। কিডনির রোগী ডিহাইড্রশনের রিস্ক বেশি। হিসেবে টেকেনা কারণ এক লিটার লিমিট পানি দিনে না করে রাত ভর পান করলেই হলো। Multidose drug রোজা না রাখার অজুহাত হতে পারে না কারণ আধুনিকতম SR MR SR (ট্যাবলেট) বা basal,

true basal, basal -bolus regimen-এর জামানায় এটা acceptable নয়। রোজা শুরুর আগে কন্ট্রোলে এনে নিলে সর্বোত্তম।

ধর্ম বলে যার পক্ষে সম্ভব তার জন্য রোজা ফরজ; আর রোজার দিনে যে কোন কাজেরই সওয়াব অন্যদিনের ৭০ গুণ; so রমাদান করিম। Office time কম হওয়ায় exhaustion avoid করা সম্ভব; এবাদত বন্দেগি বেশি করা যায়। messenger-এ একজন হিসাব করে দেখিয়েছিল প্রতি ওয়াক্তে ৪ পাতা করে পড়লে 4x5x30=600 পাতার কোরআন শরীফ রোজার মাসে শেষ করা সম্ভব; যানজটের ঢাকায় গাড়িতে বসে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ পড়ার এটা একটা উত্তম way (আমার সহকর্মী ও family members করেছেও)। একবার সুরা কাসাস (১১৪ সূরার ২৫তম) পর্যন্ত গেছি (৩৩ পারার ২০ তম); সৌদী আরবে সাত দিনে শেষ করেছিলাম; পকেট কোরআন ছিল। এখন বাড়তি সুবিধা হলো আই ফোনে কোরআন আছে so সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেই হবে।

ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কৌতূহলী বিদেশির দেখা

ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কৌতুহলী বিদেশী দেখল লাঠিসোঠা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, পিটাপিটি, মারামারি। ধোঁয়া উঠছে আগুনের। সঙ্গী বাংঙালি বলল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্র্যাক্টিকাল ক্লাস করছে।

১। উন্নয়নশীল আমাদের দেশের উন্নতি হয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় নয় নবম দশম একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের রাজপথের রাজনীতির হাতে খড়ি দিচ্ছে।

২। পাঁচফিট এগার ইঞ্চি সরদারজীর একটি (!) দেঁতো হাসিতে সমগ্র দেশ উত্তাল। ভাইসাহেব আপেল মাহমুদ (মোরা একটি হাঁসির জন্য ...) ভাবতেই পারেন ধরণী দ্বিধা হোক?

৩। মিছিলে ট্রাক তুলে দেওয়ার জন্য রাজনীতিতে জীবন্ত কিংবদন্তি অশীতিপর বৃদ্ধ যুবককে স্বৈরাচারী বললে উনার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে এদেরকে কি বলা হবে যারা পথচারীর উপর গাড়ি তুলে দেয়! এখন যা ঘটছে এটা পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ; ওদের ঘরে বাবা মা আছেন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ভাইরা আছেন, আছেন প্রতিবেশী। সবাই অরাজকতায় অতিষ্ঠ হলেও তাদের প্রতিবাদের সাহস নেই, পথ নেই। যুবকদের/যৌবনের কোটা আন্দোলন, কিশোরদের/ কৈশোরের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা। আর কেউ না বুঝলেও আমার এক জীবনের হিরো তোফায়েল ভাই ঠিকই বুঝেছেন পুলিশ, আর্মি আর এন এস এফ এর প্রেতাত্মা লাঠিয়াল (পাকিস্তানিদের সবই ছিল!) দিয়ে

সবকিছু করা গেলেও জেগে উঠলে জনতাকে ঠেকান যাবে না। নির্মোহ কিশোররা ন্যায্য কাজ করে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিল : they are truely waiting for better days!

চায়ের রাজধানী

শ্রীমঙ্গল, চায়ের রাজধানী। ঢাকা থেকে ১৯২ কিমি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি বিধৌত (সাংবাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৯৮.৫৬ ইং) এলাকা। মৌলভীবাজার জেলার একটি উপজেলা। বাণিজ্য প্রবণ বলে রেল ও সড়ক পথের যোগাযোগ খুব ভাল। বৃষ্টিই নয়, মশা এখানে বেশি। ম্যালেরিয়াও সবচেয়ে বেশি শ্রীমঙ্গলে।

চারটা জিনিসের জন্য শ্রীমঙ্গল বেশি পরিচিত যদিও ইদানিং গ্রান্ড সুলতান (গ্রান্ড সুলতান চা রিসোর্ট ও গলফ ...) হেড লাইন পাচ্ছে।

১। লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্ক: কমলগঞ্জে অবস্থিত ন্যাশনাল পার্ক আদতে একটা ইকো পার্ক। গভীর বন, পাখিদের অভয়ারণ্য। অনেক লম্বা শতায়ু রেইন ট্রি, প্রাকৃতিক লেক, ঝর্ণা সবই আছে এতে।

২। হামহাম ঝর্ণা, মাধবকুন্ড ঝর্ণা: হিমছড়ি বা সিংগাপুরের বার্ডপার্কের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। শক্তিশালী ঝর্ণার নিচে দাঁড়াতে শক্তি লাগে। বিস্তৃত এলাকায় বড় বড় পাথর থাকায় একটু দূরে পানির flow উপভোগ করা সম্ভব।

৩। বাইক্কাবিল: ১০০ হেক্টর জলাভূমি যেটা হাইল হাওরের অংশ। হাইল ঋতু ভেদে ৩০০০-১২০০০ হেক্টরে বিস্তৃত হয়ে থাকে। মাছ আর পাখির চড়ে বেড়ানোর জন্য বিশাল প্রাকৃতিক জলাভূমিতে আছে অনেক ওয়াচ টাওয়ার।

৪। মাধবপুর লেক: লালগোলাপী পানির পদ্ম এখানকার আকর্ষণ। জাইয়ান্ট কাতল মাছ ফিশিং অনেকেই উপভোগ করে।

চা, পানপাতা, লেবু, আনারস আর কাঁঠাল রফতানি করে শ্রীমঙ্গল। সিলেট, হবিগঞ্জ আর মৌলভীবাজারের মধ্যখানে বসে আছে দেশের বৃহত্তর, প্রাচীনতম সম্পদে সমৃদ্ধ এ উপজেলা। হাজারো টিলার উপরে গড়ে উঠা শত বছরে টি স্টেটের মধ্য দিন ভ্রমনই একটা বিলাস। বধ্যভূমি আর বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমানের স্মৃতি সৌধ পার হলেই চাকন্যা (ভাস্কর্য) চায়ের রাজধানীতে welcome করে।

একটি শিক্ষণীয় গল্প- হারবেন কেন?

বাজ-পাখি প্রায় ৭০ বছর জীবিত থাকে। অথচ ৪০ আসতেই ওকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ওই সময় তার শরীরের তিনটি প্রধান অঙ্গ দুর্বল হয়ে পড়ে।

১. থাবা (পায়ের নখ) লম্বা ও নরম হয়ে যায়। শিকার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।
২. ঠোঁটটা সামনের দিকে মুড়ে যায়। ফলে খাবার খুটে বা ছিঁড়ে খাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।
৩. ডানা ভারী হয়ে যায়। এবং বুকের কাছে আটকে যাওয়ার দরুন উড়ান সীমিত হয়ে যায়।

ফলস্বরূপ শিকার খোঁজা, ধরা ও খাওয়া তিনটেই ধীরে ধীরে মুশকিল হয়ে পড়ে। ওর কাছে তিনটে পথ খোলা থাকে।

১. আত্মহত্যা
২. শকুনের মত মৃতদেহ খাওয়া
৩. নিজকে পুন:স্থাপিত করা।

ও একটা উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে বাসা বাঁধে। আর শুরু করে নতুন প্রচেষ্টা।

সে প্রথমে তার ঠোঁটটা পাথরে মেরে মেরে ভেঙে ফেলে। এর থেকে যন্ত্রণা আর হয় না।

একইরকম ভাবে নখগুলো ভেঙে ফেলে আর অপেক্ষা করে নতুন নখ ও ঠোঁট গজানোর।

নখ ও ঠোঁট গজালে ও ওর ডানার পালকগুলো ছিঁড়ে ফেলে। কষ্ট সহ্য করে অপেক্ষা করতে থাকে নতুন পালকের। ১৫০ দিনের যন্ত্রণা ও প্রতীক্ষার পর সে সব নতুন করে পায়। পায় আবার সেই লম্বা উড়ান আর ক্ষিপ্রতা।

এরপর সে আরো ৩০ বছর জীবিত থাকে আগের মত শক্তি ও গরিমা নিয়ে।

ইচ্ছা, সক্রিয়তা ও কল্পনা... আমাদের দুর্বল হয়ে পড়ে ৪০ আসতেই। অর্ধজীবনেই আমাদের উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, শক্তি কমে যায়।

আমাদেরও আলস্য উৎপন্নকারী মানসিকতা ত্যাগ করে, অতীতের ভারাক্রান্ত মনকে সরিয়ে ও জীবনের বিবশতাকে কাটিয়ে ফেলতে হবে বাজের ঠোঁট, ডানা আর থাবার মত।

১৫০ দিন না হলেও ১ মাসও যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে আবার আমরা পাবো নতুন উদ্যম, অভিজ্ঞতা ও অন্তহীন শক্তি।

নিজেকে কখনোই হারাতে দেবেন না আর হারও মানবেন না!

ডাক্তার সমাচার

‘প্রেসক্রিপশন সহজবোধ্য করার জন্য সতর্কীকরণে’

১। প্রেসক্রিপশন নিয়ে চেম্বার ত্যাগ করার আগে রোগী/এ্যাটেন্ডেন্টের বুঝে যাওয়া উচিত।

২। In between patient and physician প্রেসক্রিপশন পড়েন ফার্মেসির লোক। নিয়ম হলো ঐ ব্যক্তির ফার্মাসিস্টের ট্রেড লাইসেন্স থাকা অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রীয় আইনও তাই। আমাদের দেশে ঔষধের দোকানে যারা কাজ করে তাদের পড়াশুনার লেভেল কমবেশি আমরা জানি!

৩। উন্মুক্ত ব্যবস্থার জন্য দোকান থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়াও এদেশে ঔষধ কেনা যায়।

৪। আমাদের অনেক রোগীর কাছেই ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ডের প্রেসক্রিপশন পাওয়া যায়, বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবেন না যে হস্তলিখিত এগুলো খুব স্পষ্ট।

প্রেসক্রিপশন readable হওয়া উচিৎ, ঔষধের দোকানে ট্রেড লাইসেন্সধারী ফার্মাসিস্ট থাকা উচিত।

ডাক্তারের ফি

রসিকতার ছলে বললে আমার এক সহকর্মীর বলা কথা বলি-

শ্রদ্ধেয় ইব্রাহীম সার ১৬ টাকা ভিজিট নিতেন। উনার আমলেই কেউ কেউ ২০-২২ টাকা নিতেন। কথা হলো তখন বেগুনের কেজি কত ছিল ? ০.৫০ টাকা আর এখন ৫০ টাকা (প্রতীকি comperison বাজার দর, পরিবহণ, সম্মানী বৃদ্ধির)। বেড়েছে ১০০ গুণ। করপোরেট ছাড়া individually কারো ভিজিট ১৬০০ বা ২২০০ টাকা আছে বলে শুনিনি। ডাক্তার, প্রকৌশলী, আর্কিটেক্ট, উকিল-ব্যারিস্টারের প্রোফেশনাল ফি কোন দেশে বেঁধে দেয়া আছে কিনা জানি না! (২০০০ সালের গোড়ার দিকে)। কমিশন

এবার অন্যভাবে বলি

ধরুন গ ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে ঘ সুপার স্পেশালিস্ট প্রাকটিস করেন এবং উনি গড়ে প্রতিদিন ১০০ প্রেসক্রিপশন করেন। প্রেসক্রিপশন প্রতি ১০০০ টাকার ইনভেসটিগেশন দিলে দিনে ১ লাখ টাকা হয়। প্রচলিত তথ্যানুযায়ী ৪০% অনুসারে উনার ৪০০০০.০০ টাকা দিনে অর্থাৎ মাসে ২৬ দিনে (সাপ্তাহিক বন্ধ শুক্রবার বাদ দিয়ে) তার পাওয়ার কথা ৪০০০০x২৬=১০৪০০০০.০০ টাকা। আপনাদের কারো কি বিশ্বাস হয় কমিশন বাবদ কোন স্পেশালিস্ট ল্যাব থেকে মাসে এত টাকা পান? বাস্তবে অধিকাংশই পান ১ লাখের কম।

যে সব ল্যাব ৩০%, ২৫%, ১০% কমে ইনভেস্টিগেশনের অফার দেন তারা ডাক্তারদের কিছুই দেন না অর্থাৎ extra টা পুরাই ওদের লাভ। এখন বলুন কমিশনের বেনিফিশিয়ারী কে?

আমি মনে করি আমরা সবাই খুশি হব যদি আগামী কাল থেকেই সব ল্যাব ইনভেস্টিগেশনের চার্জ ৪০% কমে যায়!

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে দেশে (অন্তত: খবরের কাগজের পাতা উল্টালে সেটাই মনে হয়) এখন তাবৎ সমস্যা ডাক্তারদের নিয়ে এবং ডাক্তারী নিয়ে!!

আজ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন দিবস

আজ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন দিবস। ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদেরকে বলার অপেক্ষা রাখে না স্বাধীন স্বদেশের জন্য সাহসী ও সংগ্রামী করেছিল। আমরা বঙ্গবন্ধুর ১০ই জানুয়ারি ভাষণ শুনেছি কম, খুবই কম।

এ ভাষণ শুনলে আমরা বুঝতে পারব বঙ্গবন্ধু কি চেয়েছিলেন- আমরা কি করছি; বিশেষ করে 'বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু' করে যারা মুখে ফেনা তুলছেন তারা লজ্জা (থাকলে?) পাবেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের নামে যারা গলা ভাঙছেন তারা বুঝবেন কথা আর কাজের মাঝে ফারাক কত বেশি!

খুব ভাল হত যদি ভাষণটি আজ মাইক্রোফনে মোড়ে মোড়ে বাজানো হত!!

১৯৭৫ সাল, ১৫ই আগস্ট, বঙ্গবন্ধ

১৯৭৫ সাল, ১৫ই আগস্ট। ফজরের নামাজের জন্য উঠে শুনলাম গুলির শব্দ। ফজলে রাব্বির দোতলায় নামাজ শেষে সবাই চাওয়া চাওয়া করছি। ডালিমের বেসুরো বেতার বাণীতে বুঝতে বাকী রইলনা কি হয়েছে; বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসের আরম্ভ সেদিন। মনে হচ্ছিল a ruler without protocol, a leader with free access to all assacination এর কারণ। বড় ভালবাসতেন বাংলার মানুষ/মাটিকে।

আমাদের ফার্মাকোলজি পরীক্ষা ছিল; গ্যালারিতে না গিয়ে হসপিটালে গেলাম। দৃশ্য আরও করুণ। দোতলার ওয়ার্ডগুলোতে deadbody রাখাছিল চাদর ঢাকা।

রাস্তায় বেরুলাম শুনশান নীরবতা। আকাশে সূর্য গড়ালো বে-ইমানি বাড়তে থ াকল। শেষবেলায় বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজনেরা (?) একে একে খুনিদের পারিষদ হল।

টুংগিপাড়া মাজারে গেলে আবেগাপ্লুত না হয়ে পারা যায় না। কি অপরাধ ছিল এ মানুষটির। যারা কাছে থেকে দেখেছেন কথা শুনেছেন আবেগভরা সর্বৈব এই বঙ্গ সন্তানটির। তাদের আত্মা কাঁদবেই এখানে গেলে।

৩২নং এর উপরতলার ঐ বারান্দায় গেলে ৭১ ও তার পূর্ববর্তী অগ্নিঝরা দিনগুলোর স্মৃতি ভেসে উঠতে বাধ্য। You are bound to feel your heart if you are a Bangali/a Bangladeshi; no matter which party you belong to, with which religion or cast u r attached.

অসমাপ্ত জীবনী আর কারাগারের রোজনামচা পড়লে মনে হবে বঙ্গের বন্ধু হবার জন্যই উনার জন্ম হয়েছিল। He was borne to be B A N G A B A N D HU!

৪০ বছর পর K31 বন্ধুদের মেডিকেল ক্যাম্পাসে একত্রিত হবার উদ্যোগ

কলেজ ক্যাম্পাস আমার জন্য নতুন নয়, একাডেমিক ও প্রফেশনাল কারণে আমি প্রায়ই ওখানে যাই। অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ (K-35) কলেজের টিচারস লাউঞ্জ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। লাউঞ্জে সম্মিলিত নাস্তা দিয়ে শুরু হলো মে দিবসের ছুটির দিনটি।

কলেজের গেট দিয়ে ফ্লোরে পা দিলেই আমাদের সমসাময়িকদের যাকে মনে হবে তিনি হলেন শরীফ ভাই এবং শরীফ ভাইয়ের সদাহাসি লেগে থাকা face, প্রথম রুমটিই ছিল প্রিন্সিপ্যাল স্যারের (আমাদের শেষের দিকে); পিএস-এর রুম থেকে শরীফ ভাই বেরিয়েই কুশল জিজ্ঞেস করতেন। এখনকার প্রিন্সিপ্যালের রুম সন্নিবেশিত কনফারেন্স রুমটি ছিল লাইব্রেরি, আমরা use করতাম।

গ্যালারির দিকে যেতে বামদিকে ছিল হেড ক্লার্কের রুম। ক্যান্টিনের পাশে গেলে একটা দৃশ্যই বারবার মনে পড়ে। বন্ধুবর আরমানের কথা (এখন বিএমডিসির ডেপুটি রেজিস্ট্রার); ৭টার ক্লাসে ঢোকার আগে দুআংগুলের মধ্যে পিরিচ ধরত, অন্যহাতে গরম চা ঢেলে দুইঢোকে চা গিলে সিগারেট পায়ের নিচে পিসে ভোদৌড়ে ক্লাস ঢুকে যেত K-31 এর সবচেয়ে শর্ট শরীরটা নিয়ে; I can say it would happen every day। বন্ধ থাকায় গ্যালারি আগ্রহীদের দেখার সুযোগ হয়নি। দেখলে বুঝতেন গ্যালারি কত সুন্দর।

ভাবতে কষ্ট হয়

(১) সময় ১টা ৩৫, স্থান শাহবাগ মোড় রোববার ৫ আগস্ট ২০১৮।

চত্বরে ঢাল হাতে জনাপঞ্চাশেক পুলিশ, একটু আগে 'we want justice' শ্লোগান দেওয়া জনসমাগম ছিল। কাঁটাবন মোড়ে জটলার কথা বলায় রিক্সাওয়ালা বাড়তি আগ্রহে টানতে লাগল; মোড়ে এসে বললাম ডাইনে যা হাতির পোল দিয়ে। ও উল্টা রাস্তায় (ডান দিক দিয়ে) এলিফ্যান্ট রোড হয়ে চলল, বলল মিছিল আসছে, বাটার মোড়ে পুলিশ দল ধরে সামনের দিকে তাড়িয়ে দৌঁড়াল, সামনে কিছু দেখলাম না।

লোকজন যারযার মত গলিতে, দোকানে ঢুকছে, কেউ সাটার খুলে উঁকি দিচ্ছে। ধর ধর শব্দে পরিবেশ গরম। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ও উল্টা দিকে টার্ন নিল। দাঁড়িয়ে থাকলাম; রাস্তা ফাঁকা হলে বলল স্যার চলেন আগাই। বুঝলাম মনে দুইজনের একই অভিলাষ দেখি কি হয়। সায়েন্স ল্যাব মোড়ে যেতেই পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটলো, চোখ জ্বলে উঠলো, অন্ধকার দেখলাম, নাক দিয়ে পানি আসলো। ভাড়া দিয়ে দিলে রিক্সাওয়ালা নিউ মার্কেটের দিকে চলে গেল। আমি ল্যাবএইডের দিকে বিরাণ রাস্তায় হাঁটা দিলাম। পুলিশের দল ফুটওভারের পথচারীদেরকে নেমে চলে যেতে বলল। সম্পূর্ণ ফাঁকা এলাকায় দেখলাম ধানমন্ডি আরঙের কোণায় পিলারের আড়ালে স্কুল ব্যাগ কাঁধে সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন, কত আর বয়স ১৩-১৪। সুঠামদেহী এক লোক (৩৭-৪০) এসে প্রথমে লাথি পরে দিল লাঠির বাড়ি। লোকটির পরনে হলুদ হাফ গেঞ্জি ইন করে পরা, জিন্সের প্যান্ট। বামহাতে লোহার চেইন দুই ভাজে পরা, হাতঘড়ি আর মোবাইল, ডান হাতে লাঠি। চুলবিহীন মাথার সামনের দিকে বসিয়ে দেওয়া চশমা। পরক্ষণেই ততোধিক শক্তিশালী পুলিশ (একজন!) ঝাঁপিয়ে পড়লো, সাথে লাথি আর লাঠির বাড়ি। মনে হল এভাবেই পেটুয়া বাহিনী ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭০ কিশোর (মতিউর!), ছাত্র যুবক জনতাকে পিটাত!। বিড়ম্বনা হলো তখন আমরা স্বাধীন ছিলাম না।

(২) BSMMU তে খাতা দেখার সময় google লগ করতে পারছিলাম না, রাস্তায় শুনলাম 3G, 4G locked ছিল। মনে পড়ল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ গ্রাম থেকে দিনে দিনে শুনতে পারি নেই এহিয়া শাহী রেডিও locked করেছিল, problem is সময় আমরা পরাধীন ছিলাম।

(৩) এ কথা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই যে এটা বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র হিসেবে উনার মিটিংএ অনেক কাছে থেকে উনাকে দেখার সুযোগ হয়েছে। ঐ ফেস ঐ অভিব্যক্তি দেখে এখনও মনে হয় এরকম একটা মানুষকে কি করে গুলি করতে পারল? এ কয়েকদিনে উনার সম্পর্কে অনেক কথাই পত্রিকায় পড়েছি; শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধার কথা শুনেছি। ছাত্রদের প্রতি আবেগের কথা কেউ লিখলেন না; বোধ করি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ভাই লিখতে পারতেন! দুঃখ লাগে সেদিনের ছাত্র আজকের শিক্ষামন্ত্রীর কথা ভাবলে। উনার এক কথায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দাগি আসামি হয়ে গেল।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (২০১৫)

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ১.৯৮১ একরের উপর। ২০১৫ সালে ৬.১ মিলিয়ন প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডেল করেছে। দিনে ১৮০ টা ফ্লাইট উঠানামা করে। ২০১৬, ১৭ -র পরিসংখ্যান অবশ্যই বেশি হবে।

সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে টারমিনাল এখন তিনটা। অদূর ভবিষ্যতে হবে পাঁচটা। প্রতিদিন উঠানামা করে ১০০০ flight; এ বছরে (২০১৬) ১৩ বর্গ কিলোমিটারের বন্দর দিয়ে গেছেন ৫৮ মিলিয়ন যাত্রী।

হো চি মিন এয়ারপোর্ট আমাদের চেয়ে বড়, তিনতলা।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সার্বক্ষণিক ক্লিনারকে কাজ করতে দেখিনি। গত বছর (১৬ সালে) সেবা পেয়েছে ৩.২ কোটি যাত্রী। এটা ওদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। ভিয়েতনাম এয়ার লাইন ছাড়া বেসরকারি লাইন ও আছে এদের।

আমাদের আসলে দিন দিন যাত্রী exponential হারে বাড়ছে। সেবা ও সুবিধা বাড়াতে হলে পরিসর বাড়ানোর বিকল্প নেই। রানওয়ের আইডিয়া আমার নেই তবে সামনের ফাঁকা জায়গাটি extend করে এয়ারপোর্ট রোড থেকে ফ্লাইওভার করে যাত্রীকে সরাসরি বিমান বন্দরে ঢোকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শৌচাগার সমাচার

বাড়ি যতই সুন্দর হোক ওয়াশ রুম ভালো না হলে মূল্য নেই।
অন্দর মহলের খবর শৌচাগার সমাচার
অন্দর মহলের খবর এটার মধ্যেই।

সম্প্রতি ঢাকা শহরের শৌচাগার নিয়ে খবরের কাগজে প্রবন্ধ এসেছে। এখানে ভ্রাম্যমাণ গুলোর কথাই বেশি বলা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণগুলোকে অনেকটাই পিকনিক স্পটের টেম্পরারি ব্যবস্থা বলে মনে হয়। জনগণের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক কাজের জন্য একেবারে লোকালয়ের মধ্যে এই পাখির খাঁচায় ঢোকার মানসিকতা না থাকলে দোষের কিছু দেখি না। ভ্রাম্যমাণ এগুলোর অবয়ব দৃষ্টিনন্দন করা যায় কিনা ভাবতে হবে।

পারমানেন্টগুলোর দিকে নজর বেশি দিতে হবে। পারমানেন্টগুলোর উপস্থিতি জানান দেবার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। আগারগাঁও এলাকায় দেখেছি?

বেলজিয়ামে এক পাবলিক টয়লেটে শীত আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ঢুকলাম (প্রথম অভিজ্ঞতা!); তিন বুড়া, পারকিনশনিজমে মাটি touch করে হাঁটে। একজন কয়েন গুছিয়ে রাখছে, একজন মেঝে পরিষ্কার করছে। আর বাকিজন সিরিয়াল মেইনটেইন করছে। শীতের দেশ লোকবসতি কম কিন্তু ভিড় কমছিল না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাখন টাওয়ারের কাছাকাছি তেল পাম্পে পাশাপাশি দুটা টয়লেটের একটা এক মহিলা তদারকি করছেন আর টাকা collect করছেন। বেশি পরিপাটি কিন্তু লাগোয়া পাশেরটাতে নাক বন্ধ করে যেতে হয়! মুজিবনগর থেকে আসার পথে চাড়িতে পানি রাখা দেখে মগটা নিয়ে ঢুকলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে ভাল লাগলো। বেরিয়ে দেখি চাদর গায়ে যুবক দাঁড়িয়ে। পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নিয়েছে কিনা। বললো এলাকার বড় ভাই

দিয়েছেন। দিনশেষে ওকে যা দেয় তাতে পোষায়। বুঝলাম ব্যক্তিগত উদ্যোগ, কিন্তু খুশি হলাম। বসুন্ধরা মার্কেটে এত ভিড় কিন্তু টয়লেট পরিষ্কার, যেমন পাবেন ধানমন্ডি লেকে। ব্যবস্থা আছে, আছে পরিচ্ছন্নতা কর্মী। কর্মসংস্থান হচ্ছে, ভদ্রোচিত জীবনযাত্রা পাচ্ছে নাগরিকগণ।

যারা লংরুটে যাতায়াত করেন তেল/গ্যাস পাম্পের কথা ভাবলে শরীর শির শির করে উঠবে। সব পাম্পেই কিন্তু ব্যবস্থা আছে। প্যান আছে, আছে কমোট, রয়েছে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার সুন্দর ব্যবস্থা। নেই শুধু মেইনটিনেন্স। মসজিদ আছে কিন্তু ওজুর জায়গায় গেলে খিস্তি খেউড় করলেও পোষাবে না।

উত্তর বঙ্গ গেলে বোঝা যাবে, অ্যারিস্টক্রেট এত সুন্দর রাখতে পারছে কিন্তু অন্য রেস্টুরেন্টগুলো কেয়ার করে না। আসলে টাকা নয় মানসিকতা থাকা চাই।

সিলেট রোডে উজান ভাটির দশা কাছাকাছি মনে হলো ওদেশে টয়লেট পেপার, ট্যালকম সোপের খুব অভাব। এসব জায়গায় আট ঘণ্টার রোটেশনে পরিচ্ছন্নতানকর্মী রাখলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতো। মেইনটেইনেন্সের জন্য যাত্রী/জনগণের সোৎসাহ সহযোগিতার অভাব হবে বলে মনে হয়না। এ কাজে মাথাপিছু ২টাকা খরচ করতে কেউ আপত্তিও করবে না। কথা হলো u spend u enjoy, (অবকাশ যাপন স্থাপনায় গেলে বুঝবেন!)

বোম্বে যে port শেষ ব্রিটিশ প্রস্থান করেছিল, পাশেই সেই তাজমহল হোটেল যেখানে সন্ত্রাসি অ্যাটাক হয়েছিল সেখানে পর্যটকের অভাব নেই; মিউনিসিপ্যালিটী নিয়ন্ত্রিত washroom বাইরে থেকে মলিন দেখলেও ভিতরে ভারি clean, কর্মীতে ভরা পুরানা এ ঘরটি সুশৃংখল, charge খুব মামুলি।

কোন এক জায়গায় পড়েছিলাম শুধু হাত ধুয়ে খাওয়ার অভ্যেস করতে পারলে নাকি দেশের স্বাস্থ্য বাজেটের ৪০০ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করা সম্ভব!

আমাদের পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তদারকীর দায়িত্ব নিতে পারে, না থাকলে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নিতে পারে। ভোক্তা, সরবরাহকারী সবার সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে পারে। পার ক্যাপিটা ১৪৪৬ ডলার আয়ের দেশের লোকের ভ্রমণকালীন এটুকু কৌলিণ্য থাকা উচিত। ট্যাক্স তো জনগণ কম দিচ্ছেনা!

Evolution / বিবর্তন

ঈদ, কোরবানির ঈদ

গরু কেনা: আমি যাই রুপনগরের ঢালে, পল্লবী extension eastern housing এর নির্মীয়মাণ প্রকল্পে। হেরিং বোন করা এলাকা। গাড়ি নিয়ে straight অকুস্থলে, পার্কিং-এর অভাবও নেই। Gossip করা, গরু দেখা, গরু কেনা relaxly সব করা

যায়। এক বেলা পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম সব এলাকার seasonal গরুর ব্যাপারীর সাথে দেখা হয় (পরিচিত+অপরিচিত)। ঠাসাঠাসি/ঠেলা ঠেলি নেই, pickpocket হবার শংকাও কম। আমদানি করা একই মাপের প্রায় একই রংয়ের অনেক গরু, ভাল collection, ঘুরে দেখলাম গরুর চেয়ে customer এর সংখ্যা বেশি মনে হলো। গরুর হাট গোবর কাঁদা থাক, পায়ে ধূলা ও লাগলো না। আগে গাবতলী, আগারগাঁও, আফতাবনগর, কাওরান বাজার থেকে এক দুজন গরুর সাথে হেঁটে আসত; এখন pick up তুলে নিল; ঝঞ্ঝাট বিহীন ট্রান্সপোর্ট। হাসিলের পার্টিও খুব কাটরবাজ। গ্রীন স্কয়ার বাসা থেকে অনেক দূরে হলেও দশটায় রওয়ানা হয়ে দুটার মধ্যে ফিরে আসলাম।

কোরবানি : সোয়া আটটায় নামাজ শেষে মাংস বানানো ভাগ বাটোয়ারা সাড়ে বারটায় শেষ এবং জোহর পড়ে আমরা খিচুড়ি মাংস খেয়ে রসূলের সুন্নত পালন করলাম। কসাই পারঙ্গম কিন্তু চার্জ খুব বেশি। ডাক্তার হবার পরও গ্রামের বাড়িতে নিজেরাই একাজ করতাম। এবার পোষের দাম কম, খাসি তো ফ্রি; এতিমের হক!

বর্জ্য : সোয়া চারটায় বেরুলাম ছেলের শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে। গ্রীন রোডের দুটা স্পট কোরবানির জন্য ফিক্স করা থাকলেও মনে হলো মানুষ used to হয়নি। কলাবাগান, শাহীনবাগ, নাখালপাড়া ধানমন্ডি ঘুরলাম চমৎকার! আমরা কি না পারি? আগে ঈদের পরের দিন বাড়ি গিয়ে ফিরে এলে গোবরের গন্ধ পেতাম, রক্তের দাগ থাকত, খড় কুটায় ভরা থাকত রাস্তা, গন্ধ পাওয়া যেত কয়েকদিন যাবত। এবার তেলেশমাতি সন্ধ্যার মধ্যে সব শেষ ব্লিচিং-এর গন্ধও নেই!

সবুজ বাংলা : বরাবরের মত ঈদের ছুটির বাড়তি দিনে সন্ধ্যায় এবার গেলাম রাজশাহী। ৫.৩০ টায় রওয়ানা হয়ে পৌঁছলাম ৮.৩০টায়। আমার কাছে লক্ষণীয় ছিল গাছ, মেহগিনির গাছ। ভেবেছিলাম গ্রামের নদীর ধারেই বুঝি শুধু এই গাছ। এবার টাঙ্গাইলও গেলাম। দশবছর আগে লাগানো গাছগুলো দৃষ্টি কাড়ার মত। টাঙ্গাইলে পুরান, নতুন বাসস্ট্যান্ড পার হয়ে সন্তোষের পথে বেবী ট্যাক্সি স্ট্যান্ড; শত শত সবুজ গাড়ি। কালামপুর যেতে পরিষ্কার হলো পরিস্থিতি; পাকা অপরিসর রাস্তায় বাস ট্রাক দেখিনি, মাইক্রোও খুব কম। পাকুল্যার পথে দুধারে ধানি জমি, বিল; মধ্য দিয়ে লম্বা পাকা রাস্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে আছে এমনটি; ওটা মিনি কক্সবাজার হিসেবে খ্যাত।

প্যারিস থেকে বেলজিয়ামের পথে সবুজ প্রান্তর, সাজানো বাড়ি দেখে কবিকে তিরস্কার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল; এবার মনে হলো he was right 'এমন দেশটি ... তুমি ... সে যে আমার জন্ম ভূমি। ভাবছিলাম এই দেশেই তো জন্মেছি, এই পরিবেশেই তো মানুষ হলাম এতগুলো বছর কাটালাম। মানুষের মধ্যে গাছ লাগানোর সংস্কৃতি কিভাবে গজাল। সারা বাংলাদেশ দৃষ্টিনন্দন সারি সারি মেহগিনি গাছে ভরে গেল।

VfS office : ব্রিটিশ ভিসার জন্য পাসপোর্ট, কাগজপত্র জমা দিলাম। ভিসা ফি'র চেয়ে বেশি দিতে হলো; সোমবার বিকেলে appointment ছিল ওরা বলল প্রাইম ডে ও প্রাইম টাইম হওয়ার কারণে extra charge. যাই হোক খাতির যত্ন করলো সোফা সেটে ভরা লাউঞ্জে বসালো। কোক, পানি, চা, কেক দিয়ে আপ্যায়ন করলো। আমরা বসেই থাকলাম, ওরা কাগজপত্র ঠিক করে সই নিল। বায়োমেট্রি সেরে চলে আসলাম। ভাবটা হলো you spend u enjoy!

দিনমজুর : আগে দিন মজুর দৈনিক আয় দিয়ে এক কেজি চাউল হতো, এখন ৫০০ টাকায় ১০-১১ কেজি! স্মার্ট হলে নিজের আয়ের ১০০০০০ টাকা দিয়ে দুটা গরু কিনে লালন পালন করলে কোরবানির সময় বিক্রী করে ১০০০০০ টাকা মুনাফা করা কঠিন নয়। প্ল্যান easy, গ্রামেরবাড়ি গরুর খাবারের খরচ কম, veterinary help available. মূলধন কম হলে এক টুকরা জমি ভাড়া নিয়ে স্বল্পকালীন সবজি লাউ কুমড়া চাষ করলে ভাল লাভ। মৌসুমী পাইকার প্রোগ্রাম করে বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে যাবে, বহন করে হাটে তোলার ঝক্কি/ঝামেলা নেই।

উবার: ট্যাক্সি আর স্কুটার মনোপলির মধ্যে উবার চালু হলো, সুবিধার জন্য পাঠাও, বেশি খরচে প্রিমিয়ার আসলো; রাস্তার জ্যাম কোন সুখ-ই কপালে সইলনা। কিন্তু পাওয়ার সুখানুভূতি খরচ করার ভূত ঘাড়ে বসে গেল।

সংরক্ষণ/ফ্রিজ : আগে সকালে পুকুর বা বিলের মাছ ধরে রান্না করে টাটকা খেয়ে স্কুল/অফিস যেতাম। তাজা মাছ দিলেও ফ্রিজে রেখে সুযোগ মত রান্না করে খাওয়া, ভুলে গেছি টাটকা খাওয়া, যেমন নেই বিলের মাছ; বিলই নেই, পুকুরে সব মাছ চাষ হয়। সংসার ছোট খানেয়ালা কম অথচ প্রতিযোগিতা অশুভ, চাই টাকা গাড়ি-বাড়ি এক দুই তিন; ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় আজ আর নেই।

নির্বাচন (Election) : সুষ্ঠু নির্বাচন এখন জনতার মনের কথা, ৫২ তে যেমন ছিল বাংলা ভাষা, ৬৮, ৭০ এ যেমন ছিল স্বাধীনতা, ৮৯ তে ছিল স্বৈরশাসক; nothing short of সুষ্ঠু নির্বাচন জনগণ মেনে নেবে। আমাদের আছে কর্মীর হাত। কাজে লাগাতে পারলেই মালয়েশিয়ার চেয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আন্দোলনের দিনগুলোতে বাচ্চাদের একটা স্লোগান ছিল 'জঞ্জাল পরিষ্কারে হাত দিয়েছি সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত'। সেদিন বেশি দূরে নয়, স্বাধীন দেশের আগামী দিনের নাগরিক ছেড়ে কথা বলবেন না, মোড়ে স্কাউটদের নিরলস সতেজ উপস্থিতি সে শিক্ষাই দিচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে অনেক। শুধু অনুর্ধ্ব ১৫ নারী ফুটবল বা ক্রিকেট নয় প্রায় সবক্ষেত্রেই যে দেশ এগিয়েছে এ কথা অস্বীকার করার মত লোক আজ আর বাংলাদেশে নেই। এ অর্জন অম্লান রাখতে হলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিকল্প নেই। গণতন্ত্র/রাজনীতির সূতিকাগারে জন্ম নেয়া ও বেড়ে উঠা শেখ হাসিনা জনগণের pulse উপলব্ধি করবেন না এটা ভাবা উচিত নয়। তিনটা agenta হতে পারে উনার পদ্মা সেতুর খরচ বেড়ে already ৩০

হাজার কোটি পেরিয়ে গেছে, হত দরিদ্রের সংখ্যা এক কোটির (৬%) বেশি, সবার উপরে knocking the door নির্বাচন, সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ১৬ কোটি লোকের দায়িত্ব নিয়েছেন; জাতির পিতার কন্যাকে যে পারতে হবে, উনাকেই তো জনগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে হবে!! Seasoned politician আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অনেক achievement আছে। নিজের ক্যারিশমার excellency দিয়েই উনি সবাই/সবদলকে নিয়ে আগামী নির্বাচন করতে পারবেন এটাই জনগণের আশা। নির্বাচনে হারজিত থাকবেই তবে জিততে হলে good candidate এর বিকল্প নেই। মিডিয়ার কল্যাণে, increased per capita income এর কারণে তৃণ মূলের লোকও কিন্তু জানে কার জনসম্পৃক্ততা বেশি। শ্রমিকের বেতন কমিয়ে নিজে আলীশান বাড়িতে থাকবেন, ২/৩ টা গাড়ি রাখবেন; ঋণ খেলাপ করে, ব্যাংক ডাকাতি করে, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিবেন; অষ্ট্রেলিয়া, কানাডার নাগরিকত্ব নিবেন মালয়েশিয়ার সিটিজেনশীপ ভোগ করবেন, এক টেন্যুরে ৩০০-৬০০ কোটি টাকার মালিক হবেন অথচ জনগণ আপনাকে নেতা মানবে আজ হোক কাল হোক এর অবসান হবে; কোটা সংস্কার আন্দোলন কিন্তু এ বার্তা দিয়ে গেছে। যারা নজরুল পড়ে তারা আপনাকে ছাড়বে না, তারা বলবেই তুমি শুয়ে রবে ... অথচ ... দেবতা ... সে ভরসা আজ মিছে! আমাদের সামনে তাকাবার অভ্যাস করতে হবে, দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। ক্যাডার সার্ভিস আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন কিভাবে সার্বজনীন চাওয়া হলো সেটা উপলব্ধি করতে হবে।

যাত্রা সংক্ষিপ্ত হোক

এখন :

গুগলস ম্যাপে দেখলাম ভায়া টাঙ্গাইল আমার ডেস্টিনেশন পাবনার আতাইকুলার দূরত্ব ১৮৯.৩ কি. মি, গাড়িতে গেলে ৫.৫ ঘণ্টা লাগার কথা। যমুনা ব্রিজ হবার পর এটাই পথ।

যমুনা ব্রিজ হবার আগে

আমরা নগড়বাড়ি আরিচা দিয়ে যেতাম, যাওয়ার সময় ভাটিতে এক বা সোয়া একঘণ্টা আরিচা গেলে বাড়ি যেতে ৫-৬ ঘণ্টার বেশি লাগত না। প্রথম যেদিন মেডিকেলে ক্লাস করতে গেলাম মনে পড়ে সকাল ৬টায় রওয়ানা দিয়ে সন্ধ্যা ৬টায় বক্সীবাজার গেছিলাম। সেদিন তরা, নয়ারহাট, মীরপুর ফেরি পার হয়েছিলাম। ঐ সময় ফেরি মিস করার সম্ভাবনা থাকতো, কুয়াশায় (শেষের দিকে) ফেরী চলাচল বিঘ্ন ঘটত।

ব্রিজ হবার পর

ব্রীজ হবার পর আশাছিল ভোগান্তি কমবে, সময় কম লাগবে। সেদিন বাড়ি গেলাম ৯ ঘণ্টায়, বাড়ি থেকে আসতে লাগল ৮ ঘণ্টা। হা হতোস্মি! টাঙ্গাইলের রাস্তা চারলেন হচ্ছে; এটা সাময়িক। অনেকে বলছে এর পর গাড়ি উড়ে চলবে; সময় কম লাগবে।

ভবিষ্যত

যাই হোক আমার সহযাত্রী বলছিল ট্রেন লাইন হলে আগাবে (সম্প্রতি পাবনায় ট্রেন লাইন বসছে)। অভিজ্ঞতা না থাকলে ও বলল বুলেট ট্রেন হলে আরো জমবে। আগের জাপানের কুয়োটো -হিরোশিমার বুলেটের কথা মনে আছে। আমি বললাম কানাডা দেখলাম দিগন্ত জোড়া খামারের মালিক দিনশেষে ঘুড়ির মত প্লেনে উঠে ঘুরছে! ও রকম ছোট প্লেন হলে তখনতো আধা ঘণ্টা লাগবে। তাহলে প্রস্তাব করল ড্রোনের মত কিছু হলে আরো ভাল হবে। ভেবে দেখলাম হতেও পারে! অসম্ভব নয়, অনাগত জেনারেশনস দেখবে আশা করি।

জ্বর হলে কি করবেন

১। প্রথম চারদিন: প্যারাসিটামল দিয়ে জ্বর কমাতে হবে। ৬ ঘণ্টা পর পর ৫০০ মিগ্রা একটা করে ট্যাবলেট দিতে হবে। ১০২-এর নিচে না নামলে আরো একটা দিতে হবে। পানি পান করলে গা ধুয়ে দিলে জ্বর যাবে। জ্বর ১০০ তে থাকলেই চলবে। ৯৯ করার দরকার নেই।

২। পানি প্রচুর (৩+ লিটার) পান করতে হবে। বিশ্রাম নিতে হবে। খাওয়া দাওয়া ঠিক রাখার চেষ্টা করতে হবে; জুস ইত্যাদিতে ক্যালরি পাওয়া যাবে।

খ) ৪ দিনের বেশি হলে, অন্য উপসর্গ থাকলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

গ) ভাইরাল ফিভার ৭দিনের বেশি থাকে না।

ঘ) বিশ্রাম জ্বরের সময় ও জ্বর পরবর্তী ভোগান্তি কমায়।

ঘ) ৭ দিনের বেশি থাকলে আমাদের দেশে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড. রিকেটশিয়া ভাবা উচিত। টাইফয়েড তিন সপ্তাহের বেশি থাকে না। তিন সপ্তাহের বেশি হলে কালাজ্বর ম্যালেরিয়া ভাবতে হবে। ম্যালেরিয়ার টিপিক্যাল উপসর্গ পাওয়া যাবে এ সময়। আমাদের দেশে কালাজ্বর কমে গেছে।

ঙ) তিন সপ্তাহের বেশি হলে জ্বরকে পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন (সংক্ষেপে পিইউও) বলে। এদের ক্ষেত্রে ২-৩ বার আউটডোরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এমন কি হাসপাতালে রেখে সপ্তাহান্তে কোন কারণ উদ্ঘাটিত হয় না।

এলামনি (ALUMNI)

অনেকদিন পর সুন্দর অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম স্কুলে। আতাইকুলা হাই স্কুলে পড়েছি ১৯৬৫-৭০ পাঁচ বছর। সুভেনির থেকে এবং সিনিয়র সতীর্থদের কাছ থেকে পেলাম স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এতদিন জানতাম আব্দুল আজিজ গেট, ভাবতাম উনিই হয়ে থাকবেন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৫ সালে উনারা শুরু করেছিলেন মাইনর স্কুল দিয়ে। জমিদাররা ছিলেন প্রতিবন্ধক। মুসলমান হওয়ায় ও আশেপাশের মুসলমান প্রভাবশালীরা সহযোগিতা করার কারণে উনাকে দোকান লুটের মামলার আসামি হতে হয়েছিল!

ALUMNI-আমার শব্দটার উচ্চারণ বিভ্রাট ছিল। আসলে এটা এলামনি। এটা বহুবচন এবং পুংলিংগের জন্য। এটার অর্থ হলো প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করা প্রাক্তন ছাত্রগণ, ছাত্রী নয়! একবচন হলো এলামনাস। স্ত্রীলিংগ ALUMNAE.

অনুষ্ঠানটির প্রোগ্রামের ছক ছিল দক্ষভাবে করা। উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত:। সিনিয়র জুনিয়রদের পারস্পরিক সাক্ষাত পর্ব ছিল মনে রাখার মত। ১৯৫৪ সালে (আমার জন্ম) পড়েছেন এমন একজনও ছিলেন! সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ সিনিয়র জুনিয়র ক্রমে সাজানো প্রায় কিলোমিটার র‍্যালি সংগঠকদের মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। র‍্যালি শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরপরই। বোঝা গেল ভালো রিহের্সাল ছিল।

সুভেনির ছিল স্মৃতিচারণে ঠাঁসা। এই পার্টটা বরাবরই আমার প্রিয় কারণ এতে ইতিহাস জানা যায়, নিজের উপলব্ধি clear হয়। সিনিয়রদের স্মৃতিচারণ, অতিথি, সংগঠকদের বক্তব্য সবাই উপভোগ করেছে। দুজনের প্রাণবন্ত উপস্থাপন, শব্দচয়ন intermittent চুটকি monotony থেকে রক্ষা করেছে। ৬৬ সাল পর্যন্ত যারা পড়েছে সিনিয়র মোস্ট ধরে তাদের উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে প্রথম পর্ব শেষ হয়।

সভাপতির ভাষণে বোঝাগেল তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত এ এলামনি ও পুনর্মিলনী। USA থেকে Skype তে মিটিংএ পর মিটিংয়ের করে he has done it দেশে অবস্থানকারী কিছু নিবেদিত প্রাণ এলামনির নিঃস্বার্থ ও নির্মোহ কর্মযজ্ঞ সফল পরিণতি দিয়েছে প্রাঞ্জল প্রোগ্রামটির। ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকলে, sincere হলে আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগুলো যে কোন উদ্যোগই যে সফলে সমাপ্ত হয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানটি তার প্রমাণ। গ্রামীণ পরিবেশে ৮৩ বছরের একটা বিদ্যালয়ের এতগুলো alumnii উপস্থিতি নিশ্চিত করে প্রোগ্রাম করা নিপুণ সংগঠক না হলে হয় না।

পান্তা পর্ব

আগে গ্রীষ্মকালে পান্তা খেতাম প্রতি সকালে, এখন একদিন পয়লা বৈশাখ।

আগে রান্না ঘরে কাঁচা মেঝেতে বসে

এখন ফ্ল্যাটে সুদৃশ্য সাজানো টেবিলে

আগে খেতাম পাটি বা পিঁড়িতে এখন চেয়ার টেবিলে

আগে ছিল obligation, এখন occasion n option

ঢাকায় আসার আগে ইলিশ দিয়ে পান্তা খায় জানা ছিল না; এখন ইলিশ ছাড়া হয়না

পেঁয়াজ মরিচ আগেও ছিল এখনও আছে

মরিচ পেঁয়াজ ছাড়া পান্তার আসল স্বাদ মিলেনা!

একটা জিনিস আদি ও অকৃত্রিম সেটা হলো স্বাদ, আগেও যা এখনও হুবহু তাই-ই।

২৫ টি প্রশ্ন আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তর

১. প্রশ্ন ঃ আমি ধনী হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, অল্পেতুষ্টি অবলম্বন কর; ধনী হয়ে যাবে।

২. প্রশ্ন ঃ আমি সবচেয়ে বড় আলেম (ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী) হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, তাক্বওয়া (আল্লাহ ভীরুতা) অবলম্বন কর, আলেম হয়ে যাবে।

৩. প্রশ্ন ঃ সম্মানী হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, সৃষ্টির কাছে চাওয়া বন্ধ কর; সম্মানী হয়ে যাবে।

৪. প্রশ্ন ঃ ভাল মানুষ হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, মানুষের উপকার কর।

৫. প্রশ্ন ঃ ন্যায়পরায়ণ হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যা নিজের জন্য পছন্দ কর; তা অন্যের জন্যেও পছন্দ কর।

৬. প্রশ্ন ঃ শক্তিশালী হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, আল্লাহর উপর ভরসা কর।

৭. প্রশ্ন ঃ আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ (জিকির) কর।

৮. প্রশ্ন ঃ রিযিকের প্রশস্ততা চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, সর্বদা অযু অবস্থায় থাকো।

৯. প্রশ্ন ঃ আল্লাহর কাছে সমস্ত দোয়া কবুলের আশা করি!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, হারাম খাবার হতে বিরত থাকো।

১০. প্রশ্ন ঃ ঈমানে পূর্ণতা কামনা করি!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, চরিত্রবান হও।

১১. প্রশ্ন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে গুনা মুক্ত হয়ে সাক্ষাৎ করতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, জানাবত তথা গোসল ফরজ হওয়ার সাথে সাথে গোসল করে নাও।

১২. প্রশ্ন ঃ গুনাহ কিভাবে কমে যাবে?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, বেশি বেশি ইস্তেগফার (আল্লাহর নিকট কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা) কর।

১৩. প্রশ্ন ঃ কেয়ামত দিবসে আলোতে থাকতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, জুলুম করা ছেড়ে দাও।

১৪. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ কামনা করি!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, আল্লাহর বান্দাদের উপর দয়া-অনুগ্রহ কর।

১৫. প্রশ্ন ঃ আমি চাই আল্লাহতায়ালা আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখ।

১৬. প্রশ্ন ঃ অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে চাই ?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যিনা (ব্যভিচার) থেকে বেঁচে থাকো।

১৭. প্রশ্ন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর নিকট প্রিয় হতে চাই ?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) এর নিকট পছন্দনীয় তা নিজের জন্য প্রিয় বানিয়ে নাও।

১৮. প্রশ্ন ঃ আল্লাহর একান্ত অনুগত হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, ফরজ সমূহকে গুরুত্বের সহিত আদায় কর।

১৯. প্রশ্ন ঃ ইহসান সম্পাদনকারী হতে চাই!
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, এমন ভাবে আল্লাহর এবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ অথবা তিনি তোমাকে দেখছেন।

২০. প্রশ্ন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) কোন বস্তু গুনাহ মাফে সহায়তা করবে?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন,

ক) কান্না। (আল্লাহর নিকট, কৃত গুনাহের জন্য), খ) বিনয়, গ) অসুস্থতা।

২১. প্রশ্ন ঃ কোন জিনিস দোযখের ভয়াবহ আগুনকে শীতল করবে?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, দুনিয়ার মুসিবতসমূহ।

২২. প্রশ্ন ঃ কোন কাজ আল্লাহর ক্রোধ ঠাণ্ডা করবে?
উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, গোপন দান এবং অত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা।

২৩. প্রশ্ন ঃ সবচাইতে নিকৃষ্ট কি?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, দুশ্চরিত্র এবং কৃপণতা।

২৪. প্রশ্ন ঃ সবচাইতে উৎকৃষ্ট কি?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, সচ্চরিত্র, বিনয় এবং ধৈর্য্য।

২৫. প্রশ্ন ঃ আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার উপায় কি?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, মানুষের উপর রাগান্বিত হওয়া পরিহার কর।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন।

আমিন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন -

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকে লাভ করা যায়।" (সহীহ আল-বুখারী, হাদীস ৬/২৫৩৩)
- রসূল (সাঃ) আরও বলেছেন, - "মনে রেখো যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তাদের অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষ অবলম্বন করব।" (আবু দাউদ)
- মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ছেড়ে যাদেরকে তাঁরা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না; কারণ এতে তারাও সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।" (সূরা আন'আম: ১০৮)

- তোমাদের কাছে কোন প্রতিমা পূজারী মুশরিকও যদি (বিপদে পড়ে) আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দিও, যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অতঃপর (তারপর সে আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করলেও) তাকে তার (বিপদ কেটে যাওয়ার পর) নিরাপদস্থানে পৌঁছে দিও। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না। (সুরা তাওবা: ৬)।

Exclusive jokes

একবার মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করলো। তো, বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানে মানুষ গিয়ে হাজির হল। কিন্তু শর্ত ছিল যে শুধুমাত্র একজনই যেতে পারবে এবং সে পরবর্তীতে আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না।

প্রথম আবেদনকারী একজন

England-এর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল তিনি যাওয়ার জন্য কত টাকা চান। শুনে তিনি বললেন, ১ মিলিয়ন ডলার, সে টাকার অর্ধেক আমি আমার পরিবারকে দিতে চাই। বাকি অর্ধেক দান করতে চাই।

এর পরের আবেদনকারী ছিলেন একজন রাশিয়ান ডাক্তার। তাকে জিজ্ঞেস করা হল যাবার জন্য তিনি কত টাকা চান।

তিনি উত্তর দিলেন, ২ মিলিয়ন। এর মাঝে ১ মিলিয়ন আমার পরিবারের জন্য। আর বাকি ১ মিলিয়ন মেডিকেলের উন্নয়নের জন্য দান করতে চাই।

এবার তৃতীয় আবেদনকারী। তিনি ছিলেন একজন বাংলাদেশি।
উনাকে জিজ্ঞেস করা হল তিনি কত টাকা চান। তিনি প্রশ্নকর্তার কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, ৩ মিলিয়ন!!
প্রশ্নকর্তা শুনে অবাক। বলল, এতো বেশি কেন..??
তখন বাংলাদেশি আবার তার কানে কানে বলল,
১ মিলিয়ন আমি রাখবো আর ১ মিলিয়ন আপনাকে দিবো।
আরেক মিলিয়ন England-এর বলদ ইঞ্জিনিয়ারটাকে দিয়ে মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দেবো।'

How to upgrade your esteems (expectations)

প্রবৃদ্ধিতে gross domestic product (GDP) 6, 7, 7.5 কিভাবে সম্ভব যেখানে

রেমিট্যান্স, রফতানির বেহাল অবস্থা। আগে দেখতাম আউশের পরে আমন ধান বোনা হতো অথবা পাট বা অন্য ফসলের পরে আমন অর্থাৎ বছরে দুটা ফসল। এখন আউশ নেই-ই। রোপা/ইরির পর পেঁয়াজ রসুন তারপর আরেকটা ফসল, তারপর আরেকটা; বছরে একই জমিতে তিন-চারটা। স্বল্প সময়ে বেশি ফলনের

ধান এখন কৃষকের মজ্জাগত। আমি নিজে (৭২, ৭৩, ৭৪ এ) শুকনো জমিতে রসুন-পেঁয়াজ লাগাতাম এখন জমির (বর্ষাকালের) পানি টেনে যাবার আগেই লাগায়; মাঝখানে পিঁয়াজের জমিতে সেচ দেয়া হত। কম সময় ফলন বেশি। দাম ও রসুন পেঁয়াজের মাশাল্লাহ! গতবার না থাকলেও এবার ধানের দামও ভাল। পুকুর কেটে মাছ চাষ, খানিক শ্রম, স্বল্প পুঁজি, মুনাফা প্রচুর। ব্রয়লার একসময় শহরের প্রচলন ছিল, এখন গ্রামে মেশিনের শব্দ মিলে।

দেখলাম প্রতি সপ্তাহে এগ্রিকালচার এক্সটেনশন অফিসার গ্রামে আসছেন। বীজ, সার সরকারি ভাবে gift দিয়ে আদর্শ চাষ/চাষিকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে; থানায়/জেলায় নিয়ে ওয়ার্কশপ, আপ্যায়ন TA দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু হয়েছে। ভাবছিলাম এগুলো হয়ত আগেও ছিল (কাগজে কলমে, টাকা-পয়সা খরচও হতো তবে মাঠ পর্যায়ে নয়)।

সার একটা অদ্ভুত উন্নতির পথ বাতলিয়েছে। আগে মানুষ জানতোনা (এখনও হয়ত অনেকে জানে না) শুধু ইউরিয়া কোন কালেই উপকারী ছিলনা। DAP (ইউরিয়া ১৫%+টিএসসপপি ৮৫%) এনেছে প্রকৃত বিপ্লব। গমের গাছ, ধানের গাছ দেখতে অনেক হৃষ্টপুষ্ট।

কলের লাঙ্গল-বৃহদাকারগুলো বিশ মিনিটে প্রতিবিঘা চষে-আদি লাঙ্গলে যেটা করতে লাগত এক দিন। (কলের লাঙ্গল-ট্রিলার) একদিনে বিঘা প্রতি ৬০০ টাকা নিয়ে দিনে ২০-৩০ বিঘা সাবাড় করতে পারে-খরচ বাদে মুনাফা ভালই! কলের লাঙ্গল দিয়েই জমি থেকে ফসল আনা নেয়া চলে সময় কম, খরচ বেশি না, রাস্তাঘাটও পাকা।

কৃষক এখন ঘাসের চাষ করে। ঘাস খাইয়ে ষাঁড় তাজা করে। ষাঁড়ের মূল্য কল্পনাতীত। ঘাসের আঁটির মূল্য/চাহিদা অনেক। বিক্রি করার দ্রব্য। একবার ফলালে ঘাস বিক্রি করা যায় তিন কিস্তী-৩গুণ লাভ।

কৃষক অনুপ্রাণিত হচ্ছে বারি বিরির তাগাদায়। প্রযুক্তি নির্ভর হাইব্রিড ফসল এখন কৃষিতে অনেক পরিবর্তন এনেছে। প্রকৃতির সাথে মিশে প্রাকৃতিক গ্রামীণ জীবন নিজের, দেশের সমৃদ্ধি আনছে।

যতদূর মনে পড়ে (হাইস্কুলের পূনর্মিলনীতে দেয়া বক্তৃতা)

আতাইকুলা হাই স্কুলে পড়েছি ১৯৬৫ থেকে ৭০ পর্যন্ত পাঁচ বছর। ১৯৩৫ সালে খোন্দকার আব্দুল আজিজ সাহেবের মত বিদ্যানুরাগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুল কালের পরিক্রমায় পাবনা জেলার নাম করা প্রতিষ্ঠান। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আশেপাশের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্ররা এখানে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়। ভর্তিতে আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল লিখিত পরীক্ষায় একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রত্যেকের এক মিনিট

লাগলে ৫০ জনের কত মিনিট লাগবে। একজন মাত্র সঠিক উত্তর দিয়েছিল। আমার সেই বন্ধুর বুদ্ধিমত্তাকে এখনও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। সম্ভবত সপ্তম শ্রেণিতে আইউব খানের decade of reforms পালিত হয়েছিল। আজও জানিনা হেডমাস্টারের সভাপতিত্বে স্কুল কমিটির ঐ সার্বজনীন অনুষ্ঠানে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে কেন আমাকে বক্তৃতা দিতে বলা হয়েছিল। সপ্তম শ্রেণীতে তখন আমাদের ইংলিশ বই থেকে reading (শ্রুতি পঠন) পড়তে হতো। অন্য বন্ধুরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে এটাকে খুব গুরুত্ব দিতেন বলে মনে হতো না।

ক্লাস এইট-এর কথা বেশি মনে পড়ে; TEO সাহেবের বাৎসরিক পরিদর্শনটা ছিল খুব thrilling; কার কি লাভ হতো তখন হিসেব করতে শিখিনি। একবার শিক্ষা অফিসার জিজ্ঞেস করলেন মিশর কোন মহাদেশে। কেউ ইউরোপ, কেউ আমেরিকা অধিকাংশই বলল এশিয়া, আমার turn আসলে বললাম আফ্রিকা; সেদিনই শিখলাম মিশর আফ্রিকায়। সব ঘটনা/সব লোকের কাছ থেকে চোখ কান খোলা রাখলে কিছু শেখার থাকে মনে গেঁথে গেল। এইটের আরেকটা ঘটনা। বার্ষিক debate (Topic মনে নেই); রিহার্সেলে খুব ভাল করলাম, মার্কিংয়ে নাইন টেনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকলাম। পরে দেখলাম ফাইনাল আর হলো না। রিহের্সেলকেই ফাইনাল ধরে আমাকে বিজয়ী বলা হলো। আমাকে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছিল (presumed); স্কুলে প্রতিবছর indoor outdoor game competition হতো, কোন ইভেন্টে যোগ্যতা দেখাতে পেরেছি বলে মনে হয়না। রচনা নিয়ে দুটা ঘটনা বলি। আতাইকুলা ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে কোন এক পার্বণে উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতা আহবান করা হলো – Topic "পলাশী যুদ্ধের পটভূমি", এটা সম্ভবতঃ ক্লাস নাইনে। আমি ইতিহাস, সাহিত্য যতদূর পারি মিলিয়ে লিখলাম; আমার উপলব্ধি ছিল যুদ্ধের ক্ষণপূর্ববর্তী ঘটনা গুলোই হলো পটভূমি, সে অনুযায়ী লিখলাম। রেজাল্ট ঘোষণায় দেখলাম আমি নাই; পরে শুনলাম অন্যরা পলাশী যুদ্ধের পূর্বপর ঘটনাগুলো লিখছিল। যখন যেটায় হাত দিই serious হয়ে যাই কারো সাথে আলাপের ফুরসৎ খুঁজি না, এটা আজীবন সমস্যা, বাস্তবিক নয়।

এইটে স্কলারশিপ পাবার পর সবাই বলল মিষ্টি খাওয়ালো, সহকারী হেডমাস্টার স্যার বললেন ওকে (আমাকে) খাওয়ানো উচিত এবং খাওয়ালেন; he became my idol। উনার নিয়মটা আজও follow করার চেষ্টা করি, উপভোগ করি। হেড স্যার বললেন স্কলারশিপ রেসিডেন্সিয়াল বিধায় হোস্টেলে থাকলাম নাইন-টেন। বেড়াস্কুল থেকে আসা সহপাঠী আর গ্রামের দুজন মিলে চারজন হলাম। গ্রুপিং করতাম, পিটাপিটি যে হয়নি তা নয়। হোস্টেলের সুপার তুর্কি স্যার, ফিজিক্স পড়াতেন; ছবি তোলার বাতিক ছিল উনার। বিকেল বেলা আড্ডা না দিলে উনার চলতো না। অনেক আন্তরিক অত্যন্ত পাতলা এই মানুষটি আমাদের গল্পের মধ্যমণি ছিলেন বহুদিন।

আমাদের হেড স্যার ছিলেন সব দিক দিয়ে হেড। চেইন স্মোকার কিন্তু অফিসে, অফিস টাইমে ধূমপানরত দেখিনি। সব কিছুতেই শেখানোর তাগিদ ছিল। যে কারণেই হোক সেভেন থেকেই উনার রুমে ছিল অবাধ যাতায়াত। খবরের কাগজ পড়তে দিতেন। জিজ্ঞেস করতেন, 'বাণিজ্য' কোন পাতা। বলতেন, আজকের সম্পাদকীয়টা দেখ কিসের উপর। উনি কেমিস্ট্রি পড়াতেন, ঝানু শিক্ষক। ক্লাস সমাপ্তিকালে ক্ষানগর্ভ চুটকি দেয়ার চেষ্টা করতেন। একদিন বললেন বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে পানি না চেয়ে H_2O চাস না আবার, বলার অপেক্ষা রাখে না সেদিনই প্রথম শিখেছিলাম H_2O মানে পানি।

স্কুলের ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। আমি সরল মনে পড়েছি বুঝিনি; বেশি কিছুদিন এটা নিয়ে কানাঘুঁষা হয়েছিল। একদিন স্যারের রুমে গিয়ে দেখি ভীষণ তর্কাতর্কি; এক পর্যায়ে হেডস্যারের নাম ধরে বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন 'স্কুল কি করে করতে হয়' আমিও জানি। তর্কটি ছিল আমাদের গ্রামের শ্রদ্ধাস্পদ লোকের সাথে। গ্রামের এ লোকটিরও ভক্ত ছিলাম; উনি পোস্ট অফিস, জুনিয়ার হাই স্কুল করেছিলেন। হাইস্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ছাত্র থাকাকালীন যথ াক্রম গ্রামে, রাজশাহী ডিপিআই অফিসে এবং এমপির কাছে অনেক কাজই করতে হয়েছে গ্রামের স্কুলটির জন্য। আসলে হেডস্যার নিজের স্কুলের ছাত্র কমে যাবে শংকায় আশে পাশে নতুন স্কুল হওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। satire এ প্রবন্ধটা কিন্তু ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। এস এস সি বাংলা পরীক্ষা দিয়ে হল থেকে ফিরছি হেডস্যার ইশারায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন রচনা কোনটা লিখেছিস। 'একটি ভ্রমন কাহিনী', 'রাজপথ' আর একতার মধ্যে আমি 'একতা' লিখেছি বলায় উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন best choice, উনার হিসাবে uncommon বলে ওটা কম attempted হবে। বাংলা ঐ পেপারে ৭৩ পেয়েছিলাম, টেস্টে ছিল ৭৮।

আমাদের ক্লাস নাইনে ইংলিশ টিচার ছিলেন না। একজন খুব বয়স্ক লোক কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। ক্লাসের সময় উনি আমাদের দিকে না তাকিয়ে অপলক পাতার দিকে তাকিয়ে পড়িয়ে যেতেন; খটকা লাগায় হেডস্যারকে বললাম। উনার অনুসন্ধিৎসা উপশম করার জন্য একদিন টিচারের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে দেখলাম, স্যারকে রিপোর্ট করলাম।

টিচার প্রতিটি লাইনের নিচে বাংলায় লিখে রেখেছেন এবং দেখে দেখে পড়াচ্ছেন। যা হবার তাই হলো; পুরা ৬মাস ইংলিশ স্যার ছাড়া চললো। পরে যিনি আসলেন নাহার স্যার; আমাকে জামাই বলতে থাকলেন। সবাই সন্দিহান হলো রহস্য ভেঙে বললেন ও যাকে বিয়ে করবে সে আমার মেয়ে হবে। একবার কে যেন perfect ইংরেজিতে উড়ো চিঠি লিখল। স্যার বললেন এত correct ইংরেজী খাজা এবং (আমার) বেড়া স্কুল থেকে আসা friend ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়; আমি শুধু এই টুকু জানতাম that was not written by me, not even now!

Class six-এর গালিভার স্যারের কথা মনে পড়ে-লম্বা কাবুলি চেহারা ও মেজাজের স্যার ক্লাসে একজন ভুল/অন্যায় করলে সবাইকে পিটাতেন। কয়েকজন বন্ধু ছিল প্ল্যান করে উনাকে উত্ত্যক্ত করতেন। বড় হবার পর উনার বদমেজাজের রহস্য আমরা বের করেছিলাম। আমাদের ছিলেন কর সার, তুর্কী সার, গালিভার স্যার কৈশোরের উদ্দীপনা ছিল নিক নামগুলো।

হোস্টেল লাইফের একটা ঘটনা না বললেই নয়। সকালে উঠে মাঠে দৌড়াচ্ছি; দেখি চোর চোর বলে দুই দিক থেকে তেড়ে আসছে, নিকটবর্তী হতে আমাকে দেখার পর ক্ষান্ত হলো; অনেকদিন পর জেনেছি ফজরের আজানের আগে বাইরে বেরুলে সব দেশেই বিপত্তি হতে পারে। বরাবরে ক্লাস ক্যাপটেন থাকলেও দশম শ্রেণীতে একবার নির্বাচন করতে হয়েছিল; জিতার পর বুঝেছিলাম ভোট কঠিন জিনিস; মুখে আপন থাকলেও ভোট অন্যকে দেয়।

ব্যাখ্যা লিখতে কবিতায় কবি লিখতে হয়, গল্পে লেখক-শিক্ষক পড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ একই সাথে কবি এবং লেখক উনার বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়; ষাম্মাসিকে আমি গল্পের বেলায় রবীন্দ্রনাথকে কবি উল্লেখ করলাম। সেই স্যারই পুরা নম্বর কেটে দিলেন, দ্বিতীয় হয়ে গেলাম। চ্যালেঞ্জ করে বসলাম; স্যার অনড় থাকলেন এবং বললেন মার্কিং চেঞ্জ হবেনা, এটা হৃদয়গম করতে অনেক সময় লেগেছিল যে my understanding was wrong and I did not commit that mistake again. আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন, একা থাকতে ভালবাসতেন। অবনত নেত্রে হাঁটতেন, চপ্পল পায়ে চলতেন। বিজ্ঞানের সব subject পড়াতেন, পারতেন। এস এস সি পরীক্ষার টেস্টের পর এক থেকে দশ পর্যন্ত সবাইকে আলাদা পড়াতেন। আমার গ্রুপে পাঁচজন তিনটার শিফটে পরলাম। উনি প্রশ্ন দিয়ে সলভ করতে বলতেন, আমার কাজ ছিল অন্যদের সলভ করা গুলো লাগলে কারেকশন করা। যাই হোক শেষের দিকে assessment পর্বে আমাকে বললেন 'তুমি ৫টায় লেটার পাবেনা। ফিজিক্স এ ৮০ হবেনা, তবে ৭৫ এর বেশি পাবে। এস এস সি রেজাল্টে দেখা গেলআমি ফিজিক্সে ৭৬ পেয়েছি, দুই অংক, রসায়ন, বায়োলজী ৪টায় ঠিকই ৮০ র বেশি পেলাম। এই না হলে মাস্টার !

জয় বাংলা শ্লোগান কবি নজরুল ইসলাম থেকে ধার করা

"জয় বাংলা" শ্লোগান কবি নজরুল ইসলাম থেকে ধার করা।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতায় শেষের দিকে আছে বাংলা বাঙালির জয় হোক, বাংলার জয় হোক, জয় বাংলা' এই কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই আওয়ামী লীগের জনসভার শেষে বঙ্গবন্ধু শ্লোগান দিতে শুরু করেন 'জয় বাংলা, জয় বাংলা ভাষা, জয় হোক বাংলার মানুষের'।

দ্রোহী নজরুল

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ছিলো, একটা ছেলে যদি একজন মেয়ের সাথে কথা বলতে চায়, তবে তাকে প্রক্টর বরাবর দরখাস্ত দিতে হবে। শুধুমাত্র প্রক্টর অনুমতি দিলেই সে কথা বলতে পারবে। এছাড়া নয়। এমন কি তার ক্লাসের কোন মেয়ের সাথেও না।

ডিসেম্বর ১৯২৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র ৬ বছর পর। একদিন কোলকাতা থেকে একজন যুবক এলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখবেন।

কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে সে ঘুরতে বের হলো। তখন কার্জন হল ছিলো বিজ্ঞান ভবন। ঘুরতে ঘুরতে যখন কার্জন হলের সামনে এসে পড়লো তারা, সে যুবক দেখলো দূরে একটা থ্রী কোয়ার্টার হাতার ব্লাউজ আর সুতির শাড়ি পরা এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলেন, এই মেয়েটি কে? তখন তার বন্ধুরা বলল, এ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম নারী ছাত্রী। তখন সেই যুবক বলে, সত্যি? আমি এই মেয়ের সাথে কথা বলব। তখন সে যুবক মেয়েটির সাথে কথা বলার জন্য একটু এগিয়ে গেলে তার বন্ধুরা তাকে বাধা দেয়। বলে, না তুমি যেওনা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের সাথে কথা বলার অনুমতি নেই। তুমি যদি ওর সাথে অনুমতি ছাড়া কথা বলো তবে তোমার শাস্তি হবে। সেই যুবক বলল, "আমি মানি নাকো কোন বাধা, মানি নাকো কোন আইন।"

সেই যুবক হেঁটে হেঁটে গিয়ে সেই মেয়েটির সামনে দাঁড়ালো। তারপর তাকে বলল, "আমি শুনেছি আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম নারী ছাত্রী। কি নাম আপনার?" মেয়েটি মাথা নিচু করে বলল, "ফজিলাতুন্নেছা।" জিজ্ঞাসা করলো, "কোন সাবজেক্টে পড়েন?" বলল, "গণিতে"। গ্রামের বাড়ি কোথায়? "টাঙ্গাইলের করোটিয়া।" ঢাকায় থাকছেন কোথায়? "সিদ্দিকবাজার।" এবার যুবক বললেন, "আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম নারী ছাত্রী, আপনার সাথে কথা বলে আমি খুব আপ্লুত হয়েছি। আজই সন্ধ্যায় আমি আপনার সাথে দেখা করতে আসবো।"

মেয়েটি চলে গেলো। এই সব কিছু দূরে দাঁড়িয়ে এসিস্ট্যান্ট প্রক্টর স্যার দেখছিলেন। তার ঠিক তিনদিন পর। ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৭, কলা ভবন আর বিজ্ঞান ভবনের নোটিশ বোর্ডে হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে দেয়া হলো যুবকের নামে। তার নাম লেখা হলো, তার বাবার নাম লেখা হলো এবং বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো, এই যুবকের আজীবনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তারপরে এই যুবক আর কোনদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেননি। সেইদিনের সেই যুবক, বৃদ্ধ বয়সে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুবরণ করলেন।

যে যুবকটা আর কোনোদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ করেননি, তার মৃত্যুর পরে তার কবর হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সেই যুবকের নাম, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

পুনশ্চঃ মেয়েটি ফজিলাতুন্নেসা জোহা। কবি নজরুল ফজিলাতুন্নেসাকে নিয়ে 'বর্ষা বিদায়' কবিতা লিখেছিলেন।

নজরুল প্রাণের কবি

জাতীয় কবি নজরুল সম্পর্কে কিছু সহজাত ও কথিত অপপ্রচার আছে।

তার মধ্যে একটি অপপ্রচার হচ্ছে- নজরুল স্বল্প শিক্ষিত, প্রাচীনপন্থী এবং উর্দু ফার্সি ছাড়া তেমন কোনো পড়াশোনা নেই।

আমাদের পূর্বসূরী বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত সুচিন্তিত তথ্য আকারে এই অপপ্রচারগুলো করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় পাঠ্য পুস্তকেও নজরুল সম্পর্কে এক সাগর সম তথ্যের জায়গায় এক গণ্ডা পরিমান ধারণা দিয়েছে।

ফলশ্রুতিতে তথাকথিত আধুনিক মানুষেরা নজরুলকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কয়েকটা ধারণা আজ এই ছোট্ট মস্তিষ্ক দিয়ে একটু ভেঙ্গে দিই।

১. স্কুল জীবনে নজরুল ডাবল প্রমোশন পেয়েছিলেন। কেরানিমুখী বিদ্যার পথ ধরে তিনি অগ্রসর হলে, উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় আমলা তিনিই হতে পারতেন।

২. সে সময় একটি পত্রিকা ছিলো- নাম শনিবারের চিঠি। এই পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য ছিলো- নজরুল সম্পর্কে সংঘবদ্ধ অপপ্রচার চালানো।

৩. নজরুল যখন গানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিলেন, তখন কায়দা করে গানের জগৎ থেকে তাঁকে বয়কট করা হলো। বলা হলো, নজরুল সরকার বিরোধী, তার গানের রেকর্ড প্রকাশ করা যাবে না।

৪. নজরুলের মতো বেস্ট সেলার লেখক সে সময় খুব কমই ছিলো। অথচ তার বই প্রকাশিত হওয়া মাত্র নিষিদ্ধ হতো। নজরুলের লেখা বই নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে অতি উৎসাহী আমলাদের তৎপরতা ছিলো ব্যাপক।

৫. এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও - নজরুল ছিলেন অজেয়। তিনি উনিশ শতকের প্রথম শতাব্দীতেই ক্রাইসলার কোম্পানির হুডখোলা গাড়ির মালিক ছিলেন।

কাজী নজরুলের জীবনকালে বাইরে জমিদারী আর ঘরে প্রেমের কুঞ্জবন রচিত ছিলো না।

তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া প্রথম অবতার। তাই তার সাহিত্যে আমরা 'প্রেম' পেয়েছি কম, দ্রোহ পেয়েছি বেশি।

যার গ্রন্থ ভরা পেয়েছি শুধু আবেগ আর প্রেম, আমরা সেই ইন্দ্রকে আলোচনায় বেছে নিয়েছি।

এই বেছে নেয়া কখনোই ব্যক্তিগত নয়, এই বেছে নেয়ার পেছনে রয়েছে এক হাজার একটা যুক্তি।

সর্বশেষ, নজরুলের দীর্ঘ সময়ের মানসিক ভারসাম্যহীনতাজনিত অসুস্থতা এবং ফলাফল স্বরূপ, সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, এই বিষয়বস্তুটি আজও অনেকটা সেই লালবাগের কেল্লা, আওরঙ্গবাদ দূর্গের সুড়ঙ্গপথের মতো অনুদঘাটিত রহস্যে ঘেরা প্রশ্নবিদ্ধ।

কচিকাঁচার বিদ্রোহ - এক নতুন ইতিহাস

ঢাকার বন্ধুর সাথে ফোনে কথা শেষ করে বললাম, ভাবীকে দে সালাম দিই।

বললো, তোর ভাবী আর তার বান্ধবীরা মিলে বিরিয়ানী রেঁধে পানির বোতল নিয়ে রাস্তার স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের খানা দিতে গেছে।

বললাম, কি বলছিস এসব? নৌমন্ত্রী বলেছেন, এই বাচ্চাদের রাস্তায় নামিয়েছে জামাত আর বিএনপি, খানা দানা তারাই নাকি দিচ্ছে।

তোর বউকে যেতে দিলি কেন?

বললো, বউকে বলেছিলাম, দেখো পিছনের ঘটনা অন্য। নোংরা ভাষায় রাস্তায় চিকা দেখেছো? কলকাঠি নাড়াচ্ছে বাচ্চাদের নাম দিয়ে অন্যরা, বুঝতে পারছ না কেন?

বউকে বললাম, হাতুড়ি বাহিনী রাস্তায় নেমে যাবে যে কোনো মুহূর্তে। শ্রমিকরা অবরোধ করেছে, অলরেডি এক ছাত্রকে গাড়িচাপা দিয়েছে গতকাল। সিসিটিভি দেখে যে কোন সময় একশন শুরু হবে। বুড়িগঙ্গায়, তুরাগে কোটা আন্দোলনের আরিফের মত দু একটা লাশ দেখলেই সব ঠণ্ডা হবে, খামাখা যেওনা, মেয়ে মানুষ ঘরে থাকো।

বউ কি বলে জানিস?

বলে, তোমরা সব অথর্ব জেনারেশন। ফেসবুকে কমেন্ট আর শেয়ার ছাড়া কিছু পারো না। তোমরা ইতিহাস নিয়ে ঝগড়া করে বিভক্ত করে ফেলেছো পুরো জাতিকে। কিশোর কিশোরী বাচ্চাগুলো এতকিছু বোঝেনা। তাদের প্রশ্ন, আইন করেছেন আপনারা, অথচ আইন ভাঙছেন আপনারা। মন্ত্রীদের গাড়ির লাইসেন্স নেই, পুলিশের গাড়ির লাইসেন্স নেই। বাচ্চাগুলো রাস্তায় নিরাপদ নয়। বাসা

থেকে বেরুলে জীবন নিয়ে ফেরার গ্যারান্টি নেই। ঘুষ নিয়ে আর ঘুষ দিয়ে সব বেআইনকে আইনি করেছো আর শুধু বড় বড় কথা বলো।

বাচ্চাগুলো বড় অভিমান নিয়ে রাস্তায় নেমেছে রাস্তা নিরাপদের আন্দোলনে। আজ সরকার স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে অথচ আরো বেশি ছাত্র-ছাত্রী রাস্তায় নেমে গেছে। বোঝ এগুলো কি? মায়েরা চায় তার সন্তানেরা নিরাপদে বাসায় ফিরুক।

বুঝলি, বউ বলেই যাচ্ছিল, আমাদের কথা তোমাদের বিরুদ্ধে গেলেই শুনতে হবে – তুই রাজাকার। পঞ্চাশ বছর আগে যুদ্ধ করে সব রাজাকার মারার পরে, বড় বড় রাজাকারগুলো ঝুলানোর পরেও তোমাদের রাজাকারভীতি যায় নাই। মানুষদের রাজাকার বানানোর ভয় দেখিয়ে আর কতদিন ঘরে আটকিয়ে রাখবা?

বলে, আমার বিরিয়ানির ডেগ উঠিয়ে দাও উবারে। রাজাকার ভূতের ডর আর দেখাইওনা।

বললাম, তুই কি জবাব দিলি ?

কি বলবো? বললাম, খামাখা কষ্ট করছো, দুদিন পরে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যারা এটিকে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে তারা টোটাল ফেল করবে।

বউ বিপ্লবী প্রীতিলতার মত আগুন কণ্ঠে বললো, দেখো সরকারে কে আছে না আছে তা নিয়ে মায়েদের কোন হেডেক নেই, আমরা চাই, যে সরকারণ থাকুক তার সময়ে সবাই আইন মানুক, আইনে ফাঁকি চাইনা, বৈষম্য চাইনা, আইন সবার জন্য সমান – সেই দাবিটুকুও করতে পারবো না?

বললাম, দোস্ত বুঝেছি, ভাবী কি সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হতে চায় নাকি? সব দেখি রাজনৈতিক কথাবার্তা।

বন্ধুর জবাব না শুনেই বললাম, শোন, এই ঘটনাবলির ফলাফল কি হবে জানি না তবে, সিপাহী বিদ্রোহের মত, তিতুমীরের অসম যুদ্ধের মত, নীল চাষীদের বিদ্রোহের মত, ভাষা আন্দোলনের মত এই অনন্য ঘটনাটি বাংলার ইতিহাসে অনবদ্য ‘কচিকাঁচার বিদ্রোহ’ নামে আখ্যায়িত হবে কোন একদিন। ইতিহাসে অনন্য হবে এজন্যে যে, একদিন বাংলার মায়েরা তাদের সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের কচিকাঁচাকে রাস্তায় পাঠিয়েছিল পুলিশকে পুলিশি শেখানোর জন্যে অথচ তারা কেউ পুলিশ নয়।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, অত্যাচার আর অনাচার অনুভূত হলে মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করবেই। আবার শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠিও তা স্তব্ধ করে দিতে সবরকম চেষ্টা করেছে আর করবে সবসময়ই।

একারণে সেই সব রক্তঝরা আন্দোলনগুলো সেই সময়গুলোতে সমষ্টিগত কোনো ফলাফল আনতে পারেনি। কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষ থাকবে আর ইতিহাস চর্চা করবে ততদিন সেই সব বিদ্রোহের ঘটনাগুলোকে মনে রাখবে ভালোবাসার সাথে, শ্রদ্ধা আর সম্মানের সঙ্গে।

বন্ধুটি বললো, বুঝেছি তোর কথা। তুই বলতে চাচ্ছিস বর্তমান কিশোর বা কচিকাঁচার বিদ্রোহ কোন কিছুরই কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না, তবে অতীতের আন্দোলনগুলোর মত এটি একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন হিসাবে লেখা থাকবে মাত্র, যা শাসক গোষ্ঠীকে ইন্ডাইরেক্টলি একটি বার্তা দিতে চেয়েছিল – আপনাদেরকে আর চাই না। কিন্তু সেটি মুখ ফুটে কেউ বলতে পারেনি।

বললাম, আমার তাইই মনে হয়, তবে এটি আমার কাছে 'তুই রাজাকার' গালির চেয়েও কষ্টদায়ক লাগছে। রাজাকার তো রাজাকারণ, গালি দিলেও সে রাজাকার না দিলেও তাই।

কিন্তু এই সরকার দেশকে অনেক অনেক উন্নত করেছে এবং আরো অনেক বড় বড় উন্নয়নের অঙ্গীকারাবদ্ধ তারা। তাই জনগণের নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসাটিই তাদের কাম্য ছিল।

বন্ধুটি বললো, প্রচণ্ড উন্নত আমেরিকায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার, তিনিও আমেরিকাকে তাদের পুরানো গ্লোরীতে ফিরিয়ে নিচ্ছেন, নতুন অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখিয়েছেন,বেকারত্ব কমিয়েছেন, অথচ মানুষ তাকে পছন্দ করেনা। কারণ, তিনি মানবাধিকারকে সম্মান দেন না, মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করেন, অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেন। তুই কি বলিস?

জবাব দেয়ার আগেই লাইনটি কেটে গেল।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস

জাতিসংঘের রেজুলেশন নং- ৬১/২২৫ প্রতি বছর একটা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে দিন পালিত হয়। ২০২১ সালে প্রতিপাদ্য ছিল "ডায়াবেটিক সেবা এখনই নয় কেন?" বিশ্বের ১৬০ দেশের দশ বিলিয়ন লোক এটা পালন করে। ১৪ই নভেম্বর ইনসুলিনের সহ আবিষ্কারক স্যার ফ্রেডারিক বেন্টিং-এর জন্ম দিবস।

November ১৪ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস IDF (ডায়াবেটিস নিয়ে কাজ করা অনেক প্রতিষ্ঠানের একটি) ১৯৯১ থেকে দিবসটি পালন করছে সেবা দিবস হিসেবে। WHO (health বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা) ২০০৬ সালে পালন করা ধরে। ঐ বছরই UNO (বিশ্ব সংস্থা) এটাকে world diabetes day হিসেবে স্বীকৃতি দিলে এটা সবার কাছে (বিশ্ব) দিবস হলো; হলো বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। বলা ভাল দিনটির স্বীকৃতির প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি।

পরিসংখ্যান

বিশ্বে ৪৩ কোটি ডায়াবেটিক রোগী আছে। ২০৪০ সালে হবে ৬৮ কোটি। ১৯৮৫ সালে ছিল ৩ কোটি। এক্ষণে প্রতি ১১জনের একজনের আছে এই সর্বভুক ব্যাধি। এ সংখ্যা কয়েক বছরেই দশে এক হবে। বিশ্বে আমাদের অবস্থান ছিল দশম; এ হারে বাড়তে থাকলে ১৫ বছরে আমরা হবো সপ্তম। বাংলাদেশে শহর অঞ্চলে আছে ১০%, গ্রামে ৮% ডায়াবেটিক রোগী। অর্থাৎ ১ কোটি ৬০ লাখ ডায়াবেটিক রোগী আছে আমাদের দেশে; প্রিডায়াবেটিকদের সংখ্যা হলো তিনজনে একজন (আমেরিকান পরিসংখ্যান)। তাহলে মোট জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ আছে বহুমূত্র রোগের/জটিলতার ঝুঁকিতে।

১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিতে নিবন্ধিত রোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ; প্রতিবছর বাড়ছে ১৫%। বারডেমে নিবন্ধিত আছে পাঁচ হাজার ডায়াবেটিক শিশু। প্রতিবছর নতুন নিবন্ধিত হচ্ছে ২০০ শিশু। আমাদের দেশে সরকারি হাসপাতালে বেড আছে ৫০ হাজার ; এর মধ্যে ৮৭ টি ডায়াবেটিস রোগীর জন্য। এ বছর (২০১৭) বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল woman & diabetes. নিরাপদ হোক গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব। ১০-১৪% গর্ভবতী মা ডায়াবেটিসে ভুগেন। গর্ভধারণের ২৪-২৮ সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা করে এটা নিশ্চিত করা উচিত। যদিও ১২ সপ্তাহের পর থেকেই ঝুঁকি বাড়তে থাকে। বাচ্চা হবার পর অনেকেরই সুগার normal হয়ে যায়। কিন্তু ঝুঁকি কমেনা; কারণ ৮০% pregnancy diabetic ২০ বছরে ডায়াবেটিক হয়। প্রেগনেন্সী ডায়াবেটিস আসলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস। তাই সব প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিকের উচিত follow up এ থাকা। স্বাভাবিক হয়ে গেলেও তাই বাচ্চা হবার ছয় সপ্তাহ পর গ্লুকোজ খেয়ে টেস্ট করা উচিত, দরকার হলে পরবর্তীকালেও। প্রত্যেকের বিশেষ করে স্থূলকায় হলে মেটফরমিন খাওয়া উচিত।

শৈশবে নিজেদের, বাপ-চাচা, দাদা-দাদির জীবন জীবিকার দিকে ফিরে তাকালে উপলব্ধি করা কঠিন নয় কেন ডায়াবেটিসের এই মহামারী। ওজন ঠিক রাখার তাই বিকল্প নেই।

আজ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

১৯৫৬ সালের এ দিনে এর যাত্রা শুরু। আল্লাহ ভিশনারী প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ইব্রাহিমকে বেহেস্ত নসীব করুন।

দুটি উপলব্ধির কথা বলি (একান্ত নিজস্ব)

১। দিল্লিতে এক কনফারেন্সে ঐ দেশের অনেক প্রথিতযশারা আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন।বেশি সিনিয়র এক জন প্রফেসর বলে ফেললেন "আমরা সবাই

চিকিৎসা করি কিন্তু ক্রোনিক রোগী ডায়াবেটিসের রেগুলার ফলো আপের কোন designated centre নেই। I said we have!! শতেক এর বেশি আছে আমাদের দেশে! Do you know why? It is because we had an Ibrahim, Professor Ibrahim .

২। যাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে নেই, জটিলতা বেশি অধিকাংশেরই গাইড বই নেই। আমি সবাইকে বলি-ভাগ্যবান আপনারা একজন ইব্রাহিম পেয়েছিলেন; ইব্রাহিম সাহেবের দেশে জন্মেছেন অথচ বই করেননি? গাইড বইটি প্রফেসর ইব্রাহিমের অনন্য সৃষ্টি।

বই দুই ধরণের লোক করেন না ১। alternate access to Physician আছে যাদের তারা ২। খরচের কারণে। বই করতে একদম করণীয় কিছু বেসিক পরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়, সংগত কারণেই এগুলোর এখন খরচ বেড়েছে। ১০% বাংলাদেশিদের ডায়াবেটিস থাকলে ২ কোটি লোকের রেগুলার ফলোআপ এবং বই করা দরকার। কোনভাবে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ভর্তূকি পেলে এ সমিতির পক্ষে রোগীগুলোর সেবা দেয়া সহজ হতো!

নতুন অভিজ্ঞতা

প্রতি মাসের মত বাড়ি এসে প্রথম ধাক্কা current নেই। মায়ের IPS আছে, সোলার আছে, নেই শুধু জেনারেটর। IPS কাজ করছেনা দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুত না থাকায় চার্জ শেষ। সোলার টিম টিমে, ছোট একটা ফ্যান, স্বল্প আলোর লাইট। তাও connection loose, ক্যারি ক্যাছারি করে চালাতে হয়। দুটো একসাথে দিলে গড়বড় হয়ে যায়। মহা ঝামেলা। মা'র wash room, hand wash, face wash, mouth wash সব আছে কিন্তু ট্যাপে পানি নেই, কারণ পাম্প ছাড়া যায় নি, টাংকিতে পানি তোলা যায়নি।

যাই হোক, ভাবলাম পুকুরঘাটে যাই, আমতলা, কাঁঠালতলায় মুক্ত বাতাস! সেখানে আরেক বিপত্তি বিরাট সাইজের ডাই, পিঁপড়া; বড় সাইজের মশা দেখে স্কুল জীবনের একটা ঘটনার কথা মনে হচ্ছিল। আমাদের স্পোর্টস টিচার (শহরের লোক) একদিন হোস্টেল থাকলেন। নাস্তার টেবিলে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন ঘুমালেন। বললেন রাতে ঘুম ভেঙে দেখি নিচে শুয়ে আছি, ভাবলাম ঘুমের ঘোরে হয়তঃ বিছানা থেকে পড়ে গেছিলেন। উনার উক্তি হলো বিরাট সাইজের মশাগুলো উনাকে ধরে নিয়ে বাইরে সিঁড়ির গোড়ায় ফেলে রেখেছিল!!

যাই হোক, আছর পরে রোগী দেখতে গেলাম, কাহিনী একই বিদ্যুত নেই। সোলারের ফ্যান বড় অপ্রতুল, রাতে লাইট দিতে গেলে সেটা আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সিস্টেমটাকে ভুয়া মনে হচ্ছিল।

ভুক্তভোগীরা বলছিলেন পর পর দুরাতে ঝড়-বৃষ্টির কারণে বিদ্যুতের পিলার পরে এই দুর্দশা। প্রভাবশালী একজন পল্লীবিদ্যুতের ডিজিএমকে টেলিফোনও করল। দীর্ঘক্ষণ না থাকা বিদ্যুত ব্যবস্থায় সবাই অভ্যস্ত মনে হচ্ছিল! যাই হোক, সোয়া আটটার দিকে বিদ্যুত এসে গেল। ঝড় বৃষ্টির আভাস না থাকায় আশান্বিত হলাম।

সাড়ে দশটার দিকে ঘুমাতে গেলাম, এসি on করে। ভাবলাম ঢাকায় তো ১২.৩০টার আগে হয়ে উঠে না, মজাসে ঘুমাবো। সাড়ে তিনটার দিকে দেখি এসি বন্ধ হয়ে গেছে। ফজরের নামাজের আগে আবার চালু হলো। আমার ধারণা রাতের পরের দিকে এসির উপযোগী ভোল্টেজ থাকেনা।

শহরে আসলে আমরা যারা সারাদিন জেনারেটরের কাস্টোডিতে থাকি বিদ্যুতের ভেল্কিবাজি তাদের বোধগম্য হওয়ার কথা না।

প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী পাবনার কৃতি সন্তান ড. অরুণ বসাক

লেখক : মো. মহিউদ্দিন ভূঁইয়া। বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের একমাত্র ‘প্রফেসর ইমেরিটাস’ ড. অরুণ কুমার বসাক ১৯৪১ সালের ১৭ অক্টোবর পাবনা শহরের রাধানগর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিপদ বসাক ও মাতা ঊষারাণী বসাক। ড. অরুণ কুমার বসাক আর এম একাডেমি, পাবনা থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের মধ্যে সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৬১ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিএসসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে ম্যারিট স্কলারশিপ লাভ করলেও পাকিস্তান সরকার তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা হওয়ার পর ১৯৭২ সালে তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্যে যান, যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় জানায়, কণাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য কোন পোস্ট ফাঁকা নেই। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গবেষণার সুযোগ আছে। ফলে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গবেষণা শুরু করেন তিনি। সেখানে প্রোটন, নিউটন, হিলিয়াম থ্রি ইত্যাদি কণার আচরণ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তিনি। ১৯৭৫ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশে ফিরে ১৯৯৭ সাল থেকে নিউটন স্টার নামে এক ধরণের তারা যেগুলো থেকে আলো বের হয় না, সেগুলোর স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে গবেষণা করেছেন। সূর্য যে আমাদের আলো দিচ্ছে, এটিও একদিন নিউটন বলেদেন। দেশের একমাত্র গবেষক হিসেবে ড. অরুণ কুমার বসাক যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এই প্রজেক্টে

গবেষণা করছেন। প্রথম ধাপে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সালের জুলাই এবং পরে ২০০২ সালের আগস্ট থেকে ২০০৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত যে গবেষণাকর্ম চালিয়েছেন, তাঁর ফলাফল নিয়ে তেত্রিশটি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র লিখেছেন। সেগুলো ইংল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স (আইওপি) ও যুক্তরাষ্ট্রের ফিজিক্যাল সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এখন তাঁর অধীনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আলফাজ উদ্দিন অ্যাটমিক ফিজিক্স ও নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রফেসর ড. অরুণ কুমার বসাক ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন। তিনি ১৯৬৪ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ১৯৭৮ সালে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ১৯৮৪ সালে প্রফেসর পদে পদোন্নতি পান। ড. অরুণ কুমার বসাক ১৯৮৫-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৯০ - ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ২০০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর নেওয়া এই বরেণ্য শিক্ষক ২০০৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে দেশের একমাত্র প্রফেসর ইমেরিটাস সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। উত্তরাঞ্চলের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর হাত দিয়েই কম্পিউটার সেন্টার চালু হয় এবং তিনি ১৯৮৬ --১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি সেটির প্রশাসক ছিলেন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টারও তাঁর হাতেই গড়া। ড. অরুণ কুমার বসাকের নামে ২০০৭ সাল থেকে পেনিনসুলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রফেসর বসাক পুরস্কার ও বৃত্তি চালু করেছে। প্রতিবছর এখান থেকে চার মেধাবীকে বৃত্তি ও দুজনকে ক্রেস্ট ও আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। কর্মজীবনে বিশেষ অবদানের জন্য ২০০৬ সালে তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স সিনিয়র গ্রুপে গোল্ড মেডেল -২০০৩ পদক পান। ২০১৬ সালে পান "The Daily Star Jubilee Award 2016" (অসম্পূর্ণ, বিস্তারিত : *বহুমাত্রিক প্রতিভার মেলবন্ধনে পাবনা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদক : মো. মহিউদ্দিন ভূঁইয়া।)

লেখক : মো. মহিউদ্দিন ভূঁইয়া

করজোড়ে বলছি ...

ডা. মালিহা পারভীন

না আমি ইতিহাস হতে চাই না,
শহিদ খেতাব আমি চাই না।
চাই না প্রণোদনা, শোক গাঁথা,
ফেসবুকে ঝড়, সান্তনার কথা।

ফিরিয়ে দাও আমার এপ্রোন, নেমপ্লেটে জমা আঠারো বছর,
ফিরিয়ে দাও শবদেহ সাথে নির্ঘুম রাত, বইয়ের পাতায় ক্লান্ত ঘাম।
ফিরিয়ে দাও মা বাবার স্বপ্ন, সন্তানের স্পর্শ,
প্রেয়সীর উষ্ণ শ্বাস, রোগীর নাড়ি স্পন্দন।

অভিমান নয়, ক্ষোভ নয়, বঞ্চনার আগুনভস্ম হয়ে বলছি,
উপেক্ষা, উপহাস, ঘৃণা নিয়ে কেউ যুদ্ধে যেও না,
মানবিক, মেধাবী তালিকায় লিখিও না নাম,
জীবন লক্ষ্যে মানবসেবাকে দিও না ঠাঁই।

যদি পার প্রজাতন্ত্রের তেল ঢালা চতুর যন্ত্র হও,
দেশকে শাটডাউনের হুমকি দেয়া হুজুর হও,
লকডাউনে বসে তুমিও ছেলের সাথে পান্তা ইলিশ খাবে,
মাস গেলে বেতন পাবে, আঙুল কেটে এয়ার এম্বুলেন্স পাবে।

দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে ক্লান্ত চেয়েছি আমি চায়ের কাপে অলস চুমুক,
চেয়েছি ছেলের সাথে ক্রিকেটের আনন্দ বিকেল,
প্রিয়ার পাশে পূর্ণিমা রাত –
আতর গন্ধ, কান্নাভরা শেষ বিদায়।

করজোড়ে বলছি আমি - করুণা চাই না,
জীবন চাই আমি, জীবন বীমা চাই না।
সন্তানের মাথায় সান্তনার হাত চাই না,
ব্রেকিং নিউজ আমি হতে চাই না।

(করোনা যোদ্ধা শহিদ ডা. মঈনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

বাঁচতে গেলে ডাক্তারদের জানতে হবে

কোভিড-১৯ এর কেস এর কন্টাক্ট এ আসলেই তো কোভিড হবার সম্ভাবনা, তো বাঁচতে গেলে সব ডাক্তারদের জানতে হবে

কন্টাক্ট দুই ধরণের ক্লোজ এবং সোশ্যাল –

যে কোনও এফেক্টেড patient এর সাথে ১৫ মিনিটের বা তার চেয়ে একটু কম সময় মুখোমুখি কন্টাক্ট বা দুই ঘণ্টার বা একটু কম সময়ের জন্য যে কোনো কোভিড কেস-এর সঙ্গে একটি closed space এ অবস্থান করলে একে ক্লোজ কন্টাক্ট বলে।

বডি ফ্লুইড-এর কন্টাক্ট বা patient এর ডাইরেক্ট কন্টাক্ট-এ আসলে এটাও ক্লোজ কন্টাক্ট।

দুই বা দুই ঘণ্টার বেশি একই রুমে, যেমন ওয়ার্ড বা Emergency রুম বা চেম্বার-এ থাকা এটাও ক্লোজ কন্টাক্ট।

হোস্টেল-এ থাকা, একই টয়লেট ব্যবহার করা এটাও ক্লোস কন্টাক্ট।

এরোসল জেনারেটেড হতে পারে, যেমন হাই ফ্লো অক্সিজেন বা নেবুলাইজেশন করা হয় এমন Place এ পি পি ই ছাড়া গেলে এটাও ক্লোজ কন্টাক্ট।

এবার আসি অন্য পয়েন্ট-এ, আমরা যখন ওয়ার্ড রাউন্ড দেই, গ্রুপ ডিসকাশন করি, ডক্টরস রুম-এ কয়েক জন মিলে বসি এটাকে বলে social কন্টাক্ট।

যে কোনো কোভিড কেস-এর সঙ্গে একটি closed space এ অবস্থান করলে এ কে ক্লোজ কন্টাক্ট বলে।

Learning point:

- একটি পেশেন্ট-এর সাথে কন্টাক্ট time অবশ্যই দশ মিনিট এর বেশি হবে না,
- সেফ ডিসটেন্স মেইনটেইন করে পেশেন্ট দেখতে হবে, এভোয়েড unnecessary auscultation ও other এক্সপোজার, আমরা আমাদের ICU তে intubated পেশেন্টগুলোকে polythene sheet দিয়ে ঢেকে দিই, এক্সপোজার প্রিভেন্ট করতে।
- কোভিড থাকতে পারে এমন place এ বা বন্ধ রুম এ যেমন chember এ, একই প্লেস-এ দুই ঘণ্টার কম সময় থাকবো, কিছু সময় না হয় বিরতিই দিলেন।
- ওয়ার্ড-এ দুই ঘণ্টার কম সময় থাকবো, দরকার হলে কিছু সময় বিরতি দিয়ে আবার শুরু করা যাবে, আমাদের isolation ICU তে দুই জন নার্স একটি patient দেখে, একজন বাইরে এবং একজন রুম-এর ভিতরে এবং ২ ঘণ্টা পর পর রেসপনসিবিলিটি চেঞ্জ করে।
- এরোসল জেনারেটেড হতে পারে এমন প্লেস এ PPE ও n95 ছাড়া যাবোনা, মনে রাখতে হবে গাউন-এর চেয়েও মাস্ক ইম্পর্টেন্ট, ম্যাকসিমাম হেলথ কেয়ার এফেক্টেড হয় গাউন খোলার সময়, মাস্ক সবার last এ খুলতে হবে।
- বডি ফ্লুইড-এর ডাইরেক্ট কন্টাক্ট এভোয়েড করতে হবে, নন স্টেরাইল গ্লাভস use করতে হবে patient টাচ করার আগে অলওয়েজ।
- Maintain hand হাইজিন অলওয়েজ।
- কোনো গ্রুপ ওয়ার্ড রাউন্ড করবো না, এখানে আমরা কোনো গ্রুপ রাউন্ড করি না, whats app গ্রুপ এ এভরিথিং share করি, দল বেঁধে ডক্টরস রুম এ না থাকি।

- সব সময় এলার্ট থাকতে হবে নিজের সম্পর্কে, কি টাচ করছি, আমার আশেপাশের লোকজন থেকে আমি সোশ্যাল ডিসটেন্স-এ আছি তো।
- ডক্টরস রুম-এ এয়ার purifier use করা যেতে পারে।

করোনা ও আমরা

৩১শে ডিসেম্বর প্রথম শনাক্ত হবার পর করোনাক্রান্তের সংখ্যা এখন মিলিয়নের উপর। দক্ষিণ এশিয়ার ১৮৫ কোটি লোকের মধ্যে মৃতের সংখ্যা ২৫৪জন। ১৩৫ কোটি লোকের ভারতে সত্তরের মত। পাকিস্তান মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিনস সহ ১১ টি দেশ এগ্রুপে। আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে আক্রান্তের সংখ্যা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার চেয়ে অনেক কম।

দূর্বল ভাইরাস

বিশেষজ্ঞদের মতে ইউরোপ হয়ে চীন থেকে আসা ভাইরাসটি জিনগত কারণে দুর্বল হয়েছে। পদ্মভূষণ প্রাপ্ত ভারতীয় চিকিৎসক রেড্ডির মতে ভাইরাসের জিনগত বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে; জানা গেছে যে ইতালিতে ছড়ানো ভাইরাসটির চেয়ে ভারতে যেটি ছড়াচ্ছে সেটি দুর্বলতর। (উৎস: প্রথম আলো)। হতে পারে আমাদের সব লোক সারাবছরই কোন না কোন করোনা স্ট্রেইনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন বলে এন্টিবডি থাকে, শরীরে ক্রস প্রোটেকশন পায়।

আবহাওয়া : এম আই টি (ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজী) গবেষণা বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের দিকের রাজ্যগুলোর তাপমাত্রা কম এবং সেখানে সংক্রমণের হার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে বেশি। মোট রোগীর ২% দক্ষিণ আমেরিকায়। আর আফ্রিকায় আছে বিশ্বজুড়ে চিহ্নিত রোগীর এক শতাংশ।

বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ায় আছে ০.৪৮%। এ অঞ্চলের আবহাওয়া করোনার প্রতিকূলে। বেশি আক্রান্ত দেশগুলোর তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রী। আর্দ্রতা ৪ থেকে ৯ গ্রাম; আমাদের সব অঞ্চলে আর্দ্রতা ঘন মিটারে ১০ গ্রাম; বর্ষা মৌসুমে হয়ত: কম হবে সংক্রমণ। গুগলসে পড়েছিলাম বাহ্যিক তাপমাত্রা ৮৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট (৩০ ডিগ্রী সে:) ভাইরাস বাঁচেনা। সেদিন দেখলাম IEDCR এর প্র. আলমগীর ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির বক্তৃতায় বলছেন ৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নাকি বাঁচে ভাইরাস। তত্ত্ব আর তথ্য আলাদাও হতে পারে, আল্লাহ করুন!

লক ডাউন /সোশাল ডিস্ট্যানসিং

অত্যাধুনিক (?) বিশ্ববাসীর এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব মহামারীতে একটা কার্যকর পথ লক ডাউন /সোশাল ডিস্ট্যানসিং। ইতালীর ৫০ হাজার চীনা অধ্যুষিত সেই প্রাডো শহর প্রথম দিন থেকে ঘরে ঢুকে যায়; আজ পর্যন্ত ওখানে একজনও

আক্রান্ত হয় নি। চীন, তাইওয়ান, হংকং দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও পশ্চিমারা অজানা কারণে ইতঃস্তত করায়ই হয়তঃ আজকের বিশ্বের এ অবস্থা।

বিভিন্ন পর্যালোচনায় উঠে আসছে যে শুরুর থেকে দিনগুণে দেড় থেকে দুমাসের মধ্য সংক্রমণের peak ছিল সবদেশে-আমাদের সময় এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু; আল্লাহ ভরসা।

করোনা ভ্যাকসিন

ভ্যাকসিনের প্রকৃতি

ফাইজার-বায়োনটেক ও মডার্নার ভ্যাকসিন : জেনেটিক-এম-আরএনএ ভ্যাকসিন। সম্পূর্ণ নতুন (আগে কোনদিন হয় নেই) পদ্ধতিতে বানানো; সাধারণ ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায় না। ফাইজার-বায়োনটেক মাইনাস ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস আর মর্ডানা মাইনাস ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস লাগে। এই সুবিধা আমাদের নেই, (পরে জেনেছি কথাটা ঠিক নয়)। এগুলো ৯৫% কার্যকরী।

স্পুটনিক-৫ (রাশিয়া) ও অক্সফোর্ড - এস্ট্রাজেনেসিয়াঃ ভ্যাকসিন ও এম আর এন ভ্যাকসিন কিন্তু টেকনোলজী আলাদা। এডিনো ভাইরাসকে বাহক করে ইনজেকশন দেয়া হয়; ভাইরাস ভেক্টর এমআরএনএ ভ্যাকসিন। ফাইজার মডার্নার বাহক চর্বি কণা।

সাধারণ ফ্রিজে রাখা সম্ভব। রাশিয়ার গ্যামেলিয়া ইনস্টিটিউট এর ভাইরাস এবং ভ্যাকসিনের অভিজ্ঞতা ব্যাপক হলেও ফাইনাল ফেস ট্রায়ালে ভলান্টিয়ার বেশি না হওয়ায় এবং পিয়ার রিভিউ জার্নালে প্রকাশ না করায় এদের স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই ; এই ভ্যাকসিন ও ৯৫% কার্যকরী। অক্সফোর্ড -এস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন ও একই সিস্টেমে বানানো। তবে এদের রিসার্চ কম্প্রিহেন্সিভ; নামকরা জার্নাল ল্যান্সেটে প্রকাশও করেছে তাদের কাজ। এটার কার্যকারিতা ৬০-৯০%। এই দুটা ভ্যাকসিনই সাধারণ ফ্রিজে সংরক্ষণ সম্ভব। জ্যানসিন কোম্পানির ভ্যাকসিন ওভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিন। এখন পর্যন্ত বলা সবগুলো ভ্যাকসিনই ৩-৮ সপ্তাহ পর পর দুই ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

চায়নার সাইনোফার্মা বা সাইনোভ্যাক ভ্যাকসিন : জেনেটিক নয় ভাইরাসকে কেমিক্যাল দিয়ে পরিবর্তন করে ভ্যাকসিন বানানো হয়েছে। এটা সনাতনী পুরানা পদ্ধতি-বানাতে সময় লাগার কথা। এন্টিবডি বানায় অনেক; একটি ডোজেই চলে। চীন, মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেয়া হয়েছে। বলছে ৮৬% কার্যকরী। এদের রিসার্চের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাইনোভ্যাক বেসরকারি এবং ট্রায়ালে কোফান্ডিং দাবি করায় আমাদের সরকার রাজি হয়নি।

আমাদের দেশের গ্লোব বায়োটিক প্রাথমিক পর্যায়ে WHO প্লাটফরম পেলে ও ICDDR-র সাথে করা MOU শেষ হয়ে গেছে।

প্রতিডোজ খরচ (মার্কিন ডলার): অক্সফোর্ড-এস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন-৪ (চার), ফাইজার-২০ (বিশ), মডার্না-৩৩ (তেত্রিশ), স্পুটনিক-১০ (দশ), সাইনোভ্যাক-৩০ (ত্রিশ), সাইনোফার্ম-৭২.৫ (সাড়ে বাহাত্তর)

আমাদের জন্য কোনটা -

সংরক্ষণ, সরবরাহের জটিলতার জন্য মডার্নাও ফাইজার আমাদের জন্য নয়। টেকনোলজি, মূল্য কাছাকাছি হলেও স্বচ্ছতার সীমাবদ্ধতার জন্য সংরক্ষণ সরবরাহের জটিলতা না থাকা স্বত্তেও আমাদের জন্য স্পুটনিক নয় অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

সব গোলার্ধেই ডিসেম্বরেই শুরু হলেও আমরা কি ভ্যাকসিনে পিছিয়ে পড়বো?

বাঁচার জন্য পড়ি; পড়ার জন্য বাঁচিনা

সেবা অনেক বড়। সাফল্য সেবা দিয়েই, সামর্থ থাকতে হবে।

সন্তানকে মইয়ে উঠিয়ে দিছেন; হাত বাড়ান। না হলে ছাদে পৌঁছবে না।

ডাক্তারী পড়ার বিশেষত্ব বলতে গিয়ে কথাগুলো বলেছেন মুগদা মেডিকেল কলেজের একজন জুনিয়র শিক্ষক; phase-1 co-ordinator. সাবলীল বর্ণনা, আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গী, চমৎকার facial Expression! শুনলাম student দেরও প্রিয় মুখ। এটা ছিল guardians awareness programme। এক এক করে anatomy, Biochemistry Physilogy madam বলে গেলেন। সুদৃশ্য ১৩ বিল্ডিং fith in built ICU CCU Hemodialysis সহ ৫০০ বেডের সরকারি হাসপাতালে ৪র্থ ব্যাচে মাত্র ৬৫ জন ছাত্র। নিজেরা বললেন, গার্জিয়ানের প্রশ্নের জবাব দিলেন। তিনজনই সাবলীলভাবে individual স্টুডেন্টদের বর্ণনা করলেন। মনে হচ্ছিল student তার সামনে দাঁড়িয়ে উনি বলছেন। attendence card, term পরীক্ষার ছাপানো রেজাল্ট শিট গার্জিয়ানের সামনে দেয়া ছিল। ছাত্রের শুধু প্রাপ্ত মার্ক নয়, লাজুক/সপ্রতিভ কিনা, এক্সট্রা কারিকুলারে আগ্রহ; এমনকি মাথা নিচু করে নাকি চোখে তাকিয়ে কথা বলে তাও বললেন। ভাল লাগলো ম্যাডামদের টিচিং/ছাত্রের উন্নতির জন্য মটিভেশন দেখে। ভাল করা, উন্নতি করার চিরন্তন কথাগুলো মনে ধরিয়ে দেবার মত করে বললেন। সকাল ৯টার প্রোগ্রাম নয়টাই শুরু হলো। অনুষ্ঠান শেষে স্ন্যাক্স, বাড়তি খোশ কথা নয়; সোজা যার যার ডিপার্টমেন্টে চলে গেলেন!

চমৎকার অনুষ্ঠান। মনে থাকবে!

কক্সবাজার-then?

বিচঃ যারা বহিরাগত কক্সবাজার থাকেন (চাকরি করেন) তাদের মতে লাবণী, সুগন্ধা ডলফিনের চেয়ে ভাল। ইনানিতে ভিড় আছে, আছে প্রবাল শৈবাল। But free মুভমেন্টের ব্যবস্থা নেই। একই অবস্থা টেকনাফের। জেট স্কী করা বা স্পিড বোটে চড়া যাবে না। বালির উপর দিয়ে তারে তার ঘষে স্টার্ট হওয়া ট্রাই হুইলে আন্তঃ বিচ স্পিডি ভ্রমণ (অযৌক্তক চার্জ) করা যাবে না। একই সাথে রথ দেখা আর কলা বেচার প্রাতঃভ্রমন বা বিচ থেকে বিচে সন্ধ্যা হাঁটা- সাগর সমতলের নির্মল, (ঢাকায় বসতকারীদের জন্য দুর্লভতম) হালকা বাতাস দিগন্ত জোড়া বঙ্গোপসাগরেই মিলবে। বড় অট্টালিকার ভারে গাছ আর জঙ্গলের (রেইন ফরেস্ট) এখন দুঃস্বপ্ন। এখন সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মেরিন ড্রাইভ। বাস, লরি নিষিদ্ধ হলেও ইজি বাইক আর স্কুটার জ্বালায় এখানেও ভ্রমণ ইদানিং আর বিলাস নয় বিরক্তির।

রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্লড Worth seeing একুরিয়াম। each ওয়ান ৩০০ টাকার টিকেট কিনে ছবি তুলে ঢুকবেন, সুড়ঙ্গ সদৃশ কিন্তু চলতে হবে, চলতে থাকবেন।

দেখবেন দেখতে থাকবেন, একসময় ২০০ প্রজাতির মাছ দেখে শেষ করবেন। ৫০ টাকা দিয়ে ১০ মিনিটের 3D show দেখবেন; compulsory নয় কিন্তু না দেখলে মিস করবেন। তিনতলায় souvenir shop, একই ব্যাপার কিনতেও পারেন, না কিনলে কেউ জোর করবে না। Next- Restaurant এ খেয়ে নামবেন। one way road, সেরাতুল মোস্তাকিম; প্রশংসাযোগ্য ব্যবসায়িক ট্যালেন্ট! 3Dর আগে আপনার ছবিটা(১০x১০) ল্যামিনেটেড করে দিবে। আপনাকে ১২০ বা ২৫০ টাকা গুনতে হবে।

হারায়ে খুঁজি

প্রথমবার গেছিলাম চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময়; মতিনের সাথে শৈবালের তৃতীয় তলার বারান্দায় তোলা ছবিটার স্মৃতিতে ভাসে। তখন আমাদের দৌড় ছিল মৎস্য গবেষণার মোড় পর্যন্ত; অধিকাংশ স্থাপনাই ছিল না প্রাচুর্যে ভরা কক্স শহর ও বিচে। ঝাউতলাই ছিল কার্যক্রম সব। এলজিইডি, সড়ক, গণপূর্ত, অফিসার্স মেস, UNHCR সমৃদ্ধ মোটেল রোডে হেঁটেছি তবে এত নামফলক ছিল না। মেরিন ড্রাইভ দৃষ্টিনন্দন হলেও চাঁদের গাড়ির মত আকর্ষণীয় কোনভাবেই নয়। কাঁচাপাকা রাস্তার উপর দিয়ে মাটির ঘর, শন-টিনের ঘর চিংড়ি পল্লীর মধ্য দিয়ে হাত পেটে ঝাঁকি খেয়ে সাগর ঘেঁষা সেই ইনানি যাতায়াতটাই কবি গোলাম মোস্তফার 'যা চাইনি তাই মোরে দাও' ছিল।

রাম

রামু উপজেলা, শহর কক্সবাজার থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে। ১০০ ফুট দীর্ঘ কাত হয়ে থাকা বৌদ্ধ মূর্তি এ পল্লীকে পর্যটন কেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে। এখানকার বিহারেই গত ২০১৯ এর অক্টোবরে ৯৩ বছরে দেহান্তরিত হয়েছেন এ পল্লীর ক্ষণজন্মা পুরুষ সত্যপ্রিয় মহাথেরো। দেহাবশেষ মমী করে রাখা আছে বিহারাভ্যন্তরে, অকুস্থলে আছেন দূরদূরান্তরের দর্শক, ভক্ত। একুশে পদক পাওয়া এ মনীষী থাইল্যান্ড, ভারত, মায়ানমার সব বৌদ্ধদের ধর্ম গুরু। মারা গেছেন এ বছর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে শেষ কৃত্য হবে ডিসম্বরের শেষে।

টেকনাফ

৮৪ কিমি কক্স বাজার থেকে ২ ঘণ্টা মেরিন ড্রাইভ নয়নাভিরাম দৃশ্যে ভরপুর। বামে পাহাড়, ডানে আছড়ে পড়া লম্বা দিগন্ততজোড়া বঙ্গোপসাগর-অভাবনীয়। মেয়েকে (১৯) বলছিলাম ওরা যখন আমাদের মত (৬৬) হবে মানবসৃষ্ট গগনচুম্বী ইমারতের আড়ালে পড়ে যাবে প্রকৃতি প্রদত্ত পাহাড়রাজি; সাগর হয়ত থাকবে – হিমছড়ির ঝর্ণা আর দেখা যাবেনা!

মাথিনের কূপ

কাপুরুষ ধীরাজ আর বোকা অবলা মাথিনের ট্রাজিক প্রেম কাহিনী (আমি যখন পুলিশ ছিলাম বই দ্রষ্টব্য) আছে এ কূপকে ঘিরে।

৫৫০ মি. জেটি: উদ্বোধন হলেও চালু হয়নি এখনও, চত্বরে গাড়ি গেলেই ২০ টাকা পার্কিং।

রাস্তার উপর দাঁড়ালেও পার্কিং চার্জ, রাইড, বোটিং এবং দোকানপাটে দামের সমন্বয়হীনতা কক্সবাজারের বিরক্তিকর অধ্যায়।

কক্সবাজার ১২০ কিমি দীর্ঘ বিচ (পৃথিবীর দীর্ঘতম)

কক্সবাজার ১২০ কিমি দীর্ঘ বিচ (পৃথিবীর দীর্ঘতম)। সিজন না হলেও এখন পর্যটকে ভরা। নিম্নচাপের ভয় থাকলেও ঈদ ভ্যাকেশনে অনেককেই দেখলাম।

১৯৭৪ প্রথম গেছিলাম। ছিলাম শৈবালে। (মোটেল) উপাল, প্রবালের সেই এলাকা এখন প্রায় জনমানব শূন্য: অনেকটা god made the village man made the town. বিশাল বিশাল বিল্ডিং এখন কক্সবাজারকে বদলিয়ে দিয়েছে। আগের মত ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে লোকসমাগম হয় কিনা বলতে পারব না। কক্সবাজারে প্রবাল থেকে সিগাল, সিপ্যালেস, লংবিচ হয়ে এখন ওশান প্যারাডাইস আর হাল আমলের সাইমন আর বেস্ট ওয়েস্টার্ন (ইনানির রয়াল

টিউলিপ, রয়াল রিসোর্ট, মারমেড) কত সব five star hotel (দাবি করলেও কোনটাই থ্রি স্টারের বেশি নয়!) বিচের নাম, ঠিকানা বেড়েছে। কলাতলী নেমে দেখলাম বিচ পুলিশ (টুরিষ্ট পুলিশের বিজ্ঞপ্তি)। দেশের অনেক কিছুর মতই একটা মূল্য/দর তালিকা দেয়া আছে। আইটেমের নাম থাকলেও টাকার অংক লেখা নেই। দেখলাম বিচ বাইক-রেট সুগন্ধা যাতায়াত করলে ২০০ আর লাবনি হলে ৪০০ টাকা। সকাল বেলা হাঁটা দিলাম। লাবনি হয়ে ফিরে আসতে এক ঘণ্টা লাগলো। সাগরের স্পিডবোট -টাইম নয় দূরত্ব অতিক্রম অনুযায়ী ৫০০ আর ১০০০ টাকা রেট।।

ঘোড়া আছে তবে সাইজ (রোগা) দেখে হয়ত কেউ সওয়ার হবার উৎসাহ পাচ্ছে না। লাইভ ভেস্ট নিয়ে অনেকেই ঘুড়ে বেড়ালেও ব্যবহারে উৎসাহী কাউকে দেখিনি।

সাগরের পাড়ে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার; এটা শুধু লাবণী, সুগন্ধায়। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের সীমানা নির্দিষ্ট করা আছে ফ্লাগ পুঁতে। কিটকাট চৌকি (ছাতাসহ বিশ্রামের জায়গার রেট ঘণ্টায় ত্রিশ টাকা। লাবনি টা সমৃদ্ধ, উন্মুক্ত মঞ্চ আছে, আছে বিশাল আকারের ডিসপ্লে স্ক্রীন।

এবারে সবচেয়ে ভাল লেগেছে মেরিন ড্রাইভ। ইনানি থেকে টেকনাফ; সাগরের গা ঘেঁষে সুন্দর রাস্তা। পড়ন্ত বেলায় যাওয়ার সময় উন্মত্ত সাগর, দিগন্তজোড়া। পাহাড়ের মত ঢেউ মনে হয় উপর দিয়ে উঁকি দিতে পারলে হয়ত: আরেকটা দেশ দেখবো (আসলে মরীচিকা)-ভাবছিলাম ড্রাইভটা যদি ডায়াবেটিস বিচ থেকে শুরু হয়ে ঝাউতলা দিয়ে সাগরের গা ঘেঁষে লাবণী, সুগন্ধা হয়ে সায়মনের সামনে দিয়ে গিয়ে ইনানিতে মিশত তাহলে কতনা enjoyable হত! হয়ত: হবে!! কেপ টাউন, কলম্বো, করাচী, বোম্বের জুহী বিচ, সিডনীর বিচ এত দিগন্ত প্রসারী নয়, জনসমাগম নেই। কক্সবাজারের ক্যাফে রেস্তরাঁগুলো ভালো, জনাকীর্ণ হলেও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সার্ভিস সুন্দর। কক্সবাজারকে ঢেলে সাজানোর বিকল্প নেই। মালয়েশিয়ার লঙ্কাবাই বা এ ধরণের আকর্ষণীয় স্থাপনা করতে হবে। কেউ নৌবিহারের পরিকল্পনা রাখতে পারে (আবুধাবী, থাইল্যান্ডের মত)। ২টা feelings (না বলে পারছি না!) যাওয়ার দিন গেলাম US bangla air lines এর boeing ৭০৭, বিমান packed যাত্রী। মনে হলো পর্যটনে আমাদের উন্নতি হয়েছে। আসার সময় অবশ্য ছোট প্লেন। প্লেন ভাড়া অন্য সময়ের চেয়ে just double. মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল কারণ festival এ সব দেশে সবকিছুর দাম কমে।

ফিরে আসার সময় বিমান বন্দরের ওয়াশ রুমে গিয়ে লজ্জা পেলাম। দরজা লাগে না, বেসিন একটায় বমি দিয়ে ভরা, চারিদিকে ময়লা। আফসোস হচ্ছিল সদ্য রূপান্তরিত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের অবস্থা দেখে। বিমান না হয় ever

loosing, Novo. ইউ এস বাংলা তো হাউস ফুল ব্যবসা করছে। ১৬ কোটি লোকের দেশে ক্লিনারের এত অভাব!

কক্সবাজার নামটা একজন ইংরেজ শাসকের নাম থেকে

আজকের কক্সবাজার হিরাম কক্সের নাম বহন করছে। হিরাম ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় এই এলাকায় আরাকানদের পুনর্বাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। কর্মদক্ষতা নয় মানুষের সাথে সম্পৃক্তার কারণে ১৭৯৯ সালে মৃত্যুর পর ওঁর স্মরণে বাজার চালু করা হয়; নাম যার কক্সবাজার। আজকের ভারতবর্ষের অনেক জায়গা থেকেই ইংরেজদের নাম মুছে ফেললেও হিরাম কক্স এখানে কক্সবাজার হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

চিটাগাংসহ কক্সবাজারের এসব এলকা আরাকান রাজের অধীনে ছিল। মোগলরা দখল করে নেবার পর চেহারা পাল্টাতে থাকে। যুবরাজ শাহ সুজা এদিক দিয়ে যাবার সময় প্রাকৃতিক নৈসর্গে আকৃষ্ট হন। তার সেনাবাহিনীর এক হাজার পালকিকে নোঙর করতে বলেন কিছুকালের জন্য। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে দুলাহাজারিয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ হতে পারে হাজার পালকি। কক্সবাজারের আরও দুটা আদুরে (পুরানো) নামের একটি হলো পালঙ্কী।

মোগলদের পরে পর্তুগাল তারপর ব্রিটিশ রাজের পর স্বাধীন বাংলাদেশে কক্স বাজারের টুরিস্ট আকর্ষণ ঈর্ষণীয়; পরিসর বৃদ্ধিকরে আন্তর্জাতিক মানের এয়ারপোর্ট, স্টেডিয়াম এখন সময়ের দাবি। ১২০ কিমি দীর্ঘ পাড়ে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ এক সাথে আছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশ তুষারপাতের মত কুয়াশাচ্ছন্ন আর শীতে কাঁপলেও চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ কক্সবাজার, হিমছড়ি ইনানী উপভোগ্য, অনন্য।

K-30 আবদুর রহমান সিদ্দিকী ভাইয়ের অসম্ভব সুন্দর একটি লেখা!

দিন সন replace করলে সব "K"-দের জীবনের কথা এটি !!

ভীরু ভীরু পায়ে আমাদের সবার প্রথম দেখা হয়েছিল এক শীতের সকালে, দিনটি ছিল বুধবার, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭২।

তখন কেউ কাউকে চিনতাম না!

কেউ এসেছে ঢাকা থেকে, কেউ বা চট্টগ্রাম, অথবা ময়মনসিংহ, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, সিলেট ইত্যাদি ইত্যাদি!

কেউ কেউ একদম মফস্বল থেকে!

ক্লাসে মেয়ে ছিল মাত্র ১৬-১৭ জন।

তাদের দেখে অনেকে আনন্দে বিগলিত ও উৎসাহিত হলো এবং বন্ধুত্ব করার জন্য মরিয়া হয়ে গেল!

'কখনো বিয়ে করবো না' বলেছিল যে বন্ধুটি তার বড় ছেলের বয়স এখন ৩৭ এর উপর এবং বড় নাতনি এখন প্রায় বিবাহ যোগ্য !

এনাটমিতে পাস করেনি বলে প্রিন্সিপাল যাকে বকেছিলেন সে এখন আমেরিকার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমেরিটাস।

ক্লাস ভালো লাগতো না বলে যে সব সময় ব্যাকবেঞ্চে বসে ঘুমাতো সে বছর খানিক আগে নামকরা সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে নামকরা শিক্ষক হিসেবে অবসর নিয়েছে!

রসময় গুপ্তের চটি বই নিয়ে হোস্টেলে লুকিয়ে লেপের নিচে পড়ত যে বন্ধু, তার এখন মুখভর্তি দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে জোব্বা, সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেয়!

ক্লাস সেভেনেই বেস্ট ফুটবলার হয়েছিল একজন। সেদিন তাকে বললাম, 'শুনেছিস, স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন রিটায়ার্ড করেছে।' ও বললো, 'লোকটা কে?'

মাথাভর্তি ঝাকড়া চুল ছিল যার- সেই চুল যাতে পড়ে না যায় তার জন্য কত কসরত! কত অহংকার! এখন তার মাথা ভর্তি টাক! মাথার টাক ঢেকে রাখতে তাকে নিউমার্কেট থেকে ক্যাপ কিনতে হয়।

প্রথম ছবির প্রথম শো দেখার জন্য ক্লাস পালিয়ে নাজ, গুলোস্তান অথবা শাবিস্তানে যারা লাইন দিত, তাদের একজন এখন শ্মশ্রুধারী মেগা জেনারেল প্রাকটিশনার। আর একজন সেই যে আমেরিকা গেল তার আর কোন খবর নেই!

মেডিকেল কলেজ জীবনে যাকে কোনদিন গান গাইতে দেখিনি, এমনকি টয়লেটেও না, সে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরানো বাংলা ও হিন্দি গান গেয়ে বাহবা নেয়!

অথচ কলেজ জীবনে গান গাওয়া আমি এখন আর গাইতে পারি না।

আমাদের ব্যাচে একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে ক্লাসে না আসলে মনটা হাই ফাই করত, সে হাসলে শরীরে ঝিলিক দিয়ে যেত! এ কথা অবশ্য কোন দিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি! শুধুই কল্পনায় অনেক ছবি আঁকতাম। ইনটার্নশিপ শেষ হবার পর আজ পর্যন্ত তাঁর সাথে দেখা হয়নি! কোন দিন আবার দেখা হবে কি? সেকি এখনও তেমনি মুচকি হাসে? জীবন গিয়েছে চলে আমাদের পঁয়ষট্টির উপর। মনে হয় এই তো সেদিন!

এক সময় যাদের সঙ্গে পাঁচ বেলা খাওয়া-দাওয়া করেছি, হাজারো দুষ্টামি, গলাগলি, গালাগালি আর দলাদলির সঙ্গী ছিল যারা তাদের অনেকেই এখন ভৌগলিক বা মানসিকভাবে অনেক দূরে। তাতে কিচ্ছু আসে যায় না।

সেদিন আমরা যারা শুধুই 'ব্যাচ মেট' ছিলাম, আজ তারা একজন অন্যজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি প্রাণের বন্ধু হয়ে !

কখন, কিভাবে টের পাইনি !

হাজারো ব্যবধানের পরেও আমাদের বন্ধুত্বটা আদি ও অকৃত্রিম।

আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবী আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছে! যারা না ফেরার দেশে আছ তাদের বলছি- সবাই আমরা তোমাদের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি!

সবাইকেই একদিন সে দেশে যেতেই হবে।

তবু আমাদের বন্ধুত্বটা থাকুক অমলিন, নিষ্কলুষ ও অটুট!

ভাবুন, ভাবতে থাকুন

জনসংখ্যার ২০% দারিদ্র্য সীমার নিচে-(দিন আনে দিন খায়) অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি লোক। এক মাসের খাবার দিতে লাগবে ১৫০০০ কোটি টাকা। কে দিবে এই টাকা! সরকার+আপনার দান দাক্ষিণ্য+যাকাত। ফি মাসের আয়ে চলে যাদের; পারবে না হাত পাততে- সেলুনের বা টেইলারিং বা শোরুম (বসুন্ধরা ইত্যাদি) দক্ষ কর্মী ১০-১২ জন ; মাস গেলে বেতন বা tips দিয়ে যাদের চলে। লক ডাউনে কর্ম নেই বেতন নেই, কিভাবে চলবে অথবা আপনার ড্রাইভার? বাইরে যাওয়া মানা, মেয়ের স্কুল/কলেজ নেই মালিক বসিয়ে রেখে কত মাস টাকা দিবে? এক মাস না দুই মাস তিন মাস যেতেই পেরে উঠা really কঠিন। মালিক কতদিন দিবে, কোত্থেকে দিবে-ব্যাঙ্কের লোন, ট্যাক্স সবই তো চলতে থাকবে। কর্পোরেট অফিস/ হাসপাতাল, ক্লিনিক? Customer নেই, client নেই কোত্থেকে আসবে টাকা? এটা তো এমন নয় যে দেয়াল ঘড়ির ব্যাটারি শেষ; কয়েকদিন পরে লাগালেও চলবে? স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি? ৪/৫ মাস ডিজিটাল যুগ, অনলাইনে সম্ভব?

বাস্তবতা হলো সময়ের সাথে চাকাকে ঘুরতে হবে। কিভাবে - সেটাই মানব জাতির decission এর ব্যাপার! লকডাউন ব্যতিরেকে করোনা রোখার রাস্তা নেই, আসলেই নেই। ব্যাপারটা কিন্তু আবেগের নয়, গভীরভাবে ভাবতে হবে বাঁচতে হলে টিকে থাকতে হলে উপায় বের করতেই হবে!

যদি তিনমাসের বেশি চলে যদি আংশিকও খুলতে হয়!

দোকানের গেটে, হাসপাতালের দরজায় স্কুল/কলেজে থার্মোস্ক্যান লাগাতে হবে; তাপমাত্রা বেশি হলে, সর্দি কাশি থাকলে no entry! এতদিন গেইটে ছিল মেটাল ডিটেক্টর এখন যোগ হবে ডিসইনফেক্টান্ট স্প্রে; আর বায়োমেট্রির জায়গায় করোনা ডিটকশন কর্নার; টেস্ট কিটের শর্টেজ রাখা চলবেনা।

অনেক দেশেই এতদিনে আক্রান্ত আর মৃতের সংখ্যা কমছে।

এশিয়ায় মৃতের সংখ্যা ১৫০০০; অনেক কম। সব দেশ উপমহাদেশেই দক্ষিণে গেলে বেশি পূবে গেলে সংখ্যা কমে।

ভাইরাস : মিউটেশন হয়ে দুর্বল স্ট্রেইন আসবে; যা আমাদের এ অঞ্চলের বিজ্ঞানীরা already বলা শুরু করেছেন।

আর কিছুদিনে প্রাকৃতিকভাবেই হার্ড ইমুনিটি, প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকার কথা।

ঔষধ, ভ্যাকসিন : যদিও ১৯২০ থেকে প্রায় প্রতি দশকে ঘটে যাওয়া ফ্লু মহামারীতে ঔষধ/ভ্যাকসিন কোন কাজ দেয়নি। দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাইরাসের কাছে মানবকুল বারবার প্রতারিত হয়েছে। লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ছোবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ্জোয়ালেমিন। (আল্লাহর দয়া ও আশীর্বাদ ছাড়া অবশ্যই কিছু হবে না) - *২০২০ সালে লেখা।

শীত আর বয়স

বয়স বাড়ার সাথে আমাদের শরীর শীতের প্রতি অসহিষ্ণু হতে থাকে। চামড়া পাতলা হওয়ার জন্য বয়স্কদের শীত বেশি লাগে। শীত বেশি লাগা, শীতের প্রতি অতি অসহিষ্ণুতা হাইপোথার্মিয়ার লক্ষণ। কম তাপমাত্রার এবং শীতল বাতাস শরীরের তাপ কমায়, রক্তনালী সংকুচিত হওয়ার কারণে রক্ত তথা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ/প্রত্যঙ্গে অক্সিজেন পৌঁছায় না; হার্ট ও রক্তনালির অসুখ থাকলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি হয়।

কতটুকু ঠাণ্ডা বয়স্কদের জন্য বেশি ঠাণ্ডা??

বয়স্ক লোকের জন্য শরীরের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট (৩৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) অনেক সমস্যা করতে পারে। এটা হলো হাইপোথার্মিয়া। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বাইরে গেলে এমনকি অত্যন্ত ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে এটা হতে পারে; আর বয়স্কদের এটা হলে হার্ট এটাক, কিডনী ও লিভার ফেইলুর বা তার চেয়ে মারাত্মক রোগ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

একজন বয়স্ক লোকের জন্য ঘরের মধ্যে আদর্শ তাপমাত্রা কত?

আমেরিকান ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েব সাইটে পাওয়া তথ্যমতে পঁয়ষট্টি উর্ধ্ব লোকের গৃহাভ্যন্তরে তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৬৪.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট) এর নিচে রাখা উচিৎ নয়।

সচল ও সুস্থ থাকার জন্য ঘরের মধ্যে ভাল তাপমাত্রা কত?

গ্রীষ্মকালে এটা থাকা উচিত ২৫.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ৭৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট; আর শীতকালে ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ৬৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট। ভাল ঘুমের জন্য সবার ক্ষেত্রে আদর্শ হলো ৬০ থেকে ৬৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট (১৫.৫ থেকে ১৯.৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)।

ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডাজনিত অসুস্থতা: সংক্রামক ব্যাধিগুলোর প্রকোপ বেশি বিশেষ করে শ্বাসনালীর অসুখ। সর্দি-কাশি, ফ্লু ইত্যাদি হামেশাই হয়। অধিকাংশই ভাইরাসজনিত তবে ব্যাক্টেরিয়াল নিউমোনিয়া মারাত্মক হতে পারে। নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের অসুখ ঠেকানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। নিউমোনিয়া ও এটিপিক্যাল নিউমোনিয়া এবং এর জটিলতার জন্য বয়স্ক লোক শীতের দিনে মৃত্যুবরণ করেন বেশি। ক্ষুধা মন্দা, কর্মহীনতা, অমনোযোগিতা নিয়ে আসতে পারে। জ্বর না থাকলেও বা বেশি না হলেও এগুলো দেখে সন্দেহ করতে হবে ; কাশি থাকলে চিকিৎসা শুরু করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।

ওয়াকিং নিউমোনিয়া বা এটিপিক্যাল নিউমোনিয়া ব্যাক্টেরিয়া বিশেষ করে মাইকপ্লাসমা, ভাইরাস দিয়ে হয়; মারাত্মক হতে পারে।

কিভাবে নিজেকে উষ্ণ রাখতে হবে?

একটা মোটা কাপড়ের চেয়ে অনেকগুলো পাতলা কাপড় স্তরে স্তরে পড়া ভাল।

মাথা ও ঘাড় থেকে অনেক গরম বেরিয়ে যায় তাই গৃহাভ্যন্তরে ঠাণ্ডা অনুভূত হলেও বাইরে যেতে মাথায় ক্যাপ বা স্কার্ফ পরতে হবে। ঠাণ্ডা পা শীতল আংগুলের জন্য মোটা মোজা, জুতসই জুতা লাগবে।

অসুখ ঠেকানোর উপায়

শীত আসার আগেই ভ্যাকসিন নিতে হবে। ভ্যাকসিন বাংলাদেশেই বানায়। বয়স্কদের প্রতি বছর একটা ফ্লু ভ্যাকসিন নিলে হবে, নিউমোনিয়ার জন্য ৫বছর পর পর ও সারাজীবনে একবার।

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস (ইথেন – মিথেন)

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস “কহেন কবি কালিদাস” এর দুই প্রধান চরিত্র ইথেন আর মিথেন। তাদের বাবা হাবীবুর রহমান একজন কেমিস্ট্রি শিক্ষক। আমাদের বাবাও হাবীবুর রহমান, কেমিস্ট্রি শিক্ষক। তাই অনেকে মনে করেন বইয়ের সাথে মিল রেখেই আমাদের নাম রাখা হয়েছে। বইয়ের সাথে এই মিলে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোটাই কাকতালীয় আসলে। বাবা যখন জানতে পারেন যমজ মেয়ে হবে তখন তার স্টুডেন্টদের কাছে কী নাম রাখা যায় তার পরামর্শ চান। বাবার স্টুডেন্টদেরই একজন ইথেন-মিথেন রাখার কথা বলেন। পরে এই নাম দুটিই বাবার পছন্দ হয়।

আমাদের মামণি মারা যান ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে। মামণি আর বাবার খুব ইচ্ছে ছিলো, দুজনেই যেন ডাক্তার হই। আর ছোট বেলা থেকেই সাদা এপ্রোন জিনিসটা আমাদের খুব ভালো লাগে। রাস্তা দিয়ে সাদা এপ্রোন পরে যারা হেঁটে যেতো, তাদের দিকে চেয়ে থাকতাম। সত্যি ভাবিনি কখনো যে, দুজনই মেডিকেলে চান্স পাবো; সাদা এপ্রোন পরার সুযোগ আমাদেরো হবে!

এডমিশন টেস্টের রেজাল্ট অনুসারে ইথেনের চান্স হয় সোহরাওয়ার্দীতে, আমার ময়মনসিংহে। পরে ও মাইগ্রেশন দিয়ে ময়মনসিংহ চলে আসে।

দুই বোন এক সেশনেই চান্স পেয়ে যাব ভাবিনি। রেজাল্টের দিন বাবা যে কি খুশি হয়েছিলেন! নিজেদের জীবন সার্থক মনে হচ্ছিল সেদিন।

একইরকম দেখতে হওয়ায় কলেজে প্রায়ই মজার ঘটনা ঘটে আমাদের সাথে। আমাদের ফিজিও প্রফেসর ভাইভাতে এক্সটার্নাল রাজীব স্যার আমাদের দুইজনের দুইদিন ভাইভা নেন। আগেরদিন ইথেনের ভাইভা ছিল। তো পরেরদিন আমি যখন ভাইভা দিতে গেছি স্যার বললেন এ কি তুমি আবার ভাইভা দিতে এসেছ কেন। পরে স্যারকে বলি আমার বোন দিয়েছে ভাইভা, আমি না স্যার। স্যার পরে বেশি মজা পান ব্যাপারটায়।

আমাদের দুজনেরই আদর্শ - বাবা। বাবাই আমাদেরকে ছোট্টবেলা থেকে স্বপ্ন দেখা শেখাতেন –

"মানুষ কতখানি বড়?

– তার স্বপ্নের সমান বড়।"

আমাদের জীবনের সব ইন্সপিরেশন, সব মোটিভেশন বাবার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রিয় শিক্ষক। আর শুধু শিক্ষকই নন, তিনি আমাদের প্রিয় বন্ধুও। তাকে আমাদের সব কথা বলতে পারি।

মেডিকেল লাইফ বেশি কাটছে দুজনের। ফার্স্ট ইয়ারের গণরুমের জীবনটা মিস করি খুব। বাড়ি থেকে দূরে এসেও সবার খুনসুটিতে মন খারাপের সুযোগই পেতাম না আমরা গণরুমে। অনেক মজার ছিল সময়গুলো।

প্রফেশনের সময় অবশ্য খুব কষ্ট হয় পড়শোনার চাপে, তবে মেডিকেল ভয়ংকর কিছু না। হল লাইফ খুব মজার, বন্ধুদের সাথে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ানো যায়, এখানে ওখানে হুটহাট ট্যুর দেওয়া যায়। আমাদের অবসরের সময়টুকু বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা, ট্যুর আর মেডিসিন ক্লাব এই দারুণ কেটে যায়।

মেডিকেলে আসলেই যে সারাদিন পড়াশোনা করতে হবে, সামাজিক জীবন বলে কিছু থাকবে না, ব্যাপারটা সেরকম না। নিয়মিত থাকাটাই আসল এখানে। আর বর্তমানটাকে উপভোগ করতে পারলে হতাশা আসে না।

ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা ভাবি না আমরা; বর্তমানেই বাঁচি। তবে,
বাবার কথা মতো দুজনে স্বপ্নের সমান বড় সার্জন হতে চাই একদিন।

সামিয়া হাবিব মিথেন

ভাওয়াল রিসোর্ট

ভাওয়াল রিসোর্ট-গাজীপুর জেলা। নলজানিল গ্রাম। শ্রীপুর-গারগরিয়া মাস্টারবাড়ি রোড। বৌরীপাড়া। ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড দিয়ে ডান দিকে অনেক ভিতরে ঢুকতে হয়। বনের মধ্যে অনেক ঢুকে তারপর শালবনে ঘেরা বিরাট রিসোর্ট। ভিতরে সুন্দর বিরাট ওয়াকওয়ে। রাতে ঢোকার সময় মনে হচ্ছিল অনেকদিন পর ইলেক্ট্রিসিটি বিহীন গ্রামে ঢুকছি। হারিকেনের বাতির মত সমগ্র এলাকায় গাছের গোড়ায় লাগানো এলইডি লাইট। এত বেশি গাছ আর আলো আধারীতে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক যে গ্রাম না ভাবার কোন কারণ নেই।

এস্বার গ্রুপ (হাশেম/পারটেঙ) এর প্রতিষ্ঠানটি তৃতীয় বছরে চলছে। এয়ারপোর্ট থেকে ৩৯ কিমি, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক থেকে ৭ কি. মি. শালবন ঘেরা রিসোর্টটি আসলে জংগলই। স্প্রে, কয়েল দিয়ে /মশারি দিয়ে মশা তাড়ানোর ব্যবস্থার কথা welcome drinks এর সাথেই বলে। কীটপতংগ মাছিতে ভরা বারান্দায় রাতে বসা দায়।

'ভাওয়াল সন্ন্যাসী' সিনেমা হয়েছে (উত্তম কুমার নায়ক?) রাজা রাজেন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্রের mysterious tell of tale হলো এই ভাওয়াল সন্ন্যাসী; পৌরাণিক নয় ষাটের দশকের গোড়ার গল্প।

প্ল্যান করে লাগানো সজীব বর্ধিষ্ণু ৫০ একরের জংগলবাড়ীতে ঢুকতেই ঘাসের গন্ধ; পাখির কিচিরমিচির। জোন করে ভাগ করে সংখ্যাক্রম দিয়ে ঘরগুলো বিচিত্র নাম দিয়ে চিহ্নিত করে সাজানো। ২০৬ টগো ফরেস্ট মানে জোন ২-এর ঐ নামের ভিলা। ৫টা জোনের হরেক অপরিচিত/দুর্বোধ্য নামের বিভিন্ন সাইজের ভিলার সাথে আছে কনভেনশন হল, ব্যাঙ্কুয়েট হল এবং জিম ও মিনি বার। শেষোক্ত দুটো খুব সচল মনে হয়নি। বাঙ্কুয়েটের সামনে গ্রামীণ /আদি পাল্কি দেখে মনে হলো বিয়ে শাদীও হয়। তবে ২ টায় চেক ইন ও ১২ টায় চেক আউটের বাইরে কোন বুকিংয়ের নিয়ম নেই। জগিং (ঘণ্টায় ৬ কি.মি) অবস্থায় ৩মি. লাগে রিসোর্টের প্রাণ সুইমিং পুল প্রদক্ষিণ করতে।

জমজমাট দোতলা রেস্টুরেন্টের বেসমেন্টে রঙিন মাছে ভরা একুরিয়াম। বুফে, তাৎক্ষণিক, রুম সব সার্ভিসই আছে।

আমদানি করা গাছ-বাঁশ যে কত প্রকার আর হরেক প্রজাতির plum! টিনের/শনের ঘর নেই – কবুতর নেই। তালগাছ নেই, বাবলা গাছ নেই, নেই বাবুই পাখি; চড়ুইও চোখে পড়ে কচিৎ। শালের বনে আর রিসোর্টের গাছে ঘুঘু বোধহয় বসে না!

খুব ইচ্ছা ছিল মাটির কাছে থেকে বৃষ্টি দেখব। শাল গাছ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি, বাতাসে বাঁশ গাছ ঢলে পড়বে একে অন্যের উপরে, সাঁ সাঁ আওয়াজ করে বাতাস ছুটবে পুরা রিসোর্টটাকে ভেদ করে; বিকট আওয়াজ করে পড়বে বজ্র। হলো না কিছুই, ঢাকায় তুমুল বৃষ্টি কিন্তু এখানে কোন ছিটেফোঁটা নেই বৃষ্টির!

ডা. তামজিদের লেখা প্রাসঙ্গিক অভিব্যক্তি (করোনাকালীন)

(লন্ডনে থাকা প্রবাসী, মেডিকেল স্পেশালিস্ট প্রফেসর কাজী তররিকের ছেলে আমাদের ছাত্র)

অসুস্থ নই, সুস্থই আছি আমি
অচেনা নই, আছি আগের মতোই।

শুধু মাঝে মাঝে অচেনা লাগে,
বারবার ধুতে ধুতে চামড়া উঠে যাওয়া
নিজের হাত দুটোকে।
অথবা
তিন পরত মাস্ক ও ভাইয়ের এর ভিতরে
চিৎকার করে করে কথা বলতে বলতে
ভেঙে যাওয়া নিজের গলার স্বরটাকে।

মাঝে মাঝে অচেনা মনে হয়
চেনা মানুষদের চেনা চোখের নিচে
চেপে বসে থাকা অচেনা মাস্কটাকে।

চেনা মনে হয়,
অচেনা মানুষদের চোখে দেখা
জীবনের আকুতি, বাতাসের আকুলতা
প্রতি রাতের দুঃস্বপ্ন গুলোও খুব চেনা জানা,
মানুষের লোভগুলো চেনা লাগে
চেনা লাগে রাষ্ট্রনায়কদের অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত

শুধু মাঝে মাঝে অচেনা লাগে
অপরিচিত জনের পরিচিত ব্যবহার
অথবা হঠাৎ করে মুখোমুখি হওয়া মনুষ্যত্বের
সম্পর্কে পরিবর্তন নেই,
পরিবর্তন শুধু চাওয়া পাওয়ার
প্রিয়জনের উষ্ণ আলিংগনের আকাঙ্ক্ষা
নেই আকাঙ্ক্ষা শুধু দূর থেকে তাদের সুস্থতার

হে মহান অতিমারী,
না চাইতেই ঋণ দিয়েছো অনেক
হয়তো এবার সময় এসেছে বিদায় নেয়ার।

কাদরী স্যার

২৯ শে জুলাই ছিল কাদরী স্যারের মৃত্যু দিবস। ২০০৪ সালের এই দিনে অধ্যাপক মাজহার আলী কাদেরী (এম এ কাদেরী) পরলোক গমন করেন।

আমার মনে হয় বাবা-মার জন্য দুনিয়াতে এসেছি আর কাদরী স্যারের জন্য আজকের অবস্থানে আসতে পেরেছি। উনার সাথে ইন্টার্ন ছিলাম ছয় মাস। আরেক আপনজন শ্রদ্ধাস্পদ কাদের ভাই, প্রফেসর ফজলুল কাদের চৌধুরী তখন ছিলেন কাদরী স্যারের সিএ (ক্লিনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট)। বদমেজাজী, স্পষ্টবাদী, কঠোর principles এর কাদরী স্যারের ওয়ার্ডে কাজ করতে সবাই ভয় পেতেন; পারতপক্ষে উনার আন্ডারে ট্রেইনিং যেতে চাইতেন না। স্যারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ না করেই ইন্টার্নশিপের জন্য ঢুকে গেলাম, কাদের ভাই পিক করলেন। স্যার চেম্বার সেরে রাত এগারোটার পর ওয়ার্ডে ভর্তি নতুন ও খারাপ রোগী না দেখে বাসায় যেতেন না। শুরু করলাম নাইট ডিউটি দিয়ে। রাউন্ড শেষ করে করিডোর দিয়ে বেরুনোর সময় কাদের ভাইকে বললেন (আমাকে দেখিয়ে!) এই কাদের এটাকে কোত্থেকে ধরে আনলে, এটাকে তো কোনদিন দেখিনি! that was my introduction. দিন গত হতে থাকলো আমি স্থিত হতে থাকলাম। মাসেক খানেক পরে আমার প্রতি উনার আস্থা/dependence প্রতীয়মান হতে থাকল। সি এ'র অনুপস্থিতিতে আমাকে বলতেন রাতের রাউন্ড দিতে, ইনভেস্টিগেশন লাইন আপ করতে; একদিন এক দোস্ত বেঁকে বসলো আমার ছকে investigation advise করবে না। স্যার বললেন সবাই তো আর মেডিসিনে ক্যারিয়ার করবে না!

সাপ্তাহিক CME তে ইউনিটের case presentation. একটা ইনভেস্টিগেশন তৎকালীন সেগুন বাগিচার আরেক ওস্তাদ ইব্রাহীম স্যারের বারডেম থেকে করাতে হবে; ইতিমধ্যেই দুই দোস্ত গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আমি জ্বর নিয়ে কেবিনে ভর্তি। স্যার গিয়ে বললেন করে নিয়ে আয়। আমি গিয়ে ইব্রাহিম স্যারের কাছে না গিয়ে চিফ বায়োকেমিস্টকে ধরে করে নিয়ে আসলাম; হাসপাতালেই ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল!

স্থুলকায় ঐ রোগীর রক্ত নেয়া কঠিন ছিল! আরেক সেরা নার্স কাজ করত তখন। She helped to take samples। কিন্তু রোগী ঠিকই স্যারের কাছে নালিশ করল pricking এর কষ্টটুকুর জন্য। স্যার খোঁটা দিলেন। এত কায়দায় টেস্ট করিয়ে আনলাম আর অকৃতজ্ঞ রোগী কিনা ...। স্যার বললেন, 'বিনিময়ে উপকার

পাবে এমন আশা করে never do good to others'. এ রকম অনেক ঘটনা! বাইরের কোন প্রফেসরের কাছে রোগী/ফাইল নিয়ে আলাপ করতে হলে আমাকেই পাঠাতেন। একবার বিচিত্রায় একটা article লেখার জন্য আমাকে নিয়ে বসলেন! ডিসচার্জ certificate না সাইন করে উনি যেতেন না। ড্রাফট দেখার নির্দেশ ছিল আমার উপর। আমার /অনেকেরই বুঝতে বাকি থাকল না his wishdom!

Intern certificate সই করতে দিলাম, একদিন সকালে ডাকলেন। সই করে বললেন আমার জীবনে কাউকে excellent দিই নি তোকে দিলাম। It was not only my inspiration, it happened to my compulsion to have career in medicine. ৮০ সালে রয়েল কলেজের রিকগনিশনের তোলপাড় চলছে। Case present করতে হবে। আমি সার্জারিতে রোটেশনে। একদিন সকালে বেডসাইডে লিভার এবসেস ড্রেন করছি। straight আমার হাত ধরে স্যার বললেন, এটা তোর কাজ না, মেডিসিনে আয়। Case prepare কর। Obliged and Started to face n approach to my destination!

প্রফেসর কাদরী '৭৯ সাল থেকে যিনি আমার সব পাওয়ার প্রেরণা।

আর গল্প নয়

১.৩০টায় টেকনিক্যালে মোড় থেকে রওয়ানা দিয়ে গ্রিন স্কোয়ার বাসায় আসলাম সাড়ে চারটায় (এর আগের দীর্ঘতম রেকর্ড ২ ঘণ্টা); তাও আমরা মোহাম্মদপুর থ ানার পাশ দিয়ে বাজার ঘেঁষে আসলাম। লালমাটিয়াকে পাশ কাটিয়ে, সাতমসজিদ ধরে ৮নং ব্রিজ হয়ে ৬নং দিয়ে মীরপুর রোড ক্রস করলাম। (পথিমধ্যে-ল্যাপটপ off হলো, iPhone এর চার্জ গেল, এখন থেকে ইনার সিটিতেও পাওয়ার ব্যাংটা রাখব; ব্লাডার তাড়া দিতে শুরু করল)

পেপারে দেখলাম কর্মসংস্থান মন্ত্রী বলেছেন, এ বছর ১০ লাখ লোকের বিদেশে কর্মসংস্থান হবে। আমি ধরে নিয়েছি মাননীয় মন্ত্রী বলতে চেয়েছন ১ লাখ। ৩৬৫ দিনে ১০ লাখ হলে দিনে কয়জন?

উত্তরের মেয়র বলেছেন ৪ হাজার নতুন গাড়ি নামাবেন। ৫টা মাত্র কোম্পানি মালিকানা পাবে। ওরা ৪% হারে ব্যাংক লোনে কিনবে আগে যেটা ছিল ২৮%। ৫বছরের বেশি পুরান গাড়ি রাস্তায় থাকবে না অর্থাৎ ১১, ১০ ... মডেল নিষেধ!

দক্ষিণের মেয়রের সাথে চিকনগুনিয়া সচেতনতা অনুষ্ঠানে বসেছিলাম। বারবার, অনেকবার বললেন তাঁর এলাকায় আক্রান্তের হার ০.০০...%. বুঝলাম না এই সংখ্যা ১/৪, ১/১০বা১/১০০বা১/১২বা১/২০ হলে কি এসে যায়?

আরেকজন সড়কের যান দেখলেও জট দেখেন না!

তোরা যে যা বলিস ভাই তালগাছটা আমার credit নেবার দরকারটা কি?

সমস্যা সার্বজনীন, সমাধান হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সম্মানিত একজন বলেছেন (নগরবিদ) ১০০ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকা শহর চলছে। প্রথমে ছিল নিউ ঢাকা প্ল্যান, পরে ডিআইটি, হালে ড্যাপ। সবগুলোতেই ছিল ঢাকার চারদিকে পরিকল্পিত জলাধার।

হিতস্মি! আমরা কি দেখছি। অনলাইন জরিপের ঐ লোক যথার্থই বলেছেন, 'ভুল পরিকল্পনা আর দুর্নীতিই' মূল সমস্যা।

কথোপকথন

তিন জন মানুষ সবাই ষাটোর্ধ্ব, প্রতিষ্ঠিত নিজের পরিসরে।

প্রসংগ রামপাল

একজন বললেন বুঝতে পারি না কয়লার ছাই ১০ মাইল গেলে ১৪ মাইল কেন যাবে না। পশুর নদী দিয়ে দিনে ১০-১২ হাজার টন কয়লা নিলে পরিবেশের কেন ক্ষতি হবে না।

আরেকজন বললেন, শ্রীলংকার তিনকোনামিতে ৫হাজার টন পরিবহনের জন্য পরিবেশ দূষণ হবে পরিবেশবিদদের এই সুপারিশকে আমলে নিয়ে similar project বাতিল হয়েছে।

ফারাক্কা ...

চালু করার বছর খানেক আগে একজন রাজশাহী কলেজে পড়তেন। বিকেলে কলেজের পিছন হয়ে প্রিন্সিপ্যালের বাসার পাশ দিয়ে শাহমখদুমের মাজার ঘেঁষে গিয়ে পদ্মার পাড়ে বসতেন। ভরা পদ্মার উত্তাল ঢেউ পাড়ে এসে আছড়ে পড়ত। দিগন্ত জোড়া পানি আর পানি, পাড়ের কাছ ঘেঁষে পাল তোলা নৌকা, ছই দেয়া বজরা। ঐ সময় যারা রাজশাহীতে ছিলেন, ষাটোর্ধ্ব যারা তখন থেকে রাজশাহীতে আছেন; বঞ্চনার খোঁচা তাদেরকে ভোগায়।

উনার কথা এখনও যারা সুন্দরবন যাননি তাদের যাওয়া উচিত। ভ্রমণ শেষে ফিরতি পথে পিছন ফিরে তাকালে উপলব্ধি করা যাবে সুন্দরবন কত সুন্দর, কত বড় সম্পদ এদেশের! কি হারাচ্ছি আমরা।

রূপপুর পারমাণবিক

একজন বললেন পদ্মার উৎসে ৫ মাইলের মধ্যে এটা। বিপদ পদ্মা হয়ে সারা বাংলায় ছড়াবে। চেরনোবিল, ফুকুশিমার প্রকল্প লোকালয়ের বাইরে ছিল। ওখানে শ শ' মাইলে ১, ২ জন লোক; আমাদের সেন্টিমিটারে ২জন। disaster prone এ project ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় না হয়ে হাতিয়া, সন্দ্বীপে হতে পারত!

এবার তৃতীয়জন বললেন ভাইরে নীতিনির্ধারকদের প্রায় সবারই পরের জেনারেশন বিদেশে settled. সবাই বয়স্ক, ১০-১২ বছরে - অধিকংশই থাকবেন না। কে ভাববে দেশের কথা!

কথোপকথন
শাহবাগের মোড়; জ্যামে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলে রিকশাওয়ালা বলল বাড়ি কিশোরগঞ্জ। বললাম প্রেসিডেন্ট এর এলাকা। বলল ওনার মিঠামইন আমি করিমগঞ্জের, যেতে লাগে একদিন। জানতে চাইলাম রাস্তাঘাট ডেভেলপ করেননি। ওর জবাব আমাদের হাওরে ব্যবস্থা ব্যতিক্রমী; পাকারাস্তা কিন্তু ছয়মাস পানির নিচে। বলল ঢাকায় গাড়িতে উঠে প্রেসিডেন্টের বাড়ি চলে যাওয়া যাবে। প্রেসিডেন্ট হয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন বললে দ্বিমত পোষণ করে ও বলল না আগে থেকেই করেছেন; আমার সাথে মিলিয়ে বলল স্পিকার ছিলেন, অনেক বার এম পি হয়েছেন। বলতে থাকল যারা সৎ তারা ৫ টাকায় ৫ টাকারণ কাজ করেছেন। ঐদিনই প্রথম আলোতে (১৬/৫/২০১৮) পড়লাম খুলনার খালেক সাহেব জেতার পর তাঁর সমকালীন এক বামপন্থী বলেছেন খালেক সাহেব মেয়র হলেন কিন্তু বিসর্জন দিলেন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন। পেশার সুবাদে আমার অনেকের সাথেই অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ হয়েছে। অনুতাপ হচ্ছিল we lost, nation is loosing a generation!!

ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের নামকরণের ইতিকথা

ইন্দিরা রোড
এককালে এ এলাকায় "দ্বিজদাস বাবু" নামে এক বিত্তশালী ব্যক্তির বাসস্থান, অট্টালিকার পাশের সড়কটি নিজেই নির্মাণ করে বড় কন্যা "ইন্দিরা" নামেই নামকরণ।

পিলখানা
ইংরেজ শাসনামলে প্রচুর হাতি ব্যবহার করা হত। বন্য হাতিকে পোষ মানানো হত যেসব জায়গায় তাকে বলা হত পিলখানা। বর্তমান "পিলখানা" ছিলো সর্ববৃহৎ হাতির আবাস।

এলিফ্যান্ট রোড
পিলখানা হতে হাতিগুলোকে নিয়ে যেতো "হাতির ঝিল"এ গোসল করাতে তারপর "রমনা পার্ক"এ রোদ পোহাতো সন্ধ্যের আগেই পিলখানায় চলে আসতো যাতায়াতের রাস্তাটির নামকরণ "এলিফ্যান্ট রোড" পথের মাঝে ছোট্ট একটি কাঠের পুল ছিলো "হাতির পুল"।

কাকরাইল
ঊনিশ শতকের শেষ দশকে ঢাকার কমিশনার ছিলেন মি. ককরেল। নতুন শহর তৈরি করে নামকরণ "কাকরাইল"।

রমনা পার্ক: অত্র এলাকায় বিশাল ধনী রম নাথ বাবু মন্দির তৈরি করেছিলো "রমনা কালী মন্দির" মন্দির সংলগ্ন ছিলো ফুলের বাগান আর খেলাধুলার পার্ক। পরবর্তীতে সৃষ্টি হয় "রমনা পার্ক"।

গোপীবাগ
গোপীনাগ নামক এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। নিজ খরচে "গোপীনাথ জিউর মন্দির" তৈরি করেন। পাশেই ছিলো হাজারো ফুলের বাগান "গোপীবাগ"।

চাঁদনী ঘাট
সুবাদার ইসলাম খাঁর একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরী ছিলো এবং নিত্যনতুন নারী নিয়ে আসতো। প্রমোদতরীর নাম ছিলো "চাঁদনী" যেই ঘাটে তরীটি বাঁধা থাকতো সেটা "চাঁদনী ঘাট"।

টিকাটুলি
হুক্কার প্রচলন ছিলো হুক্কার টিকার কারখানা ছিলো "টিকাটুলি"।

তোপখানা
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোলন্দাজ বাহিনীর অবস্থান ছিল এখানে।

পুরানা পল্টন, নয়া পল্টন
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঢাকাস্থ সেনানিবাসে এক প্ল্যাটুন সেনাবাহিনী ছিল, প্ল্যাটুন থেকে নামকরণ হয় পল্টন, পরবর্তীতে আগাখানিরা এই পল্টনকে দুইভাগে ভাগ করেন। নয়া পল্টন ছিল আবাসিক এলাকা আর পুরনো পল্টন ছিল বাণিজ্যিক এলাকা।

বায়তুল মোকাররাম নাম
১৯৫০-৬০ দিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সরকারের পরিকল্পনা পুরানো ঢাকা-নতুন ঢাকার যোগাযোগ রাস্তার। তাতে আগাখানিদের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক বাড়িঘর চলে যায়। আগাখানিদের নেতা আব্দুল লতিফ বাওয়ানী (বাওয়ানী জুট মিলের মালিক) সরকারকে প্রস্তাব দিলো, আমাদের নিজ খরচে এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ তৈরি করবো। এটা একটা বিরাট পুকুর ছিল "পল্টন পুকুর", এই পুকুরে একসময় ব্রিটিশ সৈন্যরা গোসল করতো। ১৯৬৮ সনে মসজিদ ও মার্কেট প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধানমন্ডি
এখানে এককালে বড় একটি হাট বসত। হাটটি ধান ও অন্যান্য শস্য বিক্রির জন্য বিখ্যাত ছিল।

পরীবাগ
পরীবানু নামে নবাব আহসানউল্লাহর এক মেয়ে ছিল। সম্ভবত পরীবানুর নামে এখানে একটি বড় বাগান করেছিলেন আহসানউল্লাহ।

পাগলাপুল
১৭ শতকে এখানে একটি নদী ছিল, নাম পাগলা। মীর জুমলা নদীর উপর সুন্দর একটি পুল তৈরি করেছিলেন। অনেকেই সেই দৃষ্টিনন্দন পুল দেখতে আসত। সেখান থেকেই জায়গার নাম "পাগলাপুল"।

পানিটোলা
যারা টিন-ফয়েল তৈরি করতেন তাদের বলা হত পান্নিঅলা। পান্নিঅলারা যেখানে বাস করতেন সে এলাকাকে বলা হত পান্নিটোলা। পান্নিটোলা থেকে পানিটোলা।

ফার্মগেট
কৃষি উন্নয়ন, কৃষি ও পশুপালন গবেষণার জন্য ব্রিটিশ সরকার এখানে একটি ফার্ম বা খামার তৈরি করেছিল। সেই ফার্মের প্রধান ফটক বা গেট থেকে এলাকার নাম ফার্মগেট।

শ্যামলী
১৯৫৭ সালে সমাজকর্মী আব্দুল গণি হায়দারসহ বেশি কিছু ব্যক্তি এ এলাকায় বাড়ি করেন। এখানে যেহেতু প্রচুর গাছপালা ছিল তাই সবাই মিলে আলোচনা করে এলাকার নাম দেন শ্যামলী।

সূত্রাপুর
কাঠের কাজ যারা করতেন তাদের বলা হত সূত্রধর। এ এলাকায় এককালে অনেক সূত্রধর পরিবারের বসবাস ছিলো।

সুক্কাটুলি
১৮৭৮ সালে ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হয়। এর আগে কিছু লোক টাকার বিনিময়ে চামড়ার ব্যাগে করে শহরের বাসায় বাসায় বিশুদ্ধ খাবার পানি পৌঁছে দিতেন। এ পেশাজীবীদেরকে বলা হত ভিস্তি বা সুক্কা। ভিস্তি বা সুক্কারা যে এলাকায় বাস করতেন সেটাই কালক্রমে সিক্কাটুলি নামে পরিচিত হয়।

ধোলাই খাল নাম

ঢাকা শহরের বাণিজ্যিক ব্যস্ততম খাল ছিলো যা সরাসরি বুড়িগঙ্গা হয়ে বিশ্বের যোগাযোগ ছিল। খালের দু'ধারে ছিলো কাঠের আসবাবপত্রের দোকান এবং ধোপা-ঘর। কাঠের সামগ্রী আর ধোপারা কাপড় ধুতো সে থেকেই 'ধোলাই খাল'।

স্বামীবাগ

"ত্রিপুরালিংগ স্বামী" নামে ধনী এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এক ব্যক্তি এ এলাকায় বাস করতেন। তিনি সবার কাছে স্বামীজি নামে পরিচিত ছিলেন। তার নামেই এলাকার নাম হয় স্বামীবাগ।

মালিবাগ

ঢাকা একসময় ছিল বাগানের শহর। বাগানের মালিদের ছিল দারুণ কদর। বাড়িতে বাড়িতে তো বাগান ছিলই, বিত্তশালীরা এমনিতেও সৌন্দর্য পিপাসু হয়ে বিশাল বিশাল সব ফুলের বাগান করতেন। ঢাকার বিভিন্ন জায়গার নামের শেষে বাগ শব্দ সেই চিহ্ন বহন করে। সে সময় মালিরা তাদের পরিবার নিয়ে যে এলাকায় বাস করতেন সেটাই আজকের মালিবাগ।

ইতিহাস কখনো ভুলে যাওয়ার নয় – শেরে বাংলা

কলকাতার বাবুরা বলেছেন, 'ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করার কোনো দরকার নেই। ফার্মগেট আছে, ধানমন্ডি আছে, পাশে একটা কৃষি কলেজ করে দাও।'

এই ধরণের কায়েমী স্বার্থবাদী আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রিটিশ লর্ডের কাছে গিয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হক বোঝালেন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এবার ব্রিটিশরা কিছুটা নমনীয় হলো, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো একটু দেরিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরের বছর ১৯১৭ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। তিনিই ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি যিনি একই সময়ে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯১৮-১৯ সালে জওহরলাল নেহেরু ছিলেন ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সচিব।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচনে জিতলে তিনি জমিদারি প্রথা চিরতরে উচ্ছেদ করবেন। তিনি যাতে নির্বাচিত হতে না পারেন তার জন্য সারা বাংলাদেশ আর কোলকাতার জমিদাররা একত্র হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। লাভ হয়নি!

কৃষকরা তাদের নেতাকে ভোট দিয়েছেন।

মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বক্তব্য দিচ্ছেন, হঠাৎ করে একটা গুঞ্জন শুরু হলো। দেখা গেল জিন্নাহর বক্তব্যের দিকে কারো মনোযোগ নেই। জিন্নাহ ভাবলেন, ঘটনা কী? এবার দেখলেন, এক কোনার দরজা দিয়ে ফজলুল হক সভামঞ্চে প্রবেশ করছেন, সবার আকর্ষণ এখন তার দিকে। জিন্নাহ তখন বললেন- "When the tiger arrives, the lamb must give away".

এই সম্মেলনেই তিনি উত্থাপন করেছিলেন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব।

১৯৪০ সালের ২২-২৪ শে মার্চ লাহোরের ইকবাল পার্কে মুসলিম লীগের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে বাংলার বাঘ আবুল কাশেম ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবে বলেন- হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বাস্তবতায় হিন্দু মুসলিম একসাথে বসবাস অসম্ভব। সমাধান হচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র এবং পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসাম নিয়ে আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। পাঞ্জাবের মওলানা জাফর আলী খান, সীমান্ত প্রদেশের সর্দার আওরঙ্গজেব, সিন্ধের স্যার আব্দুল্লাহ হারুন, বেলুচিস্তানের কাজী ঈসা ফজলুল হকের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কনফারেন্সে এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোতে মুসলিম নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকার কারণে ফজলুল হক খুবই উদ্বিগ্ন এবং কিছুটা উত্তেজিত ছিলেন। তিনি তার বক্তব্যে একবার বলেন- 'আমি আগে মুসলিম, পরে বাঙালী' (muslim first, bengali afterwards)।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে এসে বলেন, কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোতে যদি আর কোনো মুসলিম নির্যাতিত হয় তাহলে আমি বাংলার হিন্দুদের উপর তার প্রতিশোধ নেব।

যে ফজলুল হক তিন বছর আগে সোহরাওয়ার্দী, নাজিমউদ্দিনকে রেখে শ্যামাপ্রসাদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছেন সেই ফজলুল হকের মুখে এমন বক্তব্য তখনকার ভারতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বর্তমানে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র তার ভিত্তি হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব। তাই ২৩শে মার্চকে পাকিস্তানে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব পাস হওয়ার কয়েকদিন পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ চালাকির আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, প্রস্তাবটি টাইপ করার সময়ে ভুল করে muslim majority states লেখা হয়েছে; আসলে হবে state। জিন্নাহর ধারণা ছিল, দেন-দরবার করে দুই পাশে দুইটা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাই স্টেটস-এর জায়গায় স্টেট লিখে একটা মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্র করতে হবে।

জিন্নাহর এই ধূর্ততার কারণে ফজলুল হক তার সাথে পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হননি। তরুণ শেখ মুজিব যখন জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তখন অভিজ্ঞ ফজলুল হক পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছেন। তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে কী কী দুর্দশা হবে বাংলার মানুষের। তাই তিনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন- 'বাংলার মাটিও তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাধা পেয়েছি। একদিন আমার মনে আছে একটা সভা করছিলাম আমার নিজের ইউনিয়নে, হক সাহেব কেন লীগ ত্যাগ করলেন, কেন পাকিস্তান চান না এখন? কেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে মিলে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন? এই সব আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ একজন বৃদ্ধ লোক যিনি আমার দাদার খুব ভক্ত, আমাদের বাড়িতে সকল সময়েই আসতেন, আমাদের বংশের সকলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন- দাঁড়িয়ে বললেন, 'যা কিছু বলার বলেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না। তিনি যদি পাকিস্তান না চান, আমরাও চাই না। জিন্নাহ কে? তার নামও তো শুনি নেই। আমাদের গরিবের বন্ধু হক সাহেব।' এ কথার পর আমি অন্যভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। সোজাসুজিভাবে আর হক সাহেবকে দোষ দিতে চেষ্টা করলাম না। কেন পাকিস্তান আমাদের প্রতিষ্ঠা করতেই হবে তাই বুঝালাম। শুধু এইটুকু না, যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখাতে গিয়েছি, তখনই জনসাধারণ আমাদের মারপিট করেছে। অনেক সময় ছাত্রদের নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, মার খেয়ে।

বঙ্গবন্ধুর বাবা বলেছেন- 'বাবা তুমি যাই করো শেরে বাংলার বিরুদ্ধে কিছু বলো না। শেরে বাংলা এমনি এমনি শেরে বাংলা হয়নি।'

ফজলুল হক জানতেন মাঝখানে ভারতকে রেখে পশ্চিম আর পূর্বে জোড়া দিয়ে এক পাকিস্তান করলে তা কখনো টিকবে না। জিন্নাহ আমার লাহোর প্রস্তাবের খৎনা করে ফেলেছে - বলে ফজলুল হক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় থাকেননি। ১৯৪৬এ এসে জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীর দুই বাংলা একত্র করে স্বাধীন যুক্তবাংলার দাবি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতার কারণে শেষ পর্যন্ত বাংলাও ভাগ করতে হল। ফজলুল হক বলেছিলেন- একটি পাকিস্তান কখনও টিকবে না। বাংলা এবং আসামকে নিয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র করতে হবে।

১৯৭১ সালে এসে দেখা গেল, ফজলুল হকের আশঙ্কা এবং ভবিষ্যতবাণী সঠিক। ১৯৭১-এর মত এমন কিছু যে ঘটবে শেরে বাংলা ফজলুল হক তা আঁচ করতে পেরেছিলেন ১৯৪০ সালেই। তাই তিনি ১৯৪০ সালেই বাংলা আর আসাম নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

১৯৭১-এর যুদ্ধ হলো ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন। লাহোর প্রস্তাব ফজলুল হক যেভাবে উত্থাপন করেছিলেন সেভাবে মানলে একাত্তরে এই দেশে রক্তগঙ্গা বইতো না।

এ কে ফজলুল হক পেশাজীবনে কোলকাতা হাইকোর্টের নামকরা আইনজীবী ছিলেন। একদিন তাঁর জুনিয়র হাতে একগাদা পত্রিকা নিয়ে এসে বললেন- 'স্যার দেখুন, কলকাতার পত্রিকাগুলো পাতার পর পাতা লিখে আপনার দুর্নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে, আপনি কিছু বলছেন না।'

তিনি বললেন- 'ওরা আমার বিরুদ্ধে লিখছে তার মানে হলো আমি আসলেই পুর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকদের জন্য কিছু করছি। যেদিন ওরা আমার প্রশংসা করবে সেদিন মনে করবে বাংলার কৃষক বিপদে আছে।'

মুহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বরিশাল বারের নামকরা উকিল। একবার ওয়াজেদ আলীর প্রতিপক্ষ মামলার ইস্যু জটিল হওয়ার কারণে কোলকাতা থেকে তরুণ উকিল ফজলুল হককে নিয়ে আসে ওয়াজেদ আলীকে মোকাবেলা করার জন্য। ফজলুল হক ঐ সময়ে কেবলমাত্র ফজলুল হক, শেরে বাংলা তখনও হননি। তিনি মামলা লড়তে এসেছেন, কিন্তু বিপক্ষের উকিল কে সেই খবর জানতেন না। কোর্টে এসে দেখলেন বিপক্ষে তার বাবা ওয়াজেদ আলী দাঁড়িয়েছেন। ফজলুল হক স্বাভাবিকভাবে যুক্তিতর্ক শুরু করলেন।

এক পর্যায়ে ওয়াজেদ আলী আদালতকে উদ্দেশ্য করে বললেন- "ইনি যা বলছেন তা আইনসংগত না। আইনটা হলো আসলে এরকম এরকম – ইনি নতুন উকিল তো আইন কানুন ভালো বোঝেন না।"

উত্তরে ফজলুল হক বললেন- "তিনি পুরাতন অভিজ্ঞ উকিল হলে কী হবে, তিনি হচ্ছেন কৃষকের ছেলে উকিল (প্রকৃতপক্ষে তাঁর দাদা আকরাম আলী ছিলেন ফারসি ভাষার পণ্ডিত), তিনি আইনের কী আর বোঝেন! আমি হচ্ছি উকিলের ছেলে উকিল, যুক্তি আমারটাই ঠিক।" খ্যাতির সাথে ৪০ বছর ধরে কোলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেছেন। আইন পাস করার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স কেমেস্ট্রি আর ম্যাথমেসিক্সে ট্রিপল অনার্স করেছেন। মাস্টার্স করেছেন ম্যাথমেটিক্স-এ। ছোটবেলায় একবার পড়ে বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলার গল্প রূপকথার মত এদেশের সবার মুখে মুখে। বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশনে একজন এমপি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বক্তব্য দিতে লাগলেন। ঐ এমপি শেরে বাংলার বিরুদ্ধে গানও লিখে এনেছেন এবং সংসদের বাজেট বক্তৃতা করতে গিয়ে সেই গানটি হেলেদুলে কর্কশ কণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন। এরকম পরিস্থিতিতে যে কারও পক্ষে মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল। শেরে বাংলা ঐ এমপির বক্তব্যের মধ্যেই বলে উঠলেন-

"Mr Speaker, I can jolly well face the music, but I cannot face a monkey." এবার ঘটলো মারাত্মক বিপত্তি। তাঁর মত নেতার কাছ থেকে এরকম মন্তব্য কেউ আশা করেনি। এদিকে ঐ এমপি স্পিকারের কাছে দাবি জানালেন- এই মুহূর্তে ক্ষমা চাইতে হবে এবং এই অসংসদীয় বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। স্পিকার পড়লেন আরেক বিপদে। তিনি কীভাবে এতবড় একজন নেতাকে এই আদেশ দেবেন!

শেরে বাংলা ছিলেন ঠাণ্ডা মাথার বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন- "Mr. Speaker, I never mentioned any honourable member of this House. But if any honourable member thinks that the cap fits him, I withdraw my remark."

'জ্ঞানতাপস প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক তাঁর জীবনী লিখতে চান জেনে বলেছিলেন- 'রাজ্জাক, সত্যি বলো, তোমার মতলবটা আসলে কী?'

প্রফেসর রাজ্জাক বললেন- 'আমার এই বিষয়টা খুব ভালো লাগে আপনি যখন ইংরেজদের সাথে চলেন, তখন মনে হয় আপনি জাত ইংরেজ। যখন বরিশালে আসেন মনে হয় আপনি বহুবছর ধরে নিজেই কৃষিকাজ করেন। আবার যখন কোলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে ভাই বলে ডাক দেন তখন আপনাকে আসলেই হিন্দু মনে হয়। আবার যখন ঢাকার নবাব বাড়িতে ঘুড়ি উড়ান তখন মনে হয় আপনিও নবাব পরিবারের একজন। নিজেকে কেউ আপনার মত এত পাল্টাতে পারে না। আপনি যাই বলেন- সত্য হোক, মিথ্যা হোক, মানুষ বিনা দ্বিধায় তা বিশ্বাস করে।'

মহাত্মা গান্ধীর নাতি রাজমোহন গান্ধী তার বইতে লিখেছেন - তিন নেতার মাজারে তিনজন নেতা শায়িত আছেন যার মধ্যে দুজন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। একজনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দেওয়া হয়নি, অথচ তিনিই ছিলেন সত্যিকারের বাঘ।

কিন্তু এটা তার জীবনের কোনো অপূর্ণতা নয়, একমাত্র রাষ্ট্রপতি হওয়া ছাড়া সম্ভাব্য সব ধরণের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন জীবনের কোনো না কোনো সময়ে। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, পূর্ব বাংলার তৃতীয় মুখ্য মন্ত্রী; পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

সর্বভারতীয় রাজনীতি ছেড়ে শুধু পূর্ববাংলার রাজনীতি কেন করছেন এই প্রশ্নের উত্তরে ফজলুল হক বলেছিলেন- এরোপ্লেন-এ উঠলে নিচের জিনিস ছোট আর ঝাপসা দেখাতে পারে, তাই আমি মাটিতেই থাকছি। রাজনীতির এরোপ্লেনে না চড়লেও সৌদি বাদশাহ সউদ ফজলুল হকের সাথে একটা মিটিং করার জন্য নিজের ব্যক্তিগত বিমান পাঠিয়েছিলেন ফজলুল হককে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

অসীম সাহসী এই মানুষটি আমাদেরকে সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করার কথা বলেছেন। বাঙালি জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। তিনি বলেছেন, যে জাতি তার বাচ্চাদের বিড়ালের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়, তারা সিংহের সাথে লড়াই করা কিভাবে শিখবে?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন ফজলুল হকের শিক্ষক। আবুল মনসুর আহমদের সাথে আলাপচারিতায় ফজলুল হক সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মন্তব্য: 'ফযলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙ্গালি। সেই সঙ্গে ফযলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাঙ্গালীত্বের সাথে খাটি মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয় আমি আর দেখি নেই। ফযলুল হক আমার ছাত্র বলে বলছি না, সত্য বলেই বলছি। খাঁটি বাঙ্গালীত্ব ও খাঁটি মুসলমানত্বের সমন্বয়ই ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর জাতীয়তা।

রেফারেন্স: *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর।* (পৃষ্ঠা ১৩৫-৩৬)

পহেলা বৈশাখের সরকারি ছুটি, বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা এই ফজলুল হকের অবদান। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ফজলুল হক মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন কারণ কৃষক-শ্রমিক সংখ্যাগরিষ্ঠ এই উপমহাদেশে মাত্র একজন ব্যক্তি কৃষকদের জন্য রাজনীতি করেছেন। তিনি হলেন- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বললে ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদ করে। জিন্নাহ ছাত্রদের সাথে বৈঠকও করেন। কিন্তু ছাত্ররা ছিল নাছোড়বান্দা। জিন্নাহর ধারণা হলো, ফজলুল হক ছাত্রদেরকে উসকানি দিচ্ছেন। ফজলুল হকের বুদ্ধিতে ছাত্ররা উর্দুর বিরোধিতা করছে। জিন্নাহ এবার ফজলুল হকের সাথে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু ফজলুল হক দেখা করতে রাজি হলেন না। ফজলুল হক জিন্নাহকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করতেন।

জিন্নাহর পীড়াপিড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন ফজলুল হক। বন্ধ দরজার আড়ালে কথা হয়েছিল দুই মহান নেতার। কিন্তু ইংরেজিতে কী ধরণের বাক্য বিনিময় হয়েছিল তাদের মধ্যে পরবর্তীতে তা লিখেছেন ফজলুল হকের একান্ত সহকারী আজিজুল হক শাহজাহান।

জিন্নাহ : পাকিস্তান তো তুমি কোনোদিন চাওনি। সব সময়ে বিরোধিতা করে এসেছো।

হক : প্রস্তাবটি তো আমিই করেছিলাম। পরে ওটার খৎনা করা হয়েছে। আমি এটা চাইনি।

জিন্নাহ : পাকিস্তানের এই অংশ বেঁচে থাক তা তুমি চাও না। তাই ভারতের কংগ্রেসের টাকা এনে ছাত্রদের মাথা খারাপ করে দিয়েছ। তারা আমাকে হেস্তনেস্ত করছে।

হক: আমি এখানে কোনো রাজনীতি করি না। হাইকোর্টে শুধু মামলা নিয়ে চিন্তা করি। আইন আদালত নিয়ে থাকি।

জিন্নাহ : জানো, তুমি কার সাথে কথা বলছো?
হক: আমি আমার এক পুরোনো বন্ধুর সাথে কথা বলছি।

জিন্নাহ : নো নো, ইউ আর টকিং উইথ দ্য গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান।
হক : একজন কনস্টিটিউশনাল গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা আমি জানি।

জিন্নাহ : জানো, তোমাকে আমি কী করতে পারি?
হক : (ডান হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে) তুমি আমার এ্যাই করতে পারো। মিস্টার জিন্নাহ, ভুলে যাওয়া উচিত নয় এটা বাংলাদেশ এবং তুমি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সাথে কথা বলছ।

(আজিজুল হক শাহজাহানের কলাম, অমরাবতী প্রকাশনী, ঢাকা; পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭)

সন্তানের জন্য চমৎকার শিক্ষামূলক উপদেশ

বাবাকে এক ছেলের জিজ্ঞাসা-
-"বাবা, সফল জীবন কাকে বলে?"
বাবা (সরাসরি উত্তর না দিয়ে) বললেন:
– "আমার সাথে চলো, আজ ঘুড়ি উড়াবো। তখন বলবো।"
বাবা ঘুড়ি উড়ানো শুরু করলেন। ছেলে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আকাশে ঘুড়ি বেশ কিছু ওপরে উঠার পর বাবা বললেন:

– "এই দেখো ঘুড়িটা অতো উঁচুতেও কেমন বাতাসে ভেসে আছে। তোমার কি মনে হয় না, এই সুতার টানের কারণে ঘুড়িটা আরোও উপরে যেতে পারছেনা?"

ছেলে: "তা ঠিক, সুতো না থাকলে ওটা আরও উপরে যেতে পারতো!"

বাবা আলগোছে সুতোটা কেটে দিলেন। ঘুড়িটা সুতার টান মুক্ত হয়েই প্রথমে কিছুটা উপরে উঠে গেল। কিন্তু একটু পরেই নিচের দিকে নামতে নামতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার বাবা ছেলেকে জীবনের দর্শন শুনাচ্ছেন ...

"শোনো, জীবনে আমরা যে উচ্চতায় বা পর্যায়ে আছি বা থাকি; সেখান থেকে প্রায় মনে হয় ঘুড়ির সুতার মত কিছু কিছু বন্ধন আমাদের আরও উপরে যেতে বাধা দেয়।

যেমন-

- ঘর,
- মা-বাবা,
- পরিবার,
- অনুশাসন,
- সন্তান ইত্যাদি।

আর আমরাও সেইসব বাঁধন থেকে কখনো কখনো মুক্ত হতে চাই। বাস্তবে ঐ বন্ধনগুলোই আমাদের উঁচুতে টিকিয়ে রাখে, স্থির রাখে, নিচে পড়ে যেতে দেয় না। ঐ বন্ধন না থাকলে আমরা হয়তো ক্ষণিকের জন্য কিছুটা উপরে যেতে পারি, কিন্তু অল্পসময়েই আমাদেরও পতন হবে ঐ বিনে সুতোর ঘুড়ির মতই!

জীবনে তুমি যদি উঁচুতে টিকে থাকতে চাও, তবে কখনোই ঐ বন্ধন ছিঁড়বে না। সুতা আর ঘুড়ির মিলিত বন্ধন যেমন আকাশে ঘুড়িকে দেয় ভারসাম্য;

তেমনি সামাজিক, পারিবারিক বন্ধনও আমাদের জীবনের উচ্চতায় টিকে থাকার ভারসাম্য দেয়। আর এটাই প্রকৃত সফল জীবন।

Enjoy your moments

ঢাকা থেকে ইন্সপেক্টর এসেছে
গ্রামের একটা স্কুল পরিদর্শনে। অষ্টম শ্রেণির কক্ষে ঢুকলেন।
এক ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন -
পরিদর্শক: আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি কে?
ছাত্র: শেখ হাসিনা।

পরিদর্শক: আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি প্রেসিডেন্ট কে?
ছাত্র: প্রেসিডেন্ট খালেদা জিয়া।
পরিদর্শক: তুমি ক্লাস এইটে উঠেছো কিভাবে, আমি তোমার নাম কেটে দেবো।
ছাত্র: আমারতো স্কুলের খাতায় নামই নেই, আপনি কাটবেন কেমনে?

পরিদর্শক: নাম নেই মানে?

ছাত্র: আমি স্কুলের মাঠে গরু নিয়া আইছিলাম, স্যারে কইলো তোরে দশ টাকা দিমু তুই ক্লাসে আইস্যা বইস্যা থাক।

পরিদর্শক: ছিঃ মাস্টার সাহেব, আপনাদের লজ্জা করে না, শিক্ষা নিয়া ব্যবসা করেন? আমি আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবো।

ক্লাস শিক্ষক: আরে আপনি আমাকে বরখাস্ত করতে পারবেন না, আমি মাস্টার না। সামনে যে মুদি দোকানটা দেখছেন ঐটা আমার। মাস্টার সাবে আমারে

কইলো শহর থেকে এক বেটা আইবো, আমি হাটে গেলাম তুই একটু ক্লাস ঘরে যাইয়া বইসা থাকবি।

পরিদর্শক: (রেগে হেড স্যারের রুমে গিয়ে) আপনি হেড স্যার?

হেড স্যার: জ্বী, কোনো সমস্যা?

পরিদর্শক: কি করছেন আপনারা এসব, নকল ছাত্র-শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালান?

হেড স্যার: আমি না, আমার মামা এই স্কুলের হেড স্যার। উনি জমি কেনা-বেচার দালালী করেন।

কাস্টমার নিয়া অন্য গ্রামে গেছেন, আমারে কইলো ইন্সপেক্টর আইলে এক হাজার টাকার এই বান্ডেলটা দিয়া দিস।

পরিদর্শক: এই যাত্রায় আপনারা বেঁচে গেলেন। আসলে আমিও ইন্সপেক্টর না, আমার মামা ইন্সপেক্টর। উনি ঠিকাদারীর কাজও করেন, টেন্ডার জমা দিতে সিটি কর্পোরেশনে গেছেন, আমাকে বললেন তুই আমার হয়ে পরিদর্শন করে আয়।

শম্পা রাণী মণ্ডল- প্রতীকী চিকিৎসক

শম্পা রাণী মণ্ডল নামে ওই চিকিৎসককে রোববার রাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক কর্মচারীর বাড়ি থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় থানায়। পরে শম্পার বাবা শ্যামনগরের ধুমঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নগেন্দ্র নাথ সরকার মেয়েকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনেন।

তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেছেন, আগের ঘটনার নিরাপত্তার ঝুঁকি দেখে তিনিই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মী আরিফুজ্জামান পলাশের বাড়িতে মেয়েকে রেখে এসেছিলেন। তবে শ্যামনগর থানার ওসি এনামুল হক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জিজ্ঞাসায় বলেন, আপত্তিকর অবস্থায় শম্পা ও পলাশকে আটক করা হয়েছে। মাতৃ-শিশু দুগ্ধ ডি এস এফ কোয়ালিটি ম্যানেজার পলাশ ওসির এই বক্তব্যকে নাকচ করে বলছেন, কয়েকজন যুবক পুলিশ নিয়ে এসে তার পাশে ডা. শম্পাকে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলার পর থানায় নিয়ে যায়। পলাশের স্ত্রী শারমীন আক্তার সুইটিও স্বামীর বক্তব্য সমর্থন করে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, ওই যুবকরা তখন তার মোবাইল ফোনও ছিনিয়ে নিয়েছিল। শম্পা ও তার বাবা নগেন্দ্রনাথের দাবি, লাঞ্ছনার ঘটনার প্রতিকার চেয়ে মামলা এবং তাতে ছাত্রলীগের স্থানীয় তিন নেতা-কর্মী গ্রেপ্তারের পর ওই ঘটনাকে আড়াল করতে রোববারের ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

এই ঘটনার শুরু দুই সপ্তাহ আগে গত ২৮ আগস্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক শিশুর মৃত্যুর পর। সেদিন পেটে নাড়ি জড়ানো চার বছরের একটি শিশুকে স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছিল। ওই শিশুটি মারা যাওয়ার পর মৃত্যুসনদ লেখার সময় ডা. শম্পাকে লাঞ্ছিত করা হয়; যদিও শিশুটির চিকিৎসার সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা ছিলনা বলে জানান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. খান হাবিবুর রহমান। তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, দুপুরে শিশুটিকে আনার পর জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দীপংকর মণ্ডল তাকে একটি স্যালাইন দিয়ে বেড়ে পাঠিয়ে দেন। কিছু সময় পর বমি করায় তিনি শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাতক্ষীরায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তার আগে এক্স-রে করারও পরামর্শ দেন ওই চিকিৎসক। এক্স-রে করার ৫ মিনিটের মধ্যে বেলা ২টা ২০ মিনিটের দিকে শিশুটি মারা যায়। তবে এক্ষেত্রে চিকিৎসকের অবহেলার কোনো ঘটনা ছিল না বলে দাবি করেন ডা. হাবিবুর; যদিও চিকিৎসায় অবহেলায় অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। ডা. হাবিবুর বলেন, এরপর হাসপাতালের আবাসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শম্পা রানী মৃত্যুসনদ লেখার প্রস্তুতি নিতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন স্থানীয় ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা। “ওই রোগী সম্পর্কে ডা. শম্পা রানী তেমন কিছু জানতেন না। তিনি তার ডেথ সার্টিফিকেট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করছিলেন।” ওই সময় শ্যামনগর মহসীন কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি আবদুস সবুর ও রহমতের নেতৃত্বে ছয়-সাতজন যুবক ডা. শম্পাকে লাঞ্ছিত এবং হাসপাতালের আসবাবপত্র ভাংচুর করেন বলে হাবিবুরের অভিযোগ। শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ঘটনার পর শম্পা শ্যামনগর থানায় ছাত্রলীগ নেতা সবুর, রহমতসহ তিনজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত পরিচয় ৬/৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পুলিশ কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জয় মণ্ডল, সবুর ও রহমতকে গ্রেপ্তার করে। এরপর থেকে বিভিন্নভাবে হুমকি পাচ্ছিলেন শম্পা। ভয়ে এলাকা ছেড়ে খুলনায় এক অত্মীয়ের বাড়ি চলে যান তিনি। এদিকে কাজে যোগ দিতে হাসপাতাল থেকে তার বাবা নগেন্দ্রনাথকে খবর দেওয়া হয়। নগেন্দ্রনাথ বলেন, ডা. খান হাবিবুর রহমানের অনুরোধে রোববার সকালে তিনি মেয়েকে শ্যামনগরের বাড়ি নিয়ে আসেন। তার বাড়ি কাঁচা হওয়ায় নিরাপত্তার বিষয় ভেবে হাসপাতালের মাতৃ-শিশু দুগ্ধ ডি এস এফ কোয়ালিটি ম্যানেজার পলাশের বাড়িতে রেখে আসেন।এরপর পুলিশ একেবারে মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমার মেয়েকে রাত সাড়ে ৯টার দিকে থানায় নিয়ে যায়। আমি মেয়ের ফোনে সংবাদ পেয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে তাকে মুক্ত করে আনি। পলাশ বলেন, বাড়িতে শম্পাকে রেখে তিনি ও তার স্ত্রী পাশের গ্রামে এক অত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় তাদের পুলিশ ধরে। সাদা পোশাকের পুলিশ আমাকে আটক করে এবং পরে ঘর থেকে দিদিকে (শম্পা) বের করে আনে। ওই সময় কয়েকজন যুবক আমার স্ত্রীর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিককে দিয়ে জোর করে দিদির পাশে আমাকে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলে। পরে পুলিশ আমাদের পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। পলাশের স্ত্রী সুইটি বলেন, তারা নিমন্ত্রণ থেকে ফেরার সঙ্গে

সঙ্গে পুলিশ তার স্বামী ও শম্পাকে আটক করে। ওই সময় উপস্থিত যুবকরা তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি আপত্তিকর আচরণও করে। শম্পা রানী বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অনুরোধে শ্যামনগরে ফিরলেও নিরাপত্তার ঝুঁকির কারণে হাসপাতালের কর্মচারী পলাশের বাড়িতে উঠেছিলেন তিনি। রাত সাড়ে ৯টার দিকে সাদা পোশাকের পুলিশ ও কিছু লোক আমাকে ও পলাশ ভাইকে শ্যামনগর থানায় নিয়ে যায়। আমাকে চরিত্রহীন বানানোর চেষ্টাও চালায়। পরে লিখিত বক্তব্য দিয়ে তারা থানা থেকে ছাড়া পান বলে জানান এই নারী চিকিৎসক।

শম্পা ও তার বাবার অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। শম্পা ও পলাশকে আপত্তিকর অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বলার বাইরে আর কিছু বলতে চাননি শ্যামনগরের ওসি এনামুল। সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তানভীর হোসাইন সুজন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, ২৮ আগস্ট ডা. শম্পাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় শ্যামনগর মহসীন কলেজের সভাপতি সবুরকে সংগঠন থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিকে শম্পাকে নিয়ে এই ঘটনায় ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাতক্ষীরা জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ডা. মনোয়ার হোসেন। তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, এ ঘটনায় ডা. শম্পার সম্মানহানি ঘটেছে। তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার পরিবর্তে রীতিমতো হেনস্থা করা হয়েছে। শম্পার উপর হামলা এবং হাসপাতালে ভাংচুরের ঘটনায় দোষীদের আড়াল করার জন্য এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে এই চিকিৎসক নেতা মন্তব্য করেন।

আমাদের শরীর যদি একটা ছোট্ট শহর হয় তবে ...

আমাদের শরীর যদি একটা ছোট্ট শহর হয় তবে এই শহরের প্রধান মাস্তান হচ্ছে কোলেস্টেরল। এর সাথে কিছু সাঙ্গ-পাঙ্গ আছে। তবে প্রধান সহযোগী ট্রাইগ্লিসারাইড। এদের কাজ হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় মাস্তানি করা, মেয়েদের টিজ করা এসব। হৃৎপিণ্ড হলো এই শহরের প্রাণকেন্দ্র। শহরের সব রাস্তাগুলো এসে মিশেছে প্রাণকেন্দ্রে এসে। মাস্তানের সংখ্যা বেশি হলে কি হয় আপনারা সবাই জানেন। এরা সব রাস্তাগুলো ব্লক করে দিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্র অচল করে দিবে। আপনিও তখন পটল তুলবেন। না তুললেও মাস্তানদের ধর্মঘটে প্রায়ই আপনার প্রিয় শহরে এমন কিছু ঘটবে যে আপনি বেঁচেও মৃতপ্রায় হয়ে থাকবেন। বিয়েতে হাতের রিং তখনও হয়ত হাতেই আছে সাথে হার্টেও রিং পরতে হবে! আমাদের শরীর নামক শহরে কি পুলিশ নেই? যারা মাস্তানদের ক্রসফায়ার করবে, অথবা জেলে ভরবে। হ্যাঁ, আছে। তার নাম এইচ ডি এল। ও পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানী করা এসব মাস্তানদের রাস্তা থেকে তুলে এনে জেলে ভরে রাখে। জেলখানা চিনেন

তো? লিভার বা কলিজা হল জেলখানা। লিভার এইগুলোকে বাইল সল্ট বানিয়ে শহরের পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের মাধ্যমে (পায়খানার সাথে) শহর থেকে বের করে দেয়। কি অদ্ভুত শাস্তি মাস্তানদের! খুব মজা লাগছে তাই না? এইচ ডি এলকে বন্ধু বন্ধু লাগছে তাই না? পুলিশের ছোট ভাই লিটল ডি এল বা সংক্ষেপে এল ডি এল আবার রাজনীতিবিদ। সে লবিং করে জেলখানা থেকে কোলেষ্টেরল বা ট্রাইগ্লিসারাইডরূপী মাস্তানদের তুলে এনে আবার রাস্তায় বসিয়ে দেয়। তাদের মাতলামোতে পুরো শরীরে জ্যাম লেগে যায়। আর এলডিএল মুখ টিপে টিপে হাসে। এইচ ডি এল হায় হায় করে দৌড়ে আসে। কিন্তু সে এলডিএল আর মাস্তানদের যৌথ শক্তির সাথে পেরে ওঠেনা। পুলিশের সংখ্যা যত কমে মাস্তানরা ততই উল্লসিত হয়। শহরের পরিবেশ হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। এমন শহর কার ভালো লাগে বলুন? আপনি মাস্তানদের কমিয়ে পুলিশ বাড়াতে চান? তবে হাঁটুন। আপনার প্রতি কদমে এইচডিএল (পুলিশ) বাড়বে, এলডিএল (লবিং করা রাজনীতিবিদ) কমবে, মাস্তান (কোলেস্টেরল) কমবে! আপনার শহরে (শরীর) প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবে। আপনার প্রাণকেন্দ্র (হার্ট) মাস্তানদের অবরোধ (হার্ট ব্লক) থেকে বাঁচবে। আর শহরের প্রাণকেন্দ্র (হার্ট) বাঁচা মানে আপনিও বাঁচবেন :)

তরুণদের মনের ভাষা

বিস (BIISS) সম্মেলনে বলা হয়েছে তরুণদের মনের ভাব বোঝার মধ্যে আজকের দিনের সমস্যার (অস্থিরতার) সমাধান খুঁজতে হবে। হিলারী ক্লিনটনে প্রেসিডেন্ট নোমিনী সাপোর্ট করার বক্তৃতায় ওবামা সন্ত্রাসী শব্দটা উচ্চারণ করলেন না, উনি বললেন জিহাদী। উনি বললেন ভুল সবারই হতে পারে, ভুল থেকে শিখতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগুতে হবে।

অভিভাবক: ১৮ বছরের পরে একজন ভোটার হয়, গাড়ির লাইসেন্স পায়। অর্থাৎ স্বাবলম্বী হয়। সৌদি আরবে দেখেছি ১২ গ্রেড পাস করার বাবার অবলম্বনে না থাকার প্রবনতা। যারা ৮৫% বেশি পায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং আর্মিতে যায়। বাকিরা লাইসেন্স খুঁজে, ট্রেড কোর্সে যায় স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য। তাছাড়া অভিভাবকের সময় কই। যদি কোন যুবক তার বাবাকে তার আয় ব্যয় অসামঞ্জস্য নিয়ে জিজ্ঞেস করে অথবা যদি বলে একই যোগ্যতায় তার চাকরি হলোনা আরেকজনের কেন হলো অথবা একই অপরাধে একজনের সাজা হলোনা আরেকজনের কেন হলো। আমাদের দেশে এই সময় এমন কোন অভিভাবক কি আছেন হোক সে বড় অফিসার, বড় সেনা, বড় বিচারক, বড় ডাক্তার, বড় ইঞ্জিনিয়ার এ সব সহজ প্রশ্নের সত্য ও বাস্তব উত্তর দিতে পারবেন। এই অভিভাবক কি তার ছেলেকে বোঝাতে পারবেন?

শিক্ষক: আমি যেবার এসএসসি দিব (১৯৭০), স্যার বলেছিলন ৫টায় লেটার পাবে না, ফিজিক্সে ৭৫ এর বেশি পাবে কিন্তু আশি হবে না। রেজাল্টের পর দেখলাম কেমিস্ট্রি, বায়োলজী, দুই ম্যাথ সবগুলোই ভালো মার্ক পেয়ে লেটার পেলাম, কিন্তু ফিজিক্সে ৭৬ পেলাম। ছাত্রকে এত পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা/সময় শিক্ষকের আছে কি?

মনে পড়ে ফাইনাল ইয়ারে পড়ার সময় মায়ের অপারেশনের জন্য ব্লাড দিতে গিয়েছিলাম। ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জের অযৌক্তিক আচরণে টেবিল চাপড়ে চলে এসেছিলাম এবং অপারেশন না করিয়ে মাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। আরেকবার সন্ধ্যার ক্লাসে ওয়ার্ডে গিয়ে দেখি রোগী মারা গেলে পার্টি এক বড় ভাইয়ের গায়ে হাত তুলেছিল। কয়েক বন্ধু মিলে ওদেরকে উত্তম মধ্যম দিয়ে দিলাম। তখন মনে হয়েছিল ওর যেমন ইমোশন আছে আমার/আমাদেরও থাকতে বাধা নাই। এই না হলে তারুণ্য। ৬২ বছর বয়সে এসব ভাবলে অবাক হই।

১৯৬৯-৭০ এ গ্রামের স্কুলে পড়লেও শত শত ছেলে-মেয়ে নিয়ে মাইলের পর মাইল গিয়েছি স্লোগান দিয়ে 'আইয়ুব-মোনাম দুই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই'।

তোফায়েল ভাই এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে। এখনকার তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ফুরিয়ে যাবার কথা নয়! এই তো সেদিন দেখলাম আমেরিকার প্রাইমারিতে বার্নি স্যান্ডার্সকে নিয়ে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। হিলারী বলতে বাধ্য হলেন your cause is our course.

প্যারিসে ১৮ বছরের যুবক এক পাদ্রীকে গলা কাটার পর অন্য দুই বৃদ্ধা নানকে বলেছে- তোমরা সিরিয়ায় আমাদেরকে মারা বন্ধ করো আমরা তোমাদের মারব না। কোন হত্যা কাণ্ডকেই সাপোর্ট করা যাবে না। কিন্তু কে না জানে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল বিষফোঁড়ার কারণে উন্নত বিশ্বে আজ মুসলমানরা সব সন্ত্রাসী। জ্ঞানপাপী বুশ-ব্লেয়ারের জন্য আজ দুনিয়া জ্বলছে। পোপ ফ্রানসিস তো বলেছেন সন্ত্রাসের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা যাবে না। উনি বলেছেন সমাজের অরাজকতা এবং অবিচারই এর জন্য দায়ী।

আমাদের পারক্যাপিটা ইনকাম বেড়েছে, জীবন যাত্রার মান বেড়েছে। তাই বলে

বেসিক ভ্যালু চেঞ্জ হবে কেন। পরিস্থিতি পরিবেশ যদি আমরা ধরে রাখতে পারি। জাভেদ করিম বাংলাদেশে থাকলে ইউটিউবের আবিষ্কারক হতো না। রীতা মামুন রাজশাহীতে থাকলে রিদমিকের বিশ্বে ১নং হতো না।

গ্রামের হোক, ছোট শহর হোক, ঢাকায় হোক ফজরে মসজিদে গিয়ে দেখবেন নামাজ আদায় করছে যারা তাদের মধ্যে যুবক বেশি। জুমার দিনে যে কোন মসজিদে গিয়ে প্রমাণ পেতে পারেন ত্রিশ অনূর্ধ্ব মুসুল্লির সংখ্যা বেশি। সাতদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মানুষ উচ্ছন্নে যেতে পারে না।

পুত্রকে চেনা যায় বিয়ের পর

পুত্রকে চেনা যায় বিয়ের পর –
কন্যাকে যৌবনে।
স্বামীকে স্ত্রীর অসুস্থতায় –
স্ত্রীকে স্বামীর দরিদ্রতায়।
বন্ধুর পরিচয় বিপদে –
ভাইয়ের পরিচয় লড়াইয়ে।
আর
সন্তানকে চেনা যায় বার্ধক্যে।

এক রোগীর প্রশ্ন

এক রোগীর প্রশ্ন :- একটা টুথব্রাশ কতদিন ব্যবহার করে ওটা ফেলে দেওয়া উচিত?

ডাক্তারের উত্তর: সেটা নির্ভর করে আপনি কোন দেশের নাগরিক তার উপর। চাইনিজ হলে :- এক সপ্তাহ.

ব্রিটিশ হলে :- এক মাস.
আমেরিকান হলে :- তিন মাস.
আমাদের দেশের হলে :-
টুথব্রাশ সর্বপ্রথম দাঁত মাজার কাজে ব্যবহৃত হয়,
তারপর এটা চুলে কালার করার কাজে ব্যবহৃত হয়,
এরপর এটা দিয়ে মেশিন সাফাইয়ের কাজ চলে,
আর যখন ওটার সব দানা পড়ে যায়,
তখন এটা পাজামায় ফিতা ঢুকাবার কাজে ব্যবহৃত হয়,
আমাদের দেশে নেতা মন্ত্রীদের যেমন অবসরের কোন বয়স নেই, ঠিক তেমনি টুথ ব্রাশেরও।

আগে প্রকাশ না আগে বিকাশ

কথাটা বললেন বগুড়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সুন্দর বক্তা অধ্যাপক আহসান হাবিব। 2nd generation সরকারি মেডিকেল কলেজ বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (SZMC)। সমসাময়িক অন্যগুলোর চেয়ে আগানো। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শুধু ফাইনান্সিয়াল নয় একাডেমিক অডিটও চালু করেছেন। ৯০০ ছাত্র আর ১০২ শিক্ষকের ক্রমবর্ধিষ্ণু কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের আশা তাদের performence আর achievement দিয়েই upgraded হবেন!

মেডিসিনের অধ্যাপক ডা. জাকিরের অনন্য এক উদ্যোগের উদ্বোধনীতে তিনি বলছিলেন পোস্টগ্রাজুয়েট বিশেষ করে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানসের কার্যক্রম নীতিগত ভাবেই ঢাকাকেন্দ্রিক। স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখতে এর বিকল্প নেই। লিখিত, ক্লিনিক্যাল, OSPE, viva সব মিলিয়ে ৮টা বোর্ড ফেস করা কঠিনতম এ পরীক্ষার কঠোরতার প্রস্তুতির বিকল্প নেই। অধ্যাপক জাকিরের উদ্যোগ ছিল অত্র এলাকার সব সরকারি, বেসরকারি কলেজের ছাত্রের প্রস্তুতি পর্ব দোরগোড়ায় নিয়ে আসা। ডা. জাকিরের কৃতিত্ব তিনি রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুরই নয় শুধু আর্মি মেডিকেল কোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রামের শিক্ষকদেরও আনতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক শিক্ষকদের commitment আর বিসিপিএস-এর যুগপৎ উৎসাহের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষার সাথে জড়িত দুই পক্ষের মুখোমুখি আলাপ অনেক কিছুই সহজবোধ্য হয়। ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকায় গিয়ে এসব ক্লাস। কর্মস্থলের বাইরে থেকে পড়াশুনা, পরীক্ষার preparation প্রায় অসম্ভব। যে ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং নিচ্ছে, মক পরীক্ষা হলে সেখানকার রোগী ম্যানেজমেন্ট ও প্রটোকল অনুযায়ী হতে হবে।

মোবাইলটা অসময়ে বেজে উঠল অচেনা নাম্বার

মোবাইলটা অসময়ে বেজে উঠল। অচেনা নাম্বার। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে বলে উঠে ম্যাডাম আমি রুপার বাবা। মুহূর্তের মধ্যেই নানা বাজে চিন্তা আসে। ও ব্লাড ক্যানসারের রোগী ছিল। চিকিৎসা শেষে গ্রামে ফেরৎ গিয়েছে প্রায় ৪ বছর হলো। এক বছর হলো কোন যোগাযোগ নেই। কি হলো আবার? উনি বলেন ওর একটু চুলকানি হয়েছে কোন ডাক্তার দেখাব সেই পরামর্শের জন্য ফোন করলাম। মাথা থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল। উনিশ বছর বয়সী শ্যামলা মিষ্টি মেয়েটার কথা মনে পড়তেই আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালাম।

রোগী দেখছিলাম উনি বের হতেই তাড়াহুড়ো করে একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন খুব চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না। উনি ওনার ও ছেলের কথা বলতেই সব মনে পড়ল। উনার একমাত্র ছেলে ব্লাড ক্যানসার নিয়ে কোন এক কুরবানির ঈদের ৭/৮ দিন আগে ভর্তি হলো। খুবই খারাপ অবস্থা। আমরা ছুটির মধ্যেই থেরাপী আরম্ভ করলাম। উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। ৩/৪ মাস পর চিকিৎসা শেষে বাড়ি গেল। ৪ বছর হয়ে গেছে। পড়াশুনা করছে। আমাদের কষ্টের কথা মনে পড়তেই উনি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছেন। আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে বলি।

অফিসে ২৪/২৫ বছরের মেয়ে ২জন বাচ্চা নিয়ে ঢুকেছে। আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। সালাম দিয়ে বলল ম্যাডাম চিনলেন না, আমি সেই রিনা মিক্সড লিউকেমিয়ার রোগী। এই দুজন আমার ছেলে-মেয়ে। প্রায় ১০ বছর আগে ও

আমাদের রোগী ছিল। ফলোআপে আসত। মনে পড়ল ওর বিয়ের কথা চলার সময় শ্বশুর বাড়ির মানুষ আমার কাছে রোগের সম্ভাবনার কথা জানতে এসেছিল। সব জেনেই ওরা বিয়ে দিয়েছে। কাছাকাছি এসেছিল তাই দেখা করে গেল।

রোগীদের সুস্থ দেখলে অসম্ভব ভাল লাগে। ক্যানসারের চিকিৎসা অনেক এগিয়েছে। সময়মত সঠিক চিকিৎসায় ক্যানসার সেরে যায়। আমাদের রোগীদের সবচাইতে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক। যারা অসচ্ছল তারা উচ্চহারে টাকা ধার নেয়। অনেক সময় প্রতি হাজারে মাসে একশ’। অনেক সময় চিকিৎসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এসব ক্ষেত্রে যদি নিম্নহারে ধারের ব্যবস্থা চিকিৎসা কম খরচে করার সুযোগ করা যায় তবে অনেক রোগী চিকিৎসা থেকে দূরে থাকতো না। বিশ্ব ক্যানসার দিবসে এই প্রত্যাশা রইল।

সবার জন্য শুভকামনা।

অধ্যাপক ডা. সালমা

মুসলিম ফরায়েজ

১) প্রত্যেক পুত্র পাবে প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ।

২) পুত্র না থাকলে যদি ১ কন্যা হয় ১/২ বা অর্ধেক পাবে, একাধিক কন্যা হলে ২/৩ তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে।

৩) সন্তান থাকলে স্ত্রী পাবে ১/৮ অংশ, সন্তান না থাকলে পাবে ১/৪ অংশ।

৪) সন্তান থাকলে স্বামী পায় ১/৪ অংশ, সন্তান না থাকলে স্বামী পায় ১/২ অংশ।

৫) সন্তান থাকলে পিতা পায় ১/৬ অংশ, সন্তান না থাকলে অবশিষ্ট অংশ।

৬) সন্তান থাকলে মা পাবে ১/৬ অংশ, সন্তান না থাকলে মা পাবে ১/৩ অংশ।

৭) পুত্র থাকলে ভাই বোন ওয়ারিশ হয় না।

আজহার শাহী

শফিকুল ইসলাম (ডিআইজি, বরিশাল রেঞ্জ) প্রেসিডেন্ট পদকে ভূষিত

শফিকুল ইসলাম (ডিআইজি, বরিশাল রেঞ্জ) প্রেসিডেন্ট পদকে (life time achievement) ভূষিত হলেন। পাবনার সন্তান শফিক আমাদের গর্ব।

আমাদের পাশের গ্রামের মানুষ শফিক আমার চতুর্থ ভাই খাজা নজরুল ইসলামের (চার্টার্ড একাউন্টেন্ট) খুবই ঘনিষ্ঠ।

কৃষিবিদ শফিক শেরেবাংলা কৃষি কলেজে (এখন University) আমার চতুর্থ ভাই অধ্যাপক ড. খা. গোলজারের দুই বছরের জুনিয়র।

ট্যালেন্টেড শফিকের দক্ষতার স্বীকৃতিতে i feel buoyant.

বহুমুখী প্রতিভার শফিকের লেখা নাটক টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। আমার expectation he will complete his PhD mission!

আমরা দোওয়া করি ডিআইজি শফিকুল ইসলাম যেন প্রফেশনের সর্বোচ্চ post এ যেতে পারে।

শুভ জন্মদিন, শফিক।

রাষ্ট্রপতির হাতের সম্মাননা

সারা বাংলাদেশের গর্ব সর্বোপরি আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার ডা. খাজা নাজিম উদ্দিন-এর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বর্ণ পদক পাওয়ায় তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া ...

লক্ষীপুর গ্রামের অহংকার যার জন্য পুরো লক্ষীপুর গ্রাম আজ আনন্দিত, সগৌরবে গর্বিত। ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যিনি সব সময় দুস্থ মানুষের পাশে থাকে সব সময়।

তাদেরকে চিকিৎসা শিক্ষা বাসস্থান এবংবেশিারদের জন্য কর্মসংস্থান করে যাচ্ছেন সব সময়। ওনার জন্য লক্ষীপুর গ্রাম তথা আশে পাশের এলাকার সব ছেলে-মেয়ে পড়া-লেখায় উৎসাহিত হয়েছে। কারণ পাস করার পর কাউকে বেকার থাকতে হচ্ছে না। বলতে গেলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন।

গ্রামের মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনবরত আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

অনেক কর্ম ব্যস্ততার মধ্যও তিনি অবসর সময় নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় না করে প্রতিমাসে ছুটে আসেন গ্রামে তার নিজের অর্থায়নে নির্মিত কাশেম মেমোরিয়াল হাসপাতালে। বিরতিহীনভাবে রোগী দেখেন তাদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করে যাচ্ছেন তার কর্মজীবনের শুরু থেকে।

তিনি আসলে আমাদের গ্রামের জন্য আল্লাহতালার রহমত স্বরূপ। এই মানুষটি নীরবে সমাজ সেবায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়ের ! সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই মানুষটি পেশায় একজন ডাক্তার হলেও তাকে সমাজ সেবক হিসেবেই আমরা জেনে আসছি।

হাজারো মানুষের ভিড়ে ডা. খাজা নাজিম উদ্দিন একজনই, তিনি মেডিসিন বিভাগে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক পেয়ে আমাদের গর্বিত করেছেন ! তার এই পদক প্রাপ্তিতে আমরা উচ্ছ্বসিত..!!! এবং সেই সাথে অভিনন্দন সেই রত্নগর্ভামাকে যিনি এমন সোনার ছেলের জন্ম দিয়েছেন!

এবং সেল্যুট জানাই তার মরহুম পিতাকে যার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ত্যাগের মাধ্যম দিয়ে আজকের ডা. খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব গড়ে উঠেছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন তার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু দান করুন।

নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে- কি করে হলো 'বাংলাদেশ' নাম

আমরা কি জানি? এদেশের নাম বাংলাদেশ কী করে হলো?

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সাংবাদিক (মরহুম) আবেদুর রহমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক পূর্বদেশ এবং The People (দ্য পিপল) পত্রিকা দুটোতে (অধুনালুপ্ত) ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা)- এর নাম কি হওয়া উচিত- এই মর্মে বঙ্গদেশ, পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশ- এই তিনটি নামের প্রস্তাব ছাপানো হয়েছিলো (সম্ভবত ১০-১২ ফেরুয়ারিতে)।

আব্দুর রাজ্জাক এবং আমি (সিরাজুল আলম খান) ১৩ ফেরুয়ারি রাতে (নিউক্লিয়াসের) বঙ্গবন্ধুর বাসায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করি। ১৪ ফেরুয়ারি সকালে আব্দুর রাজ্জাক, কাজি আরেফ আহমেদ এবং আমি, নিউক্লিয়াস-এর মিটিংএ বসে এই তিনটি নামের মধ্যে একটি নাম (!) ঠিক করলাম।

১৯৭১ এর ১৫ই ফেরুয়ারী তারিখে শহীদ দিবস (২১শে ফেরুয়ারী) উদযাপন উপলক্ষে বাংলা একাডেমিতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেদিনই দুপুরে বঙ্গবন্ধু উক্ত আলোচনা সভায় যাবার প্রস্তুতি স্বরূপ পায়জামা-পাঞ্জাবী-মুজিব কোট পরেন। পোষাকটা ঠিক আছে কি না দেখাবার সময় নামকরণের বিষয়টি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আপনার সিদ্ধান্তটা এখানে জরুরি। তিনি বললেন, সেটা আমি বুঝি। তোদের মতামতও খুবই দরকার। এ নামেই তো ভবিষ্যতে এই জনপদ পরিচিত হবে।

আলাপের ঐ মুহূর্তে ভাবী (বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব) বললেন, উনারা তো ঠিক করে রেখেছেন। এখন তোমার মতামত জানতে চায়। উল্লেখ্য যে, নিউক্লিয়াস-এর মিটিংএ যে নামটি আমরা ঠিক করেছিলাম, তা ভাবীকে এর আগেই জানিয়েছিলাম।

মুজিব ভাই, চুটকি হাসির মেজাজে বললেন, এই সমস্ত কঠিন কাজে, তোরা তোদের ভাবীকে আগেই বুঝি ম্যানেজ করে রাখিস। আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম। মুজিব ভাই তাঁর হাসি শেষ করে বললেন, এটা একটা কঠিন কাজ রে! কাল সারারাত আমি এই নিয়ে খুব চিন্তা করেছি। শোন, যদি আমাকেই সিদ্ধান্ত দিতে হয়, তবে সেটা হলো- "বাংলাদেশ"।

ভাবী, রাজ্জাক ও আমিবেশি জোরে হেসে উঠলাম।

আমি বললাম, আমরাও "বাংলাদেশ" নামই ঠিক করেছি। মুজিব ভাই খুব খুশি হলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো করে তিনি বললেন, সব বিষয়ে একমত থাকলে সিরাজ, বড় বাধাও সহজে অতিক্রম করা যায়।

কামরুল আলম খান খসরু নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। খসরু, মন্টু ও মহিউদ্দিনকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিতে চলে গেলেন। আমরা নিউক্লিয়াস ও বিএলএফ এর সদস্যদের (ঢা.বির ছাত্র) প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আগেই দিয়ে রেখেছিলাম যেন আলোচনা সভাটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করা যায়।

মুজিব ভাইও তাঁর বক্তৃতা মাঠের-ভাষায় না দিয়ে আলোচনার-ভাষায় শেষ করেন এবং "বাংলাদেশ" নামটি উল্লেখ করলেন। অন্য কার কি মতামত ছিল জানি না। নিউক্লিয়াস-বিএলএফ সদস্যদের সমর্থন ও হাততালি এবং মুহুর্মুহু "জয় বাংলা" শ্লোগানের মধ্য দিয়ে আলোচনাটি সুন্দরভাবে শেষ হয়।

এভাবেই আমাদের স্বাধীন দেশের নাম হয় "বাংলাদেশ"।

সূত্রঃ সিরাজুল আলম খান

দুপুর দুটোয় বাড়ী ছাড়লাম

দুপুর দুটায় বাড়ি ছাড়লাম। আতাইকুলা পার হয়েই ঘুম। তন্দ্রা কাটতে দেখি শাহজাদপুর গ্যাস স্টেশন। এর পর destination এ্যারিস্টক্র্যাট। লাঞ্চ করেই রওয়ানা তো! এক কাপ চা আর আসরের নামাজ পড়ে আবার মহাসড়ক। কখন যে যমুনা পার হলাম বুঝতে পারিনি।

সড়ক চারলেন হচ্ছে, অহর্নিশ চলছে লাগাতার নির্মাণ কাজ। বৃষ্টি নেই। নেই জটলা। শকট তাই ঊর্ধ্বশ্বাসে শিলাবৃষ্টি এসে পৌঁছলো।

কালিয়াকৈরের ফিলিং স্টেশন। স্টেশন আমাদের আকর্ষণ নয়।

আমাদের আকর্ষণ উল্টাদিকের দোকান, নাম "ফাইভ স্টার সুপার মার্কেট"। যে লোকেশন সন্দেহ নেই নামের সার্থকতা নিয়ে মার্কেট এখানে হবে। যাওয়ার সময় না হলেও ফিরতি পথে এটা নির্ঘাত আমাদের স্টপেজ। এখানকার "মায়ের দোয়া" রেস্তোরাঁর লাগোয়া পাঁচমিশেলী দোকানে পাওয়া যায় গরুর দুধের চা। চা আর

রেস্তোরাঁর ছেলেটার গরম তাওয়ার মচমচে তেলবিহীন পরাটা। দৌড়ের উপর ৪ জন মিলে ভিজিয়ে খেলে আলাদা মজা। (ড্রাই কেক, বিস্কুট/ টোস্ট কিছুনা) রেস্তোরাঁর wash room ও clean যদিও aristocrat এর তুলনায় লিয়াকত আলী আর জুতার কালি। যাত্রা যথেষ্ট শুভ।

বাড়িতে ভাল গেছে এবার। বৃষ্টি বাদল যা হবার আগের বিকেলেই শেষ। বিদ্যুত বিভ্রাট নগণ্য।

শরতের শিশির ভেজা রাস্তায় বাল্য বন্ধুদের সাথে হাঁটা। মজাই আলাদা। দুধারে দিগন্ত জোড়া ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে সড়ক পথে হাঁটা- thrillng! ছড়া/গোড়া দেখলে বোঝা যায় ধানের ফলন ভাল হবে। আমার বন্ধুর ১০০ মণ ধান আছে। ছোট বেলায় দেখতাম এ সময় ফ্ল্যাশ ফ্লাডে সব তলিয়ে যেত। বাঁধের কারণে আমরা বেঁচে গেছি। ভাবছিলাম চালের দাম বাড়ছে। ৭০-৭৫ এ গেছে ১০০ হওয়া বিচিত্র নয়। সিন্ডিকেট করে নাকি চালের কারবারিরা ২১০০০ কোটি নিয়ে গেছে। হাওর এলাকায় বাঁধ ভেঙ্গে ধান ডুবেছে। কন্ট্রাক্টর টাকা নিয়েছে সময়মত বাঁধে মাটি ফেলেনি। খাবার জিনিস -ভাত/চাল নিয়ে মানুষকে জিম্মি না করলে চলেনা? আর কত চাই আমরা? সামান্যতম মানবতা, মিনিমাম দেশাত্মবোধ থাকবে না কেন?

১০০০ ডলার বেশি অযৌক্তিক খরচের জন্য ট্রাম্পের মন্ত্রীর চাকরি যায় (জনগণের ট্যাক্সের টাকা অপব্যবহার!) আর আমাদের?

সব অসুখে এ্যান্টিবায়োটিক নয়

সব অসুখে এ্যান্টিবায়োটিক নয় ঠাণ্ডা লাগল, নাক ঝরলো, ফ্লু হলো অথবা পাতলা পায়খানা হলো দোকান থেকে কিনে এ্যান্টিবায়োটিক খেলেন এটা ঠিক নয়। এতে এ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়, শরীরে ক্ষতিকর জীবাণু জন্ম নেয়।

রেজিস্ট্যান্স : যে এ্যান্টিবায়টিকে আগে জীবাণু মরতো সেটাতে যদি এখন আর কাজ না হয় তখন বলা হয় এ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়েছে। যে কোন এ্যান্টিবায়টিকেই রেজিস্ট্যান্স হতে পারে। সব ব্যাক্টেরিয়ার নিজস্ব রেজিস্ট্যান্স (ইনেট) ক্ষমতা থাকে। জিনের পরিবর্তন (মিউটেশন) হয়েও জিন ট্রান্সফার (প্লাসমিড) হয়ে ব্যাক্টেরিয়ায় রেজিস্ট্যান্স জন্মায়। ক্রমবর্ধমান এ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের মূল কারণ হলো অতিরিক্ত এবং অযৌক্তিক ব্যবহার। গবাদি পশুকে বলিষ্ঠ করার জন্য কিছু ঔষধ ব্যবহৃত হয়, পূর্ণ প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া এদের মাংস খেলেও রেজিস্ট্যান্স হতে পারে।

ক্ষতি : বলা যেতে পারে আধুনিক চিকিৎসায় ৩০% এ্যান্টিবায়টিকের বাবহারই অযৌক্তিক। প্রেস্ক্রিপশন বহির্ভূত বাবহারই এর মূল কারণ। প্রেক্রিপশনের ডোজ, ডিউরেশন মেনে না চললে ব্যাক্টেরিয়া থেকে যেতে পারে, পুনঃইনফেকশন হতে

পারে। ইনফেকশন রেসপন্ড না করতে পারে। শরীরের প্রতিরোধক জীবাণু মরে গিয়ে ক্ষতিকর জীবাণু জন্ম নিতে পারে। এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে খাদ্য নালিতে মারাত্মক ক্লস্ট্রেডিয়াম ডেফিসিলি ডায়েরিয়া হতে পারে যেটা অধিকাংশ ঔষধে কাজ করে না। কারবেপেনেমকে ধরা হয় সর্ব সহা এ্যান্টিবায়োটিক সেটার বিরুদ্ধে কারবপেনেম রেজিস্ট্যান্ট এন্টারকক্কাস (সি আর ই) পাওয়া যাচ্ছে। ইস বি এল (এক্সটেন্ডেড সপেক্ট্রাম বিটা ল্যাকটামেজ), এম আর এস এ (মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্টাফাইলকক্কাস), ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট এন্টারকক্কাস ভিআরই), এমডিআর, এক্সডিআর প্রভৃতি জীবন সংহারী ব্যাক্টেরিয়া এ্যান্টিবায়োটিকের অযৌক্তিক ব্যবহারের জন্যই পয়দা হয়েছে। আমেরিকায় বছরে ২ মিলিয়ন লোক এ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের শিকার; খরচ ২০ বিলিয়ন ডলার।

উপায় : জীবন সংহারী রেজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়ার চিকিৎসা দুঃস্বাধ্য। বাস্তবতা হলো ৪০-এর দশকে ফ্লেমিংয়ের পেনিসিলিনের পর এ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের বড় ধরণের ব্রেক থ্রু হয়নি। বিজ্ঞানীরা অন্য কিছু (পোষ্ট এ্যান্টিবায়োটিক এরা) নিয়ে গবেষণা করছেন। সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ফি বছরে এ্যান্টিবায়োটিক সপ্তাহ পালন করছে। আসুন একেবারে অসম্ভব না হলে কালচার /সেন্সিটিভিটি না দেখে এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করি।

সেপ্টেম্বর ১৮/২০১৭ ডাক্তার পার্টি

ছেলে বৌমা নাতনিকে airport drop করে রওয়ানা হলাম রাত ৯.৩৭ মি. উদ্দেশ্য মিরপুর ১৪ নং পুলিশ কনভেনশন হল। অধ্যাপক আজিজুল কাহারের ছেলের বৌভাত। আমিতো গাড়িতে বসেই ই-মেইল, সাফারি, ফেইসবুকে ঢুকে গেছি। আগামীকালের ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত। তাকাই না কোনদিকে। ড্রাইভারকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞস করি কতদূর। এয়ারপোর্ট রোড থেকেই বৃষ্টি, মুষলধারে বৃষ্টি। এক জায়গায় এসে গাড়ি আর নড়ে না। দেখি সামনে পিছনে সবাই দাঁড়ানো, হাঁপিয়ে উঠা অপেক্ষা! ড্রাইভার বললো কালসী রোডে আছি; একজন পথচারী নিজে থেকেই বলল সামনে অনেক পানি; যাওয়া প্রায় অসম্ভব। অতএব U turn itinerary ১০নং গোল চত্বর হয়ে যাওয়া। ১০নং পাওয়ার আগে পপুলার পার হয়ে অলোক-এর উল্টা দিকে স্থবির। গাড়ির চাকা ডুবে যাওয়া পানিতে মনে হচ্ছিল কারে নয় ডিঙ্গিতে যাচ্ছি।

গোলচত্বরের পরে বাম দিকে আরও বিপত্তি। পানি আর পানি-স্রোত আর পানি! ছোট বেলায় আষাঢ়ের শুরুতে গ্রামের রাস্তায় এইভাবে ধেয়ে আসত পানি! এগোই আর ভাবি বুঝি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল! মানুষের কষ্টের সীমা নেই। রিক্সা ভ্যান, হুন্ডা বাস সব ধরণের বাহনই আছে, আছে পায়ে হাঁটা মানুষ। বিরক্তি উৎকণ্ঠা

নিয়ে বসে আছি দীর্ঘক্ষণ; এর মধ্যে কয়েকজন পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়ে উঠলো 'জয় বাংলা'। ভীষণ কষ্ট লাগল – এই দুটো শব্দ এক সময় আমাদের রক্ত গরম করে দিত, আমাদের ধ্যান জ্ঞান ছিল; অথচ ...।

ফেসবুকে কল্যাণপুর মেইন রাস্তার ডুব সাঁতার অবস্থা দুদিন আগেই দেখেছিলাম। বুঝলাম গোটা মিরপুরেই রিকশার গলাপানি হয়। অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছলাম ১১.১০মি। সতীর্থ সহকর্মী অনেককেই দেখলাম; কারো ফ্যামিলি রাস্তায়। কেউ নিজে আসেনি ফ্যামিলি পৌঁছে গেছে। ডাক্তারদের পার্টিতো!

বাংলা বর্ষবরণ

১৪২৬ জীবনের ৬৬তম ১লা বৈশাখ। ৭৪ সাল থেকে প্রায় প্রতিটি উদযাপনেই গেছি রমনা বটমূলে; ভোর ৬-০২ মিনিটে রওয়ানা দিয়ে হেঁটে পৌঁছলাম ১ম গেইটে। কোন লাইন ছিল না। শাহবাগ মোড়ে পোঁছেই শোনা গেল "আমার ভাষা ... আমার মন"। ভাবলাম ঋষিজের স্পিকার, ঋষিজ শুরু করে সাড়ে সাতটায়। কিন্তু ভোর থেকেই নারিকেল তলা থাকে স্বরে গরম (এবার ব্যতিক্রম মনে হলো!) রাস্তায় পেলাম হাতে গোনা ২/১ জন নতুনতম কাপল, নবীনতর দম্পতি আর ট্রাউজার কেডস পরা স্বাস্থ্য পিপাসু প্রাতঃ ভ্রমণকারী। রমনার বাউন্ডারির মধ্যেও একই অবস্থা-লেকের পাড়ে ট্রাউজার পরা লোক অনেক। বাউন্ডারির মধ্যে পুলিশই বেশি। লেকে দেখলাম নৌ-টহলের স্পিড বোট, সিলিন্ডারসহ ডুবরি।

বাঁশে ঘেরা বটমূলের মূল স্টেজের সামনেও ঠেলাঠেলি নেই। আগের রাতের বৃষ্টির কারণে মাঠ ভেজাই নয় শুধু কর্দমাক্ত ছিল, extra বালি বা মাটি ফেলেনি কেন বুঝলাম না। ভেজা মাঠে পাটির উপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে বসেছিলেন কিছু পুরুষ-মহিলা। র‍্যাবের স্ট্রাইকিং ফোর্সের ঘাঁটি বামে আর ডানে পুলিশ কমান্ডিং অফিস। রমনার মধ্যেই পুতুল কাঁসা খাজা গজার দোকান বসত একসময়। পান্তা পর্ব ভিতরেই সারা যেত। উল্টাদিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এদিকে কাঁটাবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল দোকানপাট। নিরন্তর নিরাপত্তার নিস্পেষণে এ আকর্ষণগুলো নেই। বেরোনোর সময় দেখলাম উঁচু ওয়াচ টাওয়ারসহ বিরাট শকট গায়ে লেখা তাৎক্ষণিক অগ্নি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপন। ফুটপাতে দুটো কাঠবিড়ালী উপর নিচ করছে আর এক কিশোর দর্শক ওর সাথে খেলছে। ভালই লাগল পুলিশের সৌজন্য-৩ টা বাতাসার একটা প্যাকেট ও মিনি একটা হাতপাখা দিল!

মঙ্গল শোভাযাত্রা

গেলাম (৭.৩৫ সকাল) '১৬ সাল থেকে ইউনিসেফে লোকজ অনুষ্ঠান পুরস্কার পাওয়া মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হবার পয়েন্টে। একপাশে জনাপঞ্চাশেক পুলিশ, অন্যদিকে সমসংখ্যক র‍্যাব; আরো পরে যাত্রা হবে বিধায় বিদগ্ধ অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি

নামমাত্র। যশোহরের চারুপাটের উত্তরসুরি ঢাকার চারু কলার শোভাযাত্রা। এটা শুরু হয় '৮৯ সালে। সেবার যাত্রা করে গর্জে ওঠা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের রেপ্লিকা দিয়ে। সেটা ছিল এরশাদ আমল। বলা নিষ্প্রয়োজন প্রতিবছরই এটার একটা থিম থাকে। non sponsored এ প্রোগ্রামের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে'।

পান্তা/পান্তা-ইলিশ পর্ব

বাসায় ফিরে খেলাম আসল লাল চালের পান্তা- মহা স্বাদ। পেঁয়াজ-মরিচ। তারপর পাঁচপদ (আলু, ডিম, বেগুন, ডাল, শুঁটকি) ভর্তা; শেষেরটা বাদে ভাজা ইলিশ দিয়ে খেলাম, গুনে গুনে তিনবার নিলাম, আকণ্ঠ ভোজন, up to the content!

চিড়া মুড়ী খৈ-দৈ (কলা চমচম খাজা গজা পর্ব)

পরের দিন বারডেমে চিফ নার্সের সাথে দেখা হতেই নিয়ে গেল ১৬ তলায়; মহাযজ্ঞ নার্সিং একাডেমি অফিসে। ভোজন পর্ব শেষ করে পাশের রুমে গেলাম। ডিজি সাহেব ফিতা কেটে হাল (নতুন) খাতা খুললেন, শুরু হলো সংগীত পর্ব। ফেরার পথে তিন তলায় বারডেম অডিটরিয়াম - সুরের লহরী!!

চৈত্র সংক্রান্তি

আগের দিন (শনিবার) উঠান বাড়ী রেস্টুরেন্টে ল্যাবএইড কারডিওলজী/ বরেন-প্রফেসর বরেনদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। আমার জামাই-মেয়েসহ মালিক, প্রশাসন, পরিবেশক সবাই গেলেও i missed, যেতে পারিনি।

হাল খাতা

গেছিলাম রুপম জুয়েলার্স ২নং গেইট নিউমার্কেট। ষাটের দশকে আমাদের দোকানে বছরের এ অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ ছিল আলাদা। দুপুরের পর থেকে লোক আসত, টাকা দিত, নাম লেখা হতো খাতায়। আমরা কলার পাতার ঠোঙায় ৩-৪টা রসগোল্লা দিতাম। ওরা আমাকে দিল দু'প্যাকে মিষ্টি আরও কিছু উপঢৌকন; নিউমার্কেট, ঢাকা তো!

হু কিল্‌ড্‌ মুজিব

"হু কিল্‌ড্‌ মুজিব" বইটা কাল আমার এক প্রিয় ছাত্র দিয়ে গেল। আমি ভীষণ খুশি। প্রথমা, একুশের বইমেলাসহ প্রায় সব প্রদর্শনী খুঁজে পাইনি। আরিফ (আই এম-৩) এসেছিল ওর এম আর সি পি পাসের খবর দিতে। আমি আগেই জানতাম-ওকে কনগ্রাচুলেটও করেছিলাম।

কাদরী স্যার তাঁর এক teacher কে বলেছিলেন শিক্ষক ছাত্রকে ভুলে যেতে পারে কিন্তু ছাত্র শিক্ষককে ভুলেনা। ছাত্র যে শিক্ষকের মনের কথাও বুঝে আরিফের কর্মে সেটা বুঝলাম। আসলে এল খতিব (অকৃতদার, নিঃসন্তান)-এর এই বইটা বেশ কিছুদিন থেকে আমার লিস্টের টপে ছিল। গত সপ্তাহে কর্নেল শাফায়েত জামিলের বইটা পড়লাম।

এটার পরে আছে সিদ্দিক সালিক, মাসুদা ভাট্টি ও জেনারেল জ্যাকব এবং বিপ্রদাশ বড়ুয়ার (সংগৃহিত) বইগুলো।

ডা. আরিফকে ধন্যবাদ, অনেক অনেক শুভ কামনা।

৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস "প্রতিপাদ্য"

৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এবছরের প্রতিপাদ্য "Depression -let's look". বিষণ্নতার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

বিষণ্নতা মানসিক রোগ। যদি কোন ব্যক্তি কমপক্ষে ২ সপ্তাহ ধরে হতাশ, মন খারাপ ও সবকিছুর প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তবে সেটা হলো Depression।

বিশ্বে এক্ষণে প্রতি বিশজনে একজন ডিপ্রেষণে ভুগছে। বাংলা দেশে এ রোগীর হার ৪.৬%।

সারা বিশ্বে প্রতিদিন তিন হাজার মানুষ অত্মহত্যা করে (মেয়েরা attempt নেয় বেশি কিন্তু ছেলেরা মরে বেশি)। majority is due to DEPRESSION.

আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক ভাল।

স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করতে হলে-

১। রেফারেল সিস্টেম: জিপি থেকে স্পেশালিস্ট/কনসালট্যান্ট হয়ে সুপরা স্পেশালিস্ট established করতে হবে।

২। সার্ভিস: কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকের সার্ভিস বাড়াতে হলে অন্ততঃ ২দিন মেডিকেল অফিসার available করতে হবে (এখন সম্ভবতঃ কমিউনিটি ক্লিনিকের নামে পোস্ট নেই-আমার গ্রামে খোঁজ করে এটা পেলাম)।

৩। ইনভেস্টিগেশন-উপজেলা/জেলা লেভেলে যথেষ্ট বেসিক ইনভেস্টিগেশন হয়, কোন সেন্টারই গ্রাম থেকে আধাঘণ্টার বেশি দূরত্বে নয়। প্রয়োজন শুধু রিলায়েবিলিটি-(BSTI)-র মত সিস্টেম করা গেলে ভাল হতো।

৪। মেডিকেল কলেজগুলোতে সর্বাধুনিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এগুলো available করতে হবে। পরীক্ষার নকল বন্ধ করা গেলে এটাও করা সম্ভব।

৫। প্রেফশনাল সিকিউরিটি: প্রফেশনালদের জন্য ইনসিওরেন্স চালু করা যেতে পারে। হয়রানি বন্ধের জন্য আইন করতে হবে।

৬। মৃতের প্রয়োজনে পোস্ট মরটেমের সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই।

** আমাদের system আছে, sanction আছে কিন্তু ভোক্তার দোরগোড়ায় দেবার ব্যবস্থা নেই।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ও পয়লা বৈশাখ

১৯৫৪ সাল যুক্তফ্রন্ট সরকার পয়লা বৈশাখ সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন। ৫৯৪ খিষ্টাব্দ থেকে বৈশাখকে বর্ষশুরু ধরে বাংলা সন চালু হয়। তখন থেকেই ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ। ১৯৬১ সালে ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত হয়, রমনা বটমূলে বর্ষবরণ শুরু করে ৬৭ সাল থেকে, সে হিসাবে এবার তাদের অর্ধশত বছর। ২০০১ সালে জঘন্য বোমাবাজির পরেও অনুষ্ঠান চলেছিল। এবারে ১১৫ জন (ক্ষুদে শিল্পী সহ) মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু করেছে ভোর ৬.১৫ টায়। রবীন্দ্র সংগীত দিয়ে শুরু করলেও ৮.৩০ এর পর লোকগীতি ও অন্যান্য প্রোগ্রাম থাকে।

শিশুপার্কের নারিকেল বীথিতে

ঋষিজ গোষ্ঠীর এবার ৩৪তম বর্ষবরণ। ১৯৮৯ সাল থেকে ইউনেস্কোর 'সাংস্ক তিক ঐতিহ্য' বলে বিশ্বস্বীকৃতিপ্রাপ্ত মঙ্গল শোভাযাত্রার শুরু। এবার যাত্রা ছিল সকাল ৯টা থেকে মাত্র ২৫ মিনিট। টেলিভিশনে সিলেট, রংপুরেও (৫ বিভাগীয় শহরেই ছিল) শোভাযাত্রা দেখলাম। টেলিভিশনের বৈচিত্রে ভরা অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করার মত। Channel I নিখুঁত প্রচারণা।

আমাদের আরেক asset বন্যার (রেজোয়ানা) সুরধারার অনুষ্ঠানটি ও নিঃসন্দেহে খুবই উপভোগ্য। আমি ৭৩ সাল থেকে রমনা যাই, রাতে গিয়েছি (এখন সম্ভব নয়!), বিকেলে গেছি। মূল মঞ্চের কাছে, লেকের চারদিকে ঘুরে, boat-এ চড়ে দেখেছি বৈচিত্র্যে ভরা রমনার সকাল।

প্রথম দিকে পার্কের মধ্যে বালা চুড়ি ডুগডুগির দোকান নিয়ে মেলাবসত। রকমারি খাবারের সাথে পান্তা ইলিশের সরবরাহ ছিল। অনেকে ফ্যামিলি নিয়ে বসে যেত সারাদিনের preparation নিয়ে। কিছুদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও ছিল ব্যস্ততা -শিখা অনির্বাণ পর্যন্ত। এবার তারা শাহবাগ মার্কেট, আজিজ সুপার মার্কেটের সামনেও নেই নিরাপত্তার কারণে।

পুলিশের তৎপরতা বেশি। এবারই প্রথম দেখলাম মেট্রো পুলিশ মূল মঞ্চের বাউন্ডারিতে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদে ফ্রি বোতল পানি gift করছে।

* স্মর্তব্য-দ্বিতীয় গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে বিড়ম্বনা। wife কে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে ঢুকতেই দেবে না। বললাম চেক করুন অথবা জিম্মায় রাখুন; বললো সম্ভব নয়। ম্যাডামসহ উপস্থিত অনেকেই ফিরে যাবার decission নিলেন। বারবার মনে হচ্ছিল রাষ্ট্রের আইন নাগরিককে অপদস্থ/কষ্ট দেবার জন্য হতে পারে না!! যা ভাবা তাই কাজ-গেলাম পরের গেটে, ওমা ! চেক করে হাসি মুখে ছেড়ে দিল।

ফেরার সময় gate এর ঐ জুনিয়র পুলিশ অফিসারকে বললাম বাবা you are a young man আপনার কারণে রাষ্ট্রের দুর্নাম হচ্ছে। "দৃঢ়তার সাথে বলল তার দুর্নাম হবেনা!"

লুটপাটের একটি সরল হিসাব

অবকাঠামো খাতে নাকি দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। সামগ্রিক চিত্র দেখলে যা মনে হয়, জোয়ার বইছে ঠিকই তবে উন্নয়নের না, লুটপাটের। সড়কপথ, রেলপথ, ফ্লাইওভার, সেতু; এই চারটি খাতে আমাদের দেশে খরচের সাথে অন্যান্য দেশে খরচের একটি তুলনা করি:

সড়কপথ : চার লেন মহাসড়ক নির্মাণে কিলোমিটার প্রতি ব্যয়
বাংলাদেশ - ৫৯ কোটি টাকা
ইউরোপ - ২৮ কোটি টাকা
চীন - ১৩ কোটি টাকা
ভারত - ১০ কোটি টাকা

রেলপথ : সাধারণ রেলপথ নির্মাণে কিলোমিটার প্রতি ব্যয়
বাংলাদেশ - ২৫০ কোটি টাকা (ঢাকা-পায়রা বন্দর)
ভারত - ১২ কোটি টাকা
চীন - ১২.৫ কোটি টাকা
পাকিস্তান - ১৫ কোটি টাকা

ফ্লাইওভার : ফ্লাইওভার নির্মাণে কিলোমিটার প্রতি ব্যয়
বাংলাদেশ - ১৮০ কোটি টাকা (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)
কলকাতা - ৪৮ কোটি ১৫ লাখ (পরমা ফ্লাইওভার)
চীন - ৫০ কোটি টাকা
মালয়েশিয়া - ৫৭ কোটি ৭১ লাখ টাকা

সেতু : সেতু নির্মাণে কিলোমিটার প্রতি ব্যয়
বাংলাদেশ - ৪৬৮২ কোটি টাকা (পদ্মা সেতু)
ভারত - ১২৯ কোটি টাকা (ব্রহ্মপুত্র সেতু)

একটি সরল প্রশ্ন, এর নাম উন্নয়ন নাকি লুণ্ঠন?

বাংলাদেশে নির্মাণাধীন ৬.১৫ কি.মি. দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় ২৮,৭৯৩ কোটি টাকা, একই সময়ে ভারতে নির্মিত ৯.১৫ কি.মি. দীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র সেতুর নির্মাণ ব্যয় ১,১৮০ কোটি টাকা (৯৩৮ কোটি রুপি) ১.৯ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১২ দশমিক ৯ মিটার (৪২ ফুট) প্রস্থবিশিষ্ট দুই লেনে বিভক্ত সেতুটির স্প্যান সংখ্যা ১৮৩, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার (১৬০ ফুট) করে। এছাড়া ঢোলা বাজার থেকে ইসলামপুর তিনিয়ালি পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে দুই লেনবিশিষ্ট একটি সংযোগ সড়ক। সব মিলিয়ে গোটা প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে মাত্র ৯৩৮ কোটি রুপি। অথচ সেতুটি এতটাই শক্তপোক্ত করে বানানো হচ্ছে যে, এর ওপর দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্যাংক ও গোলন্দাজ বহরও পার হবে।

কার্টেসী : ড. ইমরান এইচ সরকার

Islamophobia

It’s the same in every western country

They’re offended by the way we live our lives

they refuse to Condemn terrorist organizations or attacks

They make up or change the definition of words to fit in with their agenda like islamaphobe or racist

Their practices are outdated and barbaric such as segregation or marriage with a minor

They leach off of our welfare systems while creating islamic ghettos in our communities and do not assimilate.

Canada, Australia, America, UK and much more countries all have patriotic movements against the islamisation of their countries

And all you leftists who demand for more immigration from Islamic countries do some research on the Lebanese Civil War 1975-1990

স্বাস্থ্য সেবা Sale-এ দিয়ে ভারতের আয়

বিদেশি রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে ভারত যা আয় করে, তার বেশির ভাগটাই বাংলাদেশ থেকে যাওয়া রোগীদের কাছ থেকে পাওয়া। প্রতিবেশী দেশটি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিদেশিদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে ৬২ কোটি ৩ লাখ ১৫ হাজার ডলার আয় করেছে, যার অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি রোগীরা দিয়েছে বলে সরকারি

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত অর্থবছরে দেশটি বাংলাদেশি রোগীদের কাছ থেকে ৩৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার আয় করেছে। ওই সময়ে ভারতের হাসপাতালগুলোতে চার লাখ ৬০ হাজার বিদেশি রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন, যাদের মধ্যে এক লাখ ৬৫ হাজার বাংলাদেশি। অর্থাৎ ওই সময়ে চিকিৎসা নেওয়া বিদেশিদের প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন ছিলেন বাংলাদেশি। গত অর্থবছরে ৫৮ হাজারের বেশি বাংলাদেশিকে মেডিকেল ভিসা দিয়েছিল। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে মেডিকেল ছাড়া অন্য ভিসায় ভারতে গিয়েও চিকিৎসা নিয়েছেন অনেকে। চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া এতটাই স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে, রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও মেডিকেল ভিসার সুযোগ দিয়েছে দেশটি। গত অর্থবছরে ভারতে সর্বোচ্চ সংখ্যক পর্যটক পাঠানো দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশিরা যেখানে ৩৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার ব্যয় করেছেন, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যয় ১১ কোটি ১০ লাখ ডলার। বাংলাদেশ থেকে ভারতগমনের এই প্রবণতা বাড়ার কারণে দুই দেশের মধ্যে সড়ক পথে যাতায়াতের জন্য রুট বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় ঢাকা-কোলকাতা বাস ও খুলনা-কোলকাতা ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করা হয়। সে সময় বাংলাদেশের অনুরোধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রোগ নির্ণয়ের জন্যও মেডিকেল ভিসা দেওয়ার ঘোষণা দেন। উচ্চ চিকিৎসা ব্যয় বা মানসম্পন্ন সেবা না থাকা দেশগুলো থেকেই চিকিৎসার জন্য মানুষ ভারতে যান। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরই রয়েছে আফগানিস্তানের অবস্থান; দেশটি থেকে গত অর্থবছরে ভারতের মেডিকেল ভিসা নিয়েছেন ২৯ হাজার ৪০০ জন। এরপর রয়েছে ইরাক ও নাইজেরিয়া; দুটি দেশ থেকে মেডিকেল ভিসা নিয়েছেন যথাক্রমে ৯ হাজার ১৩৯ ও ৫ হাজার ৯৯৪ জন। আর পাকিস্তানিদের মধ্যে মেডিকেল ভিসা পেয়েছেন ১ হাজার ৯২১ জন, যা ভারতে বিদেশি রোগীর মাত্র ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ। তবে গড় ব্যয়ের দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তান; রোগী প্রতি দুই হাজার ৯০৬ ডলার। অর্থোপেডিকস, কার্ডিওলজি ও নিউরোলজির নানা সমস্যায় চিকিৎসা নিতে সাধারণত রোগীরা ভারতে যান।

Beware / সাবধান

অসহ্য গরমে বাইরে বের হয়েছেন গাড়ির এসিকে ভরসা করে? এসি ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে আরাম করে বসলেন। কিন্তু আপনি জানতেই পারলেন না গাড়ির এসি কিভাবে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ, অবাক হওয়ার মতোই তথ্য দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। আমরা যখন শেড বা গ্যারোজে প্রিয় গাড়িটি পার্ক করে রাখি তখন নিশ্চয় গাড়ির কাঁচ বন্ধ করেই রাখি। এটিই ডেকে আনছে বিপদ। কাচ বন্ধ অবস্থায় গাড়িতে চার থেকে আটশত মিলিগ্রাম বিষাক্ত গ্যাস বেঞ্জিন জমা

হয়। আর বাইরের তাপমাত্রা যদি ১৬ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি এবং গাড়িটি যদি রোদে পার্ক করা থাকে তাহলে এই বেঞ্জিনের মাত্রা বেড়ে যায় দুই থেকে চার হাজার মিলিগ্রাম। যা আমাদের শরীরের সহ্যক্ষমতা থেকে প্রায় চল্লিশগুণ বেশি!

আবদ্ধ গাড়িতে আমরা যখন বসি তখন এই বিষাক্ত বেঞ্জিন নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এতে আমাদের লিভার, হাড়ের টিস্যু ও কিডনির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। গাড়ির ম্যানুয়াল লক্ষ্য করুন দেখতে পাবেন, এসি অন করার আগে কিছুক্ষণ কাচ নামিয়ে রাখার কথা বলা আছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসি চালানো অবস্থাতেই কয়েক মিনিট গাড়ির জানালা খোলা রাখুন।

আগে রাষ্ট্রকে আইন মানতে হবে

আগে রাষ্ট্রকে আইন মানতে হবে। প্রধান বিচারপতি বিচারপতিদের এক অনুষ্ঠানে এটা বলেছেন। উনি বলেছেন আমি আইন মানবো না, আমি আইন অনুযায়ী চলবো না অথচ আপনাকে বলবো আইন মেনে চলুন তাহলে রাষ্ট্র চলবে না।

সম্প্রতি রোড এ্যাক্সিডেন্ট, চালকের সাজাদণ্ড – তার পরিপ্রেক্ষিতে অবরোধ/কর্মবিরতি (হরতাল) ও জনদুর্ভোগের জন্য অনেকের মধ্যেই এ ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

সেদিন বিএসএমএমইউ-এর পাশে ফুটওভারে উঠতে যাবো দেখলাম একটা গাড়ি উল্টা দিক দিয়ে আসছে। সামনে পুলিশের গাড়ি হুইসেল দিয়ে যাচ্ছে। অবাক লাগলো দেখে যে ঐ গাড়িতে দাড়িপাল্লা ওয়ালা ফ্ল্যাগ আছে।

আমার এক বন্ধু বলছিল এক মিনিস্টারের গাড়িতে গেছিল পুরাটাই উল্টা রাস্তা দিয়ে। ওর চেয়ে বড়টাকে দেখেছি কাওরান বাজার আন্ডারপাস দিয়ে এসে এপারে দাঁড়িয়ে। উল্কার বেগে গাড়ি ছুটছে উল্টো রাস্তায়। সামনে পিছনে অনেক গাড়ি হুইসেলে কান ঝালাপালা হওয়ার অবস্থা। একবার পেপারে ছিল উল্টা দিক দিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেওয়ায় এক সাংসদ পুলিশ অফিসারকে থাপ্পড় দিয়েছে।

যারা হোন্ডা নিয়ে ঢাকা শহরে চলে তাদের অনেকের লাইসেন্স নেই, অনেক প্রাইভেটের এই অবস্থা। কানেকশন বা অন্যভাবে ম্যানেজ করা সম্ভব। একসময় আমার গাড়ি ধরা পড়লে টিকেট খেত। সমস্যা হলো ১২৫ বা ২৫০ টাকার টিকেট তুলতে extra গুনতে হতো। এখন আমি/আমার রিভব/driver connection ব্যবহার করি, ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

একবার সৌদি আরবে রাস্তা ক্লিয়ার দেখে হলুদ সিগনালের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। এক পিচ্চি সিপাই এসে ধরে ফেললো। বললাম তুমি আমাকে চেন? বললো হ্যাঁ তুমি ডাক্তার গত সপ্তাহে তোমার কাছে বাবাকে নিয়ে গেছিলাম।

বললো তুমি সিগনাল অমান্য করেছ, থানায় যেতে হবে। আমার বা তোমার ডিরেক্টরের তদবিরে কাজ হবে না। কি আর করা! গেলাম থানায়। ঘরে বসিয়ে কেটলি ভরা চা গাহোয়া (আরাবিয়ান কফি) দিয়ে ঈশারায় দেখিয়ে দৃঢ় গলায় বললো দুঘণ্টা হাজতে থাকতে হবে। আজও মনে পড়ে ইনচার্জ ছাড়া থানার সব অফিসার / সহকর্মী এসে request করলো, ওর একই কথা-দুঘণ্টা হাজত বাস লাজিম (must) সবাই যাওয়ার সময় দুঃখ প্রকাশ করে অপারগতা প্রকাশ করলো। আমি বুঝে নিয়েছি সাইজে ছোট হলে আইন ওর হাতে, ক্ষমতা খাটালে কিছু করার নেই। হাজত বাসের জন্য মনস্থির করে ফেলেছি। প্রায় পৌনে এক ঘন্টা পর এসে বললো তুমি চলে যাও। হাজত বাসের মওকা হারালাম!

একবার সিডনীতে ফ্রেন্ডের সাথে বিচে ঘুরতে গেছি অনেক ঘুরাঘুরি করে এক জায়গায় পার্ক করলো। আমি বললাম, রাস্তা ফাঁকা, বাগান ফাঁকা তেমন ঈশারা নাই কোথাও এত ঘুরছো কেন। পরে বুঝলাম; ঘোরাঘুরি করে যখন ফিরেছি হলুদ রিসিট দেখে বন্ধুর চেহারা পাল্টে গেল। বললো এরকম আর দুটা পেলে লাইসেন্স বাতিল। লাইসেন্স বাতিল মানে পথে বসা। বিদেশে গাড়ি ছাড়া এক দণ্ড চলে না। রোড এ্যাক্সিডেন্ট ও এ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর ৪০% চালকের দোষে হয়। লাইসেন্স প্রণয়ন ও ট্রাফিক আইন নীতিমালা কঠোরভাবে পালনই এর প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা।

বাড়ি যেতে কতক্ষণ লাগে?

গ্রীনস্কয়ার (ধানমন্ডি ৫) থেকে পাবনার গ্রামের বাড়ি calculated 3-4 hours, predicted 5-6 hours. এ যাবৎকাল

৬ ঘণ্টাই সর্বোত্তম সময়। এবার সকাল ৯:৩০ start করে পৌঁছলাম ১৮:৪০ টায়। পাক্কা ৯ ঘণ্টা।

ভালই যাচ্ছিলাম, কড্ডার মোড় (যেখান থেকে ডানে বাঁক নিয়ে সিরাজগঞ্জ শহরে

যেতে হয়) পার হয়ে দেখি সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় গাড়ি আর গাড়ি। ট্রাক শতকরা নব্বই (ট্রাকই কি সমস্যা)। ভাবলাম বামে ঘুরে এনায়েতপুর হয়ে যাই, রুট knowledge এর মধ্যে না হওয়ায় যাওয়া গেল না। একজন বলল ঈদের সময় এরকম ছিল, সিরাজগঞ্জ ঘুরে গেছিল। বারবার মনে হচ্ছিল TV scrol এ, news paper এ থাকলে সিদ্ধান্ত বদলাতাম।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভার একবার ডান সাইড উল্টো রাস্তা আবার বাম দিয়ে গিয়ে অনেক গাড়িকে অতিক্রম করল। সিরাজগঞ্জ মোড় cross করে বামে শাহজাদপুর রাস্তায় গেলে জ্যাম নেই কিন্তু রাস্তা খারাপ হওয়ায় স্পিড উঠানো কঠিন।

ফিরতি পথে (১৪৪৫-২৩২৫) তথৈবচ, মীর্জাপুর রেল ক্রসিং-এর আগে জ্যাম কাকে বলে। আমিন বাজার ব্রিজের আগে পুনর্বার! আমি গোটা রুটে কারণ খুঁজে

পাইনি, এক্সিডেন্ট করে গাড়ি উল্টে রাস্তা ব্লক নেই, ব্রিজ রেনোভেশন নেই। এ্যারিস্টক্রাটে আলাপ করতে একজন ইদানিং রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠা সড়ক মন্ত্রীকে বাগাড়ম্বর(+আরো কিছু) বলে ভর্ৎসনা করলেন। ভাবছিলাম যমুনা ব্রিজ হল, টাঙ্গাইল ৪ লেন হাইওয়ে হচ্ছে। কি লাভ হলো, long route এ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। সড়ক পথ unpredictable ই রয়ে গেল!

ছাত্রদের ভাষা খারাপ কেন তার জবাব

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে প্লেকার্ডে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে যাদের চুলকানি, আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি :

- মহান ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে অশালীন ভাষায় গালি দিয়ে ছাত্র সমাজ মিছিল করে, তখন সেটা ছিল প্রতিবাদের ভাষা।
- মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইয়াহিয়া খানকে অশালীন ভাষায় গালি দিয়ে ছাত্র সমাজ মিছিল করে, তখন সেটা ছিল প্রতিবাদের ভাষা।
- স্বৈরাচারী সরকার পতনের আন্দোলনে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে অশালীন ভাষায় গালি দিয়ে ছাত্র সমাজ মিছিল করে, তখন সেটা ছিল প্রতিবাদের ভাষা।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনে যুদ্ধাপরাধীদের অশালীন ভাষায় গালি দিয়ে স্লোগান দেওয়া হয়, তখন সেটা ছিল প্রতিবাদের ভাষা।
- কবি ও সাহিত্যিকগণ যখন কবিতা কিংবা গল্পে অশালীন শব্দ কিংবা গালি ব্যবহার করেন, তখন সেটা হয়ে যায় সাহিত্যের ভাষা।
- স্কুল, কলেজে পড়ুয়া আমাদের নতুন প্রজন্ম দেশের মেরুদণ্ডহীন জাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এবং মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করার সাহস জুগিয়ে দিল। তাঁরা আমাদের কাছে অবাক বিস্ময়, তাঁরাই আমাদের অহংকার। তবে আমাদের সুশীল সমাজের কারো কারো কাছে এই আন্দোলনের কিছু বিষয়ে খুব আপত্তি আছে। নিরাপদ সড়ক চাই ও ঘাতক ড্রাইভারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবির আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের প্লেকার্ডে অশালীন ভাষা ব্যবহার করার কারণে তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন তাদের কাছে, প্লেকার্ডের অশালীন ভাষাগুলো কেন প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না??? নাকি বলতে হবে, আপনারা কি কোন নির্দিষ্ট দলের সমর্থক, তাই আপনাদের আঁতে লাগে???

দয়া করে আপনাদের ছদ্মবেশী দালালি বন্ধ করে নিজেদের মুখোশ উন্মোচন করে আসল চেহারা প্রদর্শন করুন। বিগত ৪৭ বছরের সিস্টেম যাঁরা মাত্র দুই দিনে বদলে দিয়েছে, সেই ছাত্রদের নিয়ে সমালোচনা করার আগে শত বার চিন্তা ভাবনা করবেন।

বিঃদ্রঃ পোস্টটি বেশি বেশি শেয়ার করে চুলকানিবাজ সুশীল সমাজের মানুষদের দেখিয়ে দিন।

ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক নয়

ডেঙ্গু হিমরেজিক ফিভার: একবার ডেঙ্গু হলে এক বছরের মধ্যে হয় না। দ্বিতীয়বার হবার চান্স ৫%। প্রাকৃতিক নিয়মেই এখন ডেঙ্গু হিমরেজিক ফিভার বেশি। হিমরেজিক কথাটা থাকলেও রক্ত ক্ষরণ ছাড়াও হিমরেজিক ফিভার হতে পারে; রক্তক্ষরণ থাকলেই সেটা কিন্তু সবসময় হিমরেজিক নয়। হিমরেজিক ফিভার গ্রেড ১, গ্রেড ২ কিন্তু সমস্যা নয় কারণ চিকিৎসা সাধারণ ভাইরাল ফিভারের মত।

ওয়ার্নিং সাইন : পেটের ব্যথা চলতে থাকলে, বমি না কমলে, রক্তক্ষরণ বা ক্ষরণের আভাস থাকলে অতিরিক্ত সচেতনতা দরকার। এগুলে থাকলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। রোগী/রোগীর লোক সচেতন হলে, ডাক্তার অজ্ঞ না হলে প্রথম থেকেই পরিমিত পানি পান করলে এ অবস্থা খুবই কম হয়।

শক সিন্ড্রম : গ্রেড ৩ গ্রেড ৪ হলো শক সিন্ড্রম। ডেঙ্গুর সচেতনতা বাড়ার জন্য এই স্টেজে রোগী কম পাওয়া যায়, হাসপাতাল সুবিধা বাড়ায় চিকিৎসাও এখন ভাল হয়।

প্লাটিলেট : প্লাটিলেট কমে যায় ডেঙ্গু হিমরেজিক ফিভারে, ডেঙ্গু ফিভার বা সব ডেঙ্গুতে নয়। প্লাটিলেট পরীক্ষা করা দরকার হয় রোগ মারাত্মক কিনা দেখার জন্য। ডেঙ্গুর চিকিৎসায় প্লাটিলেট, প্লাটিলেট রিচ প্লাসমা, ফ্রেশ প্লাজমার কোন দরকার নেই।

এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিন্ড্রম: বলা হচ্ছে এবারের ডেঙ্গু ভিন্ন রকম। ডেঙ্গুর সাথে কিছু উপসর্গ দেখা যাচ্ছে যেমন- খিঁচুনি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (এনকেফালাইটিস), হাত/পা দুর্বল/অবশ হয়ে যাওয়া (গিলান বারী), প্যাক্রিয়াটাইটিস, উপসর্গ ও ইসিজিতে হার্ট এটাকের আভাস ইত্যাদি; একসময় এগুলোকে বলা হতো ডেঙ্গুর সাথে অন্য রোগ হয়েছে, ডেঙ্গুতে এগুলো হয়না-হওয়ার কথা নয়। আসলে এটা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ অঞ্চলের গাইড লাইনে ওভাবেই উল্লেখ ছিল; বাস্তবতা হলো ডেঙ্গু আগের মতই আছে, এডিস মশাও এডিসই আছে। এখনকার গাইডলাইনে এগুলোকে বলা হচ্ছে এটিপিক্যাল আলামত -আর এগুলো থাকলে তার নাম দেয়া হয়েছে এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিন্ড্রম। ভীতি থাকতেই পারে, মৌসুমী

রোগ ডেঙ্গুর সময় সন্দেহ হলে এ রোগগুলোকেও আমলে নিতে হবে।

প্রতিকার : প্যারাসিটামল ও পানি এ দুটোই ডেঙ্গুর আসল চিকিৎসা। প্রথম দিন থেকে পরিমিত (বেশিও নয় কমও নয়) পানীয় (পানি, স্যালাইন, জুস, ডাবের পানি) নিতে পারলে সমস্যা হবার কথা নয়। ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড অর্থাৎ জ্বর চলে যাবার পর ২ দিন ব্লাড প্রেশার (বিশেষ করে পালস প্রেশার ঠিক রাখতে পারলেই হলো)। ডেঙ্গুকে এখন হিমরেজিক না বলে লিকিং ডিজিজ বলা হয় কারণ রক্ত নালি লিক (বিশেষ করে ক্রিটিক্যাল পিরিয়েডে) করে ফলে রক্তে কণিকা, পানি, লবণ সব বেরিয়ে যায়। তৃতীয় দিনে লিক আবার বন্ধ হয়ে যায়; তাই ক্রিটিক্যাল সময়ে দক্ষ ম্যানেজমেন্ট দরকার। ভুল হলে হার্ট, ব্রেন ও কিডনিতে রক্ত সাপ্লাই কম হবে- এগুলো ফেইল করলে চিকিৎসা কঠিনতর হবে।

প্রতিরোধ : ভাইরাস মারার ঔষধ নেই, মশা ঠেকাতে পারলেই তাই ডেঙ্গু ঠেকান যাবে। দিবাচর এডিস মশা ঠেকাতে ফুল হাতা শার্ট পরতে হবে, গৃহ পালিত এ ভেক্টরকে মারতে টেবিলের নিচে, পর্দার ভাঁজে কার্যকর ইনসেক্টিসাইড স্প্রে করতে হবে। পাত্র মশার লার্ভা মারার জন্য ছোট পাত্রে পানি জমতে দেয়া যাবে না, স্প্রে করতে হবে পানিতে। প্রকৃতি প্রদত্ত ডেঙ্গু এশিয়া প্যাসিফিকে সবার সমস্যা; ফিলিপিনের মোট জনসংখ্যার ২০% আজ ডেঙ্গু আক্রান্ত। আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে, ভীত হলে চলবে না।

ডেঙ্গু ও প্লাটিলেট

প্লাটিলেট বা অণুচক্রিকা স্বাভাবিক মাত্রা দেড় লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ। অনেক জ্বরেই এটা কমে তবে এক লাখের নিচে কমে জটিল সময়ে। ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুতে কমলেও এক লাখের বেশি থাকে। শুধু জ্বর বা রক্তক্ষরণ থাকলেই সেটা ডেঙ্গু হিমরেজিক ফিভার নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ডেঙ্গু হিমরেজিক ফিভার হতে হলে প্লাটিলেট কাউন্ট এক লাখের এর নিচে থাকতে হবে। হিমাটক্রিট ২০% বেশি হতে হবে। এর সাথে রক্তনালি লিকিং-এর অন্য সমস্যা (যেমন প্রোটিন কমে যাওয়া, পেটে বুকে পানি জমা) থাকবে। বিশ্বে ৪০ কোটি লোকের ডেঙ্গু হয়; ৫ লাখের বেশি হিমরেজিক।

কি দরকার প্লাটিলেট পরীক্ষার : প্লাটিলেট এক লাখের কম হলে সেটা হিমরেজিক। আসলে প্র্যাক্টিক্যালি ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনায় প্লাটিলেট পরীক্ষার role শুধু ডায়াগনসিসের জন্যই এবং এটুকুই। ৮৯-৯০% ডেঙ্গু রোগীর প্লাটিলেট কমে তবে ১০-২০% এর ক্রিটিক্যাল লেভেল (২০%) এর নিচে যায়। ৫% ডেঙ্গু রোগীর মারাত্মক রক্তক্ষরণ (ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগে) জটিলতা হয়। ২০০০০-এর নিচে নামলে রক্তক্ষরণের ভয় থাকে। প্লাটিলেট যদি ৫০০০-এর কম হয় তখন ব্রেন, কিডনি, হার্টের মধ্য রক্ত ক্ষরণের ভয় থাকে। ডেঙ্গুতে প্লাটিলেট কমার সাথে অন্য অনেক (অন্তত:

আরো এগারোটা কারণ) কারণে রক্তক্ষরণ হয়। এককভাবে প্লাটিলেট দিয়ে লাভ হবার কথা নয়।

তথ্য উপাত্ত : ২০ হাজারের নিচে হলেই অনেকে প্লাটিলেট দিতে চায়। বিজ্ঞান সাময়িকী, বই পুস্তক পড়লে দেখা যায় যারা ২০ হাজারে দিয়েছে আর যারা দেয়নি ওদের মধ্যে end of the crisis রক্তক্ষরণের মাত্রা/ধরণের কোন তারতম্য হয়নি। অসুখের পরিণিতিরও আলাদা কিছু ছিল না। কোলকাতা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রস্তাব হলো ১০ হাজার পর্যন্ত দরকার নেই; তার নিচে হলে ডাক্তার যা decission দিবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। বারডেমে খোঁজ নিলে দেখা যাবে গত কয়েক বছরে কয়েক হাজার রোগী চিকিৎসা নিলেও প্লাটিলেট পাওয়া রোগির সংখ্যা নগণ্য; ২০০০ সালের পরবর্তীকালে প্রায় নেই বললেই চলে।

কত বাড়ে : এক ইউনিট প্লাটিলেট দিলে বাড়ে ২০০০০; তাই প্লাটিলেট দিলে ৫+২০০০০ বা ১০+২০০০০ বা ১৫+২০০০০ হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। সংখ্যা প্রয়োজন মত বাড়ে না।

আতঙ্ক : ২০ হাজার বা তার নিচে হলে রোগী/আত্নীয়স্বজনের আতঙ্ক ছাড়া কিছু হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্লাটিলেট ৮/১০/১২ হাজার কিন্তু রক্তক্ষরণ নেই। কার্যকরী (active) প্লাটিলেট থাকার কারণে এটা হয়। রক্তক্ষরণ না থাকলে – প্লাটিলেট পরীক্ষার দরকার কি? বারবার করায় টেনশন বাড়ে। উপকার হয় না। আবার মেশিনে গুনলে ভুল হয় কারণ প্লাটিলেট ক্লাম্পে থাকায় মেশিন অনেকগুলোকে একসাথে একটা ধরে সংখ্যা নিরূপণ করে।

ব্লাড ফর ব্লাড : রক্তক্ষরণ হলে রক্ত দিতে হবে (ব্লাড ফর ব্লাড); প্লাটিলেট নয়। প্লাটিলেট দেওয়াও ঝামেলা। এক ইউনিটের জন্য চার জনকে ব্লাড দিতে হয়, খরচ ২৬০০.০০ টাকা। একজন থেকেও ইদানিং নেয়া যায় যেটা ব্যয়বহুল, সর্বত্র নেই।

হিসাব মতে, ডেঙ্গুর চিকিৎসায় প্লাটিলেটের দরকার নেই। বারবার প্লাটিলেট পরীক্ষা না করলেও চলে।

কিছুদিন আগে ড. ইউনূস বলেছিলেন দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠাবেন

দুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেশে কোন গরীব থাকবে না; উনি ভিক্ষুক, ভ্যাগাবন্ডদের কথাও বলেছেন। সম্প্রতি আমরা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছি।

প্রসঙ্গেক্রমে বলি- আমি কলেজে ভর্তির পর একদিন হলে ছাত্র ইউনিয়ন এসে বলল কমিউনিজম বলে দুটো বাচ্চা মানে দুটো মুখ অর্থাৎ সম্পদ দুভাগ হয়ে কমে গেল। কয়েকদিন পর শিবিরের লোক এসে বলল দুটো সন্তান মানে চারটা হাত, কর্মীর হাত; অর্থাৎ সম্পদ ডাবল হলো; বাড়ানোর ব্যবস্থা হলো।

Reality হল ষোল কোটি মানব সম্পদের বত্রিশ কোটি হাত কাজে লাগাতে পারলে অর্থনীতির যে কোন সংজ্ঞাই পূরণ করা সম্ভব। এটা তো প্রতীয়মান বৈশ্বিক দরকারে আমরা যেখানে যাই সফল হই, কারণ কিন্তু একটাই- সম্পদ মানব সম্পদ। সৌদিতে দেখেছি দোকান করতে বিদেশ থেকে লোক আনতে হয়, ভীষণ ঝামেলা খাজনার চেয়ে বেশি বাজনা। গার্মেন্টসে আমরা তরতর করে অগ্রবর্তী হচ্ছি। কারণ কিছুই নয়, সস্তায় কর্মীর হাত।

কিছুদিন আগে প্রথম আলোতে দেখলাম একজন সাক্ষাৎকারে বলেছেন জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ করেন নাই–

তাহলে

১। নিজের কানে শোনা ঐ কথাগুলো – প্রথমে নিজের নামে; পরে সংশোধন করে মহান নেতার নামে বললেন, সতেরো বছরের সতেজ কানে নিশ্চয়ই ভুল শুনিনি।

২। এতদিন জেনেছি সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাস করতে বলায় উনি উপরের অফিসারকে নিরস্ত্র করে গৃহবন্দি করেছিলেন!

৩। বঙ্গবন্ধু সর্বজনাব বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, খালেদ মোশারফ, তাহের ও অন্যান্য সহ উনাকে বীরউত্তম উপাধি দিয়েছিলেন।

সবই কি ভুল ছিল?

নিজের সাথে আমরা প্রতারণা করি সমস্যা নেই, sorry to say জাতির সাথে যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করি!

দেশ এগুচ্ছে জাতি নিঃসন্দেহে আরো আগাবে, দেখছেন না প্রাইমারী সমাপনীর মেয়ে তাসমীন কি নৈপুণ্যের সাথে চুল উড়িয়ে ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আনছে। দেখাই তো হলো বিপিএলে নবীনদের কুশলী খেলা!

পরবর্তী প্রজন্মের brain স্বচ্ছ থাকতে দিন বিপুল জনসম্পদের এই জাতির শ্রেষ্ঠত্ব পেতে সময় লাগবে না!

আমাদের ড. মুহাম্মদ ইউনূস

পৃথিবীতে সাতজন মাত্র ব্যক্তি আছেন যারা একসঙ্গে নোবেল, আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল এওয়ার্ড আর কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল এই তিনটি পুরস্কার পেয়েছেন।

এরা হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা, মারটিন লুথার কিং, মাদার তেরেসা প্রমুখ। আর সপ্তম ব্যক্তিটি হচ্ছেন আমাদের ড. মুহাম্মদ ইউনূস!

Fortune Magazine-এ সারা বিশ্বের টপ ১২ জন উদ্যোক্তার লিস্ট তৈরি করলেন, সেখানে বিল গেটস আছেন, স্টিভ Rem আছেন।

আর আছেন আমাদের ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

জানলে অবাক হবেন জাপানের সিনিয়র হাই স্কুলের ইংরেজি টেক্সট বইতে আমাদের ড. ইউনূসকে নিয়ে একটা চ্যাপ্টার আছে।

সব স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা ওনাকে চেনেন। আমরা যেমন ছোটবেলায় ফুটবলার পেলের গল্প পড়েছি, মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর গল্প পড়েছি- এমন।

একবার পত্রিকায় প্রফেসর ইউনূসের জাপানে আগমন বার্তা শুনে যোগাযোগ করলেন জাপানের ক্রাউন প্রিন্সেস মাসাকো সামার এ্যাসিস্ট্যান্ট।

মাসাকো সামার বাবা প্রফেসর হিসাশি অওয়াদা একসময় প্রফেসর ইউনূসের সাথে জাতিসঙ্ঘের বোর্ড মেম্বার ছিলেন।

নিজের বাবার কাছেই প্রফেসর ইউনূসের গল্প শুনেছিলেন। ক্রাউন প্রিন্স নারুহিতো প্রফেসর ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানালেন অন্দরমহলের একটা রাজ রুমে। যেখানে অনেক ভি.আই.পিদেরও অ্যাক্সেস নেই!

প্রয়াত লেখক হুমায়ন আহমেদ লিখেছিলেন, "অধ্যাপক ইউনূস যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন আমি নাটকের একটা ছোট্ট দল নিয়ে কাঠমান্ডুর হোটেল এভারেস্টে থাকি। হোটেলের লবিতে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ আমার ইউনিটের একজন চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। সে বলছে, – 'স্যার, আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি। স্যার, আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি।'

সে বলেনি অধ্যাপক ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সে বলেছে আমরা পেয়েছি। অধ্যাপক ইউনূসের এই অর্জন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্জন।

আমার মনে আছে, এই আনন্দ সংবাদ শোনার পর আমি শুটিং বাতিল করে উৎসবের আয়োজন করি। সেই উৎসবের শিখা আমি বুকের ভেতর এখনো জ্বালিয়ে রেখেছি।

দেশের বাইরে যখন সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে যাই, তখন আগের মতো হীনম্মন্যতায় ভুগি না। কারণ, এই সবুজ পাসপোর্ট অধ্যাপক ইউনূসও ব্যবহার করেন।

হুমায়ূন আহমেদ: অসাধারণ প্রতিভাধর বাঙালী

হুমায়ূন আহমেদ অসাধারণ প্রতিভাধর বাঙালী ১৯৭২ সালে নন্দিত নরক দিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। ২০১২ সালে ১৯ জুলাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩০০র বেশি – বছরে গড়ে ৮ টা!

নাটক, সিনেমা, গান এগুলোর কথা নাই বললাম। এসএসসিতে সবার মধ্যে ২য় স্থান অধিকারী অনন্য প্রতিভাধর এই লোকটি বলেছিলেন-

১। যে জিনিস চোখের সামনে থাকে তাকে আমরা ভুলে যাই। যে ভালবাসা সবসময় আমাদের ঘিরে রাখে তার কথা আমাদের মনে থাকে না...মনে থাকে হঠাৎ আসা ভালোবাসার কথা (জীবন থেকে নেয়া)?

২। পৃথিবীর সব মেয়েদের ভেতর অলৌকিক একটা ক্ষমতা থাকে। কোন পুরুষ তার প্রেমে পড়লে মেয়ে সংগে সংগে তা বুঝতে পারে। এই ক্ষমতা পুরুষের নেই। তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে কোন মেয়ে যদি বলে, শোনো আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। আমি মরে যাচ্ছি। তারপরেও পুরুষ মানুষ বোঝে না। সে ভাবে মেয়েটা বোধ হয় এপেন্ডিসাইটিসের ব্যাথায় মরে যাচ্ছে। (quest ..ur own life;guess reality!!)

আরও আছে ... (source বাংলা দেশ প্রতিদিন, পৃষ্ঠা ৫, জুলাই ১৯, ২০১৭।) to all fbf ভেবে বলুন 'বাকের আলী' কোন ধারাবাহিকের চরিত্র? যে চরিত্রে আসাদুজ্জামান অসাধারণ অভিনয় করে বিখ্যাত হয়েছেন, যেটার জন্য public রাস্তায় শ্লোগান দিয়েছিল!

এখন কোলকাতার "খোকা বাবু" কে আপন..., মিলন তিথি, কুসুম কলি আমরা অনেকেই সময় দিয়ে দেখি। অথচ বহুব্রীহি, অয়োময়, আজ রোববার, এই সব দিন রাত্রি অনেক আকর্ষণীয় ছিল, প্রোগ্রাম করে আমাদের দর্শকরা দেখতেন, মিস করলে আফসোসের অন্ত থাকত না। ধারণা জন্মেছিল নাটকে আমরা ওপার বাংলার চেয়ে শ্রেয়তর।

ইলিশ-তত্ত্ব

সম্রাট আকবর বাজালেন বাজনা,
পয়লা বৈশাখে দিতে হবে খাজনা।
কেউ বলে যাই চলে, কাল দেব আজ না,
খাজাঞ্চি বলে ভাই এটা ভাল কাজ না।
এসো প্রজা, খাও গজা, সন্দেশ মিষ্টি,
ক্ষণিকেই বেড়ে গেল আদায়ের লিস্টি।।

মহাজন দেখে ভাবে, কায়দাটা সেরকম!
আয় হবে বকেয়াটা, মিষ্টিতে ব্যয় কম।
সেই থেকে হালখাতা বৈশাখ পহেলায়,
যুগযুগ এই রীতি বাণিজ্যে বহে যায়।।

বড় কথা সেটা নয়, বলে সবজান্তা
ইলিশের সাথী হল কবে থেকে পান্তা!
নাকি পান্তার সাথী, হয়ে গেল ইলিশে!
দুজনে দুজনার থাকে মিলি-মিশি সে।

পান্তার দাম কত, ইলিশের মূল্য?
এই নিয়ে হাবু কাকা তর্কটা তুললো।
ইতিহাসে নেই যাহা বাঙালির কালচার,
ইলিশের মাছওয়ালা হেঁকে বলে মাল ছাড়।।

স্টার-কী-জলসা উড়ে আসে আকাশে,
ইলিশটা ঢুকে পড়ে, পেয়ে পথ ফাঁকা সে।
বুঁদ হয়ে চেয়ে থাকি, ঠেকাতে তো পারিনা,
ঋত্বিক রণবীর, দীপিকা কি কারিনা!!

তবে কেন পান্তা আর ইলিশে আপত্তি!
সংস্কৃতি-সম্ভারে যোগ এক রত্তি।
বৈশাখী উৎসবে রঙে-রূপে মাতিও
ইলিশকে ভালোবেসো, মাছটাতো জাতীয়।

ইসলামে স্ত্রী এবং গার্লফ্রেন্ড

- স্ত্রীর হাতের সাথে হাত মিলালে হাতের সগীরা গুনাহ মাফ হয়।
- স্ত্রীর চেহারার দিকে ভালোবাসা নিয়ে তাকালে চোখের সগীরা গুনাহ মাফ হয়।
- স্ত্রীর সাথে যখন স্বামী মিলিত হয় তখন সওয়াব হতে থাকে।
- স্ত্রীর সাথে যখন শীতের দিনে কম্বল গায়ে একসাথে শুয়ে থাকে তখনও সওয়াব হয়।
- স্ত্রীকে ভালোবেসে গান শুনানোর মধ্যেও সওয়াব হয়।
- স্ত্রীকে ভালোবেসে ফুল দেওয়ার মধ্যেও সওয়াব হয়।

(সুবহানাল্লাহ)

আর যদি গার্লফ্রেন্ডের (Girlfriend) হাত ধরেন হাতের যিনা, তাকালে চোখের

যিনা, তার জন্য খরচ করলে গুনাহ, তার সাথে মিলিত হলে গুনাহতো হবেই সাথে আঘাত করে হত্যারও হুকুম আছে, তাকে গান শুনালে গুনাহ, ফুল দিলেও গুনাহ।

এখন আপনিই ভাবেন কোনটি করবেন? স্ত্রীর জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করবেন নাকি এখনি প্রেম করে গুনাহের পাল্টাটা ভারী করবেন।

ইসলামটা কত সুন্দর। একই কাজের মধ্যে সওয়াব এবং গুনাহ। শুধু পার্থক্য একটি আল্লাহর আদেশ মত হালাল মেয়ে আরেকটি আল্লাহর নিষেধ অমান্য করা হারাম মেয়ে।

খুশি / অখুশি

যে মানুষের রাগ বেশি হয় সে মানুষকে ভালোওবাসে
তত বেশি তার মনও সাফ থাকে। (হজরত আলি রাঃ)

যদি তুমি সারা জীবনের মত কাউকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাও তাহলে তোমার মনে একটা কবর তৈরি করো যাতে তুমি তোমার বন্ধুর ভুলগুলো তোমার মনে দাফন করতে পারো।

(হজরত আলি রাঃ)

বন্ধু যতই খারাপ হোকনা কেনো তার সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট করো না
কেননা পানি যতই খারাপ হোক না কেন সে তৃষ্ণা
মিটাতে না পারলেও আগুন ঠিক নিভিয়ে দেবে।
(হজরত আলি রাঃ)

মানুষের মনে এমন ভাবে জায়গা করো মরে গেলেও সে যেন তোমার জন্য দোয়া করে, আর জীবিত থাকলে যেন দেখা করার আশা রাখে।

(হজরত আলি রঃ)

জীবনে কাউকে কোনদিন নিজের সবকিছু ভেবো না,

কেননা মানুষ যখন তোমায় ভালোবাসবে তখন তোমার সব ভুল আর খারাবি ভুলে যাবে আর যখন নফরত করবে তখন তোমার সব ভালো কাজ ভুলে যাবে।
(হজরত আলি রাঃ)

দুনিয়ার খুশি

১. মা আর বাপ
২. নেক ছেলে মেয়ে
৩. নেক বিবি
৪. ভালো বন্ধ

আখেরাতের খুশি

১. ইলম
২. পরহেজগারি
৩. সদকা
৪. নেক আমল

শরীরের খুশি

১. কম খাওয়া
২. কম শোওয়া
৩. কম কথা বলা
৪. কম হাসা

মনের খুশি

১. সবর
২. জিকির করা (তসবি করা)
৩. আল্লাহর শোকর আদায় করা
৪. গৌর আর ফিক্‌র করা

ইমানের খুশি

১. হায়া (লজ্জা)
২. পাক থাকা (সাফ সুতরা থাকা)
৩. সত্যের সাথে থাকা
৪. ইনসাফ করা

কিছু কিছু কথা যাতে আল্লাহ নারাজ হন

১. মেয়েদের গালাগালি দেওয়া
২. মনে কারো জন্য হিংসা রাখা
৩. ঘরে মেহমান দেখে নারাজ হওয়া
৪. আজানের সময় কথা বলা আর কাজ করা
৫. মা বাপের উপর কথা বলা
৬. দাঁড়িয়ে পানি পান করা।

কয়েকটা কথা যা জীবনে খুব ফায়দা দেবে

যদি খুশি পেতে চাও তাহলে সময়ে ইবাদত করো।
যদি মুখের রনক বাড়াতে চাও তাহলে তাহাজ্জুদ এর নামাজ পড়ো। যদি মনেতে সুকুন পেতে চাও তাহলে কুরআন পড়ো।

যদি শরীর সুস্থ পেতে চাও তাহলে রোজা রাখো।
যদি মুসিবত থেকে বাঁচতে চাও তাহলে এসতাগফার পড়ো। যদি ঘরে বরকত চাও তাহলে দরুদ শরিফ পড়ো।
যদি সব মুশকিল শেষ করতে চাও তাহলে 'লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়ো।
যদি দুঃখ থেকে নাজাত পেতে চাও তাহলে দোয়া চাও আল্লাহর কাছে।
আর যদি অনেক নেকি পেতে চাও তাহলে এই মেসেজটা অন্য সবাইকে পাঠাও। কেনোনা এটা হলো সদকায়ে জারিয়া।

Where there's a will, there's a way

১৯৭৪ সালের কথা।

ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক। কুখ্যাত বস্তিতে বাস করে ১৩ বছরের কিশোর মাইকেল। বর্ণবৈষম্য থেকে আমেরিকা পুরোপুরি বের হতে পারেনি তখনো, চাকরি পাওয়া দুষ্কর কালোদের জন্য। তার উপরে চার ভাইবোন, সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় মাইকেলের বাবাকে।

মাইকেল নিজেও তার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত, পড়াশোনা ভালো লাগে না একদম। সময় পেলেই তাই মাইকেল টিলার উপরে গিয়ে আনমনে সূর্যাস্ত দেখে, সূর্য ডোবার সময় কেমন যেন নীরব হয়ে যায় শহরটা, ভালো লাগে তার।

একদিন মাইকেলের বাবা তাকে একটা পুরনো টিশার্ট দিলেন। বললেন, সর্বোচ্চ কতো দাম হতে পারে এটার ? মাইকেল অনেক ভেবেচিন্তে উত্তর দিলো সর্বোচ্চ এক ডলার।

মাইকেলের বাবা তার কনিষ্ঠ পুত্রকে তখন একটা কাজ দিলেন চেষ্টা করো, কিভাবে এই টিশার্টটি দুই ডলারে বিক্রি করা যায়। আমার আর তোমার মার পক্ষে সংসার চালানো কষ্ট হয়ে যাচ্ছে খুব। অনেক সাহায্য হবে এই দুই ডলার পেলে।

মাইকেল বসে বসে ভাবতে লাগলো। তারপর মাইকেল পুরনো টিশার্টটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করলো, রোদে শুকালো। বাসায় ইস্ত্রি নেই, পুরনো কাপড়ের স্তূপে চাপা দিয়ে সমান করলো টিশার্টটা। তারপর, ছয় ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর, মাইকেল টিশার্টটা বিক্রি করতে পারলো পাতাল রেলের এক যাত্রীর কাছে, দুই ডলারে।

রেখে দাও – সহাস্যে বললেন মাইকেলের বাবা। ওটা তোমার উপার্জন। পরদিন সকালে মাইকেলের বাবা তাকে আর একটি পুরনো টিশার্ট এনে দিলেন। বললেন, এটা বিশ ডলারে বিক্রি করতে পারবে ? মাইকেল হেসে ফেললো এবার অসম্ভব, কে কিনবে বিশ ডলারে এই শার্ট ? বাবা বললেন, সম্ভব, চেষ্টা করে দেখো তুমি।

মাইকেল চিন্তায় বসলো কিভাবে এই ময়লা শার্টকে বিশ ডলারে বিক্রি করা যায়। আগেরবারের মতই সে শার্ট পরিষ্কার করলো, ইস্ত্রি করলো। তারপর তার মাথায় চমৎকার একটা বুদ্ধি আসলো।

মাইকেলের এক বন্ধু চমৎকার ছবি আঁকতো। মাইকেল আগের দুই ডলার দিয়ে রং আর তুলি কিনে, সেটা দিয়ে টিশার্টে বন্ধুকে দিয়ে মিকি মাউস এঁকে ফেললো। তারপর টিশার্ট নিয়ে ব্রুকলিনের ধনী শিশুদের এক কিন্ডারগার্টেনে বিক্রির চেষ্টা।

প্রায় সারাদিন চেষ্টার পর, এক অবস্থাসম্পন্ন শিশুর খুব পছন্দ হয়ে গেল টিশার্টটা। সে তার বাবার কাছে জিদ ধরলো সেটা কেনার জন্য। ভদ্রলোক বিশ ডলার দিয়ে শুধু কিনলেনই না, মাইকেলকে পাঁচ ডলার বখশিশও দিলেন।

২৫ ডলার !! মাইকেলের পরিবারের পুরো সপ্তাহের উপার্জন !!

তার পরদিন সকালে মাইকেলের বাবা মাইকেলকে আর একটা পুরনো টিশার্ট এনে দিলেন। বললেন, এবার চেষ্টা করো, ২০০ ডলারে এই টিশার্ট বিক্রি করার। মাইকেল কিন্তু এবার হাসলোনা। বরং টিশার্ট নিয়ে চিন্তা করতে বসলো কিভাবে এটাকে ২০০ ডলারে বিক্রি করা যায়।

আমেরিকায় তখন চার্লিস এঞ্জেলস মুভি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। মুভির বিখ্যাত অভিনেত্রী ফারাহ ফওলার সিনেমার প্রোমোশনের কাজে আসলেন নিউইয়র্কে। প্রেস কনফারেন্স শেষে জনস্রোত সামলে অভিনেত্রী যখন গ্রীনরুমে পৌছালেন, দেখলেন, সেখানে ১৩ বছর বয়সের একটি ফুটফুটে কালো কিশোর একটি টিশার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে।

ম্যাডাম, আমি আপনার একজন অন্ধভক্ত। আপনি কি আমাকে দয়াকরে একটি অটোগ্রাফ দেবেন, আমার এই টিশার্টে হেসে ফেললেন অভিনেত্রী, এমন সুন্দর শিশুকে না করার প্রশ্নই ওঠে না।

এর একসপ্তাহ পরে, ব্রুকলিনের নিলামঘরে দেখা গেল এক কালো কিশোরকে। সে মিস ফারাহ ফাওলারের নিজের হাতে অটোগ্রাফ দেয়া একটা টিশার্ট নিলাম করতে এসেছে।নিলাম শেষে টিশার্টটি ১২৫০ ডলার দিয়ে কিনে নিলেন এক ব্যবসায়ী।

সেদিন রাতে বাবার পাশে ঘুমাবার সময় মাইকেলের বাবা বললেন, মাইকেল, এই টিশার্ট বিক্রি থেকে তুমি কি শিখলে ? মাইকেল গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, "Where there's a will, there's a way." মাথা নাড়লেন মাইকেলের বাবা। দেখ, ছেলে, তুমি যা বলেছ, তা সত্যি। কিন্তু আমি তোমাকে শুধু এটাই শেখাতে চেয়েছিলাম যে, সামান্য পুরনো টিশার্টও অনেক টাকায় বিক্রি হতে পারে, যদি তুমি চাও। সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্ম দিয়েছেন এই বস্তিতে, এই অভাবের সংসারে,

তার মানে এই নয়, এখানে আমাদের সারা জীবন কাটাতে হবে। নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে একদিন আমরাও পারি সফল হতে। হতাশ হলে চলবেনা তোমার, মাইকেল; বরং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখতে শেখো। এই ঘটনার বিশবছর পরে ফোর্বস ম্যাগাজিন, বিশ্বের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী খেলোয়াড়টির একটি সাক্ষাৎকার নেয়। ভদ্রলোক বাস্কেটবলের জীবন্ত কিংবদন্তী, যার বাৎসরিক আয় ৪০ মিলিয়নের বেশি, নাইকিসহ হাজার হাজার ব্র্যান্ডে যার নাম। তিনি বিশ্বের প্রথম বিলিওনিয়ার খেলোয়াড়, বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ আফ্রিকান-আমেরিকান ধনকুবের। সাক্ষাৎকারে তাকে তার সাফল্যের রহস্য জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আবারও বলেন, "Where there's a will, there's a way."

ভদ্রলোকের নাম মাইকেল জর্ডান।

অনিবার্য পরিণতি আর-বাঁচার জন্য আত্মোপলব্ধি

আজ থেকে ১০০ বছর পর। ক্যালেন্ডারের পাতায় যখন ২১২১ সাল। আমাদের প্রায় প্রত্যেকের দেহ তখন মাটির নিচে। অস্তিত্ব তখন রূহের জগতে।

ইতিমধ্যে ফেলে যাওয়া আমাদের সুন্দর বাড়িটা হয়ত নেক্সট প্রজন্ম ভোগ করছে, পছন্দের কাপড়গুলো ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে, শখের গাড়িটি হয়ত অন্য কেউ চালাচ্ছে। আর আমায়? খুব কম জনই স্মরণে রেখেছে। কেউবা ভাবেও না। হাতে সময় নেই! যাদের জন্য সব করতে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছিলাম !

আচ্ছা, ব্যস্ততার এই জীবনে আপনি, আপনার দাদার দাদাকে কতবার স্মরণ করেন? আপনার দাদার দাদীর কথা কখনো কি আপনার মনে পড়ে ?

পৃথিবীর বুকে আজকের এই বেঁচে থাকা, এতো হৈ চৈ, এতো মায়াকান্না- এভাবেই চলেছে। গত হওয়া অসংখ্য প্রজন্মকে টপকে আমরা এই জীবন লাভ করেছি। তেমনিভাবে আগামীতে অসংখ্য প্রজন্মের ভিড়ে হারিয়ে যাবে এই জীবন।

যত প্রজন্ম আসছে আর যাচ্ছে, দুনিয়াকে বিদায় জানাবার, দায়িত্ব-ক্ষমতা অন্যের হাতে অর্পণ করবার, কিংবা কারো ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে যাবার পূর্বে-খুব কম জনই সময় পায় ফেলে যাওয়া জীবনটা একটু ফিরে দেখবার। বাস্তবতা হচ্ছে, এই জীবনটা আমাদের কল্পনার চেয়েও ছোট।

২১২১ সালে কবরে শুয়ে আমরা প্রায় সবাই এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবো, সত্যিই দুনিয়াটা কতই না তুচ্ছ ছিল! একে ঘিরে দেখা স্বপ্নগুলো কতই না নগণ্য ছিল!

ইসলামের জন্যে

২১২১ সালে আমরা অনেকেই চাইবো, ইস যদি জীবনটা মহৎ কিছুতে উৎসর্গ করতে পারতাম! ইসলামের জন্যে! নেক আমল সংগ্রহের জন্য আরও কিছু করতে পারতাম! মৃত্যুর পরেও যে কাজগুলো আমাদের উপকার করে যেত, সেগুলোর পেছনে যদি আরও সময় উৎসর্গ করতে পারতাম ! ইস! শুধু ইস আর ইস!!

যারা ইসলামের আলোকে জীবন পরিচালিত করেনি তারা চিৎকার করে কথাগুলো বলবে, কিন্তু কোনো ফল বয়ে আনবে না, এই হাহাকার :

"হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতাম"। [সূরা আহযাব, আয়াত : ৬৬]

"হায়! আমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম, তা হলে বিরাট সফলতা লাভ করতে পারতাম।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৭৩]

"হায়! আমি যদি ওকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।" [সূরা ফুরকান, আয়াত : ২৮]

"হায়! এমন যদি কোনো সুরত হতো – আমাদেরকে আবার দুনিয়াতে পাঠানো হতো, আমরা আমাদের প্রভুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করতাম আর আমরা হতাম ঈমানদারদের শামিল।" [সূরা আনআম, আয়াত : ২৭]

" ... হে আমার রব! আমাকে আবার ফেরৎ পাঠান। যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি। [বরং জবাব মিলবে] না, এটা হবার নয়। এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র যা সে বলবেই। তাদের সামনে বার্যাখ থাকবে উত্থান দিন পর্যন্ত।" [আল-মু'মিনুন, ৯৯-১০০]

মৃত্যুর পর অনেকেই আফসোসে নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এই বলে, "হায়! আমি যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম।" [সূরা ফুরকান, আয়াত : ২৭]

"হায় ! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম ?" [সূরা আল-ফাজর, ২৪]

ভাই!! মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদেরকে নেককার হবার সময় দেবে না।

বোন!! সে অপেক্ষা করবে না আমাদের জন্য ...

তাই আসুন না, মৃত্যুর ফেরেশতা আসার আগেই আমরা সংশোধন হয়ে যাই ! পাপে ভরা জীবনটা পাল্টে ফেলি ! Try it Please !!

হে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

ইসলামিক বিধান

ইসলামিক দেশগুলো কতখানি ইসলামিক এই নিয়ে গবেষণা করেন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হুসেন আসকারী।

ইসলাম ধর্মে রাষ্ট্র ও সমাজ চলার যে বিধান দেয়া হয়েছে তা যে দেশগুলো প্রতিদিনের জীবনে মেনে চলে তা খুঁজতে যেয়ে দেখা গেলো, যারা সত্যিকারভাবে ইসলামিক বিধানে চলে তারা কেউ বিশ্বাসী মুসলিম দেশ নয়।

স্টাডিতে দেখা গেছে সবচেয়ে ইসলামিক বিধান মেনে চলা দেশ হচ্ছে নিউজিল্যান্ড এবং দ্বিতীয় অবস্থানে লুক্সেমবার্গ। তারপর এসেছে পর্যায়ক্রমে আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক ষষ্ঠ ও কানাডা সপ্তম অবস্থানে।

মালয়েশিয়া ৩৮তম, কুয়েত ৪৮তম, বাহরাইন ৬৪তম, এবং অবাক করা কাণ্ড সৌদি আরব ১৩১তম অবস্থানে। গ্লোবাল ইকোনমি জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় বাংলাদেশের অবস্থান সৌদিদেরও নীচে।

গবেষণায় দেখা গেছে, মুসলমানরা নামাজ, রোজা, সুন্নাহ, কুরআন, হাদিস, হিজাব, দাড়ি, লেবাস নিয়ে অতি সতর্ক কিন্তু রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে ইসলামের আইন মেনে চলে না।

মুসলমানরা পৃথিবীর সবার চেয়ে বেশি ধর্মীয় বয়ান, ওয়াজ নসিহত শোনে- কিন্তু কোন মুসলিম দেশ পৃথিবীর সেরা রাষ্ট্র হতে পারেনি। অথচ গত ষাট বছরে মুসলমানরা অন্ততঃ ৩০০০ বার জুমার খুতবা শুনেছে।

একজন বিধর্মী চাইনিজ ব্যবসায়ী বলেছেন, মুসলমান ব্যবসায়ীরা আমাদের কাছে এসে দুই নম্বর নকল জিনিস বানানোর অর্ডার দিয়ে বলে, অমুক বিখ্যাত কোম্পানির লেবেল লাগাবেন।

পরে যখন তাদেরকে বলি আমাদের সাথে খানা খান, তখন তাঁরা বলেন, হালাল না, তাই খাবো না। তাহলে নকল মাল বিক্রি করা কি হালাল ?

একজন জাপানি নব্য মুসলিম বলেছেন, আমি পশ্চিমা দেশগুলোতে অমুসলিমদের ইসলামের বিধান পালন করতে দেখি, আর পূর্বের দেশগুলোতে ইসলাম দেখি কিন্তু কোন মুসলিম দেখি না।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি আগেই ইসলাম এবং মুসলমানদের পার্থক্য বুঝেই আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করেছি।

ইসলাম ধর্ম শুধু নামাজ রোজা নয়, এটি একটি জীবন বিধান এবং অন্যের সাথে মোয়ামালাত আর মোয়াশারাতের বিষয়।

একজন নামাজ রোজা পড়া আর কপালে দাগওয়ালা মানুষও আল্লাহর চোখে একজন মোনাফেক হতে পারে।

নবী [স:] বলেছেন, "আসল সর্বহারা আর রিক্ত মানুষ হচ্ছে তারা, যারা কেয়ামতের দিন রোজা, নামাজ, অনেক হজ্জ, দান খয়রাত নিয়ে হাজির হবে।"

কিন্তু দুর্নীতি করে সম্পদ দখল, অন্যদের হক না দেয়া, মানুষের উপর অত্যাচারের কারণে রিক্ত হস্তে জাহান্নামে যাবে।

ইসলামের দুটি অংশ, একটি হচ্ছে বিশ্বাসের প্রকাশ্য ঘোষণা যাকে 'ঈমান' বলা হয়।

আর একটি হচ্ছে বিশ্বাসের অন্তর্গত বিষয় যাকে 'এহসান' বলা হয়।

যা ন্যায়সঙ্গতভাবে সঠিক সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

দুটোকে একত্রে প্র্যাকটিস না করলে ইসলাম অসম্পূর্ণ থেকে যায় যা প্রতিটি নামের মুসলমান দেশে হচ্ছে।

ধর্মীয় বিধি নিষেধ মানা যার যার ব্যক্তিগত দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং এটি আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয়। কিন্তু সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলা একজন বান্দার সাথে অন্য বান্দার মধ্যকার বিষয়।

অন্য কথায় ইসলামিক নীতিমালা যদি মুসলমানরা নিজেদের জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগ না করে, মুসলিম সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে যাবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ হবে অসম্মানজনক।

জর্জ বার্নার্ড শ একবার বলেছিলেন, ইসলাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মুসলমানরা হচ্ছে সর্ব নিকৃষ্ট অনুসারী।
Stay Well.

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ডাক্তার আফজালুন্নেসার স্মৃতিতে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনার

তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কে ১০ ব্যাচের ছাত্রী ছিলেন।
তিনি লিখেছেন, ১৯৫২ সালে আমি ছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। আমাদের ব্যাচে তখন মাত্র দুইজন মেয়ে শিক্ষার্থী পড়তো। একজন আমি, আরেকজন ডা. জাহানারা রাব্বী (শহীদ ডা. ফজলে রাব্বীর স্ত্রী)। সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম আমি, যা আমাদের দেশের ইতিহাস চিরদিনের মতো বদলে দিয়েছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আগের দিন রাতেই ছাত্রনেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ১৪৪ ধারা ভেঙে আন্দোলন হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ছেলেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মিছিলে বের হয়। প্রায়ই পুলিশের সাথে ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধছিল। আমাদের মেয়েদের হল থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম পুলিশের সাথে ছাত্রদের ইট পাটকেল ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ। বিকেল ৩টার সময় হঠাৎ গুলির শব্দ পেয়ে দৌড়ে বারান্দায় আসি। দেখি মানুষজন ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে পালাচ্ছে। এতক্ষণ আন্দোলনকারীদের যেই উত্তাল গর্জনে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হচ্ছিল, হঠাৎ করেই যেন তা শ্মশানের মত নীরব হয়ে গেল। বিকেল চারটার দিকে দেখলাম, এক সাদা শাড়ি পরা বিধবা বৃদ্ধা আর একজন অল্পবয়সী মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ডিসেকশন হলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। হল থেকে কয়েকজন মেয়ে মিলে গেলাম ডিসেকশন হলের পেছনে। সেখানে দেখলাম, স্ট্রেচারে তিনটি লাশ রাখা। তখন লাশগুলোর পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি, পরে শুনেছিলাম সেখানে শহীদ সালাম আর শহীদ বরকতের লাশ ছিল।

২২শে ফেরুয়ারি থেকে পুরো দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বাঙালি তখন একটাই কথা জানে, একটাই কথা বুঝে আর একটাই কথা বলে- "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। " ২৩ তারিখে মেডিকেলের শিক্ষার্থীরা সিদ্ধান্ত নিল, শহিদদের স্মৃতি ধরে রাখতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। স্তম্ভটির নকশার দায়িত্ব দেয়া হল আমার স্বামী ডা. বদরুল আলমের উপর, তিনি তখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি নকশা তৈরি করে দিলেন। ২৩ তারিখ রাতেই ডিএমসির প্রায় তিনশ' ছাত্র-ছাত্রী স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির কাজে লেগে গেল। কারফিউয়ের মধ্যেও সবকিছু তুচ্ছ করে আমরা নেমে পড়েছিলাম। নির্মাণাধীন কলেজ বিল্ডিংয়ের গুদাম থেকে ইট, বালু, সিমেন্ট জোগাড় করা হলো। স্ট্রেচারে করে ইট, বালু নিয়ে এসেছিলাম, বালতি ভরে পানি এনেছিলাম। সারা রাত কাজ করে ভোর পাঁচটার দিকে তৈরি হল দেশের প্রথম শহীদ মিনার।

এখন যেখানে আউটডোর বিল্ডিংয়ের সামনের ডিস্পেন্সারী স্টোর, সেখানেই ছিল প্রথম শহীদ মিনার, আমাদের মেয়েদের হল থেকে মাত্র দুইশ গজ দূরে। মিনারটির চারদিকে লাল সালু দিয়ে ঘেরা আর দুটি পোস্টার লাগানো ছিল তাতে। একটিতে লেখা স্মৃতিস্তম্ভ, আরেকটিতে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" পরদিন সকাল থেকেই সেখানে মানুষের ঢল নামে। স্তম্ভটি উদ্বোধন করেন শহীদ সফিউর রহমানের পিতা। সবাই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল।

আমার এখনো মনে আছে, এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মা এসেছিলেন। উনি ওনার গলা থেকে সোনার চেন খুলে দিলেন।

২৬ তারিখ সকালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ট্রাক এসে আমাদের ক্যাম্পাস ঘিরে ফেললো। তারা এসেছিল শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলতে। দড়ি দিয়ে স্তম্ভটি বেঁধে

১০-১২ জন মিলে টেনে উপড়ে ফেললো। তারপর ট্রাকে তুলে নিয়ে চলে গেলো। সেই ফাঁকা জায়গাটিতে আমরা বাঁশের কঞ্চি গেঁথে কালো কাপড়ের নিশান লাগিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলাম। দুই বছর পরে, ১৯৫৪ সালের ২১শে ফেরুয়ারি পুলিশ এসে আবার আমাদের ক্যাম্পাস ঘিরে ফেললে ডিএমসির মেয়েরা প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেই। হলের গেট বন্ধ করে ছাদ থেকে আমরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকি, এতে কয়েকজন আহত হয়। তালা ভেঙে পুলিশ আমাদের হলে ঢুকে ১৫ জনের মত ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে। ধরে নিয়ে যাবার সময় আমরা চিৎকার করে শ্লোগান দিতে থাকি-রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমাদের রাখা হয়েছিল সেন্ট্রাল জেলে, দিন পনের পর পুলিশ আমাদের ছেড়ে দেয়।

শহীদ মিনার তৈরির সেই অবিস্মরণীয় রাতের কথা এখন ৬৬ বছরের অতীত। অথচ সেই রাতের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখনো মানসপটে জ্বলজ্বল করে।

কি প্রবল দেশপ্রেমেই না আমরা তখন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। মাত্র এক রাতে আমরা এমন এক স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করি যা ভবিষ্যতে আমাদের সকল আন্দোলনের পীঠস্থান হয়ে থাকবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণ থেকে যেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা একদিন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে যার ফলাফল হলো আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন - স্বাধীনতা।"

আমরা অনেকেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রমজানের কথা জানি না হয়তো

রমজান মাসে রোজা রাখার বিধানের আদেশ হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করার দ্বিতীয় বছর। শাবান মাসে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন পরের মাসে রোজা রাখতে হবে। মদিনার অবস্থা তখন একদম ভাল নয়।

আওস আর খাজরাজ – এই দুই গোত্রের বাস ছিল মদিনায়। ইসলাম আসার পর তাদের বহুবছরের গৃহযুদ্ধ থেমেছে মাত্র। কিন্তু এই গৃহযুদ্ধে ধ্বংস প্রায় অর্থনীতি। তার উপর মক্কা থেকে হিজরত করে আসা একদম নিঃস্ব মুসলিমদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে মদিনার। ভয়ংকর অনিশ্চিত একটা সময়। তার উপর মক্কার শক্তিশালী এবং সম্পদশালী কুরাইশদের হুমকি। এই অবস্থাতেই মুসলিমদের জীবনের প্রথম সিয়াম সাধনার রমজান আসলো। সেই রমজানেই সংঘটিত হল কুরাইশদের সাথে প্রথম যুদ্ধ – বদরের যুদ্ধ। ইসলামের প্রথম রমজানও ছিল এক ভীষণ রকম সংগ্রামের মাস – অর্থনৈতিক দুর্যোগ, নতুন একটা জাতির অনিশ্চিত যাত্রা, আর এক প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধ।

হাজার বছরের পরিক্রমায় আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম রমজানের সত্যিকার স্পিরিট। রমজান ইফতার পার্টি আর উৎসবের মাস তো নয়। এই মাস আল্লাহ

নৈকট্য অর্জনের মাস, যেন আমরা মুত্তাকি হতে পারি। রমজান কুরআনের মাস। আল্লাহ এভাবেই রমজানের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন।

তাই এই দুর্যোগ একজন মুসলিমের জন্য আশীর্বাদ। হারিয়ে যাওয়া রমজানকে খুঁজে পাওয়ার এক অসাধারণ সুযোগ। সেই প্রথম রমজানের মুসলিমদের মত পরিমিত খাওয়া, সাধারণ জীবন, আর শুধুই ইবাদতের মাস রমজান। অফিসের ব্যস্ততা নেই, শপিং আর ইফতার পার্টির চাপ নেই, সামাজিকতার বাহুল্য নেই। শুধুই আছে প্রশান্ত চিত্তে মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে হারিয়ে যাওয়া যোগাযোগ নতুন করে তৈরি করার সুযোগ। সেই প্রথম রমজানের মত ভয়ংকর অনিশ্চিত সময়ে আল্লাহর রহমতে শান্তি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ।

দ্বিতীয় হিজরীর সেই প্রথম রমজানের মত আসুন এই রমজানকে আমাদের তাকওয়া অর্জনের উপলক্ষ বানিয়ে ফেলি।

আমার একান্ত কথা ...

কেবলমাত্র বন্ধু-সুহৃদদের জন্য

এ কেমন জীবন শুরু হলো আমাদের ঘরে ঘরে। ছেলে-মেয়েরা বেশির ভাগই বাইরে চলে যাচ্ছে higher study-র জন্য। পরিণতি হয়তো বা বিদেশেই settled হয়ে যাবে। যাকেই প্রশ্ন করি সঠিক উত্তর কারো জানা নেই। একে অন্যের ছেলে-মেয়েদের উদাহরণ টানেন। বিশেষ করে যাদের সন্তানেরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করেছে তাদের কণ্ঠে অভিন্ন সুর।

আমিও ব্যতিক্রম নই। আমার ছেলে ইমাদ Monash University থেকে Engineering শেষ করে এখন Sydney-তে চাকরি করছে। আমরা ছেলেটিকে বিদেশ পাঠিয়ে প্রায় প্রতিদিন নীরবে চোখ মুছি। ভাল কোন কিছু রান্না হলে ওর জন্য মনটা হাহাকার করে। কোন উৎসবে আজ আর আমার ছেলেটিকে পাশে পাই না। দিন দিন কি আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আদরের মানুষটিকে হারিয়ে ফেলছি। কাজের শত ব্যস্ততায় হয়তোবা কখনো ইমাদকে ভুলেই যাই।

যদি অন্যভাবে বলি। ইমাদ কি তার শৈশব-কৈশোরের খেলার একমাত্র সাথী প্রাণপ্রিয় বোনটিকে ভুলে যাচ্ছে? আমাদের বুকভরা ভালোবাসা, মায়ের হাতের অমৃত স্বাদের পছন্দের খাবারের কথা নিশ্চয়ই তার মনে পড়ে। অসুখে বিসুখে মায়ের হাতের নরম ছোঁয়া। জায়নামাজে বসে থাকা মায়ের দোয়া তার চোখকেও নিশ্চিত ঝাপসা করে। তা হলে কিসের আশায় কেন আজ তাকে বিদেশে থাকতে হবে।

আমাদেরও বয়স হয়েছে। জীবন তো থেমে নেই। ভালো মন্দ শরীর নিয়ে আমরাও এগিয়ে চলেছি বাস্তবের শেষ ঠিকানায়। ঠিক এই সময়টাতেই তো আমরা চাই

ছেলে-পিলে নিয়ে বাকি জীবনটা একসাথে কাটাব। সবাই সাথে থাকবে। পাশে থাকবে। কিন্তু এ আমরা কোথায় চলেছি।

আমাদের চেয়ে যারা বয়সে কিছুটা বড়, তাদের ঘরে ঘরে চলছে হাহাকার। ছেলে-মেয়েরা সবাই বিদেশে। বড় চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী। অনেক অনেক টাকা। বিশাল বাড়ি। দামি গাড়ি। কিন্তু বাবা-মাকে দেখার জন্য দেশে কেউ নেই। আছে, দেখভালের জন্য টাকায় কেনা লোক আছে। যাদের কাছে এরা খালাম্মা আর খালুজান। জীবনের শেষ মুহূর্তে এরাই তাঁদের মুখে পানি দেন।

জন্মের পর থেকে যে শিশুদেরকে সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে, নিজের জীবনের সমস্ত সুখ আহলাদ বিসর্জন দিয়েও সেই মা জীবনের শেষ ক্ষণটাতে প্রবাসী ছেলে-মেয়েদের কাছে পান না। জীবন তো একটাই। তাহলে কিসের মোহে আমরা কি করছি। অনেকে বলেন 'ওদের ভবিষ্যত কেন আমরা নষ্ট করবো-ওরা বিদেশে settled করুক'।

আসলে ওরা সবাই কি তা চায়? ওদের কি মা-বাবা ভাই বোনদের সাথে থাকতে ইচ্ছা করে না? আমরা কি ওদের জন্য বাসযোগ্য একটি দেশ দিতে পেরেছি?

দেশের অবস্থা কি ওদের জন্য খুব নিরাপদ? দেশে কি ওদের মেধা, যোগ্যতার দাম নিশ্চিত? ওদের নিরাপদ চলাফেরা আর স্বাভাবিক জীবন যাপনের নিরাপত্তা কি নিশ্চিত?

যদি তাই না হয়, তবে ওরা কোন পথ বেছে নিবে। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা খেয়ে পরে ভালই আছেন। এমন কি ঘর বাড়ি সম্পদও কম নেই। যা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের দিব্যি চলে যাবে। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থা কি স্বাভাবিক নিরাপত্তা দিতে পারছে?

তাই যারা পারছেন তারা সন্তানদের বিদেশ পাঠাচ্ছেন। এটা এখন ক্রেজ। অন্যভাবে স্ট্যাটাস। আর আমরা পরেছি দোটানায়।

এই মসজিদ, মন্দির কি অপূর্ব জায়গা?

- এখানে গরীব মানুষ বাইরে মানুষের কাছে ভিক্ষা চায়!!
- আর ধনী ব্যক্তি ভিতরে প্রভুর কাছে ভিক্ষা চায়!!!
  বিচিত্র এই দুনিয়ার কঠিন সত্য!!
- বরযাত্রার সময় বর সবার পিছনে থাকে ... আর সমস্ত মানুষ আগে আগে যায়!!
- কবরযাত্রায় মৃতদেহ সবার আগে থাকে! আর মানুষজন পিছনে!!
- সমস্ত দুনিয়া সুখের দিনে আগে থাকে আর দুঃখের দিনে পিছনে!!
- মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃত মানুষকে স্মরণ করা হয়!!

- মোমবাতি নিভিয়ে জন্মদিন পালন করা হয়!!
- সারাটা জীবন বোঝা বইলো দেওয়ালের পেরেকটা!
- আর মানুষ সুনাম করল পেরেকে টাঙানো ছবিটার!!
- অপূর্ব তুমি স্রষ্টা! আর অদ্ভুত তোমার লীলা!!
- যে নুনের মতো তিতকুটে জ্ঞান দেয়, সেই আসল বন্ধু হয়!!
- মিষ্টি কথার আড়ালে থাকে চতুর অভিসন্ধির ভয়!!
- ইতিহাস সাক্ষী আছে আজ পর্যন্ত নুনে কখনোই পোকা ধরেনি!!
- আর মিষ্টিতে তো প্রতিদিনই পোকা ! পিঁপড়েরাও ছাড়েনি!!
  সঠিক পথে মানুষ চলতেই চায় না ! আর বাঁকা পথে সবাই যেতে চায়!!
- এই কারণেই মদ বিক্রেতাকে কোথাও যেতে হয় না!
- দুধ বিক্রেতাকে লোকের দরজায় দরজায় যেতে হয়!!
- দুধ বিক্রেতাকে সর্বদা বলি জল মেশান – নিত??
- আর মদে নিজ হাতে জল মিশিয়ে খাই!!
- একই গ্রন্থাগারে গীতা আর কুরআন একসাথে থাকে!!
- গীতা আর কুরআন নিজেদের মধ্যে কখনোই লড়াই করে না!!
- যারা এদের নিয়ে লড়াই করে ? তারা গীতা আর কুরআন কোনদিনও পড়ে না!!
- আজ পর্যন্ত মানুষকে এইটুকুই বুঝলাম!
- জানোয়ার বললে ক্ষেপে যায়!
- তাকে সিংহ বললে খুশি হয়!!!

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চাকরি করার সময়

একবার স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের সভাপতির বউয়ের প্রেশার মাপার জন্য ডিউটি আওয়ারে তার বাসায় যেতে হয়েছিল। কোন সিম্পটম নেই, এমনি তার মন চেয়েছিল প্রেশারটা একটু চেক করাবে। আমি বাংলাদেশ সরকারের ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার, বগলে প্রেশার মাপার মেশিন নিয়ে তার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলাম।

আজকে আর আমি নামকাওয়াস্তে ফাস্ট ক্লাস অফিসার না, সত্যি সত্যি ফাস্ট ক্লাস চাকরি করি। গলায় NHS এর আইডি কার্ড দেখলে আশেপাশের মানুষের চোখে স্পষ্ট সমীহ দেখতে পাই। এর জন্যে অবশ্য আমাকে শিকড় ছেড়ে আসতে হয়েছে। এই সাহস সবার হয় না, আমারও ছিল না। স্ত্রী যদি আমাকে ফুল সাপোর্ট না দিত। তবে আমিও আজকে বাংলাদেশের রাস্তায় কোন পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ক্যাবলা মার্কা হাসি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, আর কেন ‘মুভমেন্ট পাস’ ছাড়াই আমাকে হাসপাতালে যেতে দেয়া উচিৎ সেটা ‘তাহাদিগকে’ বুঝানোর চেষ্টা করতে গিয়ে গলদঘর্ম হতাম।

আপনাদের হৃদয়ে অসুখ হলে ভারতের দেবী শেঠি লাগে, নিজের দেশের মানুষের টাকায় নিজেদের নদীতে ব্রিজ বানাতে চীন-জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনা লাগে। এই আপনারাই আবার আফসোস করেন, আহারে দেশের মেধাবীরা সব বিদেশমুখী! আর যারা দেশে থাকে, তারা গবেষণা বাদ দিয়ে নীলক্ষেত থেকে চটি বই কিনে বিসিএসের নেশায় মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্টের নাম মুখস্থ করে।

করবে না? এছাড়া আর কোন উপায় খোলা রেখেছেন তাদের সামনে? 'পাওয়ার অ্যাবিউজ' এর ক্ষেত্রে দুনিয়ার বুকে একদম প্রথম সারিতে থাকা বাংলাদেশে-

এক কালে গাঁজা খেয়ে টেম্পুর হেলপারি করা, আজকের রাজনৈতিক পাতি নেতা; মন চাইলেই হাসপাতালে ঢুকে ডাক্তারকে চড়-থাপ্পড় লাগিয়ে শিষ দিতে দিতে চলে যায়। ঘুষ দিয়ে বাগে আনতে না পেরে ইঞ্জিনিয়ারকে মেরে তার লাশটা ডোবায় ফেলে দিয়ে যায়। স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের একটা সময়ে একজন চিকিৎসককে তার কর্মস্থলে যাবার পথে রিক্সা থেকে নামিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে বলে যখন কোন পুলিশের হাবিলদার, তখন আপনি বা আপনাদের তৈরি রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাদেরকে কি বার্তা দিচ্ছেন, বলুন তো?

এই আপনারাই আবার কোন মুখে বলেন 'হায় হায়! সব মেধা পাচার হয়ে গেল?' এতো হিপোক্রেট কেন আপনারা?

দেশে নাকি আজ ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে!

ফেলে আসা বন্ধুদের ফেসবুক পোস্ট দেখে জেনেছি, বসে বসে বৃষ্টির ছবি দেখছি।

ঝুম বৃষ্টি আমার খুব প্রিয়। প্রখর রোদের পরে প্রথম বৃষ্টি হলে মাটির যে সোঁদা গন্ধ ছড়ায় সে গন্ধে আমার ঘোর লেগে আসে। কালবৈশাখী ঝড়ের পরে দক্ষিণের আমগাছগুলোর নিচে কাদায় পা ডুবিয়ে আম কুড়ানোর স্মৃতি আমার হৃদয়ের একদম গহীনে অনেক যতনে আগলে রাখা সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি। জীবনে আর কোনোদিন হয়তো সেই মুহূর্তগুলো ফিরে আসবে না! এটা ভাবতে গেলেই গলার মাঝে কেমন একটা দলা পাকিয়ে আসে।

সৎ থেকে, সম্মানের সাথে, একটু ভাল ভাবে বাঁচতে চাওয়া মানুষগুলোর জন্যে দেশটাকে যারা নরক বানিয়ে রেখেছেন; হাজার হাজার মাইল দূরে, বিলেতের এক ছোট্ট শহরে বসে আমি আপনাদের আজ অভিশাপ দিচ্ছি।

কি ভাবছি

রাত দেড়টা। শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসলো ঢাকার সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাইভেট কার্ডিয়াক হাসপাতালে। EMO দেখলো SPO2 ৪০%. বললেন COVID Pneumonia হতে পারে। এখানে COVID Pneumonia চিকিৎসা হয় না।

পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে যান। একই সড়কে ৫মিনিটের রাস্তা, এই হাসপাতালটির নাম টেলিভিশনের scrolling এ আসে, IEDCR বলে এরা করোনা চিকিৎসা করে; but বাস্তবে they we're denied. এরপর পার্শ্ববর্তী আরেকটি বিখ্যাত হাসপাতাল ঘুরে আত্মীয়-স্বজনের কাছে informed হয়ে they went DMCH initial evaluation I preliminary চিকিৎসা চলার সময় He expired.

বিড়ম্বনা-১

(ক) এত নামকরা হাসপাতাল এত বিখ্যাত ডাক্তার এ দামি যন্ত্রপাতি থেকে লাভ হলো কি? যদি একজন শ্বাসকষ্টের রোগী একটু অক্সিজেন না পেল?

(খ) এই রোগী করোনা হলেও prone position (উপুড় হয়ে শোয়া) ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা -এই কথাটা কেউ বললো না। টেলিভিশনে এত ad এত টক শো- এ কথাটা কেন বলা হচ্ছে না! আত্মীয়-স্বজন, আমজনতা, প্রাইমারি ফিজিশিয়ানকে জানাতে হবে।

(গ) Triage (করোনা কর্নার) নিয়ে seminar হলে ও মনে হচ্ছে সব হাসপাতাল বিশেষ করে private হসপিটলগুলো ওয়াকিবহাল নয়- কোন dynamic owner national technical committeeতে আছে কি?/minutes তাদের কাছে গেলে হয়। সব হাসপাতালেরই isolation corner থাকা উচিত যেখানে suspected case রাখা যাবে যেখানে থাকবে অক্সিজেন, ECG machine আর ট্রেইনড attendant (muktopath.govt.bd বিনে পয়সায় ট্রেনিং দিচ্ছে।) আর পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্ট, ডায়াগনোসিস।

বিড়ম্বনা-২

Cause of death-বাড়ীর লোক, আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার লোক কি করবে equarantines, isolation, lockdown?? আর দাফন কাফন! এজন্যে ত্বরিত diagnosis ও দরকার আমরা

১। এবোট কো. এর অটোমেটিক আই সো থারমিক RNA টেস্ট খুঁজতে পারি- ট্রাম্প সাহেব 5 min এ পজিটিভ পান।

২। Cephid এর জিন এক্সপার্ট নিতে পারি।

৩। আঙ্গুলের মাথার এক ড্রপ রক্ত দিয়ে আধা ঘণ্টার রেজাল্ট নিতে পারি।

১৩ তলার মুগদা হাসপাতালের প্রচার দরকার যেখানে আছে inbuilt ICU CCU, dialysis centre. Doctor stuff কম থাকলেও তাদের সামর্থ্য dedication তুলনাতীত; ঢাকা মেডিকেল COVID hospital- এটা ও জনগণকে জানাতে হবে।

করোনা বিপত্তি

মাস্কমহিমা-হাসপাতাল মার্কেটিং কাজ করে কায়েস। জিজ্ঞেস করলাম করোনার ব্যাপারে অনুভূতি কি। এর আগে সে আরেকটি বড় হাসপাতালে কাজ করেছে ভরা করোনার মৌসুমে। করোনা নিয়ে ভর্তি ছিল দুই সপ্তাহ। ভ্যাকসিন তিন ডোজ সম্পূর্ণ করেছে। তার ধারনা ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া ছিল করোনা ছিল আছে থাকবে এর মধ্যে কাজ কর্ম করে যেতে হব। লিফটে তিনজনের একজনের পকেটে মাস্ক সে বললো কিছু জায়গায় বাধ্য বাধকতা থাকাতে সাথে রাখে। হাসপাতালের কাজে মাস্ক পরা অত্যাবশ্যক বলে তার মত। ভীত সে নয় সন্ত্রস্ত তো নয়ই। হলে মারাত্মক হবে না;এটা দারুনভাবে বিশ্বাস করে; সবাইকে করা উচিত বলে মনে করে। আড়াই বছর পর ল্যাব এইড কার্ডিয়াকে ভর্তি রোগী দেখতে গেলাম, কাস্টমার কেয়ারকে জিজ্ঞেস করলে বললো কার্ডিয়াকে কোন করোনা নাই। রোগীর ফাইল খুলেই দেখি স্পষ্ট লেখা COVID-19 পজিটিভ; ভাগ্যিস মাস্ক পরা ছিল! বিএমএ মার্কেটের নীচতলায় মাগরিবের নামাজে দেখলাম সামনে পিছনে ডানে বায়ে সমগ্র জামাতে আমি ছাড়া ৬০ জনের জামাতে কারো মাস্ক নাই। কানাডা থেকে ফেরার পথে ছেলে সাথে থাকা মাস্ক গুলো রেখে দিল। সে সরাসরি রোগীর সংস্পর্শে আসে মাস্ক পড়ে। তার মতে করোনাকে তুড়ি মারার সময় আসে নাই বিশেষ করে কবে, কখন, কোন ভ্যারিয়েন্ট আসে ইয়ত্তা নাই। N95 best; হাসপাতালের কাজ যারা করে তাদের জন্য। আসলে মাস্ক ,ভ্যাক্সিনেশন, শেলফ ডিসটান্সিং হ্যন্ড সানিটাইজেশন কোনটাই ১০০% প্রোটেক্ট করেনা। তবে এগুলোর বিকল্প নাই। আমি প্রায় দু বছর চেম্বার করিনি। virtual ছাড়া actual meeting CME তে যাই নাই। চেম্বার গ্লাস শিল্ড দিয়ে partition দেয়া।

আমি N95 KN 95 সব পড়েছি, পড়েছি এক সাথে তিন মাস্ক। আমার করোনা হয়েছে। আমার level এর ডাক্তারদের প্রায় সবার হয়েছে, অনেকের একের অধিক বার। কথা হলো how much you adhere to the attire? Reality হলো সব কিছু adopt করা অসম্ভব না হলেও difficult। মাস্কের কারণে রাস্তাঘাটে হাঁচি-কাশি কম face করতে হয়। ধোঁয়া-ধূলা fog, ঠাণ্ডায় যাদের allergy তারা relief পায়। রোগী যখন বলে কয়েক দিন ধরে কাশি গলায় বিজলা আসে, খোঁজ নিলে দেখা যায় ৮-১০ দিন আগে ১/২ দিনের জ্বর তারপর গলা ব্যাথা ছিল। এদের করোনা, টেষ্ট করেনা করতে চায়না। ১৯১৮-২০ সালে স্প্যানিশ ফ্লুতে পাঁচ কোটি লোক মারা গেছে; এর পরে সুয়াইন ফ্লু অন্যান্য ফ্লু হয়েছে, সব ফ্লু গেছে। ফ্লুর ৩০% হয় করোনা ভাইরাস দিয়ে ৭০% ইনফ্লুয়েঞ্জা দিয়ে। পপুলেশনে ৭০% exposed হলে herd immunity হয় ।যেটার জন্য আমরা, আমাদের প্রতিবেশী পৃথিবীর সবাই আশা করে আছি; করোনা মিশে যাবে জীবনের সাথে আতঙ্ক থাকবে না। কানাডায় এখন ও হাসপাতাল ও বিমানবন্দরে

মাস্ক অত্যাবশ্যক। মারাত্মক না হলেও গলা ব্যাথা, দীর্ঘদিনের প্রতিকারবিহীন কাশি আর রোগ পরবর্তী দূর্বলতারোধে personal protection এর বিকল্প নাই।

চেষ্টা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়

খুব বড় আশা নিয়ে মিলিয়নিয়ার বাপের অফিসে গিয়েছিলেন- একটা পার্ট টাইম চাকরির জন্য। বাপ ছেলেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। আশাহত হয়ে ছেলেটি সাত মাইল দূরে এক পত্রিকা অফিসে কাজ নেয়। পিতা তাকে তাঁর গাড়ি তো দেননি বরং একটা বাইসাইকেলও কিনে দেননি। তাই প্রতিদিন সাত মাইল পথ তাকে দৌড়ে অথবা হেঁটে পত্রিকা অফিসে যেতে হতো।।

ছেঁড়া জুতো পরে স্কুলে যেতো বলে বন্ধুরা হাসি-তামাশা করতো। তাই, একদিন বাপকে না বলে বাপের জুতো পরে স্কুলে গেলে পিতা খুব মনোঃক্ষুণ্ন হন। বলেছিলেন- আগামী ক্রিসমাসের আগে কোনো জুতো কিনে দেয়া যাবে না।।

হাইস্কুল পাসের পর ছেলে পিতাকে অনুরোধ করলো - একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার জন্য সুপারিশ করতে। একটা ভালো ডোনেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলে ভর্তি সহজ হয়। যে পিতা নিজের জুতো পরে স্কুলে যাওয়ায় বকা দেন - সেই পিতা ডোনেশন দিয়ে ছেলেকে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাবেন? এখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছেলেটি একটা লোকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

পাস করে পেশাগত দিক দিয়ে ভালো সুবিধা করতে না পেরে সেনাবাহিনীর একেবারে রিজার্ভ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে কাটে সাত বছর।

সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায় আবারো ভর্তির প্রস্তুতি নেন এবং নিজের যোগ্যতায় স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তারপর শুরু হয় ইতিহাস। পাস করে হন্যে হয়ে আর চাকরির পেছনে ছুটেননি। জুতোর ফ্যাক্টরিতে বন্ধু বিল বাওয়ারম্যানের সাথে দিনে ষোল ঘণ্টা করে কাজ করে বিজনেস পাইওনিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

বর্তমানে পৃথিবীর ১৫তম ধনী ব্যক্তি এবং ২৪.৪ বিলিয়ন ডলারের মালিক। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাপের সুপারিশ পাননি- সেই স্টানফোর্ডেই ডোনেশন করেছেন- ৭০৫ মিলিয়ন ডলার। একদিন ছেঁড়াজুতো পরে স্কুলে যাওয়ায় হাসি-তামাশা আর বাপের বকুনি খাওয়া সেই ছেলেটি আজকের দুনিয়ার বিখ্যাত জুতো কোম্পানি (Nike) নাইকির মালিক – ফিলনাইট।

ফিল নাইট বলেন – সব সাফল্যের জন্য বাবার কাছে ঋণ। সেদিন শুধু চেহারা দেখে নিজের পুত্র হিসেবে স্বজনপ্রীতি করে বাবার অফিসে চাকরি দিলে, যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও স্টানফোর্ডে ভর্তির জন্য সুপারিশ করলে আর বিলাসী জীবনের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে এই অবস্থায় কোনোদিনও আসতে পারতাম না। বাবাই

শিখিয়েছিলেন – যার যতটুকু যোগ্যতা, তার ততটুকুই প্রাপ্য। যোগ্যতার বাইরে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা হলো আত্মপ্রবঞ্চনা। রাস্তা যতই সুন্দর হোক, নিজের পায়ে জোর না থাকলে সেই রাস্তা কোন দিন দৌড়ে শেষ করা যায় না। ফিল নাইট বলেন, ছেঁড়াজুতো পায়ে সাত মাইল পথ দৌড়াতে দৌড়াতে যতবারই হোঁচট খেয়েছি ঠিক ততবারই নিজের ভিতর সাফল্যের অনুপ্রেরণা পেয়েছি। জুতো ঠিক যেভাবে ছিঁড়েছিলো সেই ছেঁড়া অংশটুকুর আদলেই নাইকির লোগো বানিয়েছি যা অনেকটা দেখতে গ্রিক বিজয়ী দেবতার সিম্বল নাইকের ডানার মতো।

জীবন চরিত

মঙ্গলবার (১/১০/২০১৯) বিকেল ২টা, বিজয়নগর; ১০তলায় কাজ সেরে নিচে আসলাম। তুমুল বৃষ্টি; কার্নিভালে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে ফোন দিলাম। পার্কিংয়ে দাঁড়াতে না দেয়ায় next গলিতে আশ্রয় নিয়েছে। বললাম আমি হেঁটে আসছি; সে মোড় ঘুরে আসতে চাইল। মোড়ে গিয়ে আর আসে না; বয়স কম, অভিজ্ঞতার অভাব। ফোন দিলাম, কি খবর? স্যার টাইটানিকের মত পানি ঢুকছে গাড়িতে। সাইলেন্সার ডুবে গেছে, স্টার্ট বন্ধ।

সোয়া একটার সময় যখন ঢুকি সুন্দর শুকনা রাস্তা। বৃষ্টি দেখছি, রাস্তা ডোবার পর ফুটপাত ডুবে গেল আস্তে আস্তে। চলন্ত গাড়ির ধাক্কায় ঢেউ এসে আঘাত করছে সিঁড়িতে। ভিডিও পিপাসুরা ব্যস্ত ছবি তুলতে; মুখচোরাদের হরেক কমেন্ট। পুলিশের শিফট চেঞ্জ গাড়ি আসে না দেখে টেলিফোন করে বলছে গাড়ি নয়, নৌকা পাঠাও!

অভিজ্ঞ মনে করে জিজ্ঞেস করলাম কতক্ষণে সরতে পারে পানি? সিটি কর্পোরেশনকে জিজ্ঞেস করুন বলল; বুঝলাম বিরক্ত। দাঁড়িয়ে দেখছি গাড়ি ট্রাই করে ডিভাইডারের পাশ ঘেঁষে যেতে তবু স্টপ হয়। চেক পোস্ট লেখা বক্সগুলো ভেসে যাচ্ছে গাড়ির চলার পথ আটকিয়ে, শূন্য বোতল ভাসছে সাদা মুখ্যাটা দেখিয়ে। যেন বয়ে চলা নদী!

রিকশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার এলাকায় যাবে না। বৃষ্টির পানি নেমে যাবে স্বাভাবিক নিয়ম ভেবে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে থাকলাম, একজন বলল ৫টার আগে সরবে না। ট্রান্সপোর্ট পেলেও উঠবো কেমনে গাড়িতে সেটাই এখন বড় চিন্তা। অভেজা নয়, অক্ষত অবস্থায় শকটে উঠা। প্যান্ট, প্যান্টের ভিতরে মোজা, তারও ভিতরে পা। তিনটার দিকে সাহসী স্কুটার পেলাম। যাবে কিনা জিজ্ঞেস না করে বললাম পারবে কিনা? সাইলেন্সার পানির উপরে থাকলে যাওয়া যাবে। গাড়ি ফুটপাতের লাগোয়া হতেই স্টপ। শংকা নেই, দরজা খুলে বলল – আসুন। জুতা মোজা খুলে প্যান্ট গুটিয়ে প্রায় হাঁটু পানি ভেঙে সিটে বসলাম; পাদানির উপরের পানির মধ্যে ডুবে গেল পা। এগুতে থাকলো – বৃষ্টি শেষ হয়নি, আকাশ মেঘলা।

রাস্তার কাটা দিয়ে ঢুকে করাঞ্চল দশ (১০) হয়ে মৎস্য ভবন টার্গেট করে এগুলো, উদ্দেশ্য একটাই leave বিজয়নগর, ছাড়ো সেগুনবাগিচা।

মৎস্য ভবনের নিকটবর্তী হতে অন্য জগত, বৃষ্টির ব নেই, উজ্জ্বল রোদ; রাস্তায় পানি জমা? পাগলের প্রলাপ!

শান্তি নেই – মৎস্য ভবন থেকে ঢাকা ক্লাব দূরত্ব এক ফার্লং। স্কুটারে সময় আধা ঘণ্টা শেষ?। ম্যাডামের টেলিফোন কোথায়? বললাম, পানি থেকে ডাঙায়; বাসায় খাবা কিনা। খাব তবে লাঞ্চ নাকি ডিনার সেটা সময়েই বলবে।

ভাগ্যিস বিজ্ঞান এসব আবিষ্কার করেছিল; নইলে জানাই যেত না যে কুরআনে আগেভাগেই এতকিছু বলা আছে!!!

১. বিজ্ঞান কিছুদিন আগে জেনেছে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূরা ফুরক্বানের ৬১ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

২. বিজ্ঞান মাত্র দুশো বছর আগে জেনেছে চন্দ্র এবং সূর্য কক্ষপথে ভেসে চলে... সূরা আম্বিয়া ৩৩ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

৩. সূরা কিয়ামাহর ৩ ও ৪ নং আয়াতে ১৪০০ বছর আগেই জানানো হয়েছে; মানুষের আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে মানুষকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা সম্ভব। যা আজ প্রমাণিত।

৪. বিগ ব্যাং থিওরি আবিষ্কার হয় মাত্র চল্লিশ বছর আগে। সূরা আম্বিয়া ৩০ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে ১৪০০ বছর আগে।

৫. পানি চক্রের কথা বিজ্ঞান জেনেছে বেশি দিন হয়নি... সূরা যুমার ২১ নং আয়াতে কুরআন এই কথা বলেছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

৬. বিজ্ঞান এই সেদিন জেনেছে লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি একসাথে মিশ্রিত হয় না। সূরা ফুরকানের ২৫ নং আয়াতে কুরআন এই কথা বলেছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

৭. ইসলাম আমাদেরকে ডান দিকে ফিরে ঘুমাতে উৎসাহিত করেছে; বিজ্ঞান এখন বলছে ডান দিকে ফিরে ঘুমালে হার্ট সব থেকে ভাল থাকে।

৮. বিজ্ঞান এখন আমাদের জানাচ্ছে পিপীলিকা মৃতদেহ কবর দেয়, এদের বাজার পদ্ধতি আছে। কুরআনের সূরা নামল-এর ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে এই বিষয়ে ধারণা দেয়।

৯. ইসলাম মদ পানকে হারাম করেছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে মদ পান লিভারের জন্য ক্ষতিকর।

১০. ইসলাম শূকরের মাংসকে হারাম করেছে। বিজ্ঞান আজ বলছে শূকরের মাংস লিভার, হার্টের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

১১. রক্ত পরিসঞ্চালন এবং দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যাপারে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান জেনেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। সূরা মুমিনূনের ২১ নং আয়াতে কুরআন এই বিষয়ে বর্ণনা করে গেছে।

১২. মানুষের জন্ম তত্ত্ব ভ্রূণ তত্ত্ব, সম্পর্কে বিজ্ঞান জেনেছে এই ক'দিন আগে। সূরা আলাকে কুরআন এই বিষয়ে জানিয়ে গেছে ১৪০০ বছর আগে।

১৩. ভ্রূণ তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞান আজ জেনেছে পুরুষই (শিশু ছেলে হবে কিনা মেয়ে হবে) তা নির্ধারণ করে। ভাবা জায়... কুরআন এই কথা জানিয়েছে ১৪০০ বছর আগে।

(সূরা নজমের ৪৫, ৪৬ নং আয়াত, সূরা কিয়ামাহর ৩৭- ৩৯ নং আয়াত)

১৪. একটি শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন সে আগে কানে শোনার যোগ্যতা পায় তারপর পায় চোখে দেখার। ভাবা যায়?

১৪০০ বছর আগের এক পৃথিবীতে ভ্রূণের বেড়ে ওঠার স্তরগুলো নিয়ে কুরআন বিস্তর আলোচনা করে। যা আজ প্রমাণিত! (সূরা সাজদাহ আয়াত নং ৯, ৭৬ এবং সূরা ইনসান আয়াত নং ২)

১৫. পৃথিবী দেখতে কেমন? এক সময় মানুষ মনে করত পৃথিবী লম্বাটে, কেউ ভাবত পৃথিবী চ্যাপ্টা, সমান্তরাল... কুরআন ১৪০০ বছর আগে জানিয়ে গেছে পৃথিবী দেখতে অনেকটা উট পাখির ডিমের মত গোলাকার।

১৬. পৃথিবীতে রাত এবং দিন বাড়া এবং কমার রহস্য মানুষ জেনেছে দুশ বছর আগে। সূরা লুকমানের ২৯ নং আয়াতে কুরআন এই কথা জানিয়ে গেছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে!!

... আমাদের সমস্যা হল আমরা সব কিছুই জানি ... যারা নাস্তিক তারাও জানে... পার্থক্যটা হলো – বোধ। যেমন ধরুন একজন নেশাখোর জানে যে নেশা করলেই তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, যে ছেলে বাবাকে খুন করেছে সে জানে যে এই মানুষটি তাকে জন্ম দিয়েছে ... সব জেনে শুনেই আমরা সব থেকে খারাপ কাজগুলো করি ... ব্যাপারটা অজ্ঞানতার না ব্যাপারটা 'বোধ' এর।

... আপনার এই বোধটা থাকতে হবে।

রিজিক নিয়ে এতো সুন্দর লেখা আগে পড়িনি

রিজিক

রিজিকের সর্বনিম্ন স্তর : টাকা, পয়সা, অর্থ, সম্পদ।
সর্বোচ্চ স্তর : শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা।
সর্বোত্তম স্তর : পুণ্যবান স্ত্রী ও পরিশুদ্ধ নেক সন্তান
পরিপূর্ণ স্তর : মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।
রিজিক খুব গভীর একটি বিষয় যদি আমরা বুঝতে পারি।

আমি পুরো জীবনে কত টাকা আয় করবো সেটা লিখিত, কে আমার জীবনসঙ্গী হবে সেটা লিখিত, কবে কোথায় মারা যাবো সেটা লিখিত।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমি কতগুলো দানা ভাত দুনিয়াতে খেয়ে তারপর মারা যাবো সেটা লিখিত। একটি দানাও কম না, একটিও বেশি না।

ধরেন এটা লিখিত যে আমি সারাজীবনে ১ কোটি টাকা আয় করবো, এই সিদ্ধান্ত আল্লাহতায়ালা নিয়েছেন।

আমি হালাল উপায়ে আয় করবো না হারাম উপায়ে আয় করবো সেই সিদ্ধান্ত আমার।

যদি ধৈর্য ধারণ করি, আল্লাহতায়ালার কাছে চাই, তাহলে হালাল উপায়ে ওই ১ কোটি আয় করেই আমি মারা যাবো, হারাম উপায়ে হলেও ওই ১ কোটিই ... নাথিং মোর, নাথিং লেস!

আমি যেই ফলটি আজকে ঢাকা বসে খাচ্ছি, সেটা হয়ত ইতালি কিংবা থাইল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করা। ওই গাছে যখন মুকুল হয়েছে তখনই এটা নির্ধারিত যে সেটি আমার কাছে পৌঁছাবে। এর মধ্যে কত পাখি ওই ফলের উপর বসেছে, কত মানুষ এই ফলটি পাড়তে গেছে, দোকানে অনেকে এই ফলটি নেড়েচেড়ে রেখে গেছে, পছন্দ হয়নি, কিনেনি। এই সব ঘটনার কারণ একটাই, ফলটি আমার রিজিকে লিখিত। যতক্ষণ না আমি কিনতে যাচ্ছি, ততক্ষণ সেটা ওখানেই থাকবে।

এর মধ্যে আমি মারা যেতে পারতাম, অন্য কোথাও চলে যেতে পারতাম, কিন্তু না। রিজিকে যেহেতু লিখিত আমি এই ফলটি না খেয়ে মারা যাবো না।

রিজিক জিনিসটা এতোটাই শক্তিশালী!

যেই আত্মীয় কিংবা বন্ধু-বান্ধব আমার বাসায় আসছে, সে আসলে আমার খাবার খাচ্ছে না। এটা তারই রিজিক, শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা আমার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। হতে পারে এর মধ্যে আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ...

কেউ কারোটা খাচ্ছে না, যে যার রিজিকের ভাগই খাচ্ছে।

আমরা হালাল না হারাম উপায়ে খাচ্ছি সেটা নির্ভর করছে আমি আল্লাহ তায়ালার উপর কতটুকু তাওয়াক্কাল আছি, কতটুকু ভরসা করে আছি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঠিক পথ ও রিজিক-এর তৌফিক দান করুন, আমিন।

শিক্ষাণীয় পোস্ট ...

এক স্বর্ণকারের মৃত্যুর পর তার পরিবারটা বেশি সংকটে পড়ে গেল। খাদ্য-বস্ত্রে দেখা দিল চরম অভাব।

স্বর্ণকারের বিধবা স্ত্রী তার বড় ছেলেকে একটা হীরের হার দিয়ে বললো – এটা তোর কাকুর দোকানে নিয়ে যা, বলবি যে এটা বেচে কিছু টাকা দিতে।

ছেলেটা হারটি নিয়ে কাকুর কাছে গেল।

কাকু হারটা ভালো করে পরীক্ষা করে বললো- বেটা, তোমার মাকে গিয়ে বলবে যে এখন বাজার খুবই মন্দা, কয়েকদিন পর বিক্রি করলে ভাল দাম পাওয়া যাবে। কাকু কিছু টাকা ছেলেটিকে দিয়ে বললেন- আপাতত এটা নিয়ে যাও আর কাল থেকে তুমি প্রতিদিন দোকানে আসবে আমি কোন ১ দিন ভাল খদ্দের পেলেই যেন তুমি দৌড়ে হার নিয়ে আসতে পার তাই সারাদিন থাকবে।

পরের দিন থেকে ছেলেটা রোজ দোকানে যেতে লাগলো। সারাদিন বসে থেকে কি আর করবে, তাই সোনার কাজ শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হলো ছেলেটির। সময়ের সাথে সাথে সেখানে সোনা-রুপা-হীরে কাজ শিখতে আরম্ভ করলো।

ভাল শিক্ষার ফলে অল্প দিনেই খুব নামি জহুরত বনে গেল। দূর-দূরান্ত থেকে লোক তার কাছে সোনাদানা বানাতে ও পরীক্ষা করাতে আসত। খুবই প্রসংশিত হচ্ছিল তার কাজ।

একদিন ছেলেটির কাকু বললো- তোমার মাকে গিয়ে বলবে যে এখন বাজারের অবস্থা বেশি ভালো, তাই সেই হারটা যেন তোমার হাতে দিয়ে দেন। এখন এটা বিক্রি করলে ভালো দাম পাওয়া যাবে।

ছেলেটি ঘরে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে হারটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো যে এটা একটা নকল হীরের হার। তাই সে হারটা আর কাকুর কাছে নিয়ে যায় নি।

কাকু জিজ্ঞেস করলো- হারটি আনো নি?

ছেলেটি বললো- না কাকু, পরীক্ষা করে দেখলাম এটা একটা নকল হার।

তখন কাকু বললো- তুমি যেদিন আমার কাছে হারটি প্রথম নিয়ে এসেছিলে সেদিন আমি দেখেই বুঝে নিয়েছিলাম যে এটা নকল, কিন্তু তখন যদি আমি তোমাকে এই

কথাটা বলে দিতাম, তাহলে তোমরা হয়তো ভাবতে যে আজ আমাদের মন্দ সময় বলেই কাকু আমাদের আসল জিনিসকে নকল বলছে। আজ যখন এ ব্যাপারে তোমার পুরো জ্ঞাণ হয়ে গেছে, তখন তুমি নিজেই বলছো এটা নকল হার।

এই দুনিয়াতে প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া তুমি যা কিছু দেখছো ... যা কিছু ভাবছো সবটাই এই হারের মতই নকল, মিথ্যে।

জ্ঞান ছাড়া কোন জিনিসের বিচার সম্ভব নয়। আর এই ভ্রমের শিকার হয়েই অনেক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। আমি সেই সম্পর্কটা নষ্ট হোক তা চাই না।

শুনশান রেল স্টেশন

দিনের শেষ ট্রেনটি প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে। এক বৃদ্ধা বসেই আছেন। জানেন না পরের ট্রেনটি আসবে পরের দিন। এক কুলির নজর গেল সেদিকে।

- মাইজি, তুমি কোথায় যাবে?
- দিল্লি যাব বাবা ছেলের কাছে।
- আজকে তো ট্রেন আর নেই মাইজি।
বৃদ্ধার অসহায় দৃষ্টি। কুলিটির বোধহয় দয়া হল।
- মাইজি তোমাকে ওয়েটিং রুমে রেখে আসি। আমার সঙ্গে চল।
- তাই চল বাবা। কি আর করব!
- তোমার ছেলে বুঝি দিল্লিতে থাকে?
- হ্যাঁ বাবা।
- ক করে?
- রেলে কি যেন একটা কাজ করে!
- নামটা বল দেখি। যোগাযোগ করা যায় কিনা দেখছি।
- ও তো আমার লাল। সবাই ওকে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বলে ডাকে যে।

তিনি তখন ভারতীয় রেলওয়ের ক্যাবিনেট মিনিস্টার। মুহূর্তের মধ্যে গোটা স্টেশন তোলপাড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলো সালুন। বৃদ্ধা অবাক। তাঁর ছেলের এত ক্ষমতা!

লাল বাহাদুর কিছুই জানতেন না। সব আয়োজন করেছিল ভারতীয় রেল।

পরিশেষে একটিই কথা, এমন মা না হলে অমন ছেলে হয়! এই রকম নেতা এখন দুর্লভ, এরা ক্ষমতা প্রতিপত্তির জন্য পদে বসেননি, এরাই পদকে অলংকৃত করেছেন।

তিনি রেলমন্ত্রী থাকা অবস্থায় রেল দুর্ঘটনা হলে তিনি পদত্যাগ করেন।
'গল্পটা গল্প নয় একবারে সত্যি ঘটনা'।

সময়টা ১৯৮৩ সাল। কফিহাউজের ইতিহাস

গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার তখন আশা ভোঁসলেকে নিয়ে প্রচুর হিট প্রেমের গান লিখে চলেছেন। কিন্তু পূজার গান মান্না দের জন্য তিনি লিখতে পারছেন না। সবই লিখছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে আক্ষেপ ছিল গৌরী প্রসন্নের মনে। এ সময় একদিন নচিকেতা ঘোষের নিউ আলিপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন গৌরী প্রসন্ন। উদ্দেশ্য ছিল শক্তি ঠাকুরকে দিয়ে একটি গান তোলা।

সেই সময় সেরা জুটি ছিলেন নচিকেতা ও গৌরী প্রসন্ন। সেই সূত্রে নচিকেতার ছেলে সুপর্ণকান্তির সঙ্গেও বেশি ভাল সম্পর্ক। তবে বাড়িতে আসার অনেকক্ষণ পরে সুপর্ণকান্তিকে দেখতে পেয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজা করেই বলেন, কী বাইরে আড্ডা মেরে সময় কাটাচ্ছ? এর উত্তরে সুপর্ণকান্তি তার গৌরী কাকাকে বলেন, কী সব গদগদে প্রেমের গান লিখছো। একটা অন্যরকম গান লিখে দেখাও না। এই আড্ডা নিয়েও তো গান লিখতে পারো।

এবার গৌরী প্রসন্ন বলেন, তুমি তো অক্সফোর্ডের এমএ হয়ে গিয়েছো। আড্ডা নিয়ে বাংলা গান গাইবে? সুপর্ণ এবার বলে, কেন নয়। কফি হাউসের আড্ডা নিয়েও তো একটা গান লিখতে পারো। গৌরীপ্রসন্ন এবার বলেন, তোমার বাবা (নচিকেতা ঘোষ) কি আর সে গান গাইবেন? তর্ক চলছে বটে কিন্তু গৌরীপ্রসন্ন এরই মধ্যে মনে মনে তৈরি করে ফেলেন দুটি লাইন।

এরপরেই সুপর্ণকান্তিকে বললেন, লিখে নাও – কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই/ কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই।

সুপর্ণও সঙ্গে সঙ্গে দুটো লাইনেই সুর দিয়ে শুনিয়ে দেন। উপস্থিত শক্তি ঠাকুর সেবার পূজায় গানটা গাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেও সুপর্ণ রাজি হননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করে নিয়েছিলেন মান্না দের কথা।

কিন্তু গানের বাকি লাইনগুলো? পরের দিন সকালেই গৌরীপ্রসন্নের স্ত্রী সুপর্ণকান্তিকে ফোন দিলেন। সারা রাত জেগে বহুদিন পরে গান লিখেছেন অসুস্থ গৌরীপ্রসন্ন। তখনই তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। দুদিন পরে গানটা নিয়ে হাজির। কিন্তু শেষ স্তবক যোগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না গৌরীপ্রসন্ন।

সুপর্ণকান্তি চান যোগ করুন একটি স্তবক। শেষ পর্যন্ত রাজি হন। লেখেন দুর্দান্ত সেই লাইন – সেই সাতজন নেই, তবুও টেবিলটা আজও আছে।

কিন্তু শেষ তিনটি লাইন তিনি লিখেছিলেন চেন্নাইয়ে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার পথে হাওড়া স্টেশনে বসে একটি সিগারেটের প্যাকেটের উল্টো পিঠে।

এক চেনা লোকের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দেন সুপর্ণকান্তির কাছে।

তারপর সুপর্ণকান্তির সুরে মুম্বাইয়ে গানটি রেকর্ড করেন মান্না দে। তৈরি হয়ে যায় একটা ইতিহাস

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের এমবিবিএস, এফসিপিএস

সম্মানিত অধ্যক্ষ,
ভুটান এবং বাংলাদেশের সকল প্রতিনিধি, কলেজের সকল স্টাফ, সম্মানিত অধ্যক্ষ এবং আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা, শুভ সকাল।

একটা সমস্যা হয়ে গেল। দুটো কারণে আমি আজ বেশি কথা বলতে পারব না। প্রথম কারণ হলো, যদি বেশি কথা বলি তাহলে তোমরা বলবে আমি পলিটিশিয়ানের মত করে কথা বলছি।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমার স্ত্রীর সামনে বেশি কথা যাবে না, কারণ সে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সে তার ব্যাগে সবসময় ১০ টা অ্যামিট্রিপটিলিন রেখে দেয়।

যাই হোক, আজকে এখানে আসতে পেরে আমি অনেক খুশি। এই শহরে আমার জীবনের প্রায় দশ বছর কেটেছে। আর সাথে আজকে তো আপনাদের পহেলা বৈশাখ।

আমি এই মেডিকেলে প্রথম আসি ১৯৯১-এর শেষে ২৫/২৬ নভেম্বরের দিকে। আমি আমার সেশনে প্রায় চার-পাঁচ মাস পর ভর্তি হয়েছিলাম। ওই চার-পাঁচ মাসের সিলেবাস গোছানোর জন্যে জন্য আমাকে পরে বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমি একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করতাম। যেমন ধরুন আগামীকাল আমাদের এনাটমির কোন একটা টপিক পড়ানো হবে, আমি সেটা আজকে রাতে একবার পড়ে রাখতাম। এরপর পরদিন যখন স্যার পড়ানো শেষ করতেন, আমি আমার বন্ধুদের ক্লাসের পরপরই নিয়ে যেতাম ডিসেকশন হলে। যাই পারতাম যেটুকু পারতাম, ওদের কাছে বারবার ডেমো দিতাম ভুল হোক আর যা হোক। তাতে আমার আরেকবার জিনিসটা পড়া হয়ে যেত। এভাবে আমার অন্য ব্যাচমেটদের কোন টপিক একবার পড়া হতে হতে আমার সেটা কয়েকবার পড়া হয়ে যেত। যে কোন জিনিস ভাল করে বুঝতে হলে পড়ার পাশাপাশি ডিসকাশনের উপর জোর দিতে হবে। জীবনে এর বিকল্প নেই।

তখন ১৯৯৬ সাল, দিন তারিখটা ঠিক সঠিক মনে নেই আমার, আমি তখন ফোর্থ ইয়ারে। হঠাৎ আমার পেটে ব্যথা শুরু হল আচমকা। প্রচণ্ড ব্যথায় কাতর, রাত নয়টার দিকে একবার বমিও করেছি। সারারাত ঘুমাতে পারিনি। রাতে আরও বেশি কয়েকবার বমি হলো। পরদিন খুব ভোরে আমার এক বন্ধু আর বড় ভাই তানজিং দর্জি (ম-২৪) আমাকে নিয়ে যান আউটডোরে। ওখানকার চিকিৎসকের কাছে আমি আগে কখনো যাইনি। স্টুডেন্ট হিসেবে তো নাই, রোগী হিসেবেও না। উনি আমার কাছ থেকে জানলো আমার পেপটিক সমস্যার জন্য আমি অনেকদিন ধরে রেনিটিডিন ওমিপ্রাজল এগুলো খাই। এটুকু শুনেই আমাকে আর হিস্টোরি না নিয়ে ওমিপ্রাজলসহ আরও কিছু ওষুধ লিখে দেন। আমি চলে আসলাম হলে। ওষুধ

খেয়ে আমার কোন ইমপ্রুভমেন্ট হলো না। ব্যথা আগের মতই রয়ে গেল। বিকালে আবার গেলাম ঐ স্যারের কাছে। তিনি আমার অবস্থা দেখে স্টুডেন্ট কেবিনে ভর্তি হতে বললেন। আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। পরের দিন মেডিসিনের বেশি কয়েকজন স্যাররা মিলে আমাকে রাউন্ডে দেখতে আসলে। তাদের পরামর্শ মত ট্রিটমেন্ট চললো। আমার কোন উন্নতি নেই এরও কয়েকদিন পর অন্য একজন স্যার আসলেন দেখতে স্টুডেন্ট কেবিনে। আমার মনে হলে উনি সার্জারি ডিপার্টমেন্টের কেউ। কিছুক্ষণ আমাকে দেখে বললেন এটা তো এপেন্ডিসাইটিসের কেস। এতদিন ধরে সে এভাবে রেখে দিয়েছে, এটা তো এখন বাস্ট এপেন্ডিক্সের দিকে এগুচ্ছে। আমাকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন এটা খুবই সহজ অপারেশন। আমি তিনশো-চারশো এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করেছি। বাবা তোমার ভয় নেই। তোমার বাবা মা দূরদেশে থাকে। তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে আমাদের কাছে। তুমি পুরোপুরি নিরাপদ আমাদের হাতে। স্যারের এই কথাগুলো এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সেদিন রাত নয়টার দিকে আমি অপারেশন টেবিলে, আমার অপারেশন হলো, এপেন্ডিক্সবের করা হলো। গ্যাংগ্রিনাস এপেন্ডিক্স। কিছুদিন পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি। সেদিনের ঐ মানুষটি ছিলেন প্রফেসর খাদেমুল ইসলাম স্যার।

তখন আমি ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট, এপেন্ডিসাইটিস সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণা ছিল এবং আমি এটাও জানতাম এটা খুবই ছোট্ট অপারেশন, রেসিডেন্টরাই চাইলে করতে পারে। কিন্তু স্যার তারপরেও বারবার আমাকে সাহস দিচ্ছিলেন, পরিবারের থেকে দূরে একটা ছেলেকে মনোবল যোগাচ্ছিলেন। ওই অপারেশনটার পর থেকে স্যার আমার কাছে আমার ভগবানের মত হয়ে গেলেন।

আমাদের এই যে পেশাটা, খুব সহজেই আমরা মানুষ থেকে ভগবান হতে পারি। আমরা ডাক্তাররা সকাল থেকে সন্ধ্যা হাসপাতালে রোগী নিয়ে কাজ করতে করতে আমাদের কাছে রোগী দেখাটা অনেকটা রুটিনমত হয়ে যায়। এতে করে অনেক সময়ই মিসডায়াগনোসিস করে ফেলি আমরা।

একটা কথা মনে রাখবেন, আমরা রোগীদের সাথেই সারাটাদিন থাকলেও রোগীরা কিন্তু সবসময় আমাদের সাথে থাকেন না। তারা তাদের জীবনে একবার কি দুইবার আমাদের কাছে চিকিৎসা নিতে আসেন এবং ওই এক দুইবারেই আমাদের প্রতি যে ধারণা জন্মে সেটাই আজীবন মনে রাখেন।

তাই আমাদের উচিত প্রতিটি রোগীকেই আমাদের সর্বোচ্চটা দেয়া।

আমি অন্তর থেকে স্যারকে সবসময় স্মরণ করি। আমি এমবিবিএস শেষ করার পর এফসিপিএস করি বাংলাদেশেই। পার্ট টু পরীক্ষার ফলাফল যখন হবে বিকালের দিকে আমরা সবাই বসে আছি নিচ তলায় রেজাল্টের অপেক্ষায়। হঠাৎ স্যার আসলেন, আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, “ You have done it boy”.

সেদিনকার পর ২০০২ সালে জুন মাসের দিকে আমি ফিরে যাই আমার নিজ দেশ ভুটানে। সেখানে একটা হাসপাতালে কাজ শুরু করি জেনারেল সার্জন হিসেবে। প্রথমদিনই আমি ছুটে গিয়েছিলাম মন্দিরে দোয়া নিতে। এর পরদিন, আমাদের হসপিটালে এপেন্ডিসাইটিসের একজন রোগী আসল। আমি আমার জুনিয়র কলিগকে বললাম তুমি এটা করে ফেল, খুবই সহজ কাজ। না পারলে তো আমি আছিই। প্রায় ১০ মিনিট পর ও আমাকে ডাকল। আমাকে যেতেই হবে। আমি যাওয়ার সময় অপারেশন থিয়েটারের সামনে বসা একজন সুন্দরী মহিলা এসে আমার সাথে পরিচিত হয়ে বলতেছেন, আমি এই হাসপাতালেরই একজন নতুন ডাক্তার। কয়েকদিন আগেই কাজ শুরু করেছি। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। আমার স্যারের মত করেই। সেদিনের সেই মহিলাটিই হলেন আমার স্ত্রী। যিনি আজ আমার সাথে উপস্থিত। আর ঐ এপেন্ডিসাইটিসের রোগী ছিলেন ওর চাচা। এভাবেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। এপেন্ডিক্সকে আপনারা বলেন ভেস্টিজিয়াল অরগান, কোন কাজ নেই। কিন্তু আমার জীবনে এর অনেক গুরুত্ব। বুঝতেই পারছেন, কেন!

আমি পলিটিক্স করা শুরু করি হেলথ সেক্টরের প্রতি আমার প্যাশন থেকে। ময়মনসিংহ মেডিকেলে আমার রুমমেট ছিল আমার বন্ধু তানজিং দর্জি। যিনি এখানে উপস্থিত আছেন, আমার রুমমেট, আমার বড় ভাই, ম-২৪ ব্যাচের। তিনি এখন বর্তমানে ফরেন মিনিস্টার। আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই তার সাথে ঘুরতাম। ক্যান্টিনে একসাথে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতাম। এমবিবিএস শেষে ভুটানে আমরা এক হসপিটালে কাজ শুরু করি।

পরে ভোটে জয়লাভ করে আমরা সরকার গঠন করি। এই যে এখন আমি আজ প্রাইম মিনিস্টার, উনি, আমার সিনিয়র বড়ভাই আমাকে প্রাইম মিনিস্টার বানিয়েছেন। উনি ফরেন মিনিস্টার হলে কি হবে, আমাদের পার্টির ফাউন্ডার কিন্তু উনিই। বাগমারার ওয়েস্ট বিল্ডিং-এর ২০ নাম্বার রুমে থাকার সময়ে আমরা আমাদের দেশ নিয়ে আলোচনা করতাম। কী কী সমস্যা আছে, হেলথ সেক্টরে কিভাবে সেগুলো সমাধান করা যায় আলাপ করতাম। তারপরে পড়াশুনা শেষ করে ভুটানে এলাম, তারপর পার্টি ফর্ম করার কথা তিনিই প্রথম বলেন। এই যে এত বছর ধরে আমরা একসাথে আছি কিন্তু এর ভিতরে একবারো আমাদের ভিতরে কখনো কোনো আর্গুমেন্ট হয়নি। কখনো কোন ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়নি। কারণ আমরা একটা মিউচুয়াল স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতাম। নিজেদের সেই অনুযায়ী তৈরি করেছি। সবসময় অপরজনের মতামত কে গুরুত্ব দিয়েছি। তার কাছে যা অফ হোয়াইট আমার কাছে তা সাদা, তো কি হয়েছে। আমরা দুইজনই সঠিক নিজের জায়গা থেকে। একজন কখনো মতামত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করিনি। দুটো মতামতকে পাশাপাশি রেখে চলেছি। এটাই আমাদের সফলতার মূলমন্ত্র।

নিজেদের দেশের জন্য কিছু করার চিন্তাভাবনা আমাদের তখন থেকেই ছিল। আমরা যখন দল গঠন করি নির্বাচনের জন্য তখন আমাদের সমসাময়িক আরও চারটি দল ছিল। শেষপর্যন্ত আমরাই জয়লাভ করি। কারণ আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে হেলথ সেক্টর নিয়ে পয়েন্টগুলো ছিল বেশি স্ট্রং। সাধারণ মানুষ এই জন্যেই আমাদের পার্টিকে বেছে নিয়েছে। আমি কিংবা উনি পলিটিক্স করি বলে কিন্তু ডাক্তারি পেশা ছেড়ে দেইনি। আমরা অফ ডে তে এখনো হসপিটালে ডাক্তার হিসেবেই বসি। চেষ্টা করি নিজের সর্বোচ্চটুকু দেয়ার।

আপনারা সবাই একদিন ডাক্তার হবেন। আপনারা একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, You have to be a good human being first to be a good surgeon. I hope this hall is filled with good human beings. You will be a surgeon for sure someday. I have no doubt. But you have to be a good surgeon with a good heart.

Don't Be Ambitious, Do Your Best. Be A Good Human Being. আগে আপনি একজন ভালো মানুষ হন, আপনি এমনিতেই একজন ভালো ডাক্তার হয়ে যাবেন। আর ওই যে বলে না, আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যেই করে - এটা সবাই মনে রাখবেন।

আল্লাহর দুনিয়ার মানুষ

চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার প্রেম বাজারে একটি হোটেলে বসলাম। লক্ষ্য ছিলো শিঙ্গাড়া খাবো। এই পদার্থটি আমার সহ্য হয় না। খাওয়ার সাথে সাথে এসিডিটি হয়। তবু লোভে পড়ে খাই। মাঝে মাঝে। শিঙ্গাড়া শেষ করেই ঔষধ খাই।

আমি সব সময় হোটেল-রেস্টুরেন্টের এক কোনায় গিয়ে বসি। একটু লুকিয়ে থাকার ইচ্ছে আরকি। আমি অবশ্যই অন্তর্মুখী মানুষ।

গতকাল কোনার টেবিল ফাঁকা না থাকায় ম্যানেজারের খুব কাছের একটি টেবিলে বসলাম। তার সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

একজন বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুক এলেন। কাতর কণ্ঠে বললেন, "বাবা, খুব ক্ষুধা লেগেছে। কিছু খেতে দিতে পারো?"

ম্যানেজার একটা টেবিল দেখিয়ে বললেন, "ঐ জায়গায় গিয়ে বসেন খালা।" তারপর চিৎকার দিয়ে বললেন, "খালাকে এক প্লেট খিচুড়ি দে।"

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। ছোট্ট হোটেল। তেমন বেচাকেনা হয় বলেও মনে হলো না।

দুই তিন মিনিটের মধ্যেই আরো একজন বৃদ্ধা ভিক্ষুক ভিক্ষা নিতে এলেন। ম্যানেজার বললেন, "খাওয়া দাওয়া হয়েছে খালা?"

খালাকে নিশ্চুপ দেখে আগের খালার পাশের চেয়ারে বসালেন এবং তাকেও এক প্লেট খিচুড়ি দেওয়া হলো। দুই জন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বয়োবৃদ্ধাকে খেতে দেখে কী যে ভালো লাগছিলো!

এরপর আরো একজন বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুক এলেন। ম্যানেজারের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "বাবা, ভিক্ষা করতে এসেছিলাম। তেমন ভিক্ষা পাইনি আজ। বাড়ি যাওয়ার ভাড়া নেই। ভাড়াটা দিতে পারো।"

ম্যানেজার বললো, "আমার তেমন বিক্রি হয়নি খালা। আপনি বরং একটু খেয়ে যান। দেখেন কেউ ভাড়াটা দিতে পারে কিনা।"

এতোক্ষণ যে বয়টি খাবার পরিবেশন করছিলো সে বললো, "খালা কয় টাকা ভাড়া লাগে বাড়ি যেতে?"

- ১৫ টাকা বাবা।

হোটেল বয়টি পকেট থেকে ২০ টাকার একটা নোট বের করে খালার হাতে দিয়ে বললেন, "নেন, এটা রাখেন। একটু খিচুড়ি খেয়ে বাড়ি যান। আমি খিচুড়ি দিচ্ছি।"

হোটেল ম্যানেজার হাসতে হাসতে বললেন, "শালা যেমন ম্যানাজার, তেমন তার কর্মচারীরা! কেউ মানুষকে ফিরাতে জানে না।"

তারপর বললেন, "শোন, কোন ভিক্ষুক যেন খেতে এসে না ফিরে যায়। সবাইকে খাওয়াবি।"

আমি সব দেখছিলাম। মাথা নিচু করে বসে আছি। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। মনের ভেতর তোলপাড় চলছে।

ম্যানেজারকে এক সময় কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "ভাই, আপনার ঐ কর্মচারী ছেলেটি সম্পর্কে আমাকে একটু বলুন তো প্লিজ। কয় টাকা বেতন দেন ওকে।"

- ব্যবসা তো তেমন চলে না ভাই। সারাদিন হোটেল খোলা। রাত নয়টা পর্যন্ত। ওকে ১২০ টাকা দিই।

- বাড়িতে কে কে আছে ওর?

- কেউ নেই তেমন। মা মারা গেছে। বাবা আরেকটি বিয়ে করেছে। ওর নানা-নানি বয়স্ক হয়ে গেছে। কোন কাজ করতে পারে না। এই ছেলেটি কাজ করে নানা-নানিকে খাওয়ায়।

আমার কাছে এবার অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। সারাজীবন ভালোবাসা, মায়া, স্নেহে বঞ্চিত বলেই, এই ছেলেটার হৃদয় ভালোবাসা আর মায়ায় পরিপূর্ণ।

ছোট্ট ছেলেটিকে কাছে ডাকলাম। বললাম, "লেখাপড়া করেছো?"

- না স্যার।

- ঢাকার দিকে কোন কাজ ম্যানেজ করে দিলে যাবা? একটু বেশি বেতনের?

- নানা-নানি চলতে পারে না। তাদের গোসল করার পানি তুলে দিতে হয়। টয়লেটের, অযুর। খাওয়ার রান্না করতে হয়। আমি এদের রেখে যেতে পারবো না স্যার।

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে ফিরে এসেছি। মনটা কেমন ভার হয়ে আছে। ছেলেটা সারাদিন কাজ করে একশত কুড়ি টাকা পায়। তিন জন মানুষের সংসার। কীভাবে চলে! এর থেকে সে আবার অসহায়দের দান করে!

মন খারাপ হলে আমি আল-কুরআন খুলে বসি। আজও কুরআনুল কারীম খুলতেই সূরা আল-বাকারার একটি আয়াতে চোখ আটকে গেল। "এরা নিজেদের রিজিক থেকে অসহায়দের দান করে ..."

আমি আয়াতটির তাফসীর পড়া শুরু করলাম। সেখানে লেখা, "মানুষের এমন পরিমাণ দান করা উচিত, যাতে তার নিজের খাবারে টান পড়ে।"

মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে। নিজের খাবারে টান পড়া মানে, গোশত খেতাম, দান করার কারণে এখন মাছ খেতে হচ্ছে। দুই প্যাকেট ভাত খেতাম এখন এক প্যাকেট খেতে হচ্ছে।

কী অদ্ভুতভাবে আয়াতটি আমার কাছে খুলে যাচ্ছে! তাবুক যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন, "আজ কে বেশি দান করতে পারো দেখি?"

উসমান (রাঃ) একশত উট দিয়েছিলেন। উমর (রাঃ) তার সম্পদের অর্ধেক দিয়েছিলেন। আবু বকর (রাঃ) দিয়েছিলেন এক মুষ্টি খেজুর বা একটু জব জাতীয় কিছু আর তার বাড়িতে ঐটুকু সম্পদই ছিলো।

রাসুল (সাঃ) যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হলো, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) দানে প্রথম হয়েছে। সে তার সম্পদের শতভাগ দিয়েছে।

আমার চোখে ইসলামের ইতিহাসের সেই সোনালি দিন, আজকের ঐ হোটেল কর্মচারী আর আল-কুরআনের আয়াত "তারা রিজিক থেকে অসহায়দের দান করে" এই বিষয়গুলো এক অসহ্য ভালোলাগার এবং পরিতাপের বিষয় হয়ে উঠলো। কী করতে পারলাম জীবনে ভাবতে গিয়ে চোখ থেকে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা পানি পড়লো আল-কুরআনের পাতায়। আমি তাড়াতাড়ি কুরআনুল কারীম বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আরশে আজীম থেকে আল্লাহ তায়ালাও নিশ্চয় আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কোন কিছুই তো তার দৃষ্টির আড়ালে নয়।

৭১-এর ইন্দিরা

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। ফোনে কথা বলছেন চীন সফররত তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে। এক পর্যায়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের এক দেশের এক প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ আসতেই গালি দিলেন কুত্তি বলে।

ইংরেজিতে পুরো লাইনটা ছিল – ‘We really slobbered over the old bitch’

সেদিনের টেলিফোন আলাপে নিক্সনের গালি খাওয়া নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধী এই নোংরা গালিটা খেয়েছিলেন, লাল-সবুজের একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের জন্মলগ্নে সমর্থন দিতে গিয়ে।

সময়: ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১; সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট।

এর আগে ২৫ নভেম্বর, মিটিং-এ ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলে এসেছেন - পূর্ব বাংলায় মানুষ মরছে। সারাবিশ্ব ঘুমে থাকলেও আমি চুপ থাকবো না।

চীনা-মার্কিন প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী- “পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো যাবে না”; এই শর্তে তিনি রাজি হননি। উল্টো সারাবিশ্বের ২৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে মানুষ হত্যার বিবরণ দেখিয়েছেন; সমর্থন চেয়েছেন।

খাবার দিয়ে গেছেন ০৮ মাস; নব্বই লাখ ভুখা রিফিউজি মানুষকে। অথচ নিজের দেশের উত্তরাঞ্চলে তখন ফসল হয়নি; লাখ লাখ মানুষ না খেয়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধীর শক্ত অবস্থান- “মানুষ মরছে। কে কোন ধর্মের তা বিবেচ্য নয় ! আমরা মানুষকে বাঁচাতে চাই।”

এই আলোচিত টেলিফোন আলাপের সপ্তাহখানেক আগেই; কিসিঞ্জার বলছেন- এটা তো পাকিস্তানের ঘরের ঝগড়া। আমরা কি নিরপেক্ষ থাকতে পারি না, মিসেস গান্ধী?

ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন- “এরকম নিরপরাধ লোকদের গণহত্যা, ধর্ষণ আর লুটতরাজ দেখে যে নিরপেক্ষ থাকে; সেও আরেকজন অপরাধী, মি. কিসিঞ্জার।”

যাহোক, নিক্সন আর কিসিঞ্জারের গোপন সেই নোংরা টেলিফোন আলাপ এতদিন কেউ জানতো না।

৪৫ বছর পর সিআইএ পুরো বক্তব্যটা রিলিজ করেছে। ডিক্লাসিফাইড ফাইল আকারে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে ভালো বইয়ের একটি “The Blood Telegram: Nixon, Kissinger, and a Forgotten Genocide”। এটাতেও এসেছে প্রসঙ্গটি।

তাছাড়া, উইকিলিকসের মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসী শুনেছে। এখন ইউটিউবেও আছে পুরো আলাপচারিতা গত কয়েক বছর ধরে। আছে সেই সাথে অসভ্য গালিটাও।

কুখ্যাত প্রেসিডেন্ট নিক্সন বেঁচে নেই। প্রায় বুড়ো কিসিঞ্জার ক্ষমা চেয়েছেন, ভারতের লোকজনের কাছে। তিনিও ক্ষেপে গিয়ে বাস্টার্ড ইন্ডিয়ানস বলেছিলেন।

সেদিন একটা সদ্য ভূমিষ্ঠ মানচিত্রকে সমর্থন দিতে গিয়ে old bitch হয়েছিলেন যে ইন্দিরা গান্ধী গত ৩১ অক্টোবর ছিল তার মৃত্যু দিবস।

ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ তার নাম রেখেছিলেন প্রিয়দর্শিনী।

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধী।

এই ভদ্রমহিলার কাছে ঋণ স্বীকারে ত্রুটি করতে চাই না।
ইন্দিরার ত্যাগ আর তিতিক্ষার ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না।

জাফরুল্লাহ চৌধুরী- ভরসার জায়গা

ছর কয়েক আগে আব্বার কিডনি ফেল করল। প্রস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। সরকারি কিডনি হাসপাতালে নিলাম। ডাক্তাররা বলল ডায়ালাইসিস লাগবে। ডায়ালাইসিস কথাটা ইংরেজিতে যে রকম মিষ্টি শোনায় ঘটনা সে রকম না। ঘটনা ভয়াবহ। দেখলাম আব্বার পাশের শয্যাগুলোতে একেকজন রোগীর ডায়ালাইসিস করা হচ্ছে। বিরাট দুই বক্স স্যালাইন আনা হচ্ছে। একটার পর একটা স্যালাইন শরীরে পুশ করা হয়, আরেকটা দিয়ে শরীর থেকে পানি বের করে ফেলা হয়। প্রচন্ড কষ্ট। তার সঙ্গে প্রচুর টাকা খরচ। সেখানে সরকারি খরচে তখনই আড়াই হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছিল।

অনেক রোগী আছে যাদের সপ্তাহে দুই বার বা তিন বার ডায়ালাইসিস করতে হয়। ডায়ালাইসিস করাতে না পারলে রোগী ছটফট করতে করতে স্বজনদের সামনে মারা যাবে। যেভাবে হোক টাকা যোগাড় করতেই হবে।

ডাক্তাররা বলল, আমার আব্বার বয়স বেশি। সাধারণ অবস্থায় ডায়ালাইসিস করা যাবে না। আইসিইউর মধ্যে না রেখে তাঁকে ডায়ালাইসিস দিলে উনি নিতে পারবেন না, মারা যাবেন। ওই হাসপাতালে আইসিইউ পাওয়া যাবে না। বেসরকারি হাসপাতালে খোঁজ নিতে বললেন তাঁরা। আমি শমরিতায় গেলাম। তারা বললেন, তাঁদের আইসিইউ সুবিধা নিতে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আমাকে ৬০ হাজার টাকা দিতে হবে। স্কয়ারের কাছে ভয়ে গেলাম না। পরে ওই সরকারি কিডনি হাসপাতালেরই কয়েকজন ডাক্তার বললেন, মোহাম্মাদপুরে একটা ক্লিনিক আছে। ওখানে নিতে পারেন, খরচ কম। সেখানে গিয়ে শুনি তারা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় নেবেন ৩০ হাজার টাকা। সকাল ১০টায় তাদের দিনের মেয়াদ শেষ হয়। মানে ১০টা ক্রস করলেই

অটোমেটিক্যালি আমাকে আবার ৩০ হাজার দিতে হবে, ওই দিনের পুরোটা সময় যদি রোগী নাও থাকে। আমি রাজি হলাম। আব্বাকে নেওয়ার পর গিয়ে দেখি যে ডাক্তাররা তাঁকে ডায়ালাইসিস দেওয়ার কাজ করছেন তাঁরা ওই সরকারি হাসপাতালেরই। আমি খুবই অবাক হলাম। পরে জানলাম, ওই ডাক্তাররা মিলে এই ক্লিনিক দিয়েছেন। সরকারি হাসপাতালের রোগীদের তারা নিজেরাই এখানে আনার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। দুই দিন রাখার পর বুঝলাম আব্বার সময় শেষ। তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলাম। ক্লিনিকের ডাক্তাররা বললেন, আরও দুদিন থাকুক। আমি রাজি হলাম না। দুদিন পর আব্বা মারা গেলেন।

এরপর আমার এক খালাকে দেখলাম ভয়াবহ কষ্ট নিয়ে মরতে। তাঁর ডায়ালাইসিসে মনে হয় কোটি খানিক টাকা খরচ হয়েছে। পুরো পরিবারের সমস্ত সঞ্চয় শেষ হয়ে গেছে।

কোনো গরীব মানুষের যদি কিডনি বিকল হয় আর তার ডায়ালাইসিস দরকার হয় তাহলে তাঁর দ্রুত মৃত্যু কামনা করা উচিত। কারণ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে এভাবে ডায়ালাইসিস করে যেতে হয়। স্বজনেরা পথে বসে যায়।

কিন্তু এইসব মানুষের জন্য বিরাট ভরসার জায়গা হয়ে আছে ড. জাফরুল্লাহর গণস্বাস্থ্য। মাত্র সাত শ' টাকায় সেখানে ডায়ালাইসিস করার সুযোগ আছে। হতদরিদ্র হলে আরও অনেক কম টাকা নেওয়া হয়।

জাফরুল্লাহ নিজে একজন কিডনি রোগী। এই লোকটা দীর্ঘদিন ডায়ালাইসিস করে বেঁচে আছেন। বহু গরীব মানুষের বেঁচে থাকার উসিলা হিসেবে তাঁকে দিয়ে আল্লাহপাক কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আমার আব্বার কিডনি ফেইলিয়রের কথা, আমার খালার ডায়ালাইসিসের কথা যখন মনে পড়ে তখন জাফরুল্লাহর জন্য দোয়া করি। আমার মতো অনেকেই টেনশনে আছেন, এই লোকটার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র আর গরীববান্ধব থাকবে কিনা। ওনার সাথে সরাসরি আমার কোনোদিন আলাপ হয়নি। কিন্তু আই রিয়েলি ফিল হিম অ্যাজ মাই ফাদার। গরীব খেটে খাওয়া দিনমজুর কিডনি রোগীদের চিকিৎসার জন্য তাঁর বেঁচে থাকা দরকার। প্লিজ তাঁর জন্য দোয়া করুন।

পোর্ট্রেট অব প্রকৃত বাংলাদেশী

৮০ বছর বয়স্ক সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদের সেক্রেটারী জেনারেল থাকাকালীন সময় অথরিটির দূর্নীতি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন – ষাটের দশকের কথা।

১৯৭১ লন্ডনে পাকিস্তানী পাসপোর্ট পুড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

ডাক্তারদের বড় ডিগ্রী এফএরসিএস উপেক্ষা করে রণাঙ্গনে ৪৮০ বেডের হাসপাতালের তদারকি নিয়েছিলেন।

তিনটি বৈশ্বিক সম্মাননা পেলেও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে পাবেন প্রীতিলতা সেন মাস্টারদা সূর্যসেন সহ বিশ্বখ্যাত বিপ্লবীদের ছবি আর আমাদের বীরশ্রেষ্ঠদের ছবি।

কেবিন বুকড থাকার পরও আপনি হাসপাতালে না গিয়ে বাসায় আছেন কেন?

আমি তো ডাক্তার। করোনা রোগ নিয়েও কাজ করছি। আমি জানি, করোনা রোগীর কোন সময় হাসপাতালে যেতে হবে আর কোন সময় বাসায় থাকতে হবে। করোনা শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চলে যেতে হবে এটি একেবারেই ঠিক নয়।

আমি যদি হাসপাতালে গিয়ে কেবিনে উঠি তাহলে জনগণের কাছে ভুল বার্তা যাবে যে, শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চলে যেতে হয়।

করোনা রোগীদের জন্যে আমি ভুল বার্তা দিতে চাই না। ফলে, আমার জন্যে ঢাকা মেডিকেলে কেবিন বুকিং দিয়ে রাখা সত্ত্বেও আমি হাসপাতালে না গিয়ে বাসায় আছি। এটাই করোনা রোগের সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি।

সবার ক্ষেত্রে এটাই করা উচিৎ। এমনিতেই হাসপাতালে জায়গা নেই। যাদের দরকার নেই তারাও যদি হাসপাতালে চলে যাই, তাহলে তো সংকট আরও বাড়বে।

আপনি প্লাজমা থেরাপি কোথায় নিলেন?
গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে প্লাজমা থেরাপি নিয়েছি।
সেখানে প্লাজমা থেরাপির ব্যবস্থা আছে?

থাকবে না কেন? আমরা একটা হাসপাতাল বানিয়েছি সেই হাসপাতালে যদি আমাদের নিজেদের চিকিৎসাই করতে না পারি, তাহলে তা থাকারণ কোনো অর্থ নেই। যে হাসপাতালে আমরা নিজেদের চিকিৎসা করতে পারব না, সেই হাসপাতাল রাখব কেন? সেই হাসপাতাল তৈরি করব কেন?

আমি আমার সব রকমের চিকিৎসা আমাদের হাসপাতালে করি।

আজ থেকে ১৮ বছর আগে যখন আমার চোখের অপারেশন করা দরকার হয়েছিল তখন আমি তা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে করিয়েছিলাম। তখন আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য ছিলাম। সেসময় পৃথিবীর যে কোনো দেশে, পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশের উন্নত হাসপাতালটিতেও আমি বিনা পয়সায় চোখের অপারেশন করাতে পারতাম। কিন্তু, আমি তা করাইনি। জনগণের মাঝে কখনোই কোনো ভুল তথ্য বা ভুল বার্তা দিতে চাইনি। চোখের অপারেশন আমি আমাদের হাসপাতালেই করিয়েছি এবং বাংলাদেশের মানুষকে বুঝাতে চেয়েছি যে এই অপারেশন বাংলাদেশেও করা যায় এবং তা খুবই মানসম্পন্ন।

১৮ বছর আগে আমি চোখে যে অপারেশন করিয়েছিলাম তা বাংলাদেশের হাসপাতাল তথা আমাদের হাসপাতাল সফলভাবে করেছিল। আজকে পর্যন্ত আমার চোখে কোনো সমস্যা নেই। আমাকে চশমাও ব্যবহার করতে হয় না।

আমার আমেরিকা-ইউরোপের বন্ধুরা অনেকবার উদ্যোগ নিয়ে বলেছে, চলে আসো। বিনা খরচে আমরা তোমার কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ব্যবস্থা করবো।

রাজি হইনি। কারণ, আমি একা সুবিধা নেব আর বাংলাদেশের সব মানুষ বঞ্চিত থাকবে, তা হতে পারে না।

ডেইলি স্টারকে ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

নবাব সলিমুল্লাহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা, যার দান করা ৬০০ একর জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল, বুয়েট সেই নবাব স্যার সলিমুল্লাহরকে স্মরণ করে না কেউ।

জীবনী :

নবাব সলিমুল্লাহর জন্ম ১৮৭১ সালের ৭ ই জুন। তাঁর বাবা ছিলেন নওয়াব স্যার খাজা আহসানউল্লা (১৮৪৬-১৯০১) এবং দাদা ছিলেন নওয়াব স্যার খাজা আবদুল গণি (১৮১৩-৯৬)। এই দুজনই ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। নিঃসন্দেহে পরিবারটি ছিল অভিজাত ও ধনাঢ্য। কিন্তু অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ মনে করতেন। তিনি অকাতরে দান-খয়রাত করে গেছেন।

স্যার সলিমুল্লাহর বাবা আহসানউল্লা ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর সাড়ে ৩ লাখ টাকা খরচ করে ঢাকায় তথা বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রথম বিজলি বাতির আলো জ্বলেছিল আহসান মঞ্জিলে।

১. নবাব সলিমুল্লাহ সেই যিনি সর্বপ্রথম পানীয় জল এবং টেলিফোন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে আধুনিক ঢাকার জন্ম দেন।

২. ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯০২ সালে তিনি ১লাখ ২০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। সেই টাকায় এবং তাঁর দান করা জমিতে স্থাপিত হয়েছিল আহসানউল্লা স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৯২২ সালে যা আহসানউল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ১৯৬০ সালে আহসানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে উন্নীত হয়। সেটিই এখনকার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)।

৩. নবাব সলিমুল্লাহ যিনি ১৯০৩ সালে বড় লাট লর্ড কার্জন ঢাকায় সফরে এলে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ বৈঠকে তার নিকট পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। শেষ পর্যন্ত ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের বিষয়ে ইংরেজরা মত দেয়।

৪. নবাব সলিমুল্লাহ যিনি ১৯১১ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকার কার্জন হলে ল্যান্সলট হেয়ারের বিদায় এবং চার্লস বেইলির যোগদান উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নওয়াব আলী চৌধুরীকে নিয়ে পৃথক দুটি মানপত্র নিয়ে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জমিই শুধু দান করেননি, প্রধান অর্থদানকারীও ছিলেন। এতে তাঁর অর্থভাণ্ডারে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। শেষে সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছিল। জমিদারি চলে গিয়েছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডসে।

৬. নবাব সলিমুল্লাহ যিনি ১৯০৬ সালে নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য এবং ধর্ম রক্ষায় প্রায় ছয় মাসের প্রচেষ্টায় পাক-ভারত উপমহাদেশে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠন করেন।

৭. নবাব সলিমুল্লাহ যিনি আন্দোলন করে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক শিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের জন্য সহকারী পরিদর্শক ও বিশেষ সাব-ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন।

৮. নবাব সলিমুল্লাহ যিনি বর্ণবাদী-ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদে শত বছরের অধিক চাষাভূষা, কচোয়ান-দাঁরোয়ান ও গোলাম বানিয়ে রাখা মুসলিমদের কথা ভেবে প্রথম জেগে উঠেন, তারপর মুসলিমদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন।

৯. নবাব সলিমুল্লাহ, যিনি সুদূর তুরস্কের ভূমিকম্পে মানুষের কষ্টের কথা শুনে সাহায্যের জন্য টাকা-পয়সা পাঠিয়েছিলেন।

১. নবাব সলিমুল্লাহ, যিনি মানুষকে তার সকল সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে ঋণী হয়েছিলেন। সোনালী ব্যাংক সদরঘাট শাখায় এখনও তার বন্ধক রাখা সিন্ধুক "দরিয়ায়ে নূর" রক্ষিত আছে।

আচ্ছা আমরা ক'জন জানি এই মহান ব্যক্তির কথা? তার অসামান্য কীর্তির কথা? এই বুয়েট না থাকলে কারা বিশ্বমানের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগ করে দিত?

জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাড়িয়েছে যেখানে।

রহস্যজনক মৃত্যু :
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে তৎকালীন কোলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং লাটের সাথে তার বাদানুবাদ হয়।

কথিত আছে যে, বড়লাট রাজি ছিলেন না ঢাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে। এই নিয়ে নবাবের সাথে বড় লাটের তীব্র বিতর্ক হয়, এক পর্যায়ে তিনি হাতের লাঠি দ্বারা টেবিলে আঘাত করলে বড় লাটের দেহরক্ষীর গুলি বর্ষণে নিহত হন। প্রচার করা হয় যে তিনি Heart attack এ কোলকাতায় মারা গেছেন।

সেদিনই কোলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর জানাজায় বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। পরদিন লাশ ঢাকায় আনা হয় এবং কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকার বেগমবাজারে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

উনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, আল্লাহ উনাকে জান্নাত দান করুন (আমিন)

কাগমারী

"পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই। ১২ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।" বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ১৪ বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আগত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ কথা বলেছিলেন মওলানা ভাসানী।

১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উল্লেখ ছাড়া বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লাখো মানুষের এই সমাবেশেই মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক-শোষকেরা পূর্ব বাংলার প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে, তাতে জনগণ পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম জানাবে। শব্দ দুটি তখন মানুষ উচ্চারণ করেছিল স্বাধীনতার সমার্থক হিসেবে। এই সম্মেলনেই তিনি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বলেন, বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়েও আমি এই চুক্তি সমর্থন করবো না ! ভাসানীর দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলশ্রুতিতেই তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে গঠন করেন 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ)।

ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য এই সম্মেলন সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্যনির্ভর আকরগ্রন্থ ছিল না। এই অভাববোধ বহুলাংশে পূরণ করবে বিশিষ্ট সাংবাদিক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ *কাগমারী সম্মেলন: মওলানা ভাসানীর পূর্ব বাংলার স্বাধিকার সংগ্রাম।*

চমকপ্রদ সব তথ্য ও ঘটনার বিবরণ সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ বইটি এখন পাওয়া যাচ্ছে পিবিএস-এ।

আজ হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেল

১. পঞ্চাশোর্ধ্ব এক করোনা রোগী সুইসাইড নোট লিখে মুগদা হাসপাতাল থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। লিখে গেছেন, নিজের একাকীত্বের কথা। টাকা ছিল, পয়সা ছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ছিল না কাছে। পরিবার ও আত্মীয়দের সবাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রসহ 'উন্নত' দেশে! একাকীত্ব সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন বলে লিখে গেছেন!

২. চলচ্চিত্রের 'মিষ্টি মেয়ে' খ্যাত নায়িকা, সাবেক সাংসদ কবরী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মারা যাওয়ার পর তার একটি সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ ভাইরাল হয়েছে। তা হলো, জীবনে ভালো একজন বন্ধু পেলাম না, ভালো একজন স্বামী পেলাম না, সন্তানরাও যে যার মতো! কারো সাথে বসে এক কাপ চা খাবো, মনের কথা খুলে বলব – তা পেলাম না!

৩. "বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর" লেখক, খ্যাতনামা কলামিস্ট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর তারেক শামসুর রাহমানের লাশ নিজের বাসা থেকে দরজা, তালা ভেঙে উদ্ধার করা হয়েছে! বাসায় তিনি ছিলেন একা। স্ত্রী ও কন্যা আছেন যথারীতি 'স্বপ্নের দেশ' যুক্তরাষ্ট্রে! অসুস্থ ও মৃত্যুর সময় কেউ ছিল না পাশে, কেউ জানেনি কিছু!

টাকা, পয়সা, যশ, খ্যাতি, পরিচিতি সবই ছিল। কিন্তু পাশে ছিল না স্ত্রী, স্বামী বা পুত্র-কন্যা! ছিল একাকীত্ব! অখণ্ড একাকীত্ব!

প্রত্যেকের মৃত্যুতে খুব কষ্ট লেগেছে।

কিন্তু 'উন্নত' মহলে আমাদের সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা কোনদিকে যাচ্ছে তা ভাবতে গিয়ে আবারও শিউরে উঠেছি!

হায় রে ক্যারিয়ার, হায় রে উন্নয়ন, হায় রে উন্নত বিশ্বের স্বপ্ন! হায় রে, পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা!

একটু চিন্তা করতে পারেন, একটু ভাবতে পারেন।
আহা রে জীবন!!

বজ্রপাত ও বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর ২০টি নির্দেশনা

১. বজ্রপাতের ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।

২. প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।

৩. খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যান।

৪. কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান।

৫. খোলা জায়গায় কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। গাছ থেকে চার মিটার দূরে থাকতে হবে।

৬. ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।

৭. ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পয়েন্টগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।

৮. বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকে মতো করেই চিকিৎসা দিতে হবে।

৯. এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরে অবস্থান করুন।

১০. যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

১১. বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।

১২. ঘন-কালো মেঘ দেখা গেলে অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন।

১৩. উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

১৪. বজ্রপাতের সময় জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন।

১৫. বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকবেন না।

১৬. কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকুন।

১৭. বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন।

১৮. বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন।

১৯. বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।

২০. বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।

পদ্মা সেত

Arifur Rahman

৮৮ বছর আগে ১৯৩৪ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন পূর্বাশা পত্রিকায় ৯ পর্ব পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'পদ্মানদীর মাঝি'। উপন্যাসটি বাকি পর্বসহ ১৯৩৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ভারতের উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই বইটি। অনেক প্রাদেশিক ভাষাসহ ইংরেজি, চেক, রুশ, লিথুয়ানিয়ান, নরওয়েজিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, সুইডিশ ও জাপানী ভাষায় এই উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে বাংলাদেশে অনেক নদনদী থাকলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারণে 'পদ্মা' নামটি পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী মহলে ধীরে ধীরে বিখ্যাত হয়েছিলো।

পদ্মা নদীর পাড়ের বিক্রমপুর-ফরিদপুর অঞ্চলের কেতুপুর গ্রামের এক হত দরিদ্র ইলিশ জেলে 'কুবের' এর চরিত্র চিত্রায়ণ করতে যেয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মার ভাঙন প্রবণতা ও প্রলয়ংকরী স্বভাবের বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখার কারণেই হোক অথবা স্বাভাবিক কারণেই হোক পদ্মা উপাধি পায় 'কীর্তিনাশা' এবং 'রাক্ষুসী'।

বাঙালি মানসপটে 'পদ্মা' নামটির সাথে সবসময় জড়িত থাকে পদ্মার জেলে ও মাঝিদের জীবনের বেদনা, দুঃখ, নদীভাঙা মানুষের অভাব-অভিযোগ। এই মানুষদের প্রতিটি দিন কাটে অসহায় ক্ষুধা আর দারিদ্রের সাথে লড়াই করে। দুবেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই তাদের জীবনের পরম আরাধ্য এবং শুধু সেটুকু পেলেই তারা হয় পরম তৃপ্ত ও সুখী মানুষ।

সেই রাক্ষুসী পদ্মাকে বশে এনে দরিদ্রতার বদলে কোটি কোটি পদ্মা জড়িত মানুষদের ভবিষ্যৎ অফুরন্ত সম্ভাবনা-সমৃদ্ধি, সচ্ছল ও সহজ জীবনের অঙ্গীকারের সত্যি গল্প নিয়ে একটি নতুন উপন্যাস লেখা হলো যার নাম 'পদ্মাসেতু'। এই গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন হবে আগামীকাল।

পদ্মাসেতু উপন্যাসের ভাবনা অনেকের চাহিদার মধ্যে থাকলেও তা পরিকল্পনা, রচনা ও প্রকাশনার মূল কৃতিত্ব একজন মানুষকেই দেয়া যায়, তিনি হচ্ছেন শেখ হাসিনা।

গ্রন্থ প্রকাশ হলে সেটির ভালোমন্দ নিয়ে পাঠককুল মন্তব্য করবে এটি স্বাভাবিক। লেখিকার সাফল্যের সম্ভাবনায় পরশ্রীকাতরতামূলক অনেক আগাম নেতিবাচক কথাবার্তা আমরা শুনেছি যার একটিও সত্যি হয়নি। লেখিকা এতে মনোঃক্ষুণ্ন হয়ে কোনো সমালোচককে টুস করে পদ্মায় ফেলে দিতে আবার কাউকে চুবিয়ে উঠাতে বলেছেন ঠাট্টা করে- পাঠককুল মজা পেয়েছে তাঁর ভাষার সৌকর্যে।

পদ্মাসেতু গ্রন্থ প্রকাশনায় খরচাপাতি বেশি হয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু কারো যদি মনে থাকে যে পিলার বসাতে গিয়ে নদীর তলদেশে আরেকটি প্রবহমান নদী আবিষ্কার হবার পরে যে হতাশাজনক অবস্থা তৈরি হয়েছিলো, সেখান থেকে উত্তরণের জন্য কত কত বেশি খরচের প্রয়োজন হতে পারে তা সাধারণ মানুষ না বুঝলেও প্রকৌশলীরা ঠিকই বোঝেন। এর পরেও যারা খরচা বেশি বলে অনুযোগ করবেন, তারা আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে আগামী ৩৫ বছরে পুরো খরচ উঠে আসবে। ইতিমধ্যে জাপানী প্রযুক্তিতে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু অথবা ভূগর্ভস্থ দ্বিতীয় পদ্মা যোগাযোগ চালু হয়ে যাবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পদ্মার দরিদ্র জীবনধর্মী উপন্যাস লিখে কালজয়ী হয়ে আছেন তেমনি সচ্ছল জীবনধর্মী পদ্মাসেতুর রূপকার ও কলাকার হিসেবে শেখ হাসিনা ধ্রুব নক্ষত্রের মতো পদ্মার আকাশে জ্বল জ্বল করতে থাকবেন ইতিহাসে। পঞ্চাশ বছর পরে বাইরের বেনিয়ারা যখন এই সেতু অতিক্রম করে ঢাকা থেকে বরিশাল যাবেন দেড় ঘণ্টায় তারা একবার হলেও শেখ হাসিনার কথা ভাববেন সেদিনও।

আওয়ামী লীগের সমর্থক না হলেও, শেখ হাসিনার অনুসারী না হলেও পদ্মাসেতু নির্মাণে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও কমান্ডের সার্থকতাকে অস্বীকার করা মানে চন্দ্র সূর্যের মতো সত্যিকে অস্বীকার করা। কথাটি আমাকে বলেছেন জাপান থেকে বাংলাদেশ সফর করতে আসা শ্রীমতি মাসুয়ামা আয়ুমী এবং জনাব মাশিকো ইউটারো। এরা দুজনেই মানিক বাবুর পদ্মানদীর মাঝি বইটির অনুবাদ পড়েছেন। তাদের অনুরোধে দুজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম পদ্মায়।

বললাম, তোমরা এতো উচ্ছ্বসিত কেনো?

মাসুয়ামা বললো, আমার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে বাংলাদেশের মতো এতো গাড়ির হর্ন আমি কখনো শুনি নাই, আজান দিয়ে সুরে সুরে মসজিদে ডাকার ব্যাপারটি দেখে আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয়েছে প্রতিবার। আর পদ্মায় এসে সাগরের মতো বিশাল ফ্যাকাশে পানির ঢেউয়ের মিষ্টি নাচনের সাথে এই সেতুর সম্মিলন দেখে আমার আর টোকিওর গিনজা ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ওদের দুজনের শখ মেটাতে অনুমতি নিয়ে মাঝ নদীতে একটি পিলার স্পর্শ করানোর সুযোগ যাঁরা দিয়েছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ওরা আজ সকালে।

কালকে উদ্বোধন হবে দশ লক্ষ মানুষ মিলে, এ খবর আমার কাছে শুনে বন্ধু মাশিকো ইউটারো বললো, ইশ আমি যদি থাকতে পারতাম এই আনন্দে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপান যেভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিলো আমাদের বাপ দাদার মতো সংগ্রামী মানুষদের পরিশ্রমে, আমি জানি কালকে সেই ধরণের বাংলার মানুষেরা মিলবে পদ্মার পাড়ে। এরা ঠিকই একদিন আমাদের জাপানের সমকক্ষ ও সহযাত্রী হবে আমি এবার বুঝে এসেছি।

হে আল্লাহ, আপনি বাংলার দুঃখী মানুষের বেদনা দূর করে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জাতি হবার সক্ষমতা দান করুন। আর যা কিছু ভালো হয় তার জন্যে শুধু আপনারই প্রশংসা করি।

পদ্মা সেতু (জেনে রাখা ভাল)

১. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর প্রকল্পের নাম কী?
উত্তর : পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।

২. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ৬.১৫ কিলোমিটার।

৩. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর প্রস্থ কত?
উত্তর : ৭২ ফুটের চার লেনের সড়ক।

৪. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুতে রেললাইন স্থাপন হবে কোথায়?
উত্তর : নিচ তলায়।

৫. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর ভায়াডাক্ট কত কিলোমিটার?
উত্তর : ৩.১৮ কিলোমিটর।

৬. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়ক কত কিলোমিটার?
উত্তর : দুই প্রান্তে ১৪ কিলোমিটার।

৭. পশ্ন : পদ্মা সেতু প্রকল্পে নদীশাসন হয়েছে কত কিলোমিটার?
উত্তর : দুই পাড়ে ১২ কিলোমিটর।

৮. প্রশ্ন : পদ্মা সেতু প্রকল্পে মোট ব্যয় কত?
উত্তর : মূল সেতুতে ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।

৯. পশ্ন : পদ্মা সেতু প্রকল্পে নদীশাসন ব্যয় কত?
উত্তর : ৮ হাজার ৭০৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা।

১০. প্রশ : পদ্মা সেতু প্রকল্পে জনবল কতজন?
উত্তর : প্রায় ৪ হাজার।

১১. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর ভায়াডাক্ট পিলার কয়টি?
উত্তর : ৮১টি।

১২. প্রশ্ন : পানির স্তর থেকে পদ্মা সেতুর উচ্চতা কত?
উত্তর : ৬০ ফুট।

১৩. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর পাইলিং গভীরতা কত?
উত্তর : ৩৮৩ ফুট।

১৪. প্রশ্ন : প্রতি পিলারের জন্য পাইলিং কয়টি?
উত্তর : ৬টি।

১৫. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর মোট পাইলিং সংখ্যা কত?
উত্তর : ২৬৪টি।

১৬. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হবে কবে?
উওর : ২০২২ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

১৭. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুতে কী কী থাকবে?
উত্তর : গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অপটিক্যাল ফাইবার লাইন পরিবহন সুবিধা।

১৮. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর ধরণ কেমন?
উত্তর : দ্বিতলবিশিষ্ট এই সেতু কংক্রিট আর স্টিল দিয়ে নির্মিত হবে।

১৯. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুর পিলার সংখ্যা কত?
উত্তর : ৪২টি।

২০. প্রশ্ন : পদ্মা সেতু প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির নাম কী?
উত্তর : চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড।

VALUES are not valued in our society!!

কালিদাস - মা আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত, একটু জল দিন বড়ই পুণ্য হবে।

বৃদ্ধা - বাবা তোমায় তো আমি চিনি না, নিজের পরিচয় দাও, আমি অবশ্যই জল খাওয়াবো।

কালিদাস বললেন - আমি পথিক, দয়া করে একটু জল দিন।

বৃদ্ধা বললেন - তুমি পথিক কি করে হতে পারো? পথিক তো কেবল দুজন, এক সূর্য, দ্বিতীয় চন্দ্র এরা কখনো থামে না সর্বদাই চলায়মান। তুমি এদের মধ্যে কে সত্যি করে বল?

কালিদাস বললেন - তাহলে আমি অতিথি, বড়ই তৃষ্ণার্ত দয়া করে আমাকে একটু জল পান করান।

বৃদ্ধা বললেন - তুমি অতিথি কি করে হতে পারো ? সংসারে দুজনই মাত্র অতিথি, এক অর্থ বা সম্পদ আর দ্বিতীয় যৌবন - এরা আসেন আবার চলেও যান, সত্যি করে বলো তুমি কে?

কালিদাস তর্কে পরাজিত এবং হতাশ হয়ে বললেন - আমি একজন সহ্যশীল, এবার অন্তত একটু জল দিন!

বৃদ্ধা বললেন – না না সহ্যশীল তো মাত্র দুজন, এক ধরিত্রী যিনি পাপী-পুণ্যাত্মা সকলের ভার গ্রহণ করেন বা বহন করেন। দ্বিতীয় বৃক্ষ - তাকে যতই পাথর দিয়ে আঘাত করো তবু সে মিষ্টি ফল দিয়ে সেবা করে যায়। সত্যি বলো তুমি কে?

কালিদাস বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন – তাহলে আমি উদ্ধত হঠকারী এবার অন্তত একটু জল তো দিন।

বৃদ্ধা বললেন – অসত্য বলছো। হঠকারী দুই – এক নখ আর দ্বিতীয় চুল এদের যতবারই কাটো এরা বার - বার বেড়েই ওঠে। সত্য বল ব্রাহ্মণ, তুমি কে?

অপমানিত পরাজিত কালিদাস বললেন – তাহলে ধরুন আমি মূর্খ, এবার একটু জল দেবেন কি?

বৃদ্ধা বললেন – না, তুমি মূর্খ কি করে হতে পারো ? মূর্খ তো দুজন ! এক এমন রাজা - যিনি বিনা যোগ্যতাতেই সবার উপর শাসন করেন। আর দ্বিতীয় এমন রাজপণ্ডিত বা পুরোহিত যিনি রাজাকে প্রসন্ন করার জন্য ভুলভাল তর্কের সাহায্যে ভুলকেও সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

কালিদাস – আর কিছু না বলতে পেরে সাষ্ঠাঙ্গে বৃদ্ধার পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

বৃদ্ধা বললেন - ওঠো বৎস।

কণ্ঠস্বর অন্যরকম হওয়ায় কালিদাস চোখ তাকিয়ে অবাক দৃষ্টিতে দেখলেন স্বয়ং মা সরস্বতী তাঁর সামনে দণ্ডায়মান। কালিদাস করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মা বললেন - বৎস সর্বদা মনে রেখো শিক্ষা বা বিদ্যা কখনো দম্ভ বা অহংকার দেয় না, যা দেয় তা হল বিনয় এবং বিনম্রতা।

রক্তে চিনি কমাবো কেমনে?

তার আগে জেনে দেখি, রক্তে এই চিনি বাড়ে কেন! না জেনে তো আর যুদ্ধ করা যায় না – এটা তো মহল্লার মাস্তানের মিষ্টির দোকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সহজ ব্যাপার না।

শুরু হোক গল্প!

আপনি যা যা খান – রসগোল্লা, বিরিয়ানি, পরোটা, ঝালমুড়ি – সবকিছু হজমের কারখানায় গিয়ে ভেঙে ভেঙে শেষমেশ গ্লুকোজে রূপ নেয়। সেই গ্লুকোজ তখন লাটসাহেবের মতো রক্তে ভেসে বেড়ায়। এই সময় আসে আমাদের সুপারহিরো ইনসুলিন মামা – অগ্নাশয়ের গেট থেকে হুড়মুড় করে বের হয়ে সে বলে, "এই যে চিনির দল, চলো চলো, রাখো ঘোরাঘুরি, চলো কোষদের বাড়ি। রক্তের রাস্তা বেশি সময় দখল করে থাকা যাবে না।"

কিন্তু কোষ রাজপুত্তুররা খুব লাজুক আর মুডি। ইনসুলিন মামা গেটে টোকা দেয়– "খোল খোল দ্বার, রাখিওনা আর - চিনিদের রক্তের মাঝারে!"

তখন রাজপুত্তুররা বলে, "আচ্ছা মামা, শুধু তোমার কথা শুনে খুলি, অন্য কারও জন্য না!"

গ্লুকোজ ঢুকে পড়ে কোষদের বাসায়, আর বলে, "তোদের জন্য এনেছি শক্তির বাক্স, হাঁটবি, দৌড়াবি, প্রাণে বাঁচবি!"

কিন্তু সমস্যা কোথায়?

সব কোষের পেট তো আর অত বড় না! অতিরিক্ত গ্লুকোজ নিয়ে ইনসুলিন মামা তখন দৌড় দেয় লিভারপুর আর মাসলনগরে। সেখানে চিনিকে জমিয়ে রাখে গ্লাইকোজেন নামে।

এখন বড় প্রশ্নঃ চিনি রক্তে বাড়ে ক্যান?

দুই কারণ –

১. শরীর ইনসুলিন তৈরি করতেই পারে না। (মানে, ইনসুলিন মামা চাকরি হারিয়ে বসে আছে)

২. ইনসুলিন তো আছে, কিন্তু কোষ রাজপুত্তুররা তার কথা কানে তোলে না। ইনসুলিন বেচারা গেইটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ দরজা খোলে না। সেই অবস্থার নাম – টাইপ-২ ডায়াবেটিস। আর যখন ইনসুলিন মামার কারখানা নিজেই ধ্বংস হয়ে যায় (শরীর নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লেগে যায়), তখন সেটা হয় টাইপ-১ ডায়াবেটিস – বাচ্চাদের বেশি হয়।

কিন্তু কোষগুলোর মেজাজ এমন ক্যান?
আরে ভাই, তারাও বিরক্ত হয়। যদি আপনি সারাদিন সোফায় বসে আলুর চিপস খান, পেটে চর্বির পাহাড় বানান – তাহলে কোষ তো বলবেই, "আর না! এখন আমি দরজা বন্ধ করে Netflix দেখব!"
তাছাড়া স্ট্রেস, ইনফেকশন, অপারেশন, স্টেরয়েড নেয়া, সব মিলিয়ে শরীরে কর্টিসল, অ্যাড্রেনালিন, সোমাটোট্রপিন নামের এমন কিছু হরমোন বাড়ে – যারা ইনসুলিনের কানের কাছে 'ভুং ভুং' করে ডিস্টার্ব করে। ইনসুলিন তখন বলে, "আমি আর পারছি না রে ভাই!"

চলুন এবার বাস্তব কথায় আসি– চিনি কমাবো কীভাবে?
তিনটে কাজ একসাথে করতে হবে:

১. Low GI খাবার খেতে হবে (মানে ধীর গতির চিনি – যে আস্তে আস্তে রক্তে আসে)
২. হাঁটা দিতে হবে নিয়ম করে – সপ্তাহে ১৫০ মিনিট তো হতেই হবে। সাথে হালকা ব্যায়াম।
৩. এবং ওষুধ- ডাক্তার যা বলেন, সেটা মানতেই হবে।

GI আবার কী?
গ্লাইসেমিক ইনডেক্স! মানে, একটা খাবার রক্তে গ্লুকোজ বাড়াতে কতটা দক্ষ সেটা মাপার স্কেল। ০ থেকে ১০০ পর্যন্ত।

১০-৫৫ এর মধ্যে যারা আছে, তারা ধীর-গতি চিনি।

৭০-এর ওপরে যারা, তারা 'গড়িমসি না করে রক্তে ঝাঁপ' দেওয়া চিনি!

Low GI খাবার মানে –
ডাল, যবের রুটি, ওট্স্, দুধ, সবরকমের শাকসবজি, আর ফলফলাদি যেমন – কমলা, আপেল, পেয়ারা, জাম, নাশপাতি এইসব। সবাই কিউট আর স্লো মুভিং। রক্ত নালিতে যাবার কোন তাড়া নেই।

মাঝারি GI –
লাল চাল, আটার রুটি, আম,লিচু, কলা, আঙুর ইত্যাদি।

High GI –
সাদা ভাত, আলু, মিষ্টি কুমড়া, পাউরুটি, কর্নফ্লেক্স, সফ্‌ট্‌ ড্রিংক, তরমুজ, খেজুর, কিশমিশ – এরা সব 'মিষ্টির দৌড়বিদ'।

তাহলে প্ল্যান কী?

রান্নাঘরে একটা চার্ট টাঙিয়ে রাখুন। বাজারে গিয়ে যব আনুন, ডাল আনুন, শাকসবজি আনুন, ফল আনুন। সকালে যবের রুটি, দুপুরে লাল চালের ভাত, রাতে আবার যবের রুটি। এই খাবার খেলে শরীর উঠবে চিনি নামবে!

ফলাফল?

ফাস্টিং সুগার থাকবে ৬-এর নিচে। ইনসুলিন লাগবে না, ওষুধে টাকা যাবে না। আর হ্যাঁ – রক্তে মিষ্টি কমবে, ব্যবহারে মিষ্টি বাড়বে!

কিন্তু একটা সাবধানবাণী –

যারা হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় ভোগেন (মানে রক্তে চিনি খালি হয়ে যায়), তারা যেন নিজের মনে Low GI খাবারে ঝাঁপ না দেন – আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

দিলীপ গুহঠাকুরতা

ঢাকা, ১১ এপ্রিল ২০২৫।

কাপড়ে ১৫% ভ্যাট

গেছিলাম কাপড় কিনতে ... পছন্দ করে দাম দেওয়ার সময় দেখি দামের সাথে ১৫% ভ্যাট যোগ করেছে।

সাথে সাথে ধরলাম, এই ভ্যাট কিসের?

- এটা সরকারকে দিতে হয়।

- ঠিক আছে। আপনাদের ভ্যাট নাম্বার কত?

একটা নাম্বার দেখাল লোকটা।

এবার আমি বললাম, মুসক ১১ ফর্ম অর্থাৎ ভ্যাট চালান দেন।

সেল্‌স্‌ম্যান অবাক।

আবার বললাম, কি হল? আমি সরকারকে ভ্যাট দিচ্ছি, আর সরকার আমাকে এর রিসিপ্ট দিবে না? যান, নীল রঙয়ের ভ্যাট চালানটি নিয়ে আসুন।

এরপর সে তাদের বসকে ডাকল। তিনি এসে,

- কি সমস্যা ভাই?

- সমস্যা তো আপনার। মুসক বিধিমালা ২০১২ অনুযায়ী আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে ভ্যাট দিলাম, আর আপনি আমাকে চালানের কাগজ তো দিলেন না।

- এটা তো নাই আমাদের কাছে?

- নাই মানে? তাহলে কোন আইনে আপনি আমার কাছে ভ্যাট আদায় করলেন? আপনার বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

লোকটি চুপ। পরে ১৫% ভ্যাট ছাড়াই কাপড় দিল।

শুধু এটি নয় হাজার হাজার শপ, রেস্টুরেন্ট, হোটেল ইত্যাদি এভাবে ভ্যাটের নামে অর্থ আত্মসাৎ করছে। আর সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা নিজেদের পকেটে ঢুকাচ্ছে।

নিয়ম হল, যখনি কেউ আপনার বিলে ভ্যাট হিসেবে টাকা কেটে নিবে, সাথে সাথে সে আপনাকে একটি চালানের সরকারি কাগজ (নীল রঙয়ের) দিয়ে দিব। আপনি যে সরকারকে ভ্যাট দিলেন, আর সরকার যে বুঝিয়ে পেল সেটার প্রমাণ এটি। ভ্যাট নিবন্ধিত প্রত্যেক দোকান বা রেস্টুরেন্টে এই সরকারি কাগজ থাকে।

অনেক সময় শুধু প্রিন্ট করা বিল আমাদের দেয় যেখানে ভ্যাটের টাকার পরিমাণও উল্লেখ থাকে... কিন্তু এটি ভ্যাটের সরকারি কাগজ নয়। নীল রঙয়ের চালান কাগজটিই হল ভ্যাটের কাগজ।

কেউ যদি প্রিন্টেড বিলে ভ্যাট নিয়ে আলাদাভাবে এই চালান কাগজ না দেয়, তাহলে বুঝবেন সেই টাকা সেই প্রতিষ্ঠান নিজের পকেটে ঢুকালো, অথচ আপনি সরকারকে ঠিকই ভ্যাট দিলেন। খাবার রেস্টুরেন্টগুলোতে এই দুই নম্বরি কাজগুলো বেশি করে।

আবার অনেক প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নাম্বারই নেই, তারাও অযথা ভ্যাটের নামে টাকা আদায় করে।

কেউ চালান কাগজ দিতে অস্বীকার করলে, তাকে আইনের কথা উল্লেখ করে আর ভ্যাট দিবেন না। বেশি তেড়িবেড়ি করলে এনবিআরে সরাসরি ফোন (১৬৫৫৫) দিয়ে অভিযোগ করবেন।

আমরা কষ্টের ইনকামের টাকা থেকে প্রতিনিয়ত সরকারকে ভ্যাট দিচ্ছি কিন্তু সে টাকা সরকার পর্যন্ত যাচ্ছেই না, কারণ বেশিরভাগ লোকই এটা জানে না...আর এই সুযোগে এসব দুষ্ট লোকগুলো সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিচ্ছে চোখের সামনে।

যারা বাংলাদেশকে পৌঁছে দিচ্ছেন বিশ্বমঞ্চে:

তুমি যদি বিশ্বের সেরা হও, কিন্তু দেশের জন্য কিছু না করতে পারো – তাহলে তোমার জন্ম বৃথা।

যাও বিদেশে ...

দক্ষতা অর্জন কর বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে।
কিন্তু ফিরে এসো বিজয়ের বেশে, মায়ের কোলে।
তবেই তো বদলে যাবে আমার বাংলাদেশ।
তবেই গড়ে উঠবে এমন এক দেশ,
যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজেকে গর্ব করে বলবে – "আমি বাংলাদেশি।"
আমাদের অনুপ্রেরণা হচ্ছেন সেইসব গর্বিত সন্তানরা,
যারা বিদেশের মাটিতে সেরা হয়েছেন,
আর মায়ের জন্য রেখে যাচ্ছেন কিছু না কিছু অবদান।
চলো দেখি তাঁদের কথা -

ড. ইউনূস

নোবেল বিজয়ী (Bangladesh/Global) Muhammad Yunus Grameen Bank-এর মাধ্যমে বিশ্বে মাইক্রোক্রেডিট ধারণার জনক। বাংলাদেশি হয়ে সারা বিশ্বের দরিদ্র মানুষকে দেখিয়েছেন আশার আলো।

জাহিদ সবুর

প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার, Google (USA) Zaheed Sabur গুগলের মূল প্রযুক্তি কাঠামোতে দীর্ঘদিন কাজ করছেন এই বাংলাদেশি প্রতিভাবান। বিশ্বের অন্যতম টেক জায়ান্টে তার অবদান অনন্য।

আশিক চৌধুরী

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ ও বর্তমান চেয়ারম্যান, BIDA (Bangladesh) Ashik Chowdhury বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পর ফিরে এসেছেন দেশের জন্য। এখন তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগ উন্নয়নে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছেন।

রাহাত আহমেদ

কো-ফাউন্ডার ও CEO, Anchorless Bangladesh (USA/Bangladesh)

নিউইয়র্কভিত্তিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম, যারা বাংলাদেশের স্টার্টআপে বিনিয়োগ করে বদলে দিচ্ছেন অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ।

তানভীর হক

প্রোডাক্ট ম্যানেজার, Snapchat (USA) Snapchat-এর গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছেন, একজন উদীয়মান টেক লিডার।

হামজা চৌধুরী
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলার (UK) Hamza Choudhury Leicester City I England U21 দলের হয়ে খেলা প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার – বাংলাদেশি পরিচয়কে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন।

রোয়ান হোসেন
স্পোর্টস অ্যানালিস্ট, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল (Australia) খেলোয়াড় নন, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় ক্রিকেট দলের পারফর্ম্যান্স বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

রুমি আলী
সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর, JP Morgan (USA) বিশ্বখ্যাত ব্যাংক JP Morgan I IFC-তে কাজ করেছেন উচ্চপদে, বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন আন্তর্জাতিক আর্থিক জগতে।

শামিম আহমেদ
প্রতিষ্ঠাতা, Zunaid Consulting (UK)

প্রযুক্তি ও কনসালটিং সেবায় ইউরোপের সফল বাংলাদেশিদের একজন।

সালমান খান
প্রতিষ্ঠাতা, Khan Academy (USA) Khan Academy MIT I Harvard-এর এই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষক বিশ্বব্যাপী শিক্ষার সংজ্ঞাই পাল্টে দিয়েছেন। আজ Khan Academy-তে লাখো শিক্ষার্থী ফ্রি পড়ছে – বাংলাদেশও বাদ নেই।

ড. রাগিব হাসান
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, University of Alabama (USA) Cybersecurity গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তথ্য নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ গড়তে কাজ করছেন নিরলসভাবে।

তোমার অবস্থান যেমনই হোক ... যদি তুমি তোমার সর্বোচ্চটা দাও দেশের জন্য – তবেই আমার বাংলাদেশ হবে বিশ্বের সেরা।

তুমি হতে পারো পরবর্তী হামজা, সালমান, রাহাত বা জাহিদ সবুর।
শুধু স্বপ্ন দেখো, চেষ্টা করো
আর দেশের কথা মনে রেখো।
বাংলাদেশ তোমার দিকে চেয়ে আছে ...

সালাম জানাই পৃথিবীর সকল বাবাদেরকে!

কে লিখেছেন জানি না, কিন্তু অসাধারণ –

১. মা ৯ মাস বহন করেন, বাবা ২৫ বছর ধরে বহন করেন, উভয়ই সমান, তবুও কেন বাবা পিছিয়ে আছেন তা জানেন না।

২. মা বিনা বেতনে সংসার চালায়, বাবা তার সমস্ত বেতন সংসারের জন্য ব্যয় করেন, উভয়ের প্রচেষ্টাই সমান, তবুও কেন বাবা পিছিয়ে আছেন তা জানেন না।

৩. মা আপনার যা ইচ্ছা তাই রান্না করেন, বাবা আপনি যা চান তা কিনে দেন, তাদের উভয়ের ভালবাসা সমান, তবে মায়ের ভালবাসা উচ্চতর হিসাবে দেখানো হয়েছে। জানিনা কেন বাবা পিছিয়ে।

৪. ফোনে কথা বললে প্রথমে মায়ের সাথে কথা বলতে চান, কষ্ট পেলে 'মা' বলে কাঁদেন। আপনার প্রয়োজন হলেই আপনি বাবাকে মনে রাখবেন, কিন্তু বাবার কি কখনও খারাপ লাগেনি যে আপনি তাকে অন্য সময় মনে করেন না? ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে, প্রজন্মের জন্য, বাবা কেন পিছিয়ে আছে জানি না।

৫. আলমারি ভরে যাবে রঙিন শাড়ি আর বাচ্চাদের অনেক জামা-কাপড় দিয়ে কিন্তু বাবার জামা খুব কম, নিজের প্রয়োজনের তোয়াক্কা করেন না, তারপরও জানেন না কেন বাবা পিছিয়ে আছেন।

৬. মায়ের অনেক সোনার অলঙ্কার আছে, কিন্তু বাবার একটাই আংটি আছে যেটা তার বিয়ের সময় দেওয়া হয়েছিল। তবুও মা কম গহনা নিয়ে অভিযোগ করতে পারেন আর বাবা করেন না। তারপরও জানি না কেন বাবা পিছিয়ে।

৭. বাবা সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেন পরিবারের যত্ন নেওয়ার জন্য, কিন্তু যখন স্বীকৃতি পাওয়ার কথা আসে, কেন জানি না তিনি সবসময় পিছিয়ে থাকেন।

৮. মা বলে, আমাদের এই মাসে কলেজের টিউশন দিতে হবে, দয়া করে আমার জন্য উৎসবের জন্য একটি শাড়ি কিনবে অথচ বাবা নতুন জামাকাপড়ের কথাও ভাবেননি। দুজনেরই ভালোবাসা সমান, তবুও কেন বাবা পিছিয়ে আছে জানি না।

৯. বাবা-মা যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন বাচ্চারা বলে, মা ঘরের কাজ দেখাশোনা করার জন্য অন্তত উপকারী, কিন্তু তারা বলে, বাবা অকেজো।

১০. বাবা পিছনে কারণ তিনি পরিবারের মেরুদণ্ড। আর আমাদের মেরুদণ্ড তো আমাদের শরীরের পিছনে। অথচ তার কারণেই আমরা নিজেদের

মতো করে দাঁড়াতে পারছি। সম্ভবত, এই কারণেই তিনি পিছিয়ে আছেন...!!!! সমস্ত বাবাদেরকে উৎসর্গ করছি।

ফিরে দেখা

মামনি চারু। কনিষ্ঠ কন্যা। ডাক্তারী জীবনের প্রথম দিনে ইন্টার্ন শুরু করল। মনে পড়ল '৭৯ সালের আমার এ দিনের কথা। মেয়ের শুরু evening দিয়ে। আমি করেছিলাম night দিয়ে। অনেকেই আছে ইন্টার্ন করেনা। বিদেশ পাড়ি জমায়। আমি বলেছি বাস্তবিক ডাক্তারী হাতে কলমে শেখার এটাই সর্বোত্তম সময়। ডাক্তারির মজা এখন থেকেই শুরু। আমি মেডিসিন ইউনিট দিয়ে শুরু করেছিলাম। মেয়ে গাইনী। এখন কেমন জানিনা আমাদের ছিল major/minor. যে যেটায় career করতে চায় সে সেটায় মেজর (৬মাস) করে। সে হিসেবে আমি মেডিসিনে। আমাদেরটা ছিল ইন সার্ভিস ট্রেইনিং। চাকুরীও করতাম ট্রেইনিংও হোতো। পোষ্ট গ্রাজুয়েশনে ট্রেইনিং কাউন্ট হোতো। চাকুরীতে সিনিয়রিটি মিলত। এখন just training with একটা ফিক্সড honomarium। DMC তে preference টা difficult ছিল। সব কয়জন ইউনিট হেড ছিলেন ডাকসাইটে। তুমুল কঠোর বলে বদনাম ছিল প্রফেসর কাদরীর। যদিও শিক্ষক হিসেবে খুবই প্রিয় ছিলেন। পারতপক্ষে ছাত্ররা উনার কাছে ধারে ঘেঁষতে চাইতোনা। সেই কাদরীর ইউনিটেই শুরু করলাম। উনার সিএ কাদের ভাই 5^{th} year থেকেই পছন্দ করতেন। কেন করতেন জানিনা। তবে উনার personality আমাকে খুব attract করতো। বিশ্বাস করুন আজও উনি আমার জীবনে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় লোকদের একজন। কাদের ভাই মূলত আমাকে in করালেন otherwise ঐ সময়কার গল্প যারা জানেন they know how difficult it was!

Introduction

রাতে dutyতে গেছি। স্যারতো chamber সেরে হাসপাতালে আসেন ঐদিন সব ভর্তি রোগী দেখে বাসায় ফিরেন। Round শেষে আমরা করিডোরে আসলাম। শেষ মাথায় এসে কাদরী স্যার (আমাকে দেখিয়ে) বললেন এই কাদের "এটাকে (আমাকে) কোত্থেকে ধরে আনলি, একে (আমাকে)ত কোনদিন দেখিনি"। আমি বিস্মিত হইনি কারণ পুরা ৫ বছরের ছাত্র জীবনে পরীক্ষা ছাড়া উনার সাথে আমার encounter হয় নাই। এটাই জীবনের exciting অংশের কঠিনতম উপলব্ধি।

জীবন চলমান আর চলতে থাকলো আমার হিসেবের দিন গুলো। আমি উপলব্ধি করতে থাকলাম স্যারের দুর্বলতা হলো পড়াশুনা। আমি পড়ে prepared হয়ে রাউন্ডে আসতাম। আগে থেকেই জানতাম (ক্লাসে) he used to tell "প্রতিটি রোগী একটা book, আর রোগ এক একটা chapter." রোগী ভর্তি হোতো ৪০-৭৫ (বোধ করি এখন আরও বেশি)। মূলতঃ receiving ডাক্তারই প্রাথমিক

ডায়াগনোসিস করেন। প্রফেসর fine tuning আর management protocol decide করেন so শেখার অবাধ এবং অগাধ opportunities. আসলে চোখ কান খোলা রাখলে ডাক্তার সারাজীবনই শেখে। Knowledge add করে mature হয়। যে কয়জন আমরা ছিলাম বেড distributed থাকত। attendees হিসেবে ঐ রোগীগুলির history, examination, investigation results, ongoing treatments সবকিছু round এর সময় মুখস্ত বলতে হোতো। Naturally সবার interest আর devotion সমান থাকতোনা ভুলত্রুটি হোতো। তিরস্কারে অনেকে বিরক্ত হোতো react করত। আমার policy/উপলব্ধি ছিল এটাই শেখার system। স্যারের প্রফেসর উনাকে এভাবে deals করতেন হয়তো। আমি যখন প্রফেসর ছিলাম আমি ও হয়তো এমনই করেছি! পার্থক্য হলো স্যার যাকে খারাপ ভাবতেন অযোগ্য করে ছাড়তেন। আমার ধারণা ছিল সবাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান; হাতের ৫টা আঙুল সমান হয়না। দূর্বলের ও কিছু ভালো দিক থাকে; শিক্ষক হিসেবে সেটা বের করা আমার দায়িত্ব। পরবর্তীতে দেখেছি alternate রাস্তায় they have become established with reputation.

ঘটনা-১ :

ক্লিনিকেল মিটিংএ present করার জন্য (ঢাউস মোটা Cushing syndrome case presents করার জন্য) case রেডি করতে হবে। Serum cortisol পরীক্ষা করতে হবে। এখনকার দিনে blood sample আর টাইম লিখে দিলেই রিপোর্ট পাওয়া যায়। ১৯৭৯ সালে এমনটা ছিলনা। ইব্রাহিম সারের সেগুন বাগিচায় টিনের ঘরের বারডেমে শুধু করা যেত। পর পর দুজন সতীর্থকে পাঠালেন। ইব্রাহিম সারের tradition হলো গেলেই পড়া ধরতেন। ওরা গেল পড়া ধরলেন কিন্ত কাজ হলোনা। আমি তখন ইন্টার্নী cabin এ ভর্তি। জ্বর ছিল। রাউন্ডে এসে কাদরী স্যার বললেন, ওঠ টেষ্টটা করে আন। আমি গেলাম chief scientific officer এর কাছে। বিদেশী ভদ্রলোক আমাদের classmate এর দুলাভাই (আরও পরিচয় আছে!) উনার wife এর delivery ক্ষণে ও was an anchor. উনি বললেন ৩/৪ টা samples লাগবে throughout the day. নিয়ম হলো ত্রিশটা স্যামপল জোগাড় করে (আগের দিনের ক্যামেরা roll!) এক সাথে করতে হবে। That is why Ibrahim sir did not agree and they couldn't achieve. আমার ঘটানাটা আলাদা। Obese রোগীর blood collection. প্রথমবার pick করলাম পেলাম, দ্বিতীয় বার হলোনা। Gold medal পাওয়া নার্সকে দিলাম। Nurse পারলো সাহস পেলাম। Practice makes one perfect! তৃতীয় বার একই অবস্থা। চতুর্থ বার রবার্ট ব্রুস না হয়ে ক্ষান্ত দিলাম।

ঘটনা-২ :
আমরা admission date এ প্রায় সারা রাত থাকতাম। আমি ২নং ইউনিট পাশের দোস্ত ১২ ইউনিট। আমরা দুজনে পালাক্রমে lumber puncture (LP) করতাম। একজন fundoscopy অন্যজন puncture. হায়রে জীবন? কি জোসে না করেছি তখন। প্রফেসর হয়ে মেডিকেলে final MB পরীক্ষা নিতে গেছি। Student-কে জিজ্ঞেস করলাম LP করেছ। বললো দেখেছি। কোথায় জিজ্ঞেস করায় বললো YouTube এ!! একদিন LP করার পর রোগীর meningitis হয়ে গেল। আমরা পরিষ্কার করেছি কিন্তু site এ রোগীর infection ছিল হয়তো।

ঘটনা দুটো প্রায় সমসাময়িক। রাউন্ডের সময় সিএ ও অন্যান্য সবাই তটস্থ, আমার গলা শুকিয়ে আসছে বারবার। রোগীর কাছে এসে স্যার বললেন, "খাজা তুমি কি শুধু ফুটো করে বেড়াও নাকি?" মাথা নীচু করে বললাম, এত কষ্ট করে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দিলাম আর রোগী কিনা ...

বকা না দিয়ে বললেন "বিনিময়ে উপকার পাবে এটা ভেবে কারো উপকার করতে যেও না" স্যারের উপদেশটি আমার পাথেয় হয়ে থাকল। ঐ দিন আরেকটা ঘটনা ঘটলো। স্যার carotid angiogram করা দেখার জন্য আমকে পিজিতে পাঠালেন। তিরস্কার এর ভয় ছিল আমার। কিন্তু পেলাম পুরস্কার। শিক্ষণীয় (academic interest) অনেক কাজেই ৬ মাসে আমাকে স্যার অন্য teacher, institutes, library তে পাঠিয়েছেন।

একবার বিচিত্রায় লেখা পাঠাবেন। রাউন্ড শেষে স্যার আমাকে নিয়ে বসলেন। সংশোধন, পুনর্লিখন ও সংযোজন করে শেষ করলাম। স্যার রোগীর ডিসচার্জ সার্টিফিকেট নিজে না দেখা পর্যন্ত ছাড়তেন না। প্রায়শঃই আমাকে সামনে রেখে করতেন। এরকম একটা সার্টিফিকেট দেখে বললেন histocyte নয় হবে histiocyte. বহুদিন ধরে মনে রেখেছি। FCPS moderation এ গিয়ে দেখলাম ঐ level এও colleagues এর ধারণা স্বচ্ছ নয়। শেখার শেষ নাই। Histiocyte body-র immune system এর একটা কোষ যেটা শরীরের জন্য খারাপ কিছু পেলে খেয়ে ফেলে।

অনেক দিন আগে ছয় মাসে ভালো-মন্দ অনেক কিছুই ঘটেছে। আমাদের সময়েই এক রোগী পর পর তিনবার ভর্তি হয়েছিলেন। রাউন্ডে গিয়ে প্রতিবারই স্যার উনাকে দেখিয়ে বলতেন "খাজা ইনার খবর রেখো" অনুসন্ধিৎসু হলাম। স্বেচ্ছায় স্যার বললেন এই লোক প্রতিবারই chamber এ গিয়ে বলে "আমাকে ডা: খাজার under এ ভর্তি করে দিবেন। লজ্জা পেলাম, আপ্লুতও হলাম মনে মনে। একবার রেফার রোগীর ফলোআপে প্রফেসরের opinion অনুযায়ী treatment sheet এ লিখলাম। উনার মত হলো। I asked his advice, I may or may not accept! There is no obligation. ঐদিন মনে রাখার মত আরেকটা কথা বলেছিলেন,

তুমি যেটা জানো না, তোমার যেটা knowledge এ নাই সেটা লিখো না/লিপিবদ্ধ করোনা। আমার অনুসারীদেরও আমি একই ভাবে বলেছি।

ঘটনা-৩ :
সজ্জন ভদ্রলোক মামুন ভাই ছিলেন তখন সিএ। একবার উনি অসুস্থ। স্যার উনার কাজ আমাকে চালাতে বললেন। রাতের রাউন্ডের investigation advise লিখতে বলায় friend সতীর্থ denied (ego!)। পরদিন রাউন্ড শুরুর আগের briefings এ আদ্যোপান্ত স্যারকে বললাম। স্যার বললেন তোমরা তো ১০০ মত পাশ করেছো। সবাই post graduate করবে না। সবাই medicine এ career করবে না। বাস্তবতা এখন বুঝি। বুঝি how perfect he was!

ঘটনা-৪ :
রাত ১১ টা। স্যার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছেন। রাতের রাউন্ড। নীচ তলায় পাশের ওয়ার্ডে আমাকে দেখে (ক্ষণিক বিস্ময়ে!) বললেন, তুই এখানে? বললাম, দোস্তের বিপদ। স্যার রাজনীতি সচেতন বুঝতে পারলেন। রোগী ওয়ার্ডে ভর্তি। আমাদের সিনিয়র (এখনও পাশ করেন নাই) দুজন এসেছেন জোর করে ভর্তিরোগীকে বের করে দিবেন। বন্ধুকে প্রেসার দিচ্ছেন। শহীদুল্লাহ হলে খবর গেছে বলে ভয় দেখাচ্ছেন। আমিও কর্মচারী স্টাফদের সজাগ করলাম। ইনচার্জ প্রফেসরকে খবর দিলাম। স্যার আসার পর উপরে গেলাম। দেখলাম কাদরী স্যার রুম খুলে বসে আছেন। রাতের বেলা এটা ব্যতিক্রম! স্যারকে সব খুলে বলার পরে বললেন, মার খেয়ে আসবিনা মার দিয়ে আসবি। বিচার আমি করে দিব। That is why he was very favourite to All. পিজিতে Clinical assistant (CA) থাকা অবস্থায় কোন এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার আরেক mentor বলেছিলেন, "revolution নয় evolution is better in Bangladesh"। মজার কথা বলি। একদিন সকালে – আমার নীচতলা female word এ duty. বড় চাচা সার্জারিতে ভর্তি ছিলেন। ডিসচার্জ নিয়ে সকালে ফুলবাড়ীতে বাসে তুলে দিতে গিয়েছি। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ঘড়ির কাঁটা ঠিক ৭.৩০(সকাল)। স্যার ঢুকলেন পিছন পিছন আমিও। আমি জানতাম এমনটাই হবার। (how much I could realised him!) স্যার বললেন, তুমি ভাবছো বৃষ্টি ভেজা সকালে আমি দেরি করে আসবো। কথাটা প্রনিধানযোগ্য – রাত ১১-১১.৩০-১২ টায় বাসায় গিয়ে ঘড়ির কাঁটায় মিলিয়ে সাড়ে সাতটায় অফিসে আসা difficult বইকি। ২০১০ সালে কারিকুলাম কমিটির বিধান নির্ধারণী মিটিংয়ে ছাত্রদের রাতে ক্লাস compulsory করার কথা বললে একজন practice বিঘ্ন হবার কথা বলেছিলেন। আমাদের সময় একটা ইউনিটে (মেডিসিন/সার্জারী/গাইনী) একজনই মাত্র প্রফেসর ছিলেন। যতদূর জানি এখন প্রফেসর ছাড়াও প্রতি ইউনিটে এসোসিয়েট এসিসটেন্ট আছেন/থাকেন।

রাতের রাউন্ডে ভর্তি হওয়া অধিকাংশ রোগীই দেখতেন। ইন্টারেস্টিং finding থাকলে ওলট-পালট করে দেখতেন। ভুল হলে দোতলা নীচতলায় যতক্ষণ থাকতেন সারাক্ষণ remind করাতেন।" এ রকম হলে তোমার দ্বারা মেম্বার শীপ হবেনা।" ছয়মাসের কতবার যে এটা শুনেছি। আর শুদ্ধ হলে facial expression appreciation ছিল কিন্তু ৬ মাসে একবারও স্যারকে good ইত্যাদি বলতে শুনিনি। মনে পড়েনা আমার ৬ মাস সময়ে উনি casual leave earn leave sick leave নিয়েছেন। পিজিতে থাকাকালীন এক colleague এর নাম ধরে অনেকবার বলেছেন তোমরা দুজনে যে কোন পরীক্ষায় পাশ করার উপযুক্ত। সেই উনার এমআরসিপি হয়েছে এফসিপিএস হয় নাই। I djd not attempt MRCP। পিজিতে থাকাকালীন কথায় কথায় একদিন বললেন তুমিতো super talented / টাউট। ত্রিশ হাত মাটির নীচে রেখে আসলেও উঠে আসবা। স্যারের এই সমস্ত prediction-ই চলার পথে অদম্য সাহসী করেছে।

ঘটনা-৫ :

তোড়জোড় চলছে। প্রিপারেশন হচ্ছে ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের রিকগনিশনের জন্য। Prof. Crofton আসবেন। আমি তখন সার্জারিতে। সকালে লিভার abscess drain করছি। হঠাৎ দেখি স্যার উপস্থিত। স্যার বললেন এ কাজ তোর নয়। তুই মেডিসিনের। চল। That was how my career was decided. আল্লাহর রহমত। আমি হারিনি। আমাকে case present করতে হবে। সেদিন আরো নিশ্চিত হলাম Academic, non academic সব ব্যপারে he became very much dependent on me. স্যারের আত্মীয় স্বজন অসুস্থ হলে আমাকে দেখতে বলতেন। জ্বরের রোগী হলে investigation line up করতে বলতেন। জ্বরের রোগী pyramid exploration এর অভ্যাস ধরে রেখেছি। PG তে আমার case presentation থাকলে he never missed and used to argue. Crofton কে round এর সময় স্যার বললেন "I was your student and he added a teacher may forget his students but a student never "!

ইন সার্ভিস completion certificate এবং আমার grading: অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রফেসর এম এ কাদরী আমাকে সার্জারি থেকে ডেকে এনে বললেন তোকেই প্রথম দিলাম – "Excellent"

প্রফেসর কাদরী ছিলেন আমার মেন্টর, idol নন। তাঁর মত outspoken, দৃঢ়চেতা হওয়া কঠিন। অভিজ্ঞতা/উপলব্ধি share করলাম এই জেনারেশনের কাজে লাগতে পারে মনে করে।

উপলব্ধি

স্ত্রী : এতোগুলো কাপড় ধোয়ার জন্য ফেলে রেখোনা।

স্বামী : কেন?

স্ত্রী : খালা(বুয়া) আগামী ২দিন আসবেন না।

স্বামী : কেন?

স্ত্রী : তিনি মেয়ের বাড়িতে নাতনীকে দেখতে যাবেন।

স্বামী : ওকে! তাহলে কিছু কাপড় আমি নিজেই ধুয়ে ফেলবো।

স্ত্রী : আমি কি উনাকে ১০০০ টাকা অতিরিক্ত দিতে পারি???

স্বামী : কেন? সামনে তো ঈদ! তখন তো তাকে এমনিতেই বোনাস দিতে হবে!

স্ত্রী : ওহ জান! তিনি তার মেয়ে এবং নাতনীকে দেখতে যাবেন। যাওয়ার সময় তিনি হয়তো তাদের জন্য কিছু নিয়ে যাবেন। আজকাল সবকিছুর দাম বাড়তি। যাওয়ার সময় তার কিছু টাকার প্রয়োজন!

স্বামী : তুমি অতি সহজেই ইমোশনাল হয়ে পড়ো!

স্ত্রী : ওহ জান! তুমি চিন্তা করোনা, তোমাকে অতিরিক্ত খরচ করতে হবেনা। আজ বিকেলে রেস্টুরেন্টে পিজ্জা খাওয়ার যে কথাটা ছিলো, সেটা আমি খাবোনা। কেন শুধু শুধু কয়েকটুকরো ব্রেড খাওয়ার জন্য এতোগুলো টাকা খরচ করবো। সেই টাকাটা আমরা খালাকে (বুয়াকে) দিয়ে দিবো।

স্বামী : তোমার যা ইচ্ছে করো।

বুয়া ৩দিন পরে বাসায় আসলো। এসেই ঘর-দোর পরিস্কার করতে লেগে গেলো। স্বামী বুয়াকে জিজ্ঞেস করলো: “আপনার ছুটি কেমন কেটেছে?”

বুয়া : মামা অনেক ভালো কেটেছে। আমি যাওয়ার সময় আম্মা(স্ত্রী) আমাকে ১০০০ টাকা দিয়েছেন!

স্বামী : তাই আপনি মেয়ে এবং নাতনীর সাথে দেখা করতে গিয়েছেন?

বুয়া : জী, মামা। অনেক মজা হয়েছে, ২দিনে সবটা টাকা খরচ হয়েছে!

স্বামী : তাই? কি কি করলেন ১০০০ টাকা দিয়ে শুনি?

বুয়া : ৩০০ টাকা দিয়ে নাতনীর জন্য একটা জামা কিনেছি, ৮০ টাকা দিয়ে একটা পুতুল নিয়েছি, ২০০ টাকার মিষ্টি কিনেছি, ১৫০ টাকা দিয়ে মেয়ের জন্য চুড়ি কিনেছি, ১২০ টাকা বাস ভাড়া এবং ১৫০ টাকা নাতনীর স্কুলের খাতা-কলম কেনার জন্য দিয়েছি।

এভাবে বুয়া সবটা টাকার হিসেব দিয়ে দিলো।

বিকেলে যখন সে স্ত্রীকে নিয়ে পিজ্জা খেতে গেলো, ওয়েটার পিজ্জা দেওয়ার পর সে আশ্চর্য হলো! আট টুকরো পিজ্জার দিকে তাকিয়ে তার সকালবেলায় বুয়ার কথাগুলো মনে পড়লো! ... সে আট পিস পিজ্জার দিকে তাকিয়ে রইলো ... ১ম পিস পিজ্জা দিয়ে ১টা শিশুর নতুন পোশাক...২য় পিস পিজ্জা দিয়ে ১টা শিশুর জন্য

মিষ্টি ... ৩য় পিস পিজ্জা দিয়ে একটা শিশুর স্কুলের খাতা ... ৪র্থ পিস পিজ্জা দিয়ে খেলার পুতুল ... ৫ম পিস পিজ্জা দিয়ে বাস ভাড়া ... এভাবে কতোকিছু সম্ভব!

আট টুকরো পিজ্জা যেন তার মনকে হাতুড়ির মতো আঘাত করছিলো। এতোদিন সে পিজ্জাকে এক দৃষ্টি থেকে দেখতো, আজ বুয়া তাকে পিজ্জার অন্যদিকটাও দেখিয়ে দিয়েছে। আট টুকরো পিজ্জা তাকে লাইফের নতুন অর্থ শিখিয়েছে।

আজ সে বুঝতে পারলো - "Spending for life!" or "life for spending".

(বিদেশী গল্প অবলম্বনে)

শবেকদরের ১টি রাত ১০০০ মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

ভেবে দেখেছেন কি? লাইলাতুল কদর বা শবেকদরের ১টি রাত ১০০০ মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাজার মাস সমান ৩০ হাজার রাত্রি। অর্থাৎ এই রাতের মর্যাদা ৩০,০০০ গুণ অপেক্ষাও বেশি! সুতরাং বলা যায় যে, এই রাতের ১টি তসবীহ অন্যান্য রাতের ৩০,০০০ তসবীহ অপেক্ষা উত্তম।

অনুরূপ এই রাতের ১ রাকাত নামায অন্যান্য রাতের ৩০,০০০ রাকাত অপেক্ষা উত্তম। এই রাতের ১ টাকা দান অন্যান্য রাত বা দিনের ৩০,০০০ টাকার দান অপেক্ষা উত্তম। বলা বাহুল্য, এই রাতের আমল শবেকদরবিহীন অন্যান্য ৩০ হাজার রাতের আমল অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই রাতে ইবাদত করল, আসলে সে যেন ৮৩ বছর ৪ মাস অপেক্ষাও বেশি সময় ধরে ইবাদত করল।

ভেবে দেখুন, শবেকদর প্রায় ১০ ঘন্টার একটিমাত্র রাত্রি। তাহলে এই রাত্রে ১ ঘন্টা ইবাদত করলে তা ১০০ মাসের ইবাদত চাইতে শ্রেষ্ঠ। আর ১ মিনিট ইবাদত করলে তা ৫০ দিনের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহু আকবার! "যে ব্যক্তি এই রাতের মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হয়, সে আসলে সকল মঙ্গল থেকে বঞ্চিত। আর একান্ত বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া সে মঙ্গল থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না।"

(সহীহ ইবনে মাজাহঃ ১৩৩৩, সহীহ জামে' ৩৫১৯নং)

দিনে কিছু সময়ের নীরব ধ্যান যোগ করুন রুটিনে।

একটা খুব জরুরি বিষয় হলো – শরীরের ভাষা শোনা, বোঝা এবং শরীরকে গুরুত্ব দেয়া দরকার। বুঝতে হবে, নিজের শরীর, নিজের দায়িত্ব।

৪০ এর পর বেশি কিছু শরীরবৃত্তীয় পরিবর্তন শুরু হয়, ৫০ এর পর আরো বেশি,

৬০ এর পর শরীর শিথিল হতে থাকে, ৭০ এর পর বন্ধ হতে থাকে, ৮০ এর পর প্রতিটি বছর হলো বোনাস। তাই ৬০ মানে নতুন করে ৪০ বা বয়স হলো শুধুই একটি সংখ্যা - এসব কথা বলা বন্ধ করুন। এগুলো ঠিক কথা নয়। ৪০ বা ৫০ পরবর্তী সময়ে আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকলে কৃতজ্ঞতা অনুভব করুন, কিন্ত কাজের গতি একটু কমান যাতে হৃৎপিণ্ডের গতি বহাল থাকে।

দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন – অবসরের সময় নির্ধারণের যৌক্তিক কারণ আছে। একসময় আপনার শরীর আর মন যে চাপ বইতে পারতো এখন আর ততটা পারবে না। ব্যহত চমৎকার আছেন, ধন্যবাদ আপনার 'জিন' কে (genes), কিন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের (organs) অভ্যন্তরীণ ক্ষয় তো হচ্ছেই।

সুখী সুন্দর হোন, বাহ্যিক ভাবে নয়, অন্তর্গত ভাবেও।

ফুটনোট-১
সারকথা হলো ৬টি নির্দেশনা:

- ২০ মিনিট হালকা ব্যায়াম
- নিয়মিত নিয়ম মত হাঁটা
- সাত ঘন্টা নিবিড় ঘুম
- কিছু সময় একাকী ধ্যান
- সব খাবারই খাওয়া - কম পরিমাণে
- শরীরের কথা শোনা ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।

ফুটনোট-২
কোনো তত্ত্বই সর্বজনীন না, যাঁরা একমত নন, সেটা তাঁদের অধিকার – সম্মান করি তাঁদের মতকে।

Be happy internally and not externally.

মূল রচনাঃ Prof. Dr. Ubar Shethi

নিজের সাথে সবাই মিলিয়ে নেই ...

তিরিশ বছর বয়সের পরেই একজন মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। বলছে আমেরিকার একটি গবেষণা।

একজন নারীকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় লাগে ৩০ বছর বয়সে;

আর একজন পুরুষকে সবচাইতে হ্যান্ডসাম লাগে ৩৪ বছর বয়সে।

অবশ্য ৪১ বছর বয়স থেকে একজন নারী মোটামুটি বয়স্ক হতে থাকেন; ৫৩ বছর বয়সে তাকে আর সেক্সি মনে হয়না;

এবং ৫৫ বছর বয়স থেকে তাকে "বৃদ্ধের" কাতারে ফেলা হয়।

অন্যদিকে একজন একজন পুরুষ ৪১ বছর বয়স থেকে বয়স্ক হওয়া শুরু করে; সে তার চেহারার আকর্ষণ হারায় ৫৮তে গিয়ে

এবং বৃদ্ধের কাতারে পড়ে ৫৯ বছর থেকে।

কিন্তু আবার একজন পুরুষের আসল বার্ধক্য শুরু হয় ৭০ বছর বয়সেই

কিন্তু একজন নারীর ৭৩ বয়স বয়সে।

সারা পৃথিবীতে দুই-তৃতীয়াংশ বয়স্ক মানুষ মারা যায় তিনটি রোগের কারণে:

হৃদরোগ, ক্যান্সার আর ডায়াবেটিস

শতকরা ৯২ শতাংশ বয়স্ক মানুষের যে কোন একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ থাকবেই।

৭৭ শতাংশের কমপক্ষে দুটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ থাকেই।

উপরে উল্লেখিত তিনটি রোগ ছাড়াও বৃদ্ধ বয়সে আরো কিছু রোগ আছে।

যেমন- আরথ্রাইটিস, আলজিইমার্স, এনজাইটি ও ডিপ্রেশন।

বেশিরভাগ বয়স্ক মানুষ একাকিত্বে ভোগেন। আবার বাচ্চাদের মত আচরণ করেন। প্রচণ্ড রাগ-অভিমান করেন। চেঁচামেচি করেন। এগুলোর কারণ মূলত মনোদৈহিক পরিবর্তন। ৬৩ শতাংশ বয়স্ক মানুষ মনে করে তাঁদেরকে তাদের আপনজনেরা “অবহেলা” করে।

যারা বয়স্ক মানুষদেরকে দেখাশোনা করেন তাদেরকে প্রচণ্ড রকম ধৈর্য্যশীল, সহানুভূতিশীল হতে হয়। বয়স্ক মানুষদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বুঝে পরিস্থিতিকে হ্যান্ডল করতে হয়। তাদের কোন কিছু করতে অর্ডার না দিয়ে অনুরোধ করা; তাঁদেরকে চয়েস দেয়া উচিৎ।

বৃদ্ধকালে ভালো থাকার উপায় কী? নিজেকে ব্যস্ত রাখা!

কর্মঠ থাকা, ব্রেইনকে চালু রাখার জন্য বিভিন্ন পাজল গেম খেলা, কোন নতুন দক্ষতা শেখা বা শেখানো, সমাজকর্ম করা বা মানুষের সাথে মেশা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া, প্রিয়জনদের সাথে কানেক্টেড থাকা এবং কমেডি নাটক বা মুভি দেখা, জিম করা, প্রতিদিন আধা ঘণ্টা হাসা ইত্যাদি ইত্যাদি !!!

২৪ ঘন্টা। মাত্র ২৪ ঘন্টায় বিশ্বকে নাভিশ্বাসে ফেলো দিলো ড. মোহাম্মদ ইউনূস!’

ড. ইউনূস বিমসটেক সম্মেলন যোগ দাওয়ার জন্য কাল ব্যাংকক গেলেন, এরই মধ্যে সে বিমসটেক এর দায়িত্ব গ্রহন করলেন পাশাপাশি বাংলাদেশ সহ বিমসটেক এর আন্ডারে ৬ টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক করলেন ৪ দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে...

১. ড. ইউনূস - নরেন্দ্র মোদী = গঙ্গা ও তিস্তা চুক্তি শেষ করা, হাসিনাকে দেশে ফেরৎ চাওয়া, মোদীর বলা "বাংলাদেশে হিন্দুদের অত্যাচার করা হচ্ছে" তাঁর উত্তরে ড. ইউনূস এর কড়া উত্তর, সীমান্তে গুলি চালানো বন্ধ, সংবাদমাধ্যমকে উল্টোপাল্টা খবর প্রচার না করার আহবান।

২. ড. ইউনূস - পেটংটার্ন শিনাওয়াত্রা, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী = ভিসা, বাণিজ্য, শিপিং, সমুদ্র সম্পর্ক এবং দুর্নীতি বিরোধী MoU স্বাক্ষর (সহজ কথায় দুই দেশ তথ্য বিনিময়,অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি ও পলাতক দুর্নীতিবাজদের খুঁজে বের করতে সহযোগিতা করবে)।

৩. ড. ইউনূস - হরিনিয়া আমরাসূরিয়া শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী = দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহায়তার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে কথাটি হয় সেটি হলো "পাচার করা টাকা বাংলাদেশ যেন ফেরৎ পায় সে বিষয়ে সাহায্য চেয়েছে শ্রীলংকার এবং তারা তা করবে"।

৪. ড. ইউনূস - শেরিং তোবগ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী = দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও সংযোগ বৃদ্ধি এবং ভুটানের জন্য কুড়িগ্রামে অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে আলোচনা হয় এছাড়াও ভুটানের জন্য বিশেষ ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট সংযোগ এবং শিক্ষা সুযোগ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়াও আসিয়ান সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন এবং সবচেয়ে বড় যে খুশির খবরটা দিলেন তা হলো "মার্চের ১৫ তারিখ জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এর সঙ্গে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ইফতার পার্টি করে রোহিঙ্গাদের কথা দেন "এ ঈদে পারলাম না পরের ঈদ ইনশাআল্লাহ নিজেদের দেশে করবেন" আর তাঁর একমাসও হয়নি মাত্র ২০ দিনের মাথায় মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফেরৎ নিতে রাজি হয়েছে"।

নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্য, তাইতো ড. ইউনূস এর মত একজন মানুষকে পেয়েছি, সংস্কারের নামে দেশটাকে শীর্ষে তুলে দিচ্ছে...

শেষমেশ একটাই কথা "ইউনূস সরকার আরো ৫ বছর দরকার" – ৫/৪/২৫
আহমেদ রাকিন

ব্যক্তিত্ব ও ইউনূস

বাংলাদেশের মানুষ অবশেষে বুঝতে পারছে একজন জ্ঞানী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর নোবেল বিজয়ী রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক রাষ্ট্রপ্রধানের পার্থক্য কি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস ইউরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের উপহার দিয়েছিলেন "জুলাই বিপ্লব" নিয়ে প্রকাশিত ছবির বই। অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দিলেন, মোদীর কাছ থেকেই ২০১৫ সালে ড. ইউনূসকে দেয়া

স্বর্ণপদক এর ছবি – অর্থাৎ, আপনিই আমাকে বহু আগে সম্মাননা আর স্বীকৃতি দিয়ে বসে আছেন।

চা ওয়ালা একজন দোভাষী নিয়ে বসলেও ১১টা ভাষা রপ্ত করা ড. ইউনূস ছিলেন একাই একশো।

কোন ইস্যু বাদ পড়েনি। শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ, সীমান্ত হত্যা, তিস্তা আর গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি, জুলাই গণহত্যা সম্পর্কে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট ইত্যাদি। এই রিপোর্ট সম্পর্কে মোদীকে মনে করিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছেন, এই ইস্যু আন্তর্জাতিক আদালতে গেলে ভারতও কিন্তু ফেঁসে যাবে।

আমরা জীবনে প্রথম বারের মত দেখছি

একজন বাংলাদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করতে উন্নত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও কতটা উন্মুখ। দেখছি, উনাকে অবশিষ্ট বিশ্ব কতটুকু সম্মান করে –

দেখছি, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে অনাগ্রহী সব দেশ এখন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছে। দেখছি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ কিংবা এডিবিসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো নিজ হতেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিয়ে পাশে দাঁড়াতে আগ্রহী।

দেখছি, চীন উনার জন্য প্রাইভেট বিমান পাঠাচ্ছে, লাল গালিচা সংবর্ধনা দিচ্ছে, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন প্রজেক্টে সবধরণের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

দেখছি, শেখ হাসিনা যে রোহিঙ্গা সমস্যা ৭ বছরে সমাধান করতে পারেননি, ড. ইউনূস সেটা ৭ মাসে সমাধান করে ফেলছেন। জাতিসংঘ মহাসচিবকে দেশে আনার ৭ সপ্তাহ পার হয়নি, মিয়ানমার ১ম দফায় ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়ে গেছে। ২য় ধাপে ৭০ হাজার রোহিঙ্গার তথ্য যাচাই-বাছাই চলছে। পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই হবে অবশিষ্ট ৫ লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গার।

এরকম একজন রাষ্ট্রপ্রধান পাওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব গর্বের – অবশেষে আমরা মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখছি – যার মূল ক্রেডিট অবশ্যই উনার –

এই জাতি আপনাকে যতটা অসম্মান করেছে, তার শতগুণ সম্মান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। সেটাও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে।

স্যালুট ড. ইউনূস স্যার!!

“উচিৎ জবাব” by Dr. Asif Nazrul

“শীলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় ২০১২ সালে। বিয়ের দুবছর পরে আমাদের কন্যা আরিনার জন্ম হয়। এর কিছুদিন পর থেকে ও হিজাব করা শুরু করে। আমাদের তখন একটাই প্রাইভেট গাড়ী ছিল (এখনো তাই)। সেটা প্রায় সারাদিন ব্যস্ত থাকতো আমাদের আগের সংসারের তিন সন্তানকে স্কুলে আনা-নেয়ার কাজে। শীলা ও আমাকে প্রায়ই সিএনজি বা রিকশায় চড়তে হতো। আমার কোন সমস্যা হতো না তাতে। কিন্তু লম্বা ও ঘনচুল হিজাবে ঢাকা থাকার কারণে মাথা ভিজে শীলা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে যেতো। এটা নিয়ে আমার মন খারাপ থাকতো। কিন্তু শীলা নিজ সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, কোন অবস্থাতেই হিজাব করা ছাড়েনি কখনো।

হিজাব শুরুর কিছুদিন পর একটা দাওয়াতে আমরা যাই। সেখানে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও দেশের স্বনামধন্য একজন আইনজীবী আমার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকালেন। আমি বুঝলাম তিনি ভাবছেন শীলা বোধহয় আমার কারণেই হিজাব করতে বাধ্য হচ্ছে। এরপর সমাজের নামীদামী বহু মানুষ এভাবে আমার দিকে তাকিয়েছে। আমার একটু অদ্ভুত লাগতো। মানুষ কেন ভাবতে পারেনা যে একটা মেয়ে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় ইসলামী জীবন বেছে নিতে পারে, হিজাবও করতে পারে!

শীলা একসময় অভিনয় করতো। ১৯৯৫ সালে ১৪ বছর বয়েসে নিজের ইচ্ছেয় সে অভিনয় ছেড়ে দেয়। সেবছর অভিনয়ে জাতীয় পুরস্কার পেলে সেটা গ্রহণ করতে পর্যন্ত যায়নি ও। এর বছর পাঁচেক পর ২০০০ সালে দাদার স্কুলের জন্য ফান্ড তৈরির কথা বলে তার বাবা তাকে একটামাত্র নাটকে অভিনয়ে রাজী করাতে পারে। এরপর কোনদিন অভিনয়ের ধারেকাছে যায়নি সে বহু অনুরোধ পাওয়ার পরও। কিন্তু মানুষ তার অভিনেত্রী পরিচয়টা আজো মনে রেখেছে। অভিনয় না করে সে যে কি হারালো এটা ভেবে স্বকল্পিত সমবেদনায় উদ্বেল হয়েছে।

অথচ এনিয়ে তার বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ নেই। একসময় অভিনয় করতো এটা মনে করতেও চায় না ও। বরং এর চেয়ে অনেক প্রিয় একটা পেশাগত জীবন যাপন করছে সে। অর্থনীতিতে দুটো ফার্ষ্ট ক্লাশ ছিল তার। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সম্মানজনক পদে চাকরী করেছে, এখন কাজ করছে ‘ইকোনমিক এন্ড কমার্শিয়াল স্পেশালিষ্ট’ হিসেবে সবচেয়ে প্রভাবশালী দূতাবাসে। প্রখর মেধা, প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ আর কঠোর ঔচিত্যবোধ সম্পন্ন এবং পেশাগত জীবনে অত্যন্ত সফল একজন মানুষ ও। অথচ এই সমাজের কিছু মানুষের কাছে শুধু ‘আহা অভিনেত্রী’ আর ‘আহা হিজাব’ হয়ে থেকে গেছে আজো। কারো কারো কাছে আবার এজন্য দায়ী মানুষটা আর কেউ না, আমি!

অথচ সত্য হচ্ছে, শীলাই বরং আমাকে ধর্মের পথে নিয়ে গেছে। এখনো ফজরের আজান হলে সে আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে, ঠিকমতো যাকাত দিচ্ছি কিনা

সেই হিসেব নেয়, দুবছর আগে সেই আমাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে হজ্জ করতে নিয়ে গেছে। আমি জীবনে কোনদিন অসৎ উপার্জন করিনি আর মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেছি সারাজীবন। এগুলো আমার জন্মগত। কিন্তু এছাড়া জীবনে যতো ভালো কিছু শিখেছি সব তার কাছে থেকে শেখা, যা কিছু ভালো করেছি সব তার অনুপ্রেরণায় করা।

আমার লাভ হয়েছে আরো অনেক। আমার মা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। কখনো প্রচণ্ড বিপদে পড়লে মাকে বলতাম, আম্মা আমার জন্য দোয়া করেন। আমার ভয় কেটে যেতো, মনে হতো শেষ পর্যন্ত সব বিপদ কেটে যাবে আমার। শীলার সাথে বিয়ের কিছুদিন পর আম্মা মারা গেলেন। পরদিন কবরে গিয়ে অনেক কাঁদলাম। স্বার্থপরের মতো মনে হলো এখন আমার জন্য কে দোয়া করবে! কাকে বলবো দোয়া করতে।

আল্লাহ্ আমাকে সেই মানুষ দিয়েছেন। অপবাদ, মিথ্যাচার, হুমকি, যড়যন্ত্র আমাকে যদি একটুও বিচলিত করে বা মর্মাহত, আমার স্ত্রী চুপচাপ কোরআন নিয়ে বসে, অনেকক্ষণ বসে থাকে জায়নামাজে। শেষ পর্যন্ত কোন বিপদ থাকেনি আমার, থাকবেও না ইনশাল্লাহ্!

তসলিমা নাসরিন, আপনি গতকাল আমাদের নিয়ে একটা পোস্ট দিয়েছেন। দোয়া করি, আপনার জীবনে কোন একদিন হেদায়েত আসুক। কোন একদিন আল্লাহ্ ক্ষমা করুক আপনাকে। আপনি সেদিন বুঝবেন এই রেষারেষির জীবনের খ্যাতি, ধন, মান, ক্ষমতা এসবের চেয়ে অনেক বিশাল আল্লাহ্র দয়া। আমি সেটা এখনো পাইনি পুরোপুরি। কিন্তু আমার স্ত্রী পেয়েছেন। সে কতোটা ঐশ্বর্যবান, তার হৃদয়ে কতোটা প্রশান্তি – এটা আপনি কোনদিন ধারনা করতে পারবেন না।

তবু আপনি ভালো থাকুন

প্রসংগ : শীলা আহমেদ (হিজাব সহ)আর আসিফ নজরুলের পাশাপাশি ছবি দেখে লেখা নিম্নের পোস্টের জবাব উপরের লেখা মেয়েটাকে দেখলেই আমার দুঃখ লাগে। অসম্ভব প্রতিভা ছিল অভিনেত্রী হওয়ার, কিন্তু সমস্ত প্রতিভা বিসর্জন দিয়ে এক শঠের গৃহবধূ হয়েছেন। ধর্মমুক্ত একজন প্রতিভাবান লেখকের কন্যা তিনি, অথচ চুল ঢাকেন হিজাব দিয়ে, এমন কী ফুলহাতা ব্লাউজ পরেন। মনে হচ্ছে নিজের রুচি, সৌন্দর্যবোধ, নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে মামুলি ব্যবসায়ী ধর্মবাদীর আদেশ মেনে চলছেন। হাজিটির মাথায় টুপি নেই, মুখে দাড়ি নেই। হাজিটির জীবন কিন্তু যেমন ছিল তেমনই আছে। গায়ে বাড়তি কিছু চাপাতে হয়নি, প্রতিভা বিসর্জন দিতে হয়নি।

এ চিঠির জবাব। হিজাব পরে আসিফ নজরুলের পাশে শীলাকে দেখে লিখেছিলেন:

জিয়া ও বাংলাদেশ

মেজর জিয়া থাকলে তার ভূমিকায় ইজরায়েল এই অপকর্ম করার সাহস পেতনা এটা ট্রল করার মতো কথা না।

৮০র দশকে মুসলিম স্টেটসম্যানদের মধ্যে মেজর জিয়া একজন রেসপেক্টেড পার্সন ছিলেন।

মির্জা আব্বাস আজ ইরাক-ইরান যুদ্ধ মদ্ধস্ততায় জিয়ার ভূমিকার কথা বললেন। তিনি ইসলামিক পিস কমিশনের মেম্বার হিসেবে এটার অংশ ছিলেন। এটা আজকের দিনে চিন্তা করা যায়? তবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে মেজর জিয়ার স্পেসিফিক অবস্থান আছে।

মেজর জিয়ার সময়ে বাংলাদেশ OIC এর আল-কুদ্স কমিটিতে সদস্যপদ পায়। OIC তে চারটা স্ট্রাকচার্ড কমিটি আছে এর মধ্যে ফিলিস্তিন প্রশ্নে স্পেসিফিক কমিটি হলো আল-কুদ্স কমিটি।

OIC এর সদস্য ৫৭টা দেশ হলেও আল-কুদ্স কমিটির সদস্য দেশ হলো ১৬টা এর মধ্যে বাংলাদেশও একটা।

১৯৮১ সালের এপ্রিলে এই কমিটির ৫ম মিটিং এ মেজর জিয়া অংশগ্রহণ করেন।

এই মিটিং এর পর কমিটি থেকে ইউএন এর কাছে ৩০টা রেকমেন্ডেশন পাঠানো হয় ফিলিস্তিন ইস্যু সল্ভ্ করতে।

- এরমধ্যে অর্থনৈতিক দিক ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ইজরায়েলের সাথে অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল করে চাপ প্রয়োগ।

- ভ্যাটিকানের সাথে আলোচনা করে PLO কে ফিলিস্তিনের অথোরিটি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে খৃস্টান জায়োনিজমকে ট্যাকল দেয়া।

- কিংবা সবচেয়ে র‍্যাডিকাল, ইউএনের মধ্যে মিলিটারি ব্যুরো স্থাপন করে তার মাধ্যমে ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে সামরিকভাবে সহায়তা করার করার মতো প্রস্তাবনাও ছিলো।

এছাড়াও যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল তার অর্ধেকও প্রয়োগ হলে ফিলিস্তিনের পুরো চিত্র পাল্টে যেত।

এই মিটিং এর পরের মাসে, মে মাসে মেজর জিয়ার আসাসিনেশন হয়। মেজর জিয়ার আসাসিনেশনের পেছনে মুসলিম বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতে তার অবস্থান অন্যতম কারণ ছিলো বলে ধারণা করা হয়।

তার মৃত্যুর পর OIC থেকে বিবৃতি দেয়া হয়েছিলো যেখানে তার সম্পর্কে বলা হয়,

"...recalls his immense contribution to the Islamic Ummah, his untiring efforts till his martyrdom to further the cause of peace and security of the Muslim countries"
আজকের আরব এবং মুসলিম বিশ্বের অবস্থানের সাথে সে সময়ের অবস্থান মিলিয়ে দেখুন।
আরব দেশগুলোর নতজানু অবস্থানের কারণে OIC পরবর্তীতে একপ্রকার অকার্যকর হয়ে যায় এবং আল-কুদ্স কমিটিও একটা চ্যারিটি টাইপ কমিটি হয়ে যায়।

আরব দেশের বাইরে দক্ষিণ এশিয়ায় মেজর জিয়ার মতো শক্তিশালি স্টেটসম্যানরা থাকলে হয়তো আজ চিত্রটা আসলেই অন্যরকম হতে পারতো।

আল্লাহ তার ভুল-ক্রটিগুলো ক্ষমা করে দিক।

সারা বাংলাদেশ মিলে এই ছবিটার ভার বহন করতে পারবে?

শহীদ গোলাম নাফিস, ১৭ বছর। বনানী স্কুল এন্ড কলেজের এস.এস.সি ২০২৪ ব্যাচের ছাত্র ছিল সে। আন্দোলনে গিয়ে ৪ আগস্ট শহীদ হয়েছে।

রিকশার পাদানিতে আড়াআড়িভাবে ঝুলে আছে নাফিসের দেহ। এক পাশে শূন্যে ঝুলছে দেশের পতাকা মোড়ানো মাথা অন্যপাশে ঝুলছে গুলিবিদ্ধ নিথর পা দুটো। একজন রিকশা ড্রাইভার প্যাডেল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নাফিসকে। এই দৃশ্য যতবার মনে পড়ে ততবার চোখে ভিজে যায়।

নাফিস তখনো জীবিত ছিল। টুকরিতে করে নিয়ে গুলিবিদ্ধ আহত নাফিসকে ম্যানহোলে ফেলে দিতে চেয়েছিল পুলিশ, তারপর পোড়াতেও ট্রাই করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নাফিসকে বাঁচানোর চেষ্টা করে রিকশাচালক এই ভাইটি।

নাফিস সবেমাত্র বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি পাশ করেছে। বয়স মাত্র ১৭। এ বয়সে এতবড় স্যাক্রিফাইস করে ফেলল সে।

৪ আগষ্ট সকালে নাফিস শাহবাগ হয়ে ফার্মগেটে মুভমেন্টে যোগ দেয়। দুপুর দেড়টার দিকে সর্বশেষ তার মাকে কল দিয়ে জানায় সে নিরাপদে আছে। মা তাকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে বলে। এরপর সময় গড়াতে থাকে, নাফিসের আর কোনো সন্ধান পাচ্ছিল না তার মা। মোবাইলেও কোনোভাবে কানেক্ট করতে পারছিল না। সন্ধ্যা নাগাদ তার বাবা বের হয় ছেলের খোঁজে। শাহবাগ থেকে ফার্মগেট, হাসপাতাল টু হাসপাতাল খোঁজাখুজি করে কোথাও ছেলের সন্ধান না পেয়ে রাত বারোটায় ফিরে যান বাসায়। এরমধ্যে নাফিসের সেই হৃদয়বিদারক ছবি ফেসবুক ভাইরাল হয়ে যায়। বোন সেই ছবি দেখায় বাবাকে। সেখান থেকে তারা শনাক্ত করতে পারে নাফিসকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গে খোজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত নাফিসের বাবা মানবজমিন পত্রিকার অফিসে ছুটে যান সেই

ছবিটির ফটোগ্রাফারের কাছে। মানবজমিনের অফিসে থাকা অবস্থায় তার শালা (মানে নাফিসের মামা) কল দিয়ে জানায় সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলের মর্গে পাওয়া গেছে নাফিসের লাশ।

আসলে নাফিসের সাথে সেদিন কী ঘটেছিল তার বর্ণনা দিই। এই রিকশাওয়ালা ভাইয়ের জবানিতে। উনার নাম মো. নূর মোহাম্মদ। উনিই নাফিসকে পুলিশের কাছ থেকে উদ্ধার করে বাঁচাতে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সেদিন তিনি ২৭-এ যাত্রী নামিয়ে দিয়ে সংসদের সামনের দিয়ে ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছিলেন, বিজয় সরণীর দিকের রোডে সংসদের কোনায় দেখেন মারামারি, তিনি তখন রং সাইড দিয়ে পাশ কাটিয়ে ফার্মগেট চলে যান। এরমধ্যে একজন যাত্রী তুলেন মগবাজারের। ফার্মগেট পুলিশ বক্স পার হবেন তখন দেখছেন বৃষ্টির মত গোলাগুলি চলছে। বিজ্ঞান কলেজের সামনে পুলিশ গতিরোধ করে উনাকে, টানেন সামনে নিতে। উনি তখন বলেন, ঐদিকে গোলাগুলি হইতেছে যামু ক্যান। পুলিশ ধমক দিয়ে বলে, তোরে আইতে কইছি আয়। এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। তিনি তখন, দোয়াদরুদ পড়তে থাকেন। কপালে তার কী আছে আল্লাহ জানে।

সামনে নেওয়ার পর বলে, এইডা তোল রিকশায়। মো. নূর মোহাম্মদ (রিকশাচালক) বলেন, কী তোলমু?

তখন পাশে প্লাস্টিকের কিছু একটা আর একটা টুকরি দেখতে পান, বলেন এগুলো তোলমু?

তখন খেয়াল করেন নাই পাশে একটা গুলিবিদ্ধ দেহ কুণ্ডলি পাকিয়ে পরে আছে।

পুলিশ তাকে ধমক দিয়ে বলে, আরে বেটা লাশ ফালাই রাখছি দেখস না! এই যে, এইডা তোল। গালাগালি শুরু করে পুলিশ।

নূর মোহাম্মদ তখন নাফিসের পেছনের সাইড ধরে আলগি দেয়। পুলিশ তার দুই পা ধরে পিক্কা মেরে রিকশার পাদানিতে ফেলে।

গাড়িতে ফেলানোর পর বলতেছে, আরও দুইটা গুলি কইরা দে। বাইচ্চ্যা যাইতে পারে। রিকশার ড্রাইভারকে দেখিয়ে গালাগালি করে বলে, ওই শালার পায়েও গুলি মার। রিকশা টান দিতে গেছে দেখে নাফিস পরে যাচ্ছে। তখন পাশের আরেকজন পুলিশ এসে বলে শোয়া তারে। (ড্রাইভারের ভাষায় এই পুলিশ কিছুটা মানবিক ছিল) রিকশা ড্রাইভার দেখতেছে হাতটা চেইনে আটকে যাচ্ছে, তাই হাতটা টেনে রডের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। রিকশার ড্রাইভার আল রাজিতে নিতে চেষ্টা করে। তখনও নাফিসকে বাঁচানো যেত হয়ত। বাট পুলিশ গালাগালি করে বলে, বেটা এইডা সোহরাওয়ার্দী বা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ফালা। পুলিশের বাধা উপেক্ষা

করেও আল রাজির দিকে টানে রিকশা ড্রাইভার। তখন কেউ ধরতে আসে নাই। ছাত্রলীগ-যুবলীগের বাধার মুখে সেখান থেকে ফিরে আবার চক্ষু হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে সেনাবাহিনী দেখে এগিয়ে আসে। বলে তাকে ইমার্জেন্সিতে নিতে হবে। দুই তিনজন তাকে ধরাধরি করে একটা অটোতে তুলে তাকে সোহরাওয়ার্দী নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে আমাদের নাফিসে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে নেয়। শহীদের তালিকায় তার নামও যোগ হয়ে যায়।

রিকশার ড্রাইভারের ভাষ্যমতে, পুলিশ প্রথমে ট্রাই করছিল তাকে টুকরিতে করে ম্যানহোলে ফেলে দিতে, বাট কোথাও আশপাশে ম্যানহোলের ঢাকনা খুঁজে দেখতে পায় নাই। পরে বলতেছে, তাকে পুইড়া ফেল। তখন রিকশা ড্রাইভার পাশেই দাঁড়ানো। রিকশায় যখন তুলছিল তখন মানবজমিনের যে সাংবাদিক ছবি তুলছিল তাকেও গালাগালি করে বলতে থাকে, ক্যামরা বন্ধ কর। তোর ক্যামরা ম্যামরাসহ তোরে পুড়া দিয়ে লামু।

আমাদের স্মৃতি থেকে নাফিসরা কোনদিন সরবে না, এই পুলিশ বাহিনীও যতদিন থাকবে আমরা তাদেরকে ততদিন ঘৃণার চোখের দেখব। এরা আমাদের ভাই, বন্ধু, সহপাঠীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে, কীভাবে আমরা তাদের ক্ষমা করব।

উহুদের যুদ্ধে

উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন শহীদ হয়েছে! সকল শহীদের লাশ এনে এক জায়গায় রাখা হচ্ছে। নবীজি গুণে দেখেলেন ৬৮টা লাশ। ২টা নাই ... একজন তাঁর চাচা হামজা (রাঃ), আরেকজন হানজালা (রাঃ)। অস্থির হয়ে পড়েছেন নবীজি। সব সাহাবাদের পাঠাইলেন লাশ খোজার জন্য। ...হঠাৎ বোরকা পরা এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন নবীজির কাছে। নবী তাকে চিনলেন না। মহিলা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আজকে আপনি একটা বিয়ে পড়িয়েছিলেন মনে আছে? নবীজি বলেন, হ্যাঁ আমি তো হানজালার বিয়ে পড়িয়েছি। যার বিয়ের খুশিতে আমি খুরমা খেজুর ছিটিয়ে ছিলাম। মহিলা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার হাতটা দেখেন। হাতের মেহেদী এখনও শুকায় নাই। কাল বিকেলে বিয়ে হয়েছিল আর রাত ২ টা বাজে উহুদের যুদ্ধের জন্য বের হয়ে গেছে হানেজালা। বাসর রাতে উনার সাথে আমার ভালোভাবে পরিচয়ই হয় নাই। যাওয়ার আগে শুধু বলে গেছেন – যদি দেখা হয় তাহলে দেখা হবে দুনিয়ায়, আর যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে দেখা হবে জান্নাতে। মহিলা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ যাওয়ার আগে আমার কপালে একটা চুম্বন করে গেছেন। লজ্জায় বলতেও পারি নাই আপনার জন্য গোসল ফরজ। নবীজি কাঁদতেছেন। মহিলা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, শহীদদের তো আপনি গোসল দেন না, আমার স্বামীকে আপনি একটু গোসল দিয়েন? নবীজি সম্মতি প্রকাশ করার পর একজন সাহাবি দৌড়ে এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ হানজালাকে পাওয়া গেছে। ... সবাই গেলেন। গিয়ে দেখলেন সাদা কাফনের ভিতর লাশের মাথায় পানি।

নবীজি মাথা হাতায়ে দিলেন। জিবরাঈল আসলো! ... এসে বলল; ইয়া রাসুলুল্লাহ হানজালার কোরবানিতে আল্লাহ্ পাক এতটাই খুশি হয়েছে যে আমার বাহিনীকে আদেশ করলেন তাকে নিয়ে আসতে। ... ইয়া রাসুলুল্লাহ আমরা ফেরেশতারা তাকে তৃতীয় আসমানে এনে জমজমের পানি দিয়ে গোসল করিয়েছি এবং তার শরীরে থেকে যে সুগন্ধ পাচ্ছেন, এটা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ খুসবু মিশক আম্বর আতরের ঘ্রাণ। আমরাই উনাকে কাফনের কাপড়ে আচ্ছাদিত করেছি। ...

সুবহানআল্লাহ !!! আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় মানুষকে কী পরিমাণ ভালবাসেন, কী পরিমাণ সম্মানিত করেন তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলতে চাই, "হে আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে সফল মানুষদের পথের পথিক হওয়ার তওফিক দান করুন, আমিন"।

রাষ্ট্র সংস্কারের সুপারিশ: এনসিপি ও বিএনপির তুলনামূলক

সংস্কার কমিশন	এনসিপি	বিএনপি
জীবনে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না	একমত	একমত হয়নি। কেউ টানা তিনবার প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। তবে বিরতি দিয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন।
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণের সুপারিশ	একমত	একমত হয়নি। সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর বহাল রাখতে চায় তারা।
নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবে	প্রধানমন্ত্রী হবেন মন্ত্রীসভায় first among the equals (সমানদের মধ্যে প্রথম)	একমত হয়নি
নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন থাকলেও সংবিধান সংশোধনে গণভোট লাগবে	একমত	সংবিধান সংশোধনে গণভোট চায় না
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স ২১ বছর	প্রার্থীতার নুন্যতম বয়স ২৩ এবং ভোটাধিকারের বয়স ১৬ করা উচিত	২৫ বছরই বহাল রাখার পক্ষে
বাহাত্তরের সংবিধানের চার মূলনীতি বাতিলে	একমত	একমত হয়নি
সরাসরি ভোটে ১০০ নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন	একমত	একমত হয়নি
সাংবিধানিক পদগুলোতে নিয়োগ দেয়ার জন্য জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল নামক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ	একমত	একমত হয়নি

সংস্কার কমিশন	এনসিপি	বিএনপি
শুধু সংসদ নয়: ইলেক্টোরাল কলেজ-এর মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রপতি। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে বিনা বাধায় দলীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঠেকাতে এ সুপারিশ করা হয়েছে।	একমত	একমত হয়নি
জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না	একমত। সংসদের দুই-ত তীয়াংশের মত ছাড়া জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে না। নির্বাচনকালীন সরকার জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবে না।	একমত হয়নি
উচ্চকক্ষের ১০০ সদস্য নির্বাচিত হবেন রাজনৈতিক দলগুলোর সারা দেশের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে	একমত। দলগুলোকে নির্বাচনের আগে উচ্চকক্ষের প্রার্থী ঘোষণা করতে হবে। যেন ভোটাররা আগে থেকেই অবগত।	একমত নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে যেভাবে নারী আসন বণ্টন হয়, সেভাবে উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন হতে হবে।

দায়

বিশাল অংকের টাকার অফার নিয়ে বিপাশা হায়াতের সামনে হাজির হলেন এক বিজ্ঞাপন নির্মাতা। 'আপা আমাদের ক্লায়েন্টের খুব ইচ্ছা আপনাকে দিয়ে বিজ্ঞাপনটি করানো। আপনি যদি রাজি হতেন তাহলে আমরা খুবই খুশি হতাম।'

নির্মাতা পক্ষ নিশ্চিত ছিলেন বিশাল অংকের এই অফার পেয়ে যেকোনো তারকাই একবাক্যে রাজি হয়ে যাবেন। কিন্তু ঘটল উল্টোটা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিপাশা হায়াত বললেন, 'আপনাদের প্রডাক্ট-এর রেপুটেশন তো ভালো না। আমি যদি আপনাদের পন্যের বিজ্ঞাপন করি তাহলে অনেকেই বিভ্রান্ত হতে পারেন। তাদের ক্ষতি হতে পারে। আমি এটা করব না।'

'টাকার অংক যদি দ্বিগুণ করে দেই তাহলেও করবেন না?'

'না, দশগুণ করে দিলেও করব না' – বিপাশা হায়াতের স্পষ্ট উত্তর। আরেকটু ভেঙে বললেন তিনি, 'দেখুন, দেশের মানুষের প্রতি আমার একটা দায়বদ্ধতা

আছে। টাকার বিনিময়ে আমি এমন কিছু করতে পারি না যাতে অন্য কারো ক্ষতি হতে পারে।'

কটাক্ষ করে নির্মাতা পক্ষ বললেন, 'কি যে বলেন আপা, এই সময়ে এসে কেউ এতকিছু ভাবে নাকি?'

বিপাশা হায়াত কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু ছোট করে বললেন, 'সেটাই!'

হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন নির্মাতা পক্ষ।

অনেক পরিচিত মুখের অসচেতন পদক্ষেপের কারণে যখন অনেক সাধারণ মানুষের ক্ষতি হতে দেখি, যখন রাজধানীতিবিদরা রাজনৈতিক বক্তব্য বলে সব দায়বদ্ধতা অস্বীকারের চেষ্টা করেন তখন বিপাশা হায়াতের মতো মানুষদের কথাই মনে আসে। আজকের এই দিনে বিপাশা হায়াতকে উপলক্ষ করে স্রোতের বিপরীতে চলা সবার প্রতি রইল অসীম শ্রদ্ধা। শুভ জন্মদিন বিপাশা হায়াত। আমাদের বড় আপা।

লীগের আমলে ড. ইউনূসকে নিয়ে যা জানতাম:

১। উনি সুদ খায়।
২। উনি আমেরিকার দালাল।

বিএনপি ড. ইউনূসকে নিয়ে যা জানাচ্ছে:

১। উনি মুক্তিযুদ্ধ করে নাই।
২। উনি জিয়ার নাম না নিয়ে ভুল করসে।
৩। উনি নির্বাচন দিতে চায় না।

আমি ফেসবুকে গত দুইদিন যা জানলাম:

১। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের মিডল টেনেসি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। সেখানে জন্মভূমির স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে নেমে পড়েন তিনি। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের খবর পৌঁছে দিতে সেখানকার স্থানীয় পত্রিকা ও টেলিভিশনের সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটি নিয়মিত করেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্থন জোগাতে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার পরিচালনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশভিলে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে প্রকাশ করতেন 'বাংলাদেশ নিউজলেটার'।

২। চীনের হাইনানে প্রাদেশিক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

৩। মাইক্রোসফটের বিল গেটস নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে প্রফেসর ইউনূসকে পুরো সিলিকন ভ্যালি শহর দেখিয়েছিলেন।

৪। নোবেল, অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড, মার্কিন কংগ্রেশনাল অ্যাওয়ার্ড – পৃথিবীর ইতিহাসে ৩টা পুরস্কারই জিতেছেন এমন মানুষ মাত্র ১২ জন! সেই ১২ জনের একজন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

৫। 'অলিম্পিক গেমস' পৃথিবীর সম্মানজনক প্রতিযোগিতার একটি। আর অলিম্পিকে সবচেয়ে সম্মানিত মেহমান হলেন মশাল বাহক, জাপানে অনুষ্ঠিত ২০২০ অলিম্পিকে মশাল বাহক ছিলেন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

৬। ২০২৪ সালের ফ্রান্সে অনুষ্ঠিতব্য প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজক কমিটির ৩ জনের একজন হচ্ছে মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে আরেকজন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাঁক্রো। ২০২৬ ইতালী অলিম্পিকের জন্য ইতালিয়ানরা উনাকে পাওয়ার জন্য তদবির করছে। পুরা অলিম্পিকের মডেলই ছিল থ্রি-জিরো।

৭। সারা পৃথিবীর ১০৭টা ইউনিভার্সিটিতে মুহাম্মদ ইউনূস সেন্টার আছে। ইউনিভার্সিটিগুলো নিজেদের উদ্যোগে এটা করেছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর মাইক্রো-ফাইন্যান্স। যেটা তাকে এবং তার গ্রামীণ ব্যাংককে নোবেল শান্তি পুরষ্কার এনে দিয়েছিলো।

৮। ড. ইউনূস হচ্ছেন পৃথিবীর ওয়ান অব দ্যা হায়েস্ট পেইড স্পীকার। স্পীচ দেয়ার জন্য ওনাকে টাকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ওনার বক্তব্য শোনার জন্য খরচ করতে হয় ৭৫ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার। কখনো আরো বেশি।

৯। বিশ্বের লিডিং ইন্টালেকচুয়ালের যেকোনো তালিকায় টপ ১০ এর ভিতরে থাকেন ড. ইউনূস। মুসলিম বিশ্বে নোবেল বিজয়ী ইউনূসের বিকল্প খুঁজে পাওয়াটা খুবই কঠিন, কিন্তু তিনি আমাদের বাংলাদেশের! এদেশে আর এমন ইউনূস জন্মাবে কিনা আজও সন্দেহ।

১০। কোর্ট-কাচারির ৮ তলার এজলাসে তাকে যখনই হাজিরা দিতে হতো সেসময় কোর্ট বিল্ডিং এর লিফট বন্ধ করে দেয়া হতো। ৮২ বছরের অশীতিপর এই বৃদ্ধকে প্রতিবারই হেঁটে হেঁটে ৮ তলায় যেতে হতো। এবং এই ঘটনা নাকি ৪০ বারের মত ঘটেছে।

বিএনপির ফজলু একদম উচিত কথা বলছে। আমরা উনাকে যত বড় মাপের ভাবি উনি তত বড় মাপের না। উনাকে আল্লাহ এত বড় মাপের মানুষ বানাইসেন যে বিএনপির নব্য দিল্লীর দালালদের পক্ষে সেটা মাপা কোনদিম সম্ভব না।

উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

এই লোকের মেধা ও সাফল্য দেখলেই ঈর্ষা জাগবে।

তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুটো পরীক্ষাতেই কুমিল্লা বোর্ড থেকে সেরা ১০ এর মধ্যে থেকে বোর্ড স্ট্যান্ড করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়ে অনার্স-মাস্টার্স দুটোই প্রথম হয়ে শেষ করেন।

তিনি ১৯৭৯ সালে বিসিএস পরীক্ষা দেন সেখানে তিনি সারা বাংলাদেশের মধ্যে তৃতীয় হন এবং তিনি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে কাজ শুরু করেন।

তিনি ১৯৮৪ সালে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকার বিখ্যাত বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে যান। তিনি পিএইচডি শেষ করে ১৯৮৯ সালে দেশে আসেন এবং তার কাজে ফিরেন। ৩ বছর তিনি সেখানেই কাজ করেন। তারপরে তিনি সিঙ্গাপুরে যান।

১৯৯২ সালে তিনি এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথিবীর সেরা ১০টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টা সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে জয়েন করেন।

(পরিশেষে বলি সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে হাতে গোনা কয়েকজন বাঙালি শিক্ষকতা করতে পেরেছেন তার মধ্যে তিনি একজন।)

১৯৯২-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন।

সালমান মুক্তাদির সাকিবকে না এই লোককে জাতীয় সম্পদ বলেছিলেন।

১. এই লোক চাইলেই আমেরিকায় 1st Class জব করে লাক্সারি জীবন পার করতে পারতেন।

২. এই লোক চাইলেই সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তার শিক্ষকতা পেশা কন্টিনিউ করে লাক্সারি জীবন পার করতে পারতেন। কিন্ত তিনি লাক্সারি জীবন ত্যাগ করে দেশে এসেছিলেন দেশের জন্য কিছু করার জন্য। মেট্রোরেল চালু করতে ৩০০-৪০০ কোটি টাকা লাগবে। ১

বছরের বেশি সময় লাগবে। এই লোক উপদেষ্টা পদে আসার ১০ দিনের মধ্যে মেট্রোরেল চালু করেন।

তামিম ইকবালের কার্ডিয়াক এরেস্ট – গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূল্যায়ন

গত বছর একজন বৈমানিক এর মৃত্যু নিয়ে লিখেছিলাম। তাকে কার্ডিয়াক এরেস্ট অবস্থায় নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। সে ক্ষেত্রে হাসপাতালে নিতে নিতে অনেক দেরি হয়ে যায়। যদি উদ্ধার এর পর পরই বুকে চাপ দিয়ে (CPR , BLS) কৃত্রিম ভাবে হৃদপিণ্ড পাম্প করা যেতো বাঁচার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যেত।

এবার আসি তামিম ইকবালের প্রসঙ্গে। এ ক্ষেত্রে অসাধারণ একটা উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে।

আমরা যে সব চিকিৎসক আইসিইউ, সিসিইউ কিংবা ইমার্জেন্সি বিভাগে কাজ করি প্রতিনিয়ত কার্ডিয়াক এরেস্ট এর পেশেন্ট ম্যানেজ করি। যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো অনেক সময় সিপিআর শুরু করতে অনেক অনেক দেরি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হার্ট পাম্প করছে না (যখন গলার ধমনীর পালস হাতে অনুভব করা যায় না) নিশ্চিত হলে অনতিবিলম্বে বুকের মাঝখানে চাপ দিয়ে কৃত্রিমভাবে হার্ট পাম্প করতে হবে। পাশাপাশি প্রতি তিরিশটা চাপের পরে দুবার করে মুখ দিয়ে ভিকটিমকে শাস দিতে হবে। এ ভাবে পাঁচবার করে একটা চক্র পূর্ণ করা যায়।

এখন এই প্রক্রিয়া শুরু করতে যত দেরি হবে ততো দ্রুত ভিকটিম এর ফিরে আসার সম্ভবনা কমবে। প্রতিটা সেকেন্ড, মিনিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অক্সিজেন ঘাটতি জনিত কারণে মস্তিষ্ক দ্রুত স্থায়ীভাবে অকার্যকর হয়ে যায়। এমনকি যদি হৃদপিণ্ড পুনরায় সচল হয়েও যায় তবুও মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। অনেক সময় এই সব পেশেন্ট সারা জীবনের জন্য এক রকম নির্জিব (vegetative) জীবন যাপন করেন।

তামিম এর ক্ষেত্রে সব ধরণের খারাপ পরিস্থিতি হবার সম্ভাবনা ছিলো কিন্তু আসুন দেখে নেই কি অসাধারণ ভাবে তার পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হয়েছে।

১. হাসপাতালে নেয়ার আগ থেকেই তাকে হাই কোয়ালিটি সিপিআর দেয়া হয়েছে এবং হাসপাতালে নেয়ার পরও সেটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যার ফলে তার মস্তিস্ক বড় ধরণের ক্ষতি হতে রক্ষা পেয়েছে। যদি ওই সময়, সময়ক্ষেপণ করা হত তাহলে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা অনেক কমে যেত।

২. খুবই দ্রুত সময়ে তাকে primary PCI করে হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন পুনরায় চালু করা হয়েছে। যেটিই বিশ্বমানের যথাযথ পদ্ধতি। যা তাকে বেঁচে উঠতে মূল ভূমিকা রেখেছে।

আমাদের শিক্ষা

১. প্রত্যেক নাগরিককে BLS (Basic life support) training দিতে হবে। এটি অবশ্যই পাঠ্যক্রমে থাকতে হবে।

২. জরুরি ও মুমূর্ষু চিকিৎসা সেবা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

৩. Primary PCও বা জরুরি হৃদসেবা ঢাকার বাইরেও সহজলভ্য করতে হবে।

সর্বোপরি তামিম ইকবালের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দেশের সাস্থ্য ব্যবস্থায় আস্থা রাখুন। ভারত কিংবা চিনে নয় এই দেশেই বিশ্বমানের হাসপাতাল গড়ে তলুন।

ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে।

নায়ক মান্না vs ক্রিকেটার তামিম vs কক্সবাজারের অজানা রোগী

১. নায়ক মান্না: বুকের ব্যাথাকে প্রথমে গ্যাস্ট্রিকের ব্যাথা মনে করে অতটা গুরুত্ব দেন নি। ম্যাসিভ হার্ট এট্যাকের পর ইউনাইটেড হসপিটাল থেকে Emergency Primary PCI ট্রিটমেন্ট এডভাইস করা হয়। কিন্তু তিনি এটা দেশে করাতে চান নি। উনার স্ত্রী-পরিবার তখন দেশের বাইরে ছিলেন। উনি চেয়েছেন শুধু মেডিসিন দিয়ে চিকিৎসা হোক। ডিসিশন দিতে অনেক কালক্ষেপণ করা হয়। # ফলাফল:

১. ১. মান্নার মৃত্যু।
২. হাসপাতাল ও ডাক্তারদের নামে মামলা।

২. ক্রিকেটার তামিম ইকবাল: বুকের ব্যাথাকে প্রথমে গ্যাস্ট্রিকের ব্যাথা মনে করে গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ সেবন করেছেন।

তারপরেও ব্যাথা পুরোপুরি না কমায় বিকেএসপির নিকটস্থ কেপিজে হসপিটালে যান। হার্ট এট্যাক ডায়াগনোসিস এর পর ঔষধ দিলে কিছুটা ভালো বোধ করেন।

ইমার্জেন্সি হেলিকপ্টার কল করতে বলেন। এরপর হসপিটাল থেকে বিকেএসপির মাঠে যান হেলিকপ্টারে উঠতে, কিন্তু হেলিকপ্টারে উঠার আগেই সম্ভবত সেকেন্ড এট্যাক হয়ে কার্ডিয়াক এরেস্ট হয়ে যায়, অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে যায়।

ওখানেই ইমার্জেন্সি CPR (বুকের উপর ক্রমাগত চাপ) শুরু করেন ফিজিও দেব এবং ডাক্তারদের পরামর্শে হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনার ডিসিশন পরিবর্তন করে বরং পুনরায় কেপিজে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে লাইফ সাপোর্টে দিয়ে তারপর Emergency Primary PCI করা হয়।

এক্ষেত্রে তামিমের পরিবার ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে ম্যাচ রেফারিকে স্বাধীনতা দিয়ে দেন। উনি ডাক্তারদের পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত দেন তামিমের পরিবারের পক্ষ থেকে।

#ফলাফল: আল্লাহর অশেষ রহমতে কার্ডিওলজিস্ট ডা. মারুফ স্যার, এনেস্থেসিওলজিস্ট ডা. মনিরুজ্জামান স্যার এবং বিকেএসপি + কেপিজে টিমের উছিলায় তামিম এ যাত্রায় বেঁচে ফিরেছে।

আল্লাহ না করুন, যদি মান্নার মত পারিবারিক সিদ্ধান্তহীনতা/কালক্ষেপণ হয়ে তামিমের কিছু হত, তখন সব দায় কার উপর পড়তো?? যত দোষ হত নন্দ ঘোষের!!

(অনেকটা ওবায়দুল কাদেরের ঘটনার মত ভীষণ রিস্কি সিচুয়েশনে ডাক্তাররা কাজ করেছেন)

৩. কক্সবাজারের অজানা রোগী(বয়স্ক): এই রোগীর অতীতে ২ বার হার্টে রিং পরানো হয়, ১ বার ওপেন হার্ট সার্জারী করা।

পুনরায় রোগী ম্যাসিভ হার্ট এট্যাক নিয়ে আসে। একজন চিকিৎসক (ডা. সজীব) সেই রোগী কে বেঁচে ফেরাতে কক্সবাজার সদর হসপিটালের ইমার্জেন্সি তে CPR (বুকে ক্রমাগত চাপ) দেন।

#ফলাফল: অনেক চেষ্টার পরেও রোগী বেঁচে ফিরে নি। আর ডা. সজীবের উপর হামলা হয়, মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার হয়!!

#Take_Home_Message

১. ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আল্লাহর উপর ভরসা করে আপনার চিকিৎসকের ডিসিশনকে সমর্থন জানান, তাকে স্বাধীনভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে দিন। বেশি পণ্ডিতি করে কালক্ষেপণ করবেন না, এবার আপনি যত বড় শিল্পপতি/আপনার বিষয়ে যত বড় জ্ঞানীও হোন না কেন।

২. বুকের ব্যাথাকে গ্যাস্ট্রিকের ব্যাথা বলে অবহেলা করা যাবে না। হসপিটালে অনেক রোগীর লোক এবং স্টাফ/নার্সও অনেক সময় "গ্যাস্ট্রিকের ব্যাথা" বলে পণ্ডিতি করে ইসিজি করাতে চায় না। মনে রাখতে হবে, গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা না করলে রোগী মরবে না কিন্তু হার্টের সমস্যা ধরতে/চিকিৎসা শুরু করতে দেরি করলে রোগীর মৃত্যু ঝুঁকি আছে!

৩. CPR (বুকে চাপ), Heimlich Maneuver এর মত Life Saving টেকনিকগুলো বেসিক এডুকেশন সিস্টেমে এড করা উচিত। কেউ এসব চেষ্টা করেও যদি জীবন বাঁচাতে ব্যর্থ হয়,তাকে বুকে চাপ দিয়ে রোগী মেরে ফেলেছে না বলে তাকে সাপোর্ট করুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

৪. ওবায়দুল কাদেরের মত অকৃতজ্ঞতা না দেখিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শিখুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে কারো ২ টাকার লাভ হবে না, বরং ঝুঁকি নিয়ে হলেও ভালো কাজ করার স্পৃহা বাড়বে।

ওবায়দুল কাদের এতটাই অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিল যে, সুস্থ হবার পর প্রেস কনফারেন্সে শেখ হাসিনা, ভারতের ডা. দেবী শেঠি, সিংগাপুরের ডাক্তার, তার নেতা কর্মী কারো অবদানের কথা মেনশন করতে ভুলে নি। শুধু ভুলেছে সেই ডাক্তারের (অধ্যাপক ডা. আবু নাসের রিজভী) কথা যিনি নিজে গাড়ী ড্রাইভ করে ওবায়দুল কাদেরকে পিজি হসপিটালে নিয়ে এসে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেন। ভুলেছে পিজি হসপিটালের পুরো কার্ডিয়াক টিমের কথা, আল্লাহর রহমতে যাদের উছিলায় সেদিন সে বেঁচে ফিরেছিল!

দয়া করে এমন অকৃতজ্ঞ হবেন না।

Dr Fahim Uddin

জিল হোসেনের গল্প

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭-৬৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন জিল হোসেন। ৭৩ সালে উনি অনার্সে একটি বিষয়ে ফেল করে শিক্ষকদের গাফিলতির কারণে। একজন শিক্ষক উনাকে ক্লাসরুমে বলে, জিল হোসেন তুমি তো ফেল করো নাই। একটা রাউন্ড ফিগার (০.৫ মার্ক) যোগ করতে ভুল করেছে শিক্ষকরা, তুমি ব্যাপারটা ডিপার্টমেন্টের অফিসে জানাও।

তখন ঐ শিক্ষকের কথা শুনে জিল হোসেন সাহেব ডিপার্টমেন্টের প্রধানকে জানান যে তার খাতায় একটা রাউন্ড ফিগার যোগ করা হয় নাই। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে একাডেমিক বোর্ড গঠন করে এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য।

এই চার শিক্ষকের মিটিং ২ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে থাকে। তারা বলে, ভুল হউক আর যাই হোক, যেহেতু আমরা ফেল দিয়েছি এটা ফেইলই থাকুক। এখন পাশ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপমান। তখন সভার বাকি ২ জন শিক্ষক প্রতিবাদ করেন, তাই বলে আমাদের ভুলে একজন শিক্ষার্থীর জীবন নষ্ট করে দিব? আর আমরা কেমন শিক্ষক, নিজেদের ইগোর কারণে একজন শিক্ষার্থীর প্রতি অন্যায় আচরণ করে যাবো!

শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে থাকা দুই শিক্ষককের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হলো। জিল হোসেনকে ফেলই দেখানো হলো।

পরবর্তীতে প্রতিবাদ করা ঐ ২ শিক্ষকের একজন মিটিং থেকে বের হয়ে ছাত্র, মানে জিল হোসেনের কাঁধে হাত রেখে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলছিলো, জিল হোসেন, এই দেশটায় বাস করা যায় না, অমানুষে ভরে গেছে।

পরবর্তীতে ঐবছরই তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকতা ছেড়ে বিদেশে চলে যায়, পরবর্তীতে আর কোনোদিন দেশে ফেরেননি।

এই দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হাসিমুখে মেনে নেন জিল হোসেন, কিন্তু তার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের ক্ষোভ রয়ে যায় তার প্রতি। এক বছর পর আবার পরিক্ষায় নকলের মিথ্যা অভিযোগ এনে এবার তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।

এবার জিল হোসেন আইনের আশ্রয় নেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তখন ১৯৭৬ সালে আদালত রায় দেয়, তার ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দিয়ে তাকে আবার পড়াশোনার সুযোগ দিতে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আবার আপিল বিভাগে যায়, সেটা গড়িমসি করতে করতে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রায় হয়, তাকে ফেল দেখানো এবং ছাত্রত্ব বাতিল করা ছিলো অবৈধ। তাকে পাশ দিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য রায় দেয় আদালত।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন মানতে নারাজ, তারা বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করে উনাকে। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন মঈনুল হোসেন। তিনি জিল হোসেনকে আদালত প্রাঙ্গণে বলেন, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ভুল বুঝিয়ে এই মামলায় নিয়ে এসেছে, আমি কেন একজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে লড়ব।

শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনার্সের সার্টিফিকেট দিতে সম্মত হয়। কিন্তু তখন উনার বয়স ৪৭ বছর। এখন গ্রাজুয়েশনের সার্টিফিকেট দিয়ে কী করবেন তিনি!

তখন তিনি আদালতে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেন। কিন্তু সে সময় সবাই তাকে উপহাস, ঠাট্টা করতো। কেউ কেউ বলতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে সব হারাতে হবে, তার আগেই সরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। মামলা চালিয়ে যান।

শেষ পর্যন্ত ৯ মার্চ ২০২৩ মামলার চূড়ান্ত রায় হয়েছে – উনার পরিবারকে দুই কোটি টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেওয়া। কারণ তার আগের বছর অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে তিনি মারা যান। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত রাষ্ট্র হওয়ায় ক্ষতিপূরণ মাত্র ২ কোটি দেওয়ার রায় হয়েছে। উন্নত বিশ্বের যেকোনো দেশ হলে এই মামলায় বিশ-পঞ্চাশ কোটি এমনকি একশো কোটি টাকাও ক্ষতিপূরণের রায় হতে পারতো।

যাইহোক এখন কথা হলো, দুই কোটি টাকা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় থেকে দিবে? নিশ্চয়ই জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকারের অনুদান থেকেই দিবে। কিন্তু কেন! এই টাকা ঐ দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বাকৃবি পুনরায় মামলা করে কর্তৃপক্ষ তাদের রিটায়ার্ড সুবিধা থেকেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার। শিক্ষক নামে অমানুষগুলোর শিক্ষা হওয়া দরকার। যারা ইগোর কারণে একজন শিক্ষার্থীর জীবন নষ্ট করে দিলো। এরকম আরো শতশত শিক্ষক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, যারা প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের সাথে জুলুম করে চলছে!

ঐতিহাসিক এই রায় শোনার পর এই দিনে বেঁচে থাকলে ঐ শিক্ষক সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, যিনি সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক বোর্ডের সিদ্ধান্তে হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, এই দেশে বাস করা যায় না জিল হোসেন এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতা ছেড়ে বিদেশে চলে গেছিলেন আর ফিরে আসেননি কোনদিন।

কাজ চলছে, চলতে দেন

পুনশ্চঃ আমার নানার টুপিটা ইউনূস সাহেবের মাথায় দেখে আবেগতাড়িত হলাম। ক্যারিশমা!

তুমি আর আমি, দুজনেই উচ্চ মাধ্যমিকটা একসাথেই পাস করেছি। বয়সটা তখন ১৮। এরপর তুমি গেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আমি মেডিকেলে। প্রথম সপ্তাহে হয়তোবা তুমি যখন বইই কেনো নি, আমাকে তখন বসতে হয়েছে -"আইটেমের টেবিলে!"

তুমি হয়তোবা সপ্তাহে দুদিন ছুটি কাটাতে, আমি তখন অপেক্ষায় থাকতাম বৃহস্পতিবার রাতটার জন্য, সেটা যে ঈদের আগের চাঁদরাতের মতো আকাঙ্ক্ষিত।

বছর বাদেই যখন তোমার সেমিস্টার শেষের বইগুলো একপাশ করে স্তূপ তৈরি করে, আমাকে তখন একবছর আগের বইগুলো আবার নতুন করে নিয়ে পড়তে বসতে হয়। তুমি হয়তোবা সামার ভ্যাকেশানে চিল করো আমি তখন হাপিত্যেশ করি টানা দু চার দিন বন্ধের।

তুমি হয়তোবা রোজা রেখে দুদিন ক্লাশ করতে হবে বলে আন্দোলন করো, আর আমি ভাবি শবে কদরের আগে বন্ধ কি এবারো দিবে না?

অতঃপর ৪ বছরেই তুমি গ্রাজুয়েট হয়ে বের হয়ে গেলে, আর আমি তখনো প্রফের গ্যাঁড়াকলে বন্দী।

তুমি ইন্টার্ন করতে লাগলে হয়তোবা কোন এসির বাতাসে ব্যাংক কিংবা কর্পোরেট অফিসে, আর আমার ইন্টার্ন হয় রাতজাগা লোহার খাট আর ১৫ ফুট উঁচুতে "বাতাসের চেয়েও শব্দ বেশি" ওয়ালা ফ্যানের সাথে।

ইন্টার্ন শেষে তুমি হয়তোবা হও বেতুনে কর্মকর্তা, আর আমি বেকার,বাবার কাছে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে পোস্টগ্রাজুয়েশন কোচিং এর জন্য টাকা চেয়ে বসি।

বিসিএস দিয়ে তুমি হয়তোবা অফিসের বড় একজন কর্মকর্তা, আর আমি? উপজেলায় নিজের টাকায় চেয়ার টেবিল কিনে রোগী দেখা এক হতভাগা।

তোমার প্রমোশান হয় সময়ের গড়ানোর সাথেই, আর আমারটা আটকে থাকে ডিগ্রী নেবার গ্যাঁড়াকলে।

তুমি হয়তোবা পরিবারকে সময় দেয়া নিয়ে টকশো করো টিভি চ্যানেলের পর্দায়, আর অনেক সময় আমার পরিবার রাতে আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে টেবিলেই ঘুমিয়ে যায়।

বেশ কবছর বাদেই সরকার তোমাকে দেয় সরকারি গাড়ি, প্রহরী আর আমার কর্মস্থলে নিরাপত্তা চাওয়াটাই বাড়াবাড়ি।

তোমার সামনে যেতেই লোক ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে যায়, আর আমি এখন আগেই পথেই গত হয়ে আসা রোগীর পাষণ্ড এটেনড্যান্সদের দেখে পিলে চমকে যাই।

তোমার নামে মামলা করবে সে সাহস আছে কোন সাধারণের?
তুমিই এখন কর্তা, তুমিই সরকার,
আর আমি বিনা দোষে অপরাধী!
তবুও সাধারণে বলে কম হয়েছে, আরো বেশি দরকার।

একমাসের বেতন একটু দেরীতে পাবার স্বাদ কি কখনো তুমি পেয়েছো? কিন্তু তুমি কি জানো – এমবিবিএসের পরে আরও পাঁচটা বছর আমি ২০ হাজার টাকায় (অনিয়মিত বেতন) শ্রম দিয়ে গিয়েছি সকাল সন্ধ্যা শুধু অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের জন্য?

দিনশেষে তুমি সবার শ্রদ্ধেয়, সবাই ডাকে স্যার,

আর আমি এক কসাই ডাক্তার !!!

দোষটা আসলে আমারই,

তুমি নিজেকে নিয়ে ভেবেছিলে, পরিবার নিয়ে ভেবেছিলে।

আর আমি লোভী ছিলাম, মৃত্যুর সাথে জিতে আসা মানুষগুলোর মায়া মাখা হাতের পরশের লোভী, রক্তাক্ত মানুষটার বন্ধ চোখ খুলে পৃথিবীটা নতুন বিস্ময়ে দেখার অনুভূতিটা দেখবার লোভে লোভী। কিংবা বাবা মা এর মুখে শুনে আসা তথাকথিত "সম্মান" এর লোভী।

আমি আমার নিজ অর্জনের দোষে দোষী, আমি দোষী ১৮ বছর বয়সে নেয়া এক ভুল সিদ্ধান্তের। ক্ষমা করো আমায়।

২ সপ্তাহ আগেই এক পুলিশকে আমরা এপ্রিশিয়েট করলাম কাউকে না মেরেই মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য

আর আজকেই বামেরা যাইয়া পুলিশের উপর হামলে পড়লো। কেন? যাতে পুলিশ আবার আগের মতো দানব হয়, তাই?

ধর্ষণের যে কয়টা ঘটনা ঘটেছে, সবগুলো, আই রিপিট সবগুলোর আসামীরা এই মুহূর্তে জেলে।

পাগল সেজে নারীদের টিজ করা লোকটা গ্রেফতার হয়েছে গতকাল। হট লাইন চালু হয়েছে। অভিযোগ দায়েরের এক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ একশনে যাইতেসে।

আর কী করতে বলেন?

ধর্ষণের প্রতিবাদে ইউনূসের বাসভবন ঘেরাও কেন? ইউনূসের এখানে দায়টা কী? একজন ক্রিমিনালকেও কি বাইরে রাখা হয়েছে? হাসিনার আমলে অভিযোগ করার সাথে সাথে অমুক নেতা তমুক নেতা ফোন করতো, হাসিনা নিজে বলতো যে সব জামায়াত শিবিরের ষড়যন্ত্র।

অনেক হতাশা নিরাশার মধ্যে লাস্ট তিন-চারদিনের কয়েকটা সুখবর আপনাগো শুনাই। দেশের ভালো শুনাইতে এবং শুনতে ভালোই তো লাগে।

- ইন্টারিম লাস্ট ৬ মাসে দেশী-বিদেশী ঋণ পরিশোধ করেছে ৬২ হাজার কোটি টাকা।
- দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে ১৮.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। যা গতবছরের এই সময়ের তুলনায় ৪ বিলিয়ন বেশি।
- দেশের রিজার্ভ বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৪০ কোটি টাকা।
- হাসিনা ও তার পরিবারের একাউন্ট থেকেই উদ্ধার করেছে ৬৩৫ কোটি টাকা।
- দেশের খাদ্যপণ্যে ভর্তুকি বেড়েছে প্রায় ১২ শতাংশ।
- রমজানে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার আশংকাকে আশ্চর্যজনকভাবে হ্যান্ডেল করেছে ইন্টারিম।
- গত ২২ মাসের তুলনায় সর্বনিম্ন মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে এই ফেব্রুয়ারিতে।
- ধর্ষণের তদন্ত ১৫ দিন এবং বিচার ৯০ দিনের মধ্যে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

- আওয়ামী আমলে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির কারণে বাফুফের উপর ফিফা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলো – বাফুফের উপর সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ফিফা।
- জাতিসংঘের মহাসচিব ৪ দিনের জন্য বাংলাদেশ সফরে আসতেছে। ইমাজিন! যেটা কেউ পারে নাই, সেটা ইউনূস পারতেছে। গুতেরেসের সফর এই সরকারের ওয়ার্ল্ডওয়াইড রিকগনিশন বাড়াবে।

অনেক কিছু বলা সহজ। গাইলানো সহজ – নির্বাচন দ্রুত চাওয়াও সহজ – বিএনপি সবসময় নির্বাচন চাইতেছে জাস্ট একটু চাপে রাখার জন্য এবং পলিটিক্যাল এক্টিভিজম হিসেবে – বিএনপির হাইকমান্ড জানে যে, হাসিনার রেখে যাওয়া ধ্বজভঙ্গ অর্থনীতিকে বিএনপি আইসা সোজা করতে ঘাম ছুইটা যাবে। উপরন্তু, অর্থনীতি, দ্রব্যমূল্য, মুদ্রাস্ফীতি ঠিক রাখতে না পারলে বিএনপির ক্ষমতায় আসলেও যে টিকতে মুশকিল হবে, এটা ভালো করেই জানে।

ইউনূস সাব হিমশিম খাইতেছে অনেক কিছু করতে। ধ্বজভঙ্গ একটা দেশ এবং চুতিয়া একটা জাতিকে ঠিক করতে। তারপরও, অনেক কিছু করতেছে এবং করবে। একটু ক্ল্যাপ দেন লোকটারে। ইন্টারিমকে একটু সাহস দেন।

নবগঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির লিডারশিপ স্ট্রাকচার

নবগঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির যে লিডারশিপ স্ট্রাকচার - তার সবচেয়ে উপর এর যে লেভেলে তা তাকে ওরা বলছে সুপার টেন। দশজনের এই গ্রুপে তিনজন মেয়ে - তা আমাকে আশ্বস্ত করলো। এরা প্রথম থেকেই ডাইভার্সিটি এবং ইনক্লুশন প্র্যাকটিসটা আত্মস্থ করেছে।

তবে নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এক্সট্রাঅর্ডিনারি যে নামটা তা আমার মতে ডা. তাসনিম জারা'র নাম।

তাসনিম জারা আমাদের দেশের ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ডিএমসি) গ্রাজুয়েট।

ডিএমসি থেকে গ্রাজুয়েশন করে সে ইংল্যান্ড চলে যায় - অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে এভিডেন্স বেজ্‌ড মেডিসিন নিয়ে এমএসসি কমপ্লিট করে।

এরপর সে রয়্যাল প্যাপওয়ার্থ হাসপাতাল আর কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি হসপিটাল থেকে ইন্টারনাল মেডিসিনে রেসিডেন্সি করে এমআরসিপি ডিগ্রি অর্জন করে। সাথে সাথেই কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি জারাকে ইন্টার্নাল মেডিসিন স্পেশিয়ালিস্ট আর টিচিং এটেন্ডিং হিসেবে নিয়োগ দেয়।

এমআরসিপি ছাড়াও জারা রয়্যাল কলেজ অব অবস্টেট্রিক্স এবং গাইনোকোলোজিতে নারী স্বাস্থ্য (উইমেন্স হেলথ) নিয়ে এডভান্সড ট্রেইনিং নেয় এবং এমআরসিপির সাথে সে একজন ডিআরসিওজি।

চিকিৎসা পেশায় ফ্রি টাইম খুবই কম। বিদেশে টিচিং হাসপাতলগুলোতে কাজ অনেক বেশি - সবচেয়ে জটিল রোগীগুলো দেখতে হয়; জুনিয়র চিকিৎসকদের ট্রেইন করতে হয়; রিসার্চ করতে হয় – রিসার্চ পেপার লিখতে হয়। জারা এগুলো সবই করেছে। কিন্তু এসব করার পর আমার মত বাড়ি ফিরে টায়ার্ড হয়ে বসে থাকেনি।

ডা. তাসনিম জারা একটা ইউটিউব হেলথ চ্যানেল মেনটেইন করে। বাংলাদেশের মেডিকেল সোশ্যাল মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপ যখন জাহাঙ্গীর টাইপের ভণ্ড আর ডা. সংযুক্তা সাহাদের মতো ভয়ঙ্কর ব্যবসায়ী চিকিৎসক সহ সবধরণের বুজরুকির আখড়া সেখানে তাসনিম জারার চ্যানেলটা সত্যিকারের এভিডেন্স বেসড মেডিসিন – একটা অনারেবল একসেপশন।

আমাদের কালচারে মেয়েদের স্বাস্থ্য একটা লুকানো ছাপানো ব্যাপার। কিশোরীরা, তরুণীরা, বিবাহিতা বা বয়স্ক মহিলারা অনেক শারীরিক সমস্যা নিয়ে ডাক্তার তো দূরের কথা - নিজের মা বা হাজবেন্ড বা এডাল্ট পুত্র কন্যার সাথে কথা বলতে অনীহা বোধ করে। সেই কারণেই হয়তো আমাদের দেশে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা জরায়ু মুখ ক্যান্সার ইত্যাদি অনেক এডভান্সড স্টেজে এসে ডায়াগ্নোসিস হয়; তখন আর কিছুই করার থাকে না।

জারা তার ১২ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার এর ইউটিউব চ্যানেল এর মাধ্যমে বাংলাদেশী কমিউনিটি ও ডায়াস্পোরা কমিউনিটির বিশেষ করে মহিলাদের স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। এর জন্যে বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়া তাকে লিনচিং করলেও - ব্রিটিশ সরকার ওর কাজের ভ্যালু বুঝতে পেরেছে – ওকে বিশেষ পুরস্কারে/ পদকে ভূষিত করেছে।

জারা ব্রিটেনে একটা পরিচিত মুখ – বিবিসি; স্কাই নিউজ; আইটিভি আর পৃথিবীর এক নম্বর নিউজপেপার ফাইনান্সিয়াল টাইমস এ ওর কাজ নিয়ে নিউজ হয়েছে; ওর ইন্টারভিউ প্রকাশিত/প্রচারিত হয় নিয়মিতই।

তাঁর হাজব্যান্ড খালেদ সাইফুল্লাহ (ওঁর কথায় পরে আসছি) এর সাথে মিলে ‘সহায়’ হেলথ নাম একটা বাংলা এপভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করেছে। এই সহায় হেলথ এপ বাংলা ভাষাভাষীদের বিশেষত নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এভিডেন্সড বেজড সমাধানের একটা অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম। এক লক্ষের মত বাংলাদেশী নারী নিয়মিত এই এপ থেকে সহায়তা নিচ্ছে।

কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি হসপিটালে কাজ করতো - কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলের টিচার ছিল। ওর ১২ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার এর ইউটিউব চ্যানেল এর ইনকামই প্রচুর। সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে বাংলাদেশ এর জন্যে কাজ করার জন্য দেশে চলে এসেছে তাসনিম জারা।

ভেবে দেখুন আপনারা - আমাদের এই দেশ জারাকে কিভাবে ওয়েলকাম করলো। আপনারাই না অনুযোগ করে থাকেন ভালো মানুষ শিক্ষিত মানুষ কেন রাজনীতিতে আসে না!

জারার জন্য এতবড় একটি সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়েছে আরেকজন মানুষের উৎসাহে, স্যাক্রিফাইস আর সহায়তায় - খালেদ সাইফুল্লাহ - জারার লাইফ পার্টনার।

খালেদ সাইফুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের তুখোড় ছাত্র - ঢাকা ল রিভিউ এর ফাউন্ডিং চিফ এডিটর। এর পর সে অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি থেকে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ল এর উপর মাস্টার্স করেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ফিল্ডে এক যুগের উপর দীপ্ত পদচারণা খালেদ এর।

জারার সাথে মিলে যে হেলথ কেয়ার টেকনোলজি প্ল্যাটফর্মটা প্রতিষ্ঠা করেছে – সহায় হেলথ – সিইও হিসেবে ওটার মেইন ড্রাইভিং ফোর্স খালেদ। নতুন যে দলটা গঠিত হয়েছে – খালেদ তার জয়েন্ট কনভেনর।

এই তরুণ কাপলটা দেশে ফিরে এসেছে। আমরা বাকিরা আসিনা। পশ্চিমা কমফোর্টে বসে বাংলাদেশের ইস্যু নিয়ে হাহা-হুহু করি। জারা আর খালেদ এসেছে। এসে কুশি কমফোর্ট কর্পোরেট জব খোঁজ শুরু করে নি। রাজনীতির কঠিন পথ বেছে নিয়েছে।

প্রার্থনা করি জারা আর খালেদ এর জার্নিটা সহজ হোক। ওদের পথ ধরে আরো সহস্র জারা খালেদ দেশে ফিরে আসুক। আমাদের দেশটি আরো সুন্দর হোক।

ড. ইউনূসের Three Zeros থিয়োরি

ড. ইউনূসের Three Zeros থিয়োরি : "A World of Three Zeros" বইটির আলোকে আরেকটি নোবেল পুরস্কার যে কারণে পেতে পারেন!

ড. মুহাম্মদ ইউনূস, যিনি বিশ্বের কাছে "ড. ইউনিভার্স" নামে পরিচিত, তাঁর মাইক্রোক্রেডিট ধারণার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। এই কাজের জন্য তিনি ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর অবদান এখানেই শেষ নয়। ২০১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বই "A World of Three Zeros" এ ড. ইউনূস একটি নতুন এবং সাহসী ধারণা উপস্থাপন করেছেন, যা তিনি "Three Zeros" থিয়োরি নামে পরিচিত করেছেন। এই থিয়োরি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নিয়ে গঠিত: Zero Poverty, Zero Unemployment, এবং Zero Net Carbon Emissions। এই ধারণা বাস্তবায়িত হলে এটি আবারও ড. ইউনূসকে নোবেল পুরস্কারের মঞ্চে নিয়ে

আসতে পারে, এবং কেননা এই থিয়োরি আমাদের বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

Zero Poverty : দারিদ্র্যের অবসান

ড. ইউনূসের Three Zeros থিয়োরির প্রথম লক্ষ্য হল Zero Poverty, অর্থাৎ দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান। তিনি বিশ্বাস করেন যে দারিদ্র্য কেবল অর্থনৈতিক সমস্যার ফল নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সমস্যা যা সঠিকভাবে সমাধান করা সম্ভব। মাইক্রোক্রেডিট ধারণার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে কীভাবে ছোট ঋণ মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারে। এই মডেলটি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কার্যকর একটি উপায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং ড. ইউনূস এখন আরও বড় পরিসরে এই ধারণাকে প্রসারিত করতে চান, যাতে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান সম্ভব হয়।

Zero Unemployment : কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা

Three Zeros থিয়োরির দ্বিতীয় লক্ষ্য হল Zero Unemployment, অর্থাৎ, বেকারত্বের সম্পূর্ণ অবসান। ড. ইউনূস বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক মানুষের কর্মসংস্থান একটি মৌলিক অধিকার, এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তিনি সোশ্যাল বিজনেস মডেলগুলোর ওপর জোর দেন। এই মডেলগুলো লাভের পরিবর্তে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হয়, যা কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়ক। ড. ইউনূস মনে করেন যে এই মডেলগুলো যদি বৈশ্বিকভাবে গৃহীত হয়, তাহলে বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

Zero Net Carbon Emissions : পরিবেশের রক্ষা

Three Zeros থিয়োরির তৃতীয় এবং সর্বশেষ লক্ষ্য হল Zero Net Carbon Emissions, অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণকে সম্পূর্ণভাবে শূন্যে নামিয়ে আনা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে আমাদের গ্রহকে রক্ষা করতে হলে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস একটি জরুরি পদক্ষেপ। ড. ইউনূস বিশ্বাস করেন যে সোশ্যাল বিজনেস মডেলগুলোর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগগুলোর প্রসার ঘটানো সম্ভব, যা কার্বন নিঃসরণ কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। যদি এই মডেলগুলি বৈশ্বিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমিয়ে পৃথিবীকে একটি সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

ড. ইউনূস ইতিমধ্যে তাঁর মাইক্রোক্রেডিট ধারণার জন্য বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন, এবং তিনি দেখিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি কীভাবে বৈশ্বিক পরিবর্তন আনতে পারে। তাঁর "A World of Three Zeros" বইয়ে প্রস্তাবিত Three Zeros থিয়োরি, যা দারিদ্র্য, বেকারত্ব, এবং কার্বন নিঃসরণের মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান প্রদান করে, নোবেল পুরস্কারের জন্য একটি শক্তিশালী

প্রার্থিতা হতে পারে। এই থিয়োরি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী একটি টেকসই, ন্যায়সংগত, এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব।

ড. ইউনূসের Three Zeros থিয়োরি আমাদের সময়ের জন্য একটি প্রয়োজনীয় সমাধান হিসেবে দেখা যেতে পারে। যদি এটি বৈশ্বিকভাবে গৃহীত এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এটি তাকে আরও একবার নোবেল পুরস্কারের সম্মান এনে দিতে পারে। তাঁর এই সাহসী এবং প্রয়োজনীয় ধারণা বিশ্বকে একটি নতুন পথে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে সকলের জন্য সমান সুযোগ, দারিদ্র্যমুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব পৃথিবী সম্ভব হবে।

ড. ইউনূস তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে মানবতার কল্যাণে কাজ করতে ইচ্ছুক একজন ব্যক্তি কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন। তাঁর "A World of Three Zeros" বইয়ে উল্লিখিত Three Zeros থিয়োরি শুধুমাত্র একটি ধারণা নয়; এটি একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা যা আমাদের ভবিষ্যতকে পরিবর্তন করতে পারে। এই থিয়োরির জন্য তাঁর নোবেল পুরস্কারের যোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রাপ্য, এবং আমরা আশা করি যে বিশ্ব এটি গ্রহণ করবে এবং এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য একসাথে কাজ করবে।

The unsung hero of Bangladesh

আজ এমন এক মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিবো যার অবদান সারা বাংলার গুটিকয়েক মানুষ জানে। ১৮ জুলাই দুপুরের পর যখন সারা ঢাকায় ম্যাসাকার হয়, বিকালের পর থেকে গাড়িতে ভরে মৃতপ্রায় শত শত মানুষ ঢাকা মেডিকেলে আসে। সন্ধ্যায় লাশের পর লাশ আসতে থাকে। আমাদের বিভিন্ন সার্জারী ইউনিটের এসিস্ট্যান্ট প্রফেসররা, কয়েকজন সিএ ঐ সন্ধ্যায় ইমার্জেন্সি রুমের সেবায় ছিলেন। কাভার দেয়া যাচ্ছিলো না। আমাদের সিএ সুমন ভাই এর কলে আমরা ছুটে যাই হল থেকে। হলে তখন খুব অল্প কয়জন মানুষ আমরা।

কি ভয়ংকর সেই রাত! যে চোখে দেখে নাই তাকে কোনোদিনই বুঝানো সম্ভব না। আহাজারি আর রক্তপাত! এমনও অবস্থা গিয়েছে আমাদের ইন্টার্ন হাত চাপ দিয়ে ধরেছে, সিস্টার রা ক্যানুলা করছে। সাথে আরেক ইন্টার্ন ফ্লুইড ঝুলাচ্ছে। ফ্লুইড এ তখন কাভার দেয়ার উপায় নাই। লাগতো ব্লাড। এত রক্ত কে দিবে তখন, মানুষ তো ভয়েই রাস্তায় বের হচ্ছে না। আর রক্ত না পেলে তখন বাঁচানো সম্ভব না।

বন্ধু Naim Hasan পুরোটা সময় তখন ইমার্জেন্সিতে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ নিজেই ব্লাড কালেকশন করার উদ্যোগ নিলো। সন্ধানীর এক স্টাফকে সাথে নিয়ে চেয়ার টেবিলসহ বসে গেলো। সাথে আরেকটা ব্লাড ব্যাংকও অপেক্ষা করছিলো। কারণ ডিরেক্টর এর অনুমতি লাগবে। নাইম হাসান একা গিয়ে ডিরেক্টর এর অনুমতি নিয়ে এলো। শুরু হলো কাজ। সেই কি অবস্থা!

দাঁড়িয়ে থাকা কিছু মানুষ ব্লাড দেয়া শুরু করে দিল। প্রচণ্ড গরম। তাদেরকে বাতাস করতে আরেক গ্রুপ দাঁড়িয়ে গেলো। আরেকগ্রুপ দ্রুত তাদের জন্য পানি আর স্যালাইন নিয়ে আসলো। মূহুর্তেই আরেক গ্রুপ কাগজে লিখে দাঁড়িয়ে গেলো ভলান্টিয়ার হিসেবে যে রক্ত দিন। হাসপাতালের বিভিন্ন বিল্ডিং এ গেলো যেন রোগির সাথের লোকজন রক্ত তিতে আসে।

ঐ রাতে ১১৫ ব্যাগ রক্ত কালেক্ট করলো নাইম এবং তার দল। সাথের যে ব্লাড ব্যাংক তাদের ও কালেকশন ১১০+! যার সুবিধা ভোগ করলো ঐদিনে হাসপাতালে রক্তক্ষরণ নিয়ে আসা শতশত রোগী। এটা আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব না। সারা ঢাকা মেডিকেলে খবর ছড়িয়ে যায় রক্তের কমতি নাই। যার লাগবে ইমার্জেন্সিতে যেতে। কত শত মানুষ যে প্রাণে বেঁচে যায়!

ঐদিন রাতে আমি নাইমের মানবিকতাকে অন্যতম উচ্চতায় দেখেছি। দেশের ঐ কটা দিন আমার এই রুমমেটের হসপিটাল এ দৌড়ঝাঁপ দেখেছি। সারারাত সজাগ থেকে আমরা ডট্স্ মিলানোর চেষ্টা করতাম, কালকের দিন কি হবে! বন্ধু নাইম এর জীবনের জন্য শুভকামনা।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের অর্জন

কোটার দাবী অর্জন।

৮/৮/২০২৪

সাহসী সফল সমন্বয়করে অভিনন্দন ধন্যবাদ।

পূর্বাপর যুথবদ্ধতার প্রশংসা করি।

অধিকার অর্জনের প্রত্যয়দীপ্ত আত্মবিসর্জন।

আবু সাইদের এই আইকনিক ছবি ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে বিবেককে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, দিবে। বহু যুগ ধরে ন্যায্য দাবীর পক্ষে দাঁড়ানো ছাত্র-আন্দোলনের প্রতীক হয়ে থাকবে এ ছবি।

স্বীকৃত দ্বিতীয় স্বৈরাচার দেখল জাতি।
ছাত্রলীগ বুঝলো বাবারও বাবা আছে।
সমন্বায়কদের জন্য জড়ো হয়েছিল ২৫ লাখ।

স্মরণকালের বড় জমায়েত। তাজউদ্দিনের সময় ১০ হাজার। তোফায়েল ভাইয়ের লাখো আর ৭ই মার্চে তার বেশী। সবই ছাত্র জনতার সত:স্ফূর্ত উপস্থিতি।

মনে রাখতে হবে –

১। মাতৃভক্তি আর মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা সবার নিজস্ব (individualised)- কাউকে কটাক্ষ করা অন্যায়।

২। পবিত্র কোরানে বলা আছে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে অপছন্দ করেন। ছাত্রজনতাই আসলে ক্ষমতার নিয়ামক। ভুলে যাবার পরিণতি দেখেছি, দেখলাম আশা করি আর দেখতে হবেনা।

জ্বালাও-পোড়াও আর পিটিয়ে মারার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের।

অভিজ্ঞতা অপূর্ব

পাসপোর্ট প্রকল্প : রেগুলারকে ইলেক্ট্রনিকে রুপান্তর।

ফরম পূরণ করে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র নিয়ে জমা দিতে গেলাম। ছোটখাট ঘাটতি অফিস থেকেই পূরন করা গেল। বলা নিষ্প্রয়োজন সহকারী সঙ্গে নিলাম। লাইন ছিল। তবে খুব দীর্ঘ নয়।যাই হোক সিকিউরিটিকে ভিজিটিং কার্ড দেয়ায় অফিসার খাতির করলেন। সহনীয় সময়ে সংশোধনী দিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্টে পাঠালেন। আমি এবং মেয়ে প্রিন্ট দিয়ে সময়মতই বাসায় ফিরলাম। কয়েকদিন পর SMS আসলো collection এর নোটিশ দিয়ে। সহকর্মীরা বললো লাইন দিতে হবে। সংগে না গেলে মেয়ের authorisation লাগবে। দুটো জিনিসই explore করার অভিপ্রায়। দিনের প্রথমার্ধে ফ্রি থাকি। নিজেই গেলাম। সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করায় বললো নীচতলায় ১১৩ দোতলায় ১০৫ নং এ ডেলিভারি। ১১৩ তে সামান্য ভিড় দেখে দোতলায় গেলাম। ১০৫ ফাঁকা। লেখা আছে অফিসিয়াল পাসপোর্ট। সত্তোরোর্ধ দুনিয়ার অনেক জায়গায় লাইনে দাঁড়ালে খাতির পাই। দেশের স্ট্যান্ডার্ডে নিজেকে VIP ভাবি। যাই হোক, যিনি চেয়ারে বসে আছেন greeting এর পর ডেলিভারি রিসিপ্ট গ্রহন করলেন। মেয়েরটা দেয়ায় জিজ্ঞেস করলেন মেয়ে এসেছেন কিনা। না সূচক জবাব দেয়ায় অতিরিক্ত কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন না। অপেক্ষমানদের চেয়ারে wait করতে চাইলে বললেন index figure এর প্রিন্ট দিতে। ইতিমধ্যে উনার assistant কে receipt দুটা দিয়ে দিয়েছেন। উনি যেটা করলেন সেটা হলো বাম হাত ফটোকপি করলেন (সম্ভবতঃ)। সামনের দিকে কম্পিউটারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ব্যস্ত থাকলেন। না, চোখ তুলে তাকালেন না। ইতিমধ্যে পাসপোর্ট এসে গেল। আমাকে দিয়ে দিলেন। একটু অবাক হবার কথা। ধন্যবাদ দিয়ে বললাম পাসপোর্ট অফিসের কাজ এত তাড়াতাড়ি হয় – সব মিলিয়ে ৫ মিনিট!

Online সুবিধা

আরেকজনের মাধ্যমে করতে চেয়েছিলাম। biometry করতে দুদিন যেতে হবে। নিয়ম কানুন set করা আছে। খামোখায় তৃতীয় পক্ষ কেন? Online হওয়ায় সুবিধা টা পেলাম।

LONDON

রোমানদের Londinium এ যুগের London 4th fastest growing & most visited city of the world। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা সবকিছু আকর্ষণীয়। ওয়েস্টমিনিস্টার হার্ট অব দি সিটি। ওয়েস্টমিনিষ্টার স্কয়ার, আমেরিকার টাইম স্কয়ার, প্যারিসের দ্য গল এভিনিউ সব প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। এখানেও আছে ট্রাফালগার স্কয়ার।

বিগ বেন রেনোভেশন চলছে। ক্লক আছে তাই ক্লক টাওয়ার, ঘড়ি বাজার শব্দ আছে। ১৮৫ ফিটের টাওয়ার বিগ বেন। ২০১২ থেকে এটা এলিজাবেথ টাওয়ার। দেখলে মনে হয় পার্লামেন্টের extension. টেমসের উপর দিয়ে গেছে অনেক ব্রীজ। লন্ডন ব্রীজ নিয়ে ছোটদের ছড়ানাট্য আছে, আছে motion ছবি। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত টাওয়ার ব্রীজ, লন্ডন টাওয়ারের সাথে সংযুক্ত। ১৮৯৪ সাল থেকে চালু ব্রীজের নীচ দিয়ে গাড়ী যাবার জন্য স্প্যান খুলে দিনে প্রায় ৫০ বার। ব্রীজের উপর দাঁড়ালে লন্ডন আইতে উঠলে দৃষ্টিতে আসে টেমসের পারে অনেক ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার স্টেশন থেকে বেরুলেই চার্চিল, ম্যান্ডেলা, গান্ধী, লিংকনের মত মহামানুষদের sculpture; শহরের মাঝখানে মাটির খোলা চত্বর। নেলসনের হাত খোলা, লিংকনের চেয়ার দেয়া, চার্চিল লাঠি হাতে।

Underground train london (সংক্ষেপে টিউব) এর বড় আকর্ষণ। ১৮৬৩ থেক চালু হওয়া সেন্ট্রাল, জুবিলী, district হরেক রংয়ের ১১টা লাইনে দিনে ৫ মিলিয়ন লোক যাতায়াত করা এ line পৃথিবীর ১১তম ব্যস্ত টিউব। বসতি এলাকায় অধিকাংশ ছোট গাড়ী, বাজার ঘাটের জন্য; অফিস আদালতে টিউবে যায়। শহর লন্ডনে পার্কিং নেই।

৭৭৫ রুমের বাকিংহাম প্যালেস বৃটিশ রাজের আবাস কাম অফিসস্থল; ডিউক অব বাকিংহাম ১৭০৩ সালে শুরু করেছিলেন। আগষ্ট-সেপ্টম্বর পাবলিকের জন্য খুলে দেয়।

ট্রাফালগার স্কয়ারে ১৮৬ ফিট কলামের মাথায় এডমিরাল নেলসনের (ট্রাফালগার যুদ্ধে ফ্রান্সকে হারিয়েছিলেন) মূর্তি। চেরিংক্রস আর পোর্টল্যান্ডের সংযোগ স্থলটি পরিবর্তিত/পরিবর্ধিত হয়ে আজকের এ স্কয়ার উন্মুক্ত বিক্ষোভ, বিতর্ক বক্তৃতার জায়গা।

১৯৯৯ থেকে চালু লন্ডন আই ৪৪৩ ফিট উঁচু, ইউরোপের সর্বোচ্চ ফেরী হুইল উপর থেকে প্রায় পুরো শহর দেখা যায়। লন্ডনের বিল্ডিংগুলোর architecture exceptional. শীতের দিনে চরম ঠাণ্ডা; এখন ৬-১৭। পথযাত্রীর ড্রেস দেখলে বোঝা যায়; overcoat কম শীত, winter jacket বেশি শীতঃ snow jacket

অনেকে পরে তবে এটা কানাডা /আমেরিকার ড্রেস কারণ, snow এখানে পরে কদাচিৎ।

হো চি মিন

হো চি মিন ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টম্বর স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফ্রান্স কলোনী থেকে- এ দিনকে তারা ইনডিপেন্ডেন্স ডে পালন করে। হো চি মিন সংগ্রাম করেছেন ফরাসি কলোনিয়াল শাসনের বিরুদ্ধে, মেজর জেনারেল সহ ফরাসিরা পাকড়াও হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ইনভেড করে। মিত্র বাহিনীর কাছে এরা আবার ফরাসি কবলে পড়ে। চুক্তি করে বিভক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অকুতোভয় বিপ্লবী দেশপ্রেমিক ইনভেডারদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। ৫৪র পর থেকে আমেরিকান ইন্ট্রুডার ক্রমান্বয়ে সামরিক শক্তি বাড়িয়েছে সাথে ব্রুটালিটি। গোটা ৬০ এর দশকে রেজিস্ট্যান্স বেড়েছে। হো চি মিন মারা গেছেন ১৯৬৯ সালে। কিন্তু দক্ষতা দেখিয়েছেন অরগানাইজেশনে। সারা দুনিয়াকে ভিয়েতনামীদের পাশে এনেছেন। আমেরিকার শেষ শাসক ১৯৭৫ সালে পালিয়ে বেঁচেছে; এ বছরের ১৩ এপ্রিলে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে দুই ভিয়েতনাম মুক্ত হয়ে পুনঃএকত্রিত হয়েছ; দিনটিও তাই এদের কাছে ইউনিয়ন ডে। কুচি টানেলের এক জায়গায় ব্রোঞ্জের মূর্তি ছাড়া কোথাও এ নেতার ছবি, মূর্তি, ব্যানার চোখে পড়েনি তবে হো চি মিন সিটি সহ (আগের নাম সায়গন) সর্বত্র নামকরণে ফুটে উঠেছে উনি ভিয়েতনামীদের কাছে কি, ভিয়েতনামীরা কোথায় এই জাতীয় বীরকে স্থান দিয়েছে।

(সায়গন কথাটা অনেক প্রতিষ্ঠানের Address-এ লেখা আছে) হো চি মিন সিটি

মিউজিয়াম : মিউজিয়ামের নাম (War Remnant Museum) মধ্যে গেলে বোঝা যায় স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, আগ্রাসন, হিংস্রতা কি। তিনটি শেল-এর উপরে উড়ন্ত পায়রার সিম্বল নিয়ে হার্ট অব হো চি মিনে আছে এটি। তিনতলা বিল্ডিং-এ level অনুযায়ী যুদ্ধের ইতিহাস আছে।

১। যুদ্ধে আমেরিকানদের যুদ্ধাস্ত্র, শক্তি, স্ট্রাটেজি (মানুষ, বাড়ী, শস্য সম্পদ ধ্বংস করার পৈশাচিক প্লান) দেখানো আছে। আছে নাপাম বোমার বীভৎস কীর্তি।

২। রেজিস্ট্যান্স ফোর্স (ভিয়েত কং) বাহিনীর বীরত্ব, স্যাক্রিফাইস, আত্মোৎসর্গ, অস্ত্রদখল সব দেখানো আছে।

৩। রণাঙ্গনে যুদ্ধের পাশিপাশি local ও বিশ্বজনমত গড়ার মেন্টাল কারেজ কত কার্যকরী ছিল বোঝা যায়। আমেরিকানসহ দুনিয়ার মানুষ (ব্যাক্তি,

সংগঠন রাষ্ট্র এদের পাশে অভূতপূর্ব সাড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। যুদ্ধাহতদের পুনর্বাসন, National, International পর্যায়ে ওদের individual achievement encouraging কাহিনী depicted আছে দেয়ালে।

Tiger cave : জেলখানায় বিদ্রোহ করা, মৃত্যুর সামনে দাড়িয়ে দেশপ্রেম দেখানোর মত আত্মগাঁথাগুলো Tiger cave নাম দিয়ে আলাদা Compound এ সংরক্ষিত আছে; আছে Slaughtering জন্য ব্যবহৃত ফাঁসির কাষ্ঠ।

স্ট্রাটেজিক উইপন্স : সামনের কম্পাউন্ডে আছে দখল করা স্ট্রাটেজিক উইপন্স (ওয়ার প্লেন, হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক)।

হো চি মিনের ভিয়েতনাম (প্রোফাইল)

সবকিছুতেই Suffix VIN, VN (টেলিফোন, ট্রান্সপোর্ট)।

ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝা দায়। কথা কম বলে যেটা থাইল্যান্ডের বিপরীত। নামলেই বোঝা যায় একই বেল্টে আছি, থাইল্যান্ড হয়ে বালি, বার্মা সব এক। Weather, humidity, sun, গাছপালা, বাড়ীঘর। রাস্তায় ধূলি কম। লোক কম, মনে হয় কংক্রিটের রাস্তা বলে এটা হয়েছে। আমাদের ইট-সুরকি আর নিত্যদিনের ভাঙাগড়ার জন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটা দায়। রাস্তা বলার মত পরিস্কার নয়, মিয়ানমারে এর চেয়ে বেশি পরিপাটি। সিংগাপুর, মালয়েশিয়ার মত বৃষ্টিও বেশি নয়। High rise আধুনিকতম আর্কিটেকচারের বিল্ডিং অনেক কম, এয়ারপোর্ট থেকে বেরুলেই যেটা চোখে পড়ে। থাইল্যান্ড, বার্মা মালয়েশিয়ার মত মাজা মোটা মানুষ (ছেলে বা মেয়ে) একদম নেই।

ঋতু ২টা, এখন springly summer, আরেকটা rainy summer, winter নেই। উত্তরে (হ্যানয়) কচিৎ ১২ ডিগ্রী হয়।

থাইল্যান্ড, দঃ কোরিয়ার সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ বেশি, আশিয়ানে পাসপোর্ট ছাড়া যাতায়াত চলে। পাশাপাশি লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম (এক সাথে ইন্দোচীন)। আমেরিকান আগ্রাসী যুদ্ধ সবার বিরুদ্ধে বলে এক পর্যায়ে নাম ছিল ইন্দোচীন যুদ্ধ। এদেরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (জাপান-ফ্রান্স) ও ভিয়েতনাম যুদ্ধ (ফ্রান্স, আমেরিকা) ও করতে হয়েছে। হো চি মিন (আগের সায়গন) বৃহত্তম সিটি। লোক সংখ্যা ৮ মিলিয়ন। এটা দক্ষিণে। হ্যানয় রাজধানী, উত্তরে। প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল (পে চ্যানেল) অনেক। Asia news cover করে অনেক। বিশেষ করে ASEAN -এর। বাংলাদেশ, ইন্ডিয়ার খবরও দেয় বিদেশী অন্য চ্যানেল-এর চেয়ে বেশি।

এদের সবার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে। ১৮ বছরের পর সবাইকে মিলিটারী ট্রেনিং নিতে হয়। কর্মক্ষেত্রে মেয়ে-ছেলে সমান। গাড়ীর নেমপ্লেট সরকারি, মিলিটারী,

সাধারণ নাগরিকের discriminating আলাদা color। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আগে ছিল দুই রঙা (লাল কমুনিস্ট, ব্লু ক্যাপিটালিস্ট)। এখন শুধু লাল; centre এ ৫ arms অর স্টার (ইন্টেলেকচুয়াল, education, economy, ARMY. agriculture)

শহরের বাড়ীঘর প্রায় এক প্যাটার্ন, আহামরি নয় দেখতে। ফুটপাত দখল নেই। ট্রাফিক পুলিশ নেই। সিগনাল আছে, অনেক জায়গায় পথচারীর জন্যও সিগন্যাল আছে।

পূর্ণ স্বাধীন হয়েছে ৭৬ সালের পরে। পরাজয় ও ভুল উপলব্ধি করে জেরাল্ড ফোর্ড ইন্দোচীনকে ২.৭ বিলিয়ন ভর্তুকি দিয়েছিল। ভিয়েতনামীরা দূর্নীতির ফাঁদে পড়েছিল। ৮০'র দশকের প্রথম দিকে যেজন্য সর্বোচ্চ আসনে আসীন দুজনকে পদত্যাগও করতে হয়েছিল। অল্প সময়ে জাতি হিসেবে চালকের আসনে বসে গেছে। GDP তে চায়নার নীচের আসনটাই তাদের; থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে advanced. গত বছর foreign investment (loan নয়) ছিল ৭.৭ বিলিয়ন; এক বছরেই যেটা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬%।

কুচি টানেল ভিয়েতনামঃ Thrilling অভিজ্ঞতা

একটা জাতি আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কতটা ক্রেজি হতে পারে, সাহস আর সমর্পণের চরমতম উৎকর্ষতা দেখাতে পারে এ টানেল তার প্রমাণ। ভ্যানকুবারে দেখেছিলাম দোলনা ব্রীজ, গাছ থেকে গাছে যাওয়া যায়, ক্ষরস্রোতা লেক পার হওয়ার thrill পাওয়া যায়। ২০০ কিলোমিটার সম্পুর্ণ মাটির নীচের এ টানেলে ঢোকার রাস্তা দিয়ে একটি চিকন মানুষ দুই হাত উঁচুতে না রেখে ঢুকতে পারে না।

হো চি মিন সিটি থেকে দেড় ঘণ্টার রাস্তা কুচি ডিস্ট্রিক্টে ভিয়েতনামের খেটে খাওয়া মানুষের এ রণাঙ্গন। বোমারু বিমানের বানানো খালগুলো আছে, (আমেরিকান soldierদের নিশানা নির্ঘাত /নিখুঁত)। ৫৪ সালের পর থেকে পুরো সত্তর দশক জুড়ে মাটি নীচের এ যুদ্ধক্ষেত্র। বিশ্বাস করা কঠিন মাটির নীচেই আছে নিজস্ব প্রযুক্তিতে অস্ত্র বানানোর কারখানা; ওদের বোমার বিষ্ফোরক ব্যবহার করেই ট্যাংক বিধ্বংসী ছোট বোমা বানাতো নিজস্ব টেকনোলজি দিয়ে। জঙ্গলের মধ্যস্থ টানেল গুলোর একদিকে যুক্ত ছিল নদীর সাথে। ২০, ৩০, ৬০ হাত অন্তর আছে টানেল থেকে বেরুনো/ঢোকার মুখ। নীচেই আছে হাসপাতাল, কিচেন সাথে বিশ্রামাগার।

বিভিন্ন ইন্টারভেলে মাটির ভিটি করে করা আছে underground tunnel ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা; simplicity থাকলেও highly scientific উপলব্ধিতে যে এগুলো করা হয়েছে, গাইড সেটা যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়েই বুঝিয়েছেন। আমেরিকানদের ট্র্যাপে ফেলে মারার অন্তত দশটা পন্থা দেখালো।

সবশেষে দিল সিদ্ধ করা মিষ্টি আলুর মত খাবার। এ জিনিসটা নাকি অনেক সময় নেয় to pass through খাদ্যনালী। স্বল্পতম খরচে সরবরাহ যুদ্ধকালীন সময়ের উত্তম খাবার। শত্রুর গাড়ীর টায়ার দিয়ে স্যান্ডেল বানিয়ে সেটার আবার নাম দিয়েছে হো চি মিন স্যান্ডেল; এটা পড়ে মাটি, বালি দিয়ে হাঁটলে নাকি ছাপ পড়ে না।

ভুটান : সার্ক প্রতিবেশী

ভুটান, সার্ক প্রতিবেশী। ঢাকা থেকে প্লেনে পারে ১ঘ. ২০ মি. নেমেই ১৪ ডিগ্রী, ঢাকায় ২৬ ডিগ্রী। টাইম same, clock change করতে হয়না। দুই গরম প্রতিবেশী ভারত আর চায়নার মধ্যে sandwitched, mostly controlled by india. রয়্যাল ড্রুক এয়ারের ৫৪ সিটের প্লেন। প্লেন থেকে পাহাড়ই শুধু দেখা যায়। দূরের পাহাড়ে বরফ দেখা গেলেও যেখানে নামলাম সেখানে পরিষ্কার। ইমিগ্রেশন shortest time, তারচেয়ে সংক্ষিপ্ত baggage collection, প্যাসেঞ্জার যে কম, খুবই কম! সিগারেট ডিক্লেয়ার দিয়ে আনতে হয়। custom clearance queue তাই দেরী। সহযাত্রীকে এজন্য ৪০ ডলার গুনতে হলো; পাবলিক প্লেসে ধূমপান শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ক্লিন আকাশ, bright sun. সুন্দর ঘরবাড়ী। শহরতলী (এমনকি এয়ারপোর্ট বিল্ডিং), শহরের বিল্ডিং একই ধাঁচের। ফ্ল্যাট ছাদ নেই। সব ছাদই আমাদের টিনের ঘরের মত। জানালা দরজায় একই ডেকোরেশন, রং করা। indoor এ কাঠের ব্যবহার বেশি। প্রতিটা বাড়ীর দেয়ালে কোন না কোন drawing করা আছে; mostly ড্রাগন (druk) কেন্দ্রিক একটা ছোট শহর। ইন্টারন্যাশনাল airport এখানে একটা।

Druk Royal Air দিয়ে ১৯৮১ সালে বিমানের শুরু। প্রথমে কোলকাতা। তারপর ঢাকা; পর্যায়ক্রমে মোম্বাই, দিল্লী ও কাঠমুন্ডু, ব্যাংককের সাথে যোগাযোগ। এখন ডমেস্টিকও আছে। রাজধানী থিম্পু থেকে ৫৬ কি.মি. – ১ ঘণ্টা ড্রাইভ। আমাদের দেশে মদ খেতে লাইসেন্স করতে হয়, এখানে ধূমপান (পরিবেশ বান্ধব!)। ৩৯০০০ বর্গ কি.মি. দেশের লোক সংখ্যা সাত লাখ। প্লেন থেকে ল্যান্ড দেখা গেলেও আমাদের মত সবুজ কিছু নেই। মেইন ইনকাম টুরিজম এবং হাইড্রো-ইলেক্ট্রিকের বিদ্যুত। দুটোরই বৃহত্তর কাস্টমার ভারত; next বাংলাদেশ। গাইডের /দোকানীর ইংরেজী দক্ষতা থেকে আন্দাজ করা যায়। গত বছরে টুরিষ্ট ছিল ২ লক্ষ ৯ হাজার। ২০% হিন্দু, কিছু খৃস্টান থাকলে ও মুসলমান নেই। স্পষ্টতই বুদ্ধদের দেশ। অন্য ধর্মকে discourage শুধু নয় prevent করা হয়। শিক্ষিতের হার ৬০%, পনেরোর্ধ্ব সবাই ভাল ইংরেজী জানে। ডিসেম্বর থেকে শীত শুরু, এপ্রিল পর্যন্ত চলে। তাপমাত্রা মাইনাসও হয়।। সারা বছর ২০র কাছাকাছি থাকে। Mountain এ (herbs & stone only) এ বরফ পড়া ঠাণ্ডা, hill (বড়

বড় পাইন আর ওক গাছ) subtropical সহনীয় ঠাণ্ডা আর valley সমতলে tropical. ভুটান কোনদিন পরাধীন ছিল না, যদিও পররাষ্ট্র নীতিতে ভারতের প্রভাব স্বীকৃত। যে ২০ টি ফোরট্রেস (administrative)/মনাসট্রির (spiritual) জন্য ভুটান প্রসিদ্ধ ওগুলোকে রাজা ২০ টা জেলা করে দিয়ে ২০ জন নির্বাচিত শাসক নিয়োগ করেছেন – এদের ক্ষমতা সেক্রেটারীর উপরে। GDP না GNH (gross national happiness) দিয়ে এরা উন্নয়নের মাত্রা নিরূপণ করে। ছোট গাড়ী বেশি, অধিকাংশই ইন্ডিয়ান। সবারই individual গাড়ী আছে। পাহাড়ের দেশে এ ছাড়া সম্ভবও নয়। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের মত ভুটানেও পাহাড়ের গা ঘেঁষে বিপজ্জনক হাইওয়ে, মাঝখানে অনেক নীচে বইছে স্রোতস্বিনী ঝর্ণার মত নদী/ লেক। But ভুটান অনেক সুশৃঙ্খল। natural (প্রকৃতিকে) দেখতে এখানে আসতে হবে আর manmade /artifical beauty দেখতে হলে যেতে হবে দুবাই/মালয়েশিয়া/সিংগাপুর!! এশিয়ার সবচেয়ে সুখী এই দেশটি পৃথিবীর বুকে স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদেরকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ। ইন্ডিয়ানদের NID হলে চলে, বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট লাগে। ভিসা on arrival.

কোলকাতা ভ্রমণ

USB ২২০১ ইউএস বাংলার কোলকাতা ফ্লাইট ১১.৪০, রিপোর্টিং টাইম আটটা চল্লিশ। ৮.৩০ আগে কোনমতেই বেরুনো গেল না। গলি ঘুরে আসতো ৮.৪১ বেজে গেল। ৮ নং এসে শুরু হলো জ্যাম। গ্রীন লাইফ পার হয়ে পান্থপথ হয়ে ফার্মগেট মোড়; মেট্রোরেলের কাজ সরু হয়ে যাওয়া রাজপথে গাড়ী আর যায় না! রিচার্জ হতেই দাঁড়াল গিয়ে বিজয় স্মরণীতে। মোড় আর ছাড়তে চায়না; ভাগ্য ভাল PM অফিসের সামনে দেরী হলো না, জাহাঙ্গীর গেট পার হবার পর ভাবলাম ১০টার মধ্যে যাওয়া যাবে, ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে যে টান দিল বিশ্বাসও হতে শুরু করল। চেয়ারম্যান বাড়ীতে এমনকি নেভাল হেড কোয়ার্টারে দেরী: টেনশনের মধ্যে কার্ডগুলোর ইন্টারন্যাশনাল পার্ট চালু করলাম, বৃহস্পতিবারের পেন্ডিং টেলিফোন মেসেজগুলো সারলাম। টেনশনের পারদ ১০.৩০টা অবধি সেট করে রাখলাম। এয়ারপোর্টে ঢোকার সময় বড় লাইন নেই। বোর্ডিং নিতে ৫ মিনিট লাগলেও ইমিগ্রেশনে ২মিনিট; সব কাউন্টার ফাঁকা, গড়ের মাঠ। রাখে আল্লাহ মারে কে? এক ঘণ্টা আগে (১০৪০) এ ঈপ্সিত লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। সবচেয়ে কম সময়ে ক্লিয়ার হলো সব।

১১৪০ এয়ার লাইনারদের খবর নেই, বুঝলাম বিপত্তি শুরু হয়ে গেছে। ১২টার পরে ঘোষনা টেকনিক্যাল ডিফেক্ট – একটায় বিমান উড়বে।

আগের দমদম। হালের পরিপাটি নেতাজী সুভাষ বোস এয়ারপোর্টে নেমে প্রথমেই মনে হলো আকারে ছোট না হলেও waiting এ থাকা বিমানের সংখ্যা কম,

নগণ্য; striking হলো immigration এর queue-দুই পাশের এর মধ্যে divider; ডিঙ্গিয়ে আগে যাবার উপায় নেই, নেই হুড়মুড় করে লাইন ভেঙে আগে যাবার আদিম তাড়না।

এয়ারপোর্ট ফরমালিটিস সেরে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ ড্রাইভার প্রসেঞ্জিতকে পেয়ে গেলাম; তবে বেরিয়ে যার সাথে প্রথম মোলাকাত হলো তিনি হলেন বিরাটকায় ডোরাকাটা মশা। আফসোছ হচ্ছিল ওডোমসটা চেম্বারের টেবিল ড্রয়ারে ফেলে আসার জন্য। ষোল কি.মি. দূরে বৃহদাকার হোটেলটিতে পৌঁছুতে লাগলো ২৫ মি. রাস্তায় পেলাম মমতার হাসিমুখে অভিনন্দন, চেন্নাইতে যেমন জয়ললিতা। রিসেপশনের পরেই বিশালকায় পুকুর শাপলায় ভর্তি। রুমের এ্যামেনিটিস চাহিদা মাফিক; না হোটেল রুমে মশার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি।

সেমিনারে স্পিকারদের ইংরেজী ভালো – লোকাল, কিন্তু দিল্লীতে থাকে তারা better, local কিন্তু londonবাসী তারা আরো ভাল। অভ্যাগত হিসেবে বক্তৃতায় বললাম তোমাদের ইংরেজী ভাল – ওরা বলল আমার বাংলা ওদের চেয়ে অনেক আগানো। I said, তোমরা national language এর কাছে mother tongue কে বিসর্জন দিও না!

কোলকাতার লোক হিন্দিই বেশি বলে, বাংলা বলতে চায় না। জুম্মার খোতবার প্রথমটুকু ইমাম সাহেব হিন্দিতে বললেন। রাজপথে লম্বা লম্বা (একটা ৯ কি.মি.) ফ্লাইওভারে দিদির পছন্দের সাদা-নীল বাতির আলোকসজ্জা; সৌরভ গাঙ্গুলী (বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট) ও অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জী (নোবেল লরেট) পাশাপাশি ছবির একক বিলবোর্ড।

ঢাকার ঐতিহ্য কোলকাতার অনেক আগে (নবাবী/বাদশাহী) আমলে; ইংরেজ লর্ডরা কোলকাতাকে বেছে নিয়েছিলেন; অনেক প্রতিষ্ঠানই নমুনা ধরে রেখেছেন।

কোলকাতার রাস্তায় গাছ, বাড়ীতে গাছ, মার্কেটে-দোকানে গাছ; কোলকাতা সবুজ, শীতল।।

ভরসা রাখুন আল্লাহর উপর: সুদিন আসবেই

আত্মহত্যা থেকে ফিরে সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট ... নগর রাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট হালিমা বিনতে ইয়াকুবের জীবনীতে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়!

১৯৫৪ সালে জন্ম নেয়া হালিমা বিনতে ইয়াকুবের পিতা পাহারাদার মোঃ ইয়াকুব তাঁর ৮ বছরের সময় মারা যান। তাঁর মা হোটেলে ঝিয়ের কাজ করতেন। পড়াশুনার ফাঁকে হালিমা মাকে থালাবাসন ধোয়ার কাজে সহায়তা করতো। তারপর অনেক সংগ্রাম, অনেক ইতিহাস !

ল তে মাস্টারস হালিমা ২০০১ সালে যোগদান করেন সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক দল 'পিপলস এ্যাকশন পার্টি'তে। এরপর তিন তিনবার এমপি নির্বাচিত হোন তিনি। ২০১৩ সালে প্রথম মুসলিম মহিলা হিসেবে সিঙ্গাপুরের পার্লামেন্টের 'স্পীকার' নির্বাচিত হন হালিমা। ২০১৭ সালে নির্বাচিত হন সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে।

সম্প্রতি এক ভাষণে তিনি বলেছেন, জীবনের খারাপ সময়ে অনেক দিন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিন্তু পারিনি মুসলিম বলে। আল্লাহ এখন আমায় সব দিয়েছেন।

তাই জীবনের খারাপ সময়ে ভেঙে পড়লে চলবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে চলতে হবে, ইনশাআল্লাহ সুদিন আসবে।

Foregiveness : Nelson Mandela

Before Nelson Mandela left prison he said, "as I stand before the door to my freedom, I realise that if I do not leave my pain, anger and bitterness behind me, I will still be in prison". Self imprisonment is worse than that imposed. How many of us have imprisoned ourselves inside the walls of anger and bitterness, holding grudges, etc. Forgiveness sets you free. Get out of your prison before you move into 2020. Enjoy the last two days of 2019. God bless you and your family. Stay blessed forever.

মালদ্বীপ

Arrival

৪.৫ লাখ (ভুটান-৭.৫ লাখ) লোকের মালদ্বীপের এয়ারপোর্ট ছোট, ততোধিক ছোট করোসাল। এক্সিটের পরেই মজা – সরাসরি ইন্ডিয়ান ওসানের মধ্যদিয়ে যেতে হবে। মনে হলো স্পীড বোট অনেক। সন্ধ্যা রাতের উত্তাল সাগরে পানির উপরে লাফিয়ে চললোবোট। যাত্রী সবাই আমরা লাইফ জ্যাকেট পরা। লোকালয় থেকে যতদূরে যাচ্ছি নিয়ন বাতি তত ম্রিয়মাণ, অন্ধকার তত গভীর!

শত দ্বীপের দেশ মালদ্বীপ

১১ শ'র উপরে আইল্যান্ড, বসতি আছে ২০০তে। ৮০টিতে আছে লাক্সারী হোটেল। গুচ্ছাকারে কয়েকটা আইল্যান্ড মিলে হলো ২৬টা এটল। ১৬টি প্রশাসনিক ডিভিশনে বিভক্ত সারাদেশ। মেইন শহর মালে। আরো তিনটা সিটি আছে। এয়ারপোর্ট আছে অনেকগুলো। দ্বীপগুলোর সাথে স্পীডবোট দিয়েই যোগাযোগ, কোন কোন ক্ষেত্রে প্লেন। বেশি দূর বা তাড়া থাকলে সী প্লেন। সাগরে ভাসছে লঞ্চ, ফেরী, জাহাজ।

ছোট দ্বীপগুলো বাউন্ডারী করা। সাজানো নারিকেল গাছ আর রাতের বেলার লাইট – অপূর্ব লাগে। পর্যটকে ঠাসা ৪ হাজার ডলার পার ক্যাপিটা ইনকামের ভারত মহাসাগরের দেশটিতে। ভারত থেকে ৪৫০ আর শ্রীলংকা থেকে দূরত্ব পানি পথে ৭০০ কিলোমিটার। বৌদ্ধদের দেশটি শ্রীলংকার অধীনে ছিল; পরিবর্তন ঘটেছে ১১৫৩ সালে। শত ভাগ মুসলমানের দেশটিতে এখন কলেজ ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। ২০০৪ সাল থেকে পোস্ট সেকেন্ডারী শিক্ষার উন্নতির প্রয়াসে আছে দেশটি। স্কলারশীপে ভারত, শ্রীলঙ্কায় পড়ানো হয় হায়ার এডুকেশনে উৎসাহীদের। মেডিকেল কলেজের প্ল্যান হচ্ছে। ! ১০ম বা ১২ স্ট্যান্ডার্ড করে হোটেল ম্যানেজমেন্ট, তারপর আর লাগে না। পর্যটনের প্রবৃদ্ধির সাথে ইংরেজীতে চৌকস হচ্ছে চলমান জেনারেশন।

আমাদের দ্বীপটি হুদুরান গুসী। আদারান সিলেক্ট হোটেলের তিনটা রিসোর্টের একটাতে আমরা। ৪০০ ভিলা – হাউসফুল প্রতিদিন। এরকম অহর্নিশ ভরা থ াকলে বাণিজ্যের অভাব হবে কেন?

কোন মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং নেই, নিজস্ব পাওয়ার হাউজে বিদ্যুত সার্বক্ষণিক, প্রতিটা ভিলার সাথে সোলার প্যানেল। সাংবাৎসরিক ২৪-৩২ ডিগ্রী তাপমাত্রায় সাগর ঘেঁষা ভিলায় থাকা। কারেন্ট গেলে কঠিনের চেয়ে কঠিনতর গরম।

হোটেলগুলোর মালিক বিদেশী বেশি – শ্রীলংকান, ইন্ডিয়ান অনেক। দ্বীপ লীজ নিয়ে চেইন ব্যাবসা করে। ইউএস ডলারেই লেনদেন বেশি, রুপীর কথা কম বলে।

সেলস ট্যাক্স ১২%।। টুরিজম বৃহত্তম শিল্প, জিডিপির ৬০% আসে। কৃষি নেই; সব আমদানী করতে হয়। শ্রীলঙ্কা (৭.৫%) সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। রফতানীতে ফিস আগোনো, গার্মেন্টস আছে। majority USA তে।

ছোট ছোট দ্বীপ

আমাদের ডিম্বাকৃতির দ্বীপটিতে মর্নিং ওয়াক (৪৫ মিনিট) পুরা করতে ৩ রাউন্ড দিতে হয়। দুটা মেইন রেস্টুরেন্ট অনেকগুলো বার চা কফি আর মদে ভরা। সব মাংস হালাল, চাহিদা অনুযায়ী পর্ক মিলে। মালদ্বীপের সবচেয়ে বড় দ্বীপের দৈর্ঘ্য ৮ কি. মি.। সাদা চামড়ার পর্যটকদের মধ্যে ফরাসী আধিক্য মনে হলো ওদের সাথে ইতিহাসের যোগ আছে। আরবও আছে বেশি। অন্য রিসোর্টের মত এখানেও শ্রমিক কর্মচারী বাঙালী আছে শতাধিক। ওরা অধিকাংশই বছরে একবার বেতনসহ একমাসের ছুটি পায়।

এখানে মসজিদ আছে একটা, ফাস্ট এইড ক্লিনিকও দেখলাম। প্রতিবেশী ফরাসী মহিলা ডাক্তার দেখানোর জন্য পার্শ্ববর্তী দ্বীপে গিয়েছিলেন। বাঙালী ডাক্তারও আছে।

ফুটবল মাঠ, লন টেনিস কোর্ট ও মিনি চিলড্রেন পার্ক আর দিগন্ত জোড়া সাগরের উপভোগ্য বীচ বাংলাদেশের আর্টিফিশিয়াল সব রিসোর্ট থেকে এটাকে আলাদা করেছে।

নদীপথে এক ঘণ্টা cruise গেলে অন্ততঃ ৫০টা আইল্যান্ড চোখে পড়বে। মনে হলো প্রত্যেকটাতে বীচ ভিলা আর বিশেষ আকর্ষণ ওসান ভিলা। Ocean villa গুলো সাগরে পানির মধ্যে, পাটাতন দিয়ে মেইন ল্যান্ডের সাথে যুক্ত করা আছে। সব ভিলার প্যাটার্ন কিন্তু স্বতন্ত্র।

মালডিভিয়ান এয়ার

প্লেনে সহযাত্রী এক রিসোর্ট কর্মীর আফসোস আমদানী করা চালের দাম তিন রুপীকে (বাংলাদেশী ৩ x ৬ টাকা) বছরের পর বছর বদলায় না। ভিলার মুখে বীচে রাতভর বসে থাকা যায়, মূল্যবান জিনিষপত্র হারায় না।

খাওয়া পরা

মুসলমান দেশ, হালাল ছাড়া নেই কোথাও Piculiar dress এর (সামনে দেখলে লুঙ্গী, পিছনে পাজামা) মানুষগুলো অবয়বে আমাদের মত তবে শ্রীলঙ্কানদের মত সাগর পাড়ের মানুষ; রোদে পোড়া।

Longivity

সী লেভেল-এর সামান্য উপরে মালদ্বীপ দেশটির ভবিষ্যত কি? গ্লোবাল ওয়ার্মিং effect? ২০৫০ নাগাদ নির্ঘাৎ সলিল সমাধি!

ইন্দিরার পিতা- নেহরু, স্বামী - ফিরোজ খান। তিনি ইন্দিরা গান্ধী হলেন কিভাবে?

সেদিন ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে এক পরিচিত কলেজ প্রভাষকের সাথে আলাপ হচ্ছিল। একথা সেকথার পর এক পর্যায়ে তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, ইন্দিরা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীর কন্যা না নাতনী?

আমি আশ্চর্য হইনি। কারণ, আমার জানামতে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ এরকমই মনে করে। উত্তর দিলাম – পুত্র বধূ।

দেখলাম লেকচারার সাহেবের ইতিহাস জ্ঞান বেশ টনটনে।

তিনি আমার নির্বুদ্ধিতায় মর্মাহত হয়ে বললেন – ধুর মিয়া, ইন্দিরা গান্ধী বিয়ে করেছিলেন এক পার্সিয়ানকে, নাম ফিরোজ গান্ধী, ধর্মে অগ্নিউপাসক।

তাঁর সাথে অনেক আলাপ হল। সেদিকে না গিয়ে আসল কথায় আসি।

ইন্দিরা গান্ধী। পুরো নাম ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী নেহরু। স্বামী ফিরোজ জাহাঙ্গির খান। পিতা জওহরলাল নেহরু। মা কমলা নেহেরু, দাদা মতিলাল নেহেরু।

দেখা যাচ্ছে স্বামীর দিক, পিতার দিক কোন দিকেই 'গান্ধী' নেই। তাহলে ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী নেহরু ইন্দিরা গান্ধী হলেন কিভাবে?

ফিরোজ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পার্টির একজন নবীন সদস্য ছিলেন এবং এলাহাবাদে পার্টির কাজের সুবাদে ইন্দিরা এবং তাঁর মা কমলা নেহরুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি নেহেরু পরিবারের খুব কাছের একজন হয়ে যান। ১৯৩৩ সালে তিনি ইন্দিরাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন এটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কমলা নেহেরু। ইন্দিরা নেহেরুর বয়স তখন মাত্র ১৬।

১৯৩৬ সালে কমলা নেহেরু মারা যান এবং ইন্দিরা তখন খুব একা হয়ে যান। পিতা জওহরলাল তাকে অক্সফোর্ডে পড়তে পাঠান। ফিরোজ আরো আগ থেকেই অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়টাতেই ইন্দিরা এবং ফিরোজ খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে একে অপরের কাছে চলে আসেন।

সেই সময়েই ইন্দিরা তার পিতা জওহরলাল নেহেরু কে প্রায় ১০০ টা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে একটা মাত্র বাক্য লেখা থাকতো। "বাবা, আমি ফিরোজকে ভালবাসি"।

জওহরলাল নেহরু এতে বেশ বিচলিত ও বিব্রতবোধ করেন। কারণ, সে সময় অসম ধর্মের বিয়েকে ভারতে খারাপ চোখে দেখা হত। এই বিবাহ হলে খবরের কাগজে নানা কথা লেখা হতে পারে ... তাই কোনো উপায় না দেখে বিষয়টা নিয়ে জওহরলাল মহাত্মা গান্ধীর শরণাপন্ন হন।

গান্ধীজি ইন্দিরা ও ফিরোজের সাথে আলাপ করে তাদের অনড় অবস্থান বুঝতে পারেন।

– আমার পুত্রের সাথে ইন্দিরাকে বিয়ে দেবে? গান্ধীর এমত প্রস্তাবে চমকে উঠেন জহরলাল নেহরু। তিনি জানান, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে ইন্দিরা রাজি হবেনা।

গান্ধী বলেন, ইন্দিরা রাজি। ফিরোজকে আমি দত্তক নেব। সে হবে আমার পুত্র ফিরোজ গান্ধী।

পরে সে মতেই ফিরোজ গান্ধীর সাথে হিন্দু রীতিতে বিয়ে হয় ইন্দিরা নেহরুর। ইন্দিরা হয়ে যান 'ইন্দিরা গান্ধী'।

জাপান : সততাই যার মূল শক্তি

উপরোক্ত শিরোনামে প্রথম আলোতে প্রকাশিত সংবাদটা হয়ত অনেকেই পড়েছেন।

নিউইয়র্ক ও টোকিওর ওপর চালানো একটি গবেষণার চিত্র:

টোকিওতে ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষের বাস। এমন জনবহুল নগরে বছরে লাখ লাখ জিনিস হারিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। যায়ও। কিন্তু তার বড় একটা অংশ ফেরৎ পান মালিকেরা।

বিষয়টি প্রমাণে ২০১৮ সালের একটা পরিসংখ্যান দেখা যাক। সে বছর টোকিওতে ৫ লাখ ৪৫ হাজার হারিয়ে যাওয়া আইডি কার্ড মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে টোকিওর মেট্রোপলিটন পুলিশ। সংখ্যাটা হারিয়ে যাওয়া মোট আইডি কার্ডের ৭৩ শতাংশ।

ঠিক একইভাবে হারিয়ে যাওয়া ১ লাখ ৩০ হাজার মুঠোফোন (৮৩ শতাংশ) এবং ২ লাখ ৪০ হাজার ওয়ালেট (৬৫ শতাংশ) ফেরৎ পেয়েছেন এগুলোর মালিকেরা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে, হারিয়ে যাওয়ার দিনই প্রিয় বস্তুটি হাতের মুঠোয় পেয়েছেন তাঁরা। চক্ষু চড়কগাছ হলেও তথ্যটি সত্য।

হারিয়ে ফেলা ৮৮ শতাংশ মুঠোফোন টোকিওর পুলিশের কাছে জমা পড়েছে। কিন্তু নিউইয়র্কের ক্ষেত্রে চিত্রটা প্রায় বিপরীত। মাত্র ৬ শতাংশ মুঠোফোন জমা পড়েছে পুলিশ স্টেশনে। একইভাবে ৮০ শতাংশ হারানো ওয়ালেট টোকিওতে এবং মাত্র ১০ শতাংশ ওয়ালেট নিউইয়র্কে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

জাপানীদের এই সততার পিছনে বিভিন্ন কারণের মাঝে অন্যতম বলে বিবেচিত হলো স্কুলের শিক্ষা। জাপানি সমাজে হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারটি শিশু বয়সেই শেখানো হয়। অন্যের খোয়া যাওয়া জিনিস মাত্র ১০ ইয়েন (৭ পেনি) হলেও পুলিশ স্টেশনে জমা দেওয়ার বিষয়ে শিশুদের উৎসাহিত করা হয় পরিবার থেকেই। একটি শিশু ১০ ইয়েনের একটি মুদ্রা জমা দিলেও পুলিশ কর্মকর্তারা তা আনুষ্ঠানিকভাবে লিখে রাখেন। রিপোর্ট করে মুদ্রাটি কারাগারে জমা রাখা হয়।

শিক্ষণীয়

ভারতের একসময়ের জাঁদরেল আইসিএস অফিসার পরবর্তীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (১৯৯০-৯৬) টি এন শেষন এক ছুটির দিনে উত্তর প্রদেশের কোন এক এলাকায় পিকনিকে যোগ দেওয়ার জন্য সস্ত্রীক রওনা হয়েছেন।

একটি আমবাগান অতিক্রম করার সময় চোখে পড়ল আমগাছে অজস্র বাবুইপাখির বাসা ঝুলছে। এ ধরণের দৃশ্য তিনি আগে কখনো দেখেননি। তার স্ত্রী আগ্রহ প্রকাশ করলেন, দুটি বাসা তিনি বাড়িতে নিয়ে যাবেন।

এসকর্টের লোকেরা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক রাখাল তরুণকে দুটি পাখির বাসা পেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। সে রাজি হলো না।

শেষন কত বড় অফিসার, কি তার ক্ষমতা, সব কথা বলা সত্ত্বেও তরুণটির কোন ভাবান্তর নেই। শেষ পর্যন্ত শেষন নিজে এগিয়ে গিয়ে তাকে ১০ টাকা বকশিস দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইলেন কিন্তু কাজ হলো না। এর পর ৫০ টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলেন তবুও সে অনড়।

সে বলল, সাহেব এই বাসাগুলোতে একটি করে পাখির বাচ্চা রয়েছে, মা পাখিটা যখন বিকেলে খাবার নিয়ে এসে তার বাচ্চাটিকে পাবে না তখন তার কান্না আমি সহ্য করতে পারব না। আপনি যত কিছুই আমাকে দিতে চান কোন কিছুর বিনিময়েই আমি এ কাজ করতে পারব না।

টি এন শেষন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, মুহূর্তে মনে হলো আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি উচ্চ পদমর্যাদা সবকিছুই এই রাখাল তরুণটির কাছে একদানা শস্যেরও সমতুল্য নয়।

শেষন বলেছেন, এই অভিজ্ঞতা তিনি সারা জীবন বয়ে বেড়িয়েছেন। যে বিদ্যা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে না, বিবেক জাগ্রত করে না তা অন্তঃসারশূন্য বোঝামাত্র।

দয়া করে এটি delete করার আগে, Share এ পাঠিয়ে ১৬ কোটি বাংলাদেশীদের কাছে পৌঁছে দাও।

এটি কাউকে সাহায্য করতে পারে। যতবেশি সম্ভব এটি Forward করো।

দয়া করে এটি পড়ো ও পাঠাও। আমেরিকান ডাক্তাররা মানুষের শরীরে এক নতুন ক্যান্সার খুঁজে পেয়েছেন যার কারণ Silver Nitro Oxide. যখন তুমি মোবাইল কার্ড নখ দিয়ে ঘষে তোলো তখন এটি তোমার শরীরে স্কিন ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটি Share করো যাদের তুমি ভালোবাসো।

বাম কানে ফোনে কথা বলো।
ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ঔষধ খেও না।
৫টার পরে ভারী খাদ্য খেও না।
রাতের চেয়ে দিনে পানি বেশি পান করো।
ঘুমানোর উত্তম সময় হলো রাত ১০টা হতে ভোর ৪টা।

চার্জের বাতি যখন শেষ দাগে তখন কোনো কল ধরো না। এই সময় রেডিয়েশন অন্যান্য সময়ের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি থাকে।

তুমি কি এটি তাদের পাঠাতে পারবে যাদের তুমি আদর, যত্ন বা ভালোবাসো? আমি করেছি, উদারতা কিছু নয় কিন্তু জ্ঞান হলো শক্তি।

আমেরিকান কেমিক্যাল রিসার্চ সেন্টার: প্লাস্টিকের কাপে চা খেওনা এবং পলিথিন পেপার-এ কোনো ফল খেওনা কারণ এর দ্বারা ৫২ ধরণের ক্যান্সার হতে পারে। তাই এই সুন্দর একটি এস এম এস ১০০ খারাপ এস এম এস থেকে উত্তম। দয়াকরে এটি পাঠাও যাদের তুমি যত্ন করো।

প্রধানমন্ত্রী হয়েই ছাড়লেন ইমরান খান। পার্লামেন্টে ১৭

প্রধানমন্ত্রী হয়েই ছাড়লেন ইমরান খান। পার্লামেন্টে ১৭৬-৯৬ ভোটে জিতে হলেন পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী। যেদিন ক্রিকেট ছেড়ে পলিটিক্স ধরলেন সেদিনই বলেছিলাম – he will be the prime minister, nothing less than that. কিছু কিছু লোকই থাকে person of achievement. পাকিস্তানের unpredictable team নিয়ে ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন strong determination ছিল তাই। Personality উচ্চতর থাকায় প্রতিভাবান কিন্তু এরোগ্যান্ট দলটিকে নিয়ে শীর্ষে পৌঁছতে পেরেছিলেন ক্যাপ্টেন্সির পারঙ্গমতা দিয়ে। Final এ he scored 72.

ইমরান খান জন্মেছেন ওয়াজিরিস্তান পাখতুন প্রদেশে, মানুষ হয়েছেন লাহোরের পশ এরিয়ায়, পশ স্কুলে পড়েছেন; মাতুল পরিচয়ে পাখতুনিরা তার রাজনীতির সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন।

অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করা এককালের কাউবয়; শুধুমাত্র জুম্মার দিন আর দুই ঈদে নামাজ পড়া মানুষ এখন খাঁটি পাকিস্তানি; হয়ে গেছেন আপাদমস্তক মুসলমান। পার্লামেন্টে দেখলাম স্যুট নয়, কাবুলি ড্রেসে। সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে তো ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারতেননা! রাষ্ট্রক্ষমতা বংশধারার বাইরে নিতে পেরেছেন যেটা উপমহাদেশের ব্যাতিক্রম, কৃতিত্ব তাঁকে দিতেই হবে।

এককালে আমরাও ছিলাম আমেরিকার নাম শুনলে উল্টো বিপ্লবী শ্লোগান দিতাম- ইমরান এ যাবৎ যা করেছেন বলেছেন তা দিয়ে young generation এ এ্যান্টি আমেরিকা ইমেজ গড়ে তুলেছেন; ধর্মপরায়ণতা সাধারণদের সামনে এনেছেন; এ দুটোর সাথে দুর্নীতি জিরো করার প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানীদের বিশ্বাস করাতে পেরেছেন, মায়ের নামে হাসপাতাল করতে পেরেছেন মানুষের কাছ থেকে পাওয়া কোটি কোটি টাকার সদ্ব্যবহার করে; শুধু আর্মি নয় সাধারণ মানুষে সাহায্যেই he could achieve his cherished goal ইমরান ideologist নন; বাস্তবতার নিরিখেই নিজের লক্ষ ঠিক রেখে পদক্ষেপ নেয়া লোক, এ্যাপ তৈরি করেছেন, বানিয়েছেন পাঁচ কোটি ভোটারের ডাটাবেজ; জেতাই তাঁর লক্ষ্য নীতি নয় – অবশ্যই বেসিক ঠিক রেখে সেরাতুল মোস্তাকিমে চলেছেন, নির্বাচনে গেছেন, জিতেছেন।

সুদর্শন ইমরান এদের দলের – ডোনাল্ড ট্রাম্প, মাহাথির মোহাম্মদ-এরা হারতে চান না, এরা জিততে জানেন!

কুচিং (অর্থ বিড়াল) পূর্ব মালয়েশিয়ার শহর

কুচিং (অর্থ বিড়াল) পূর্ব মালয়েশিয়ার শহর। সারওয়াক প্রদেশের রাজধানী। ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুর তিন ঘণ্টা, কুয়ালালামপুর থেকে কুচিং পৌনে দুই ঘণ্টা। পূর্ব মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ার ৬০% (ল্যান্ড এরিয়া)। এটাকে মালয়েশিয়ান বোর্নিও বলে। বোর্নিওর সারওয়াক ও সাবাহ্ এখন মালয়েশিয়ার অন্তর্গত।

পূর্ব থেকে পশ্চিম মালয়েশিয়া (যেটা পেনিনসুলার মালয়েশিয়া) দঃ চায়না সাগরের ৪০০ কিলোমিটার দিয়ে separated। ৬৩ সালে স্বাধীন হওয়ার সময় সিংগাপুর মালয়েশিয়ার সাথে ছিল। ১৯৬৫ সালে সিংগাপুরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়। ৯১% পপুলেশন ও অর্থনীতি পশ্চিমে। উত্তরে ছোট্ট একটা অংশে ব্রুনাইর সাথে (লাবুনাই)। সাবাহ আবার ফিলিপিনের কাছে। পূর্ব মালয়েশিয়ার পাশে ইন্দোনেশিয়া। পশ্চিম মালয়েশিয়া আবার থাইল্যান্ড ঘেঁষা; সবাই মিলে সাউথ-ইস্ট এশিয়ার অংশ; ASEAN গোষ্ঠীর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এই এলাকাকে ব্রিটিশ আধিপত্যমুক্ত করে। এখানেও কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ছিল, সেপারিটিসমের হাওয়া ছিল; দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং সুবিধাজনক ইকোনমিক্সের কারণে সবাই বিভেদ চেপে গেছে।

কুচিংয়ের লোকসংখ্যা সাত লক্ষ। কুচিং নদীর ধার দিয়ে গড়ে উঠা শহরটা সুন্দর। মেলবোর্নের বা প্যারিসের শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়া নদী/লেকের মত অত সুন্দর করে সাজানো অট্টালিকা নেই তবে দেখার মত স্থাপনা আছে। নদীর পাড়ের রাস্তাটা শহরের প্রাণ। তবে সিডনীর ডার্লিং হারবারের মত ব্যস্ত লোকারণ্য বা আলোকময় নয়। ছোটশহর, ছোট গাড়ীই বেশি; পাতলা বসতি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই, নেই রিক্সা-স্কুটারের মত কিছু। হোটেলাধিক্য থাকায় পর্যটনের শহর বলতে দ্বিধা থাকেনা। বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্য, বীচ, মাল্টিকালচারাল পার্ক, রেইন ফরেস্ট, অগাধ টিম্বার, তেল, গ্যাস সহ প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ব মালয়েশিয়ার ইন্ডাস্ট্রির অভাব পুষিয়ে দিয়েছে।

ডা. আরিফ (K-২৯) : Arif Bhi

৪২ বছর ধরে সৌদি আরবে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ঢাকা মেডিকেলের একসময়ের প্রিয়মুখ ডা. আরিফুর রহমান। পেশায় ফিজিশিয়ান হয়েও মরুপ্রান্তরে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করছেন টানা চার দশক। ২০০৪ সালে রেমিটেন্স সংক্রান্ত ইউএনডিপির এক প্রতিবেদন মোতাবেক সৌদি আরবের বিশাল জনশক্তি বাজার

থেকে পাকিস্তানী ও ভারতীয়দের হটিয়ে দিয়ে এই ব্যবসাকে একটি শিল্পরূপ প্রদান করেন যে বাংলাদেশি তিনিই ডা. আরিফ। পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ দেশটিতে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশির কর্মসংস্থানে সরাসরি অবদান তাঁর। একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. আরিফ জানান, বিশ্বব্যাপী প্রবাসীদের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শক্তির যথার্থ ব্যবহারে বাংলাদেশের অযোগ্যতা কীভাবে দূর করা যায়, তা নিয়েই আমাদের বসতে হবে অক্টোবরে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য ১ম Bangladesh Investment Summit ২০১৮ প্রবাসী বিনিয়োগ মহাসম্মেলনে। সৌদি রাজ পরিবারের বিশেষ আস্থাভাজন এই মেধাবী বাংলাদেশির অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ হবে প্যারিস সামিট।
- www.bangladeshinvestmentsummit.com

ভীষণ মজার একটা মানুষ। শ্মশ্রুমণ্ডিত হওয়ায় অবয়ব স্বাভাবিক ভাবেই change হয়েছে। ছবি দেখলে height আন্দাজ করা যায় না।

৭৩-৭৪ সালে যখন একটা TV channel ছিল, উনার প্রোগ্রামগুলো ভীষণ টানতো আমাদেরকে; সবস্তরের মানুষ উপভোগ করত। বিচিত্রায় উনি নিয়মিত লিখতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে উনি আমাদের দুই বছরের সিনিয়র। ছাত্র শিক্ষক স্টাফদের মাঝে ছিল হিংসা করার মত জনপ্রিয়তা।

মৃত্যুশয্যায় মহাবীর আলেকজান্ডার

মৃত্যুশয্যায় মহাবীর আলেকজান্ডার তার সেনাপতিদের ডেকে বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার তিনটা ইচ্ছা তোমরা পূরণ করবে।

- আমার প্রথম অভিপ্রায় হচ্ছে : শুধু আমার চিকিৎসকরাই আমার কফিন বহন করবেন।
- আমার ২য় অভিপ্রায় হচ্ছে : আমার কফিন যে পথ দিয়ে যাবে সেই পথে আমার অর্জিত সোনা ও রুপা ছড়িয়ে থাকবে।
- আর শেষ অভিপ্রায় হচ্ছে : কফিন বহনের সময় আমার দুই হাত কফিনের বাইরে ঝুলিয়ে রাখবে। তার সেনাপতি তখন তাঁকে এই বিচিত্র অভিপ্রায় কেন করছেন প্রশ্ন করলেন। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে আলেকজান্ডার বললেন, আমি দুনিয়ার সামনে তিনটি শিক্ষা রেখে যেতে চাই।
- আমার চিকিৎসকদের কফিন বহন করতে এই কারণে বলেছি যে যাতে লোকে বলতে পারে যে চিকিৎসক মানুষকে সারিয়ে তুলতে পারে না। তারা ক্ষমতাহীন আর মৃত্যুর থাবা থেকে রক্ষা করতে অক্ষম।
- যাবার পথে সোনা-দানা ছড়িয়ে রাখতে বলেছি সোনা-দানার একটা কণাও আমার সঙ্গে যাবে না। এগুলো পাওয়ার জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করেছি, কিন্তু নিজের সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারছি না। মানুষ বুঝুক এসবের পেছনে ছোটা মানে সময়ের অপচয়।

- কফিনের বাইরে আমার হাত ছড়িয়ে রাখতে বলেছি মানুষকে বুঝানোর জন্য পৃথিবীতে খালি হাতে এসেছি আজ পৃথিবী থেকে খালি হাতেই চলে যাচ্ছি। মহান আল্লাহ, সকল মানুষের ঈমানী শক্তি আরও বাড়িয়ে দিক এবং আল্লাহকে বোঝার মতো তৌফিক দান করুন।

আমিন, আমিন, সুম্মা আমিন।

কিছু তথ্য জেনে নিন

- পৃথিবীর মোট রাষ্ট্র ২২৮ টি।
- পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্র ১৯৫ টি।
- পৃথিবীতে মোট মুসলিম রাষ্ট্র ৬৫ টি।
- OIC ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র ৫৭ টি।
- সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কসোভা (ইউরোপ)।
- পৃথিবীর মোট রাষ্ট্রসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম রাষ্ট্রের হার ২৬%।
- পৃথিবীর মুসলিম জনসংখ্যা ১৪২ কোটি।
- পৃথিবীর জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যার হার ২৩.১৮%।
- জনসংখ্যার দিক দিয়ে বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া।
- জনসংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষুদ্রতম মুসলিম রাষ্ট্র মালদ্বীপ।
- জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম শহর করাচী (পাকিস্তান)।
- মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে সবচে বেশি মুসলমান বাস করে ভারতে (১৬%)।
- মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন মহাদেশের মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হারঃ এশিয়া ২৪%, ইউরোপ ১%, আফ্রিকা ৫৯%, উত্তর আমেরিকা ১.৫%, দক্ষিণ আমেরিকা ০.৫০%।
- ১৫ ই নভেম্বর – জনসংখ্যা ৮০০ কোটি হলো।

শীতের দেশ কানাডায় জীবন যাত্রা

তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ দেখলাম, ০ ডিগ্রী দেখলাম প্লাস ৫ ও দেখলাম (২ সপ্তাহের মধ্যে); ঘরের/গাড়ীর ভিতরে থাকলেও ব্যাবধান অনুধাবন করা যায়, dress alter করতে হয়। বিরক্তিকর হলো বের হবার সময়, সব কভার করতে হবে। যত শীত কম, বরফ তত কম। প্লাসের দিকে গেলে বরফের টিলা গলতে থাকে, রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয়; গাড়ী অর্ধেকটা ময়লায় ঢেকে যায়। ৩ ডলারে তিন মিনিটে অটোমেটিক গাড়ী ওয়াশিং, গাড়ী রিপেয়ারিং হয়; এগুলো এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া হয় না।

রেডিও (গাড়ীতে) খুললে চিকিৎসার পরামর্শ, weather, criminal acts প্রচার হতে থাকে continuous ৬০০০ চ্যানেল (TV), ৬০০০ ছবি দেখতে মাসে কেবলকে পে করতে হয় ১১ডলার মাত্র।

ট্রাফিক জ্যাম আছে গায়ে সহার মত। ডাউন টাউন (আদি শহর) অফিস বেশি, লোক বেশি, গাড়ী বেশি জ্যাম বেশি।

গাড়ী চুরি হয়। বাড়িতে চুরি হয়। ইন্সুরেন্স থাকলে রিকভার হয়, সিকিউরিটিতে রেজিষ্টারড থাকলে সেফটি গ্যারান্টেড।

মসজিদে হালকা-গ্যাদারিং হয়, ইসলামের বিভিন্ন টপিক নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা; উদ্দেশ্য পরের জেনারেশনকে ধর্মের পথে রাখা। আমেরিকায়ও দেখলাম এটা আছে। Google এর কল্যাণে কিবলা পেতে অসুবিধা নাই, আজান শোনা যায় সব ওয়াক্তে।।

পাসপোর্ট বা পি আর (পারমানেন্ট রেসিডেন্সী) ধারীদের অনেক ট্রেইনিং, শিক্ষা ফ্রি। সারা বছরে কয় ঘণ্টা কাজ করেছে তা দেখে বেনিফিট পরিমাপ হয়। ছয় মাসের সার্টিফিকেট কোর্স বা ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স বা ২ বছরের ডিগ্রী কোর্স না করলে কোন চাকুরীর স্কোপ নেই।

দোকানপাট খোলা সাতটা থেকে নয়টা। রবিবার পার্শিয়াল; ব্যাংক শনিবার পার্শিয়াল, রোববার পুরা বন্ধ। সব দোকান/মলে ফ্রি ওয়াইফাই; ইন্টারনেট ও browse করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। স্কুল-কলেজ শনি-রবি বন্ধ। এপ্রিলে ইনকাম-ট্যাক্স রিটার্ন দিতে হয়।

ডে-কেয়ার সেন্টারে সকালে বাচ্চাকে দিয়ে মা বাবা দুজনেই নিশ্চিন্তে অফিস করতে পারে। স্কুল বাস বাচ্চাকে ডে-কেয়ার থেকে নিয়ে ও দিয়ে যায়; ওরা মা/বাবা না আসা পর্যন্ত ওখানে থাকে। আমাদের অফিসগামী বাবা-মাদের এমন সুষম ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো।

উইনিপেগ ম্যানিটোবা প্রদেশের রাজধানী

উইনিপেগ ম্যানিটোবা প্রদেশের রাজধানী। ৮০০ বাঙালী আছে ঢাকার চেয়ে বৃহত্তর এ শহরে। ১.৭% মুসলিম অধ্যুষিত এ শহরে মসজিদ আছে ৮টি। বাঙালীরা পলিটিক্যালী বেশি concious. কাউন্সিলর ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১১ ভোটে হেরে গেছে (ক্যালকুলেশনে ভুল?) বরফে ঢাকা শহরে নাগরিক সুবিধা কম নয়। হিউম্যান রাইট মিউজিয়ামের সামনে গান্ধীর মূর্তি দেখলে ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধার কথা মনে হয়। লোকসংখ্যা ৭.৮ লাখ; ম্যানিটোবার (বাংলাদেশের ৬ গুণ) লোক সংখ্যা ১.৩ মিলিয়ন। পার ক্যাপিটা ইনকাম ৩১০০০ ডলার।

স্কুল
সিক্স পর্যন্ত প্রাইমারি; সেভেন, এইট, নাইন জুনিয়র স্কুল; টেন, ইলেভেন, টুয়েলভ গ্রাজুয়েট স্কুল। স্কুলের মধ্যে জিম দেখলাম; হার্ডল রেস হচ্ছে। বাস্কেটবল কোর্ট আছে। সবকিছুই ছাদের নীচে দেয়াল ঘেরা। স্কুলে এওয়ার্ড দেয়া হয় একাডেমিক এ্যাচিভমেন্টে, পার্সেন্টেজে, গেমসে।

৪৬৪ বর্গ কি. উইনিপেগে ৬৪% খ্রীষ্টান, ১২% কোনো ধর্ম মানেনা। প্রাচীনতম শহরটি ঢাকার চেয়ে বড়; কানাডার সপ্তম বৃহত্তম শহর। এ শহরের ৮০% ইংরেজী, ৪% টোগাল (ফিলিপিন), ৩% ফ্রেঞ্চভাষী। ১১% এবোরিজিন (সারা কানাডার ৪%) মনে করে ওদের দেশে সবাই এসে জেঁকে বসেছে, স্বভাবতই ওরা অন্যদের জন্য headache.

সীমান্ত: ১১০ কি.মি. দূরে আমেরিকার বর্ডার। সীমান্ত দিয়ে নর্থ ডাকোটা গেলাম। আমেরিকার এ শহরে আমার ৪নং ভাই থাকেন। কানাডা-আমেরিকার এই যাত্রা ৩-৪ ঘন্টার; ৩৩০ কি.মি.। লং ড্রাইভে থ্রিল হলো। গরমের দিনে সবুজ আর সবুজ, গম আর ক্যানোলা অয়েলের গাছ। এখন শীতে দুধারে শুধুই সাদা, বরফ আর বরফ। লম্বা রাস্তায় গাড়ী কম, পাশাপাশি দুটো গাড়ী রান করছে এ দৃশ্য খুব কম। পুরা রাস্তায় হর্নের কোন বালাই নেই।

শয়তানকে পাথর মারার প্রতিকী স্তম্ভ : বাঙালী প্রকৌশলী ইব্রাহীম

পবিত্র হজ্ব পালন করতে গিয়ে জামারাতে শয়তানকে পাথর মারার সময় হুড়োহুড়িতে পদদলিত হয়ে অতীতে বহু মুসলিম মারা গেছেন।

বাংলাদেশের প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম সস্ত্রীক হজ্বে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে মর্মাহত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন – কিভাবে তা থামানো যায়? দেশে ফিরে তিনি একটি সুবিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন (পরিকল্পনা) করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ে জমা দিলেন। সেখান থেকে ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে সৌদি সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

হজ্বের সময় পাথর মারার জন্য প্রত্যেক হাজীকে সৌদি আরবের মিনায় তিনদিন অবস্থান করতে হয়। যে তিনটি স্তম্ভে পাথর মারতে হয়, তাকে বলা হয় জামরা বা পাথরের স্তূপ। এটা শয়তানের প্রতীকী স্তম্ভ। প্রথম জামারার নাম জামরাতুল আকাবা, মধ্যেরটি উস্তা ও শেষেরটি উলা। একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব মোটামুটি ৩৩০ মিটার। পাথর মারার ক্ষেত্রে আগে কোনো নিয়ম ছিল না। যে যেদিক থেকে যেভাবে পারত, পাথর মারা শুরু করত এবং একপর্যায়ে বিশৃঙ্খলায় পদদলিত হয়ে প্রাণ হারাত।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম ১৯৯৪ সালে প্রথম সস্ত্রীক হজ্ব করতে গিয়ে লক্ষ করলেন – অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে শয়তানকে পাথর মারতে গিয়ে পদদলিত হয়ে প্রতিবছর অনেক প্রাণহানি ঘটছে। একই কারণে সেবার ২৭০ জন হাজী মারা যান।

দেশে ফিরেই মোহাম্মদ ইব্রাহীম শয়তানকে পাথর মারার একটি মডেল (একমুখী বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা) তৈরি করলেন। তাঁর পরিকল্পনার চারটি ধাপ রয়েছে – ১. প্রতিটি জামারাকে বেড়া দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করতে হবে, যাতে উভয়দিকে দুটি রাস্তার সৃষ্টি হয়। ২. জামারার দেয়াল মাত্র ছয় ফুট বাই ছয় ফুট ছিল, তা উভয়দিকে অন্তত ৩০ ফুট করে বাড়িয়ে নেওয়া। ৩. একমুখী ট্রাফিক সিগনালের ব্যবস্থা করা। ৪. এরপর মিনার দিকে In ও অপর প্রান্তে Out বসিয়ে জনতার স্রোত একমুখী চালনা করা- এদিক দিয়ে ঢুকে পাথর মেরে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; কেউ পেছনে ফিরবে না। এই হলো প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার।

এই পরিকল্পনা এতটাই নিখুঁত ছিল যে, খোদ সৌদি বাদশাহ ফাহাদ মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে "মুহিব্বুল খায়ের" হিসেবে উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর জন্য উপহারসামগ্রী পাঠান। শুধু তাই নয়, পরে তাঁকে পবিত্র মক্কায় প্রকল্প-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ক্বাবা শরীফের তৎকালীন প্রধান ইমাম শায়খ আবদুস সুবাইল বলেন, পৃথিবীর ১০ জন সেরা প্রকৌশলীদের মধ্যে ইব্রাহীম একজন। কেননা এর আগে হাজারো প্রকৌশলী হজ্ব করে গেলেও কেউ কখনো এ বিষয়টি নিয়ে ভাবেননি বা সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নেননি।

ফ্রান্সের শিল্পী

#Juan_Lucena এঁকেছেন ছবিটা। করোনার এই মহামারীতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বয়স্করা, রেখে যাচ্ছেন শিশুদের।

কি বেদনাদায়ক ছবিটি! (কভারের ছবি)

শিশুরা চিৎকার করে ডাকছে তাদের দাদা, দাদী, নানা, নানীদের। কিন্তু তারা ফিরে আসছেন না, চলে যাচ্ছেন না ফেরার দেশে। ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা তাদের সিনিয়র সিটিজেনদের রক্ষা করতে পারেনি।

আমরা চেষ্টা করি আমাদের পরিবারের বয়স্কদের রক্ষা করতে যেনো করোনার পরও তাদের দোয়া থেকে আমরা বঞ্চিত না হই।

মহান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি...

আসুন নিয়ম কানুন মেনে চলি যেন আমি এবং আমার পরিবার করোনার করালগ্রাস থেকে মুক্ত থাকি।

ফ্লু কিন্তু হয়েছে periodically. বিংশ শতাব্দীতে তিনবার (১৯১৮, ১৯৫৭, ১৯৬৮) ; এক বিংশ শতাব্দীতে এ পর্যন্ত ৪ (চার) বার (২০০২, ২০০৯, ২০১২, ২০১৯)। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত বেশি, অধিকাংশই মিলিয়নের উপর – হয়ত আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় এত মারাত্মক নয়। করোনায় আক্রান্ত কম, মৃত বেশি (সার্স ১০%, মার্স ৩০%, কোভিড-১৯ ৫%)।

এত advanced দুনিয়া, স্পষ্ট evidence থাকার পরও মৃত্যুর মিছিল কেন? Virologistরা ২০১২ সালেও বলেছে সামনে আরেকটা epidemic/pandemic আসছে – তাহলে?

ভাইরাসের (Mutation) পরিবর্তন হয়-এই H (hemagglutinine) আর N (neuraminidase) এ, কখনও H1 কখনও H2/H3 ev N1/N2/....

আরেকটা হল সংমিশ্রণ। ভাইরাসগুলো আসলে প্রাণী থেকে মানুষে আসে, আর যখন মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়, কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয় শহর, নগর, দেশ, মহাদেশ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সোয়াইন ফ্লুতে শুকরের ভাইরাস আর মানুষের ভাইরাসের জিন মিশে, আর এবার (COVID-19) বাদুড়, সাপ, বিড়ালের ভাইরাসের জিন সংমিশ্রণে মানুষের capacity বাইরে যাচ্ছে সব। ট্রাম্প সাহেব ১০ ফেব্রুয়ারী চাইনিজ ভাইরাস বলায় ইতালী-স্পেন ফুটবল soccer বন্ধ করে নাই, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য আমলে নিতে দেরী করে ফেলেছে। আসলে কার্যকরী ঔষধ বাজারে চালু হবার আগেই-ভাইরাস প্রতিবারই তার রূপ বদলিয়ে ফেলেছে। Effective ভ্যাকসিন চালু করার ফুরসতই পায় নাই দুনিয়া, আল্লাহর মার! প্রোটোকল মানা ছাড়া গত্যন্তর নাই!!

An Israeli doctor says (Fun!)

An Israeli doctor says: "In Israel, medicine is so advanced that we cut off a man's liver put them on another man, and in 6 weeks, he is looking for work."

The German doctor says: "That's nothing, in Germany we take part of a brain, put it in another man, and in 4 weeks he is looking for work."

The Russian doctor says: "Gentlemen, we take half a heart from a man, put it in another's chest, and in 2 weeks he is looking for work."

The American doctor laughs: "You all are behind us. Two days ago, we took a man with no brains, no heart, and no liver and made him President.

Now, the whole country is looking for work!"

আশ্চর্য এবং অসাধারণ একটি দেশ

ইউরোপের একটি দেশ, যেখানে এই দৃশ্য অহরহ দেখতে পাবেন :

একটি রেস্তোরাঁ। ঐ রেস্তোরাঁর ক্যাশ কাউন্টারে এক ভদ্রমহিলা এলেন আর বললেন, ৫ টা কফি আর একটা সাসপেনশন। তারপর উনি পাঁচটি কফির বিল মেটালেন আর চার কাপ কফি নিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে, এক ভদ্রলোক এলেন আর অর্ডার করলেন, দুটো লাঞ্চ প্যাক করুন আর দুটো সাসপেনশন রাখুন। উনি চারটে লাঞ্চ-এর বিল মেটালেন আর দুটো লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে চলে গেলেন।

তার কিছুক্ষণ পর আরো একজন এলেন। অর্ডার করলেন, দশটা কফি, ছটা সাসপেনশন। উনি দশটা কফির পেমেন্ট করলেন আর চারটে কফি নিয়ে গেলেন।

এমন ভাবেই একের পর এক চলতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি জর্জর অবস্থায় কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো সাসপেনশন কফি আছে?

কাউন্টার থেকে জানানো হলো, অবশ্যই আছে এবং এক কাপ গরম কফি ওনাকে দেওয়া হলো।

তারও অল্প কিছুক্ষণ পরে এক দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ভিতরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি কোনো লাঞ্চ সাসপেনশনে রাখা আছে ? কাউন্টার থেকে যথারীতি সম্মতি জানিয়ে, তাকে গরম খাবারের একটি পার্সেল আর এক বোতল জল দেওয়া হলো।

এই ব্যাপারটা সারাদিন চলছে, চলছে তো চলছেই। কিছু মানুষ নিজেদের পকেট থেকে, নিজেদের অর্জিত রোজগার থেকে, কিছু অজানা মানুষের খাওয়ার জন্যে পেমেন্ট করছেন। আর কিছু গরীব, দুঃস্থ মানুষ বিনা পেমেন্টে নিশ্চিন্তে খাওয়া দাওয়া করছেন। দিনভর চলছে এই কাণ্ড। কেউ জানেনা কারুর পরিচয়। না দাতা জানে গ্রহীতার পরিচয়, না গ্রহীতা জানে দাতার পরিচয়। প্রয়োজন নেই পরিচয় জানার, প্রয়োজন নেই নিজের নাম জাহির করার, কিন্তু প্রয়োজন আছে কিছু অভুক্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেবার এবং সেটা একেবারেই গোপনে।

মানবিকতার এই চরম শিখরে পৌঁছানো দেশটির নাম নরওয়ে। এবং নরওয়ের দেখাদেখি এই পরম্পরা ছড়িয়ে পড়ছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও।

ইতিহাসের এক আশ্চর্য গল্প

আপনারা কী জানেন একসময় কোলকাতা থেকে লন্ডন পর্যন্ত বাস সার্ভিস ছিল? ১৯৫৭ সালে এপ্রিল মাসে প্রথম কোলকাতা-লন্ডন বাস সার্ভিস শুরু হয় যা ১৯৭০ এর দিক পর্যন্ত ছিল। অ্যালবার্ট নামক একটি কোম্পানি এই ট্রাভেলের দায়িত্বে ছিল।

বাসের রুট ছিল: ইংল্যান্ড থেকে বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে শেষে অমৃতসর, দিল্লি হয়ে কোলকাতা। একবারের যাত্রাতে ভাড়া ছিল ৮৫ পাউন্ড (খাবারসহ)। লন্ডন থেকে কোলকাতার উদ্দেশ্যে প্রথম বাসটি যাত্রা শুরু করে ১৯৫৭ সালের ১৫ এপ্রিল এবং কোলকাতা পৌঁছায় ৫ জুন, মানে প্রায় ৫০ দিন লেগেছিল। যাত্রীদের জন্য ভিয়েনা, সালজবুর্গ, কাবুল, তেহরান, ইস্তাম্বুলে শপিং ডেও রাখা হত।

উপলব্ধি

চলো গ্রামে : মর্নিং ওয়াক (প্রাতঃভ্রমণ): গ্রামে পীচ ঢালা পথ। প্রশান্ত মনে বুক ভরে নেয়া বিশুদ্ধ বাতাস। যতদুর চোখ পড়ে নয়ন জুড়ানো সবুজ আর সবুজ। মাঠকে মাঠ পাট, ধান ফসল আর ফসল। যোগাযোগ সহযোগী হওয়ায় লোকালয়ের বাইরে গড়ে উঠা নিম্নবিত্তের বাড়ী। হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, ঘোড়ার চারণভূমি আঙ্গিনার জমি। পাতি হাঁস, রাজহাঁস প্রায় সব বাড়ীর ব্যাবসা। নতুন দেখলাম পক্ষিরাজ হাঁস। পক্ষিরাজ নতুন নাম, নতুন জাতের হাঁস। বিলে শিকার করা বেলে হাঁসের মত। শ্রুতি আছে ডিম দেয় বেশি, বাচ্চা পাওয়া যায় বেশি। মাংস সুস্বাদু। আলোড়ন করার মত রাজহাঁস সংখ্যা গ্রামে। ব্যবসাবান্ধব প্রাণী, ঘাসখেকো। মাংস বেশি, মূল্য বেশি।

ঈদ, নামাজ : ঈদের মাঠে গেলাম। ওদের মতে ৩৫ বছর পরে মাঠে এসেছি। উষ্ণ সম্বর্ধনা, আবেগাপ্লুত উপস্থিতি। গ্রামে আপন জন কমছে ক্রমশঃ প্রবাসী আসায় এবার প্রিয়জন ছিল। মাঠে গিয়ে বুঝলাম বয়সে ন্যুব্জ পরিচিতের সংখ্যা কম নয়।

বিবর্তন : ঈদের মাঠ কলেবরে বাড়ে নাই কিন্তু সংস্কারে অবয়ব বদলিয়েছে। ঈদগাঁহ মাঠ, পার্শ্ববর্তী গোরস্থান দেখলে এক বাক্যে বলা যায় আমার গ্রামে নামাজীদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে। নামাজের পর সবাই যার যার নিকটজনের কবরের পাশে চলে গেল। বন্ধুপুত্র ইমাম সাহেব সবাইকে নিয়ে একযোগে দোয়া করতে পারতেন।

গ্রামে ঘোড়ার সংখ্যা বেশি, স্বাস্থ্য সুঠাম। ফসলাদি পরিবহণের নব্যসংস্করণ; রেসকোর্স মাঠ সদৃশ বলিষ্ট ঘোড়া। ৭ হাজার লোকের গ্রামে এখন মাত্র দুটো মহিষ গাড়ী। আবু তাহের চাষী লাঙ্গল নাই, বাহক গরু নাই। শোয়ারে কলের মেশিন দিয়ে চাষ করে জমি। সৌদীতে ছিল কিছুদিন। দেশে ফিরে লোকালয়ের বাইরে নতুন রাস্তার পাশে পরিপাটি বাড়ী। মেয়ে ভাল রেজাল্ট করে এইচএসসি পাশ করেছে। ওর বাবা ছিল তোষ্য গরীব, দিনমজুর আমাদের দুর্দিনের নিকটজন। কাসেম চাচার ছেলে হাবিবকে জিজ্ঞেস করায় বললো ভাই ভাল আছি, ছেলে মালয়েশিয়ায় চাকুরী করে ভালো income করেছে। বিল্ডিং দিয়েছি। এক পাল

নয় একটা গরু চড়াচ্ছে। খোঁজ করে জানলাম পেলে পুষে গরু, খাসী বড় করে কোরবানীর সময় বিক্রি একটা সমীহ করার মত লাভের ব্যবসা। পুকুরভর্তি মাছ – তেলাপিয়া আর পাঙাশ। দ্রুত বর্ধনশীল তাই লাভজনক। গরুর পালন, সাথে পুকুর মাছের ব্যবসা। হ্যাঁ, পাশাপাশি করতে পারলে বিল্ডিং বানানো সহজ। ভ্যান চালক দিনশেষের কামাই থেকে ১০০ টাকার গরুর খাবার কিনে আনে। সারাবছর একটা দুটো পালন করে। বিক্রি করে ভাল লাভ। হাইস্কুল teacher বললো এ করে একজন কয়েকতলা বিল্ডিং করেছে। গ্রামে অধিকাংশ বাড়ীতে পাকা ঘর, বাসস্থানের আনুসঙ্গিকসহ বিল্ডিং। ওয়াসা, সিউয়ারেজ নাই, পল্লীবিদ্যুত PWD বহাল। উচ্চমার্গের ডেকরেটর থাকলেও ফ্যাশনের কমিউনিটি সেন্টার অদ্যাবধি নাই। প্যান্ডেল চালিয়ে অনুষ্ঠানগুলো চলে। তুমুল বৃষ্টি হলে স্কুল বিল্ডিং ছাড়া উপায় নাই। কোরবানীর গরু ও খাসীর সংখ্যা দেখে মনে হলো মানুষের সামর্থ্য বেড়েছে। গ্রামেও শহরের মত প্রফেশনাল এবং রেট করে গরু বানানোর প্রচলন আছে। তবে নিজেরাই কোরবানীর পর গরু-খাসী বানায়। ভাই-ভাতিজা মিলে হৃদ্যতার নজির দেখলাম মাংস বানানোর কাজে। যার ছেলে সন্তান নাই, মেয়েরা মাংস বানাল। যার ভাইবোন কেউ নাই, পড়শীরা করল।

সাশ্রয়ঃ প্রবাসী শামীম খেতে বসে কাঁচা মরিচ চাইল। একটা মরিচ পেয়ে তিন টুকরা করে তিনজনকে ভাগ করে দিল। জিজ্ঞেস করায় বলল, অপচয় কমালাম (মরিচ যে ৭৫০ টাকা কেজি)। ছোটবেলায়ও দেখেছি বৃষ্টি-বর্ষার এ season এ গাছ মরে গেলে মরিচের দাম বেড়ে যেত। টাকার অবমূল্যায়নের কারণেই চোখ ছানাবড়া করা দাম।

কূপমণ্ডূকতা

১। হাফেজিয়া মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানকে বললাম – আমরা বেতন দিব, কামিল পাশ মহিলা টিচার দিই। মহিলা নিতে আপত্তি করলেন এ বলে যে, "মেয়ে মানুষ হেঁটে এসে পড়াবে?"

২। ইনসুলিন নেয়া রোগী মসজিদে আবোল তাবোল বলছে। রোগীর কথা – মিষ্টি খাব, হাইপো হয়েছে। মুসুল্লিরা বলছে, না, তোমাকে ভূতে ধরেছে, মসজিদেই থাক, বাসায় যাবার দরকার নাই! ভাগ্যিস বাড়ীর লোক জোর করে মিষ্টি খাইয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করায় ডাক্তার বললেন, এক সপ্তাহ আগে করা সব রিপোর্ট ভাল। সময় মত খায় নাই বলে এমন হয়েছে। কোন টেষ্ট দরকার নাই। ইনসুলিন adjust করতে হবে শুধু। কে শুনে কার কথা। ডায়াবেটিস হাসপাতালে নিয়ে টেষ্ট করে রিপোর্ট পাঠাল। সব রিপোর্ট ভাল। ভাগ্যিস এম আর আই, সিটি স্ক্যান করায় নাই।

৩। ইছামতির (নদী) উপর কাঠের ব্রীজের প্রোপজাল দিল সিএনবি। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, গাড়ী ঘোড়া চলে বাড়ি ঘর ধূলায় ভরিয়ে দেবে। দরকার নাই। এটা আইয়ুব আমলের কথা। এ আমলে এলজিইি থেকে প্রোপজাল গেল। এলাকার সুহৃদ বড় ভাই বললেন ব্রীজ হলে গ্রামে চোর ডাকাত ঢুকে পড়বে সহজে, নাশকতা হবে বেশি। দরকার নাই খাজা।

৪। গ্রাম থেকে বন্ধু টেলিফোনে বললো, ছেলেকে বিদেশে পাঠাবো। কারণ ব্যবসায় সুবিধা করতে পারছে না। সাক্ষাতে বলল ছেলেকে বলেছি গ্রামে এসে লাউ, শশা, কুমড়া, পটল চাষ করলে মাসে এক-দেড় লাখ টাকা ইনকাম সম্ভব। ছেলে গ্রামে আসবেনা।

৫। একজন চেম্বারে এসে বলল, আপনি বড় ডাক্তার, পাবনা বাড়ী। প্রেসিডেন্টকে বলে ছেলের পোস্টিংটা ঠিক করে দেন। বললাম, রাষ্ট্রের প্রধানের আর কাজ নাই!

চেন্নাইর চারটা ছদ্মনাম

১। গেটওয়ে অব এশিয়া। ম্যাপ দেখলে বোঝা যায়।

২। ডেট্রয়েট অব ইন্ডিয়া – ইন্ডাস্ট্রির প্রাচুর্যের কারণে, যদিও আমেরিকার ডেট্রয়েটের সে প্রাচুর্য নেই এখন। সাবার্ব চেন্নাই ইন্ডাস্ট্রিতে ঠাসা। সব ধরণের গাড়ী আছে রাস্তায় – মার্সিডিজ বেঞ্জ, ভলভো, ফোর্ড। তবে হাইউন্ডাই বেশি আর ইনোভা - কোলকাতার মত।

৩। সিটি অব ফ্লাইওভার, এখানে ফুটওভার কম। যদিও transport-এ ইলেক্ট্রিক ট্রেইনের কন্ট্রিবিউশন বেশি। ৩ ঘণ্টা ঘুরলে ফ্লাইওভারের সংখ্যা আন্দাজ করা যায়। মেট্রোরেল expand করছে।

৪। ইন্ডিয়ার হেলথ ক্যাপিটাল – (আমরা বুঝি!) গোটা ইন্ডিয়ায় যারা বহির্বিশ্ব থেকে স্বাস্থ্য সেবার জন্য আসে তাদের ৪৫% আসে চেন্নাই, আগের নাম ছিল মাদ্রাজ। ফোরটিস, এপোলোর রমরমা ব্যাবসা। মারালা হাসপাতাল বিখ্যাত। ড্রাইভার বলতে পেরে খুশী হলো যে ওয়াসীম আকরাম এপোলোতে আসে চিকিৎসার জন্য। সরকারি মাল্টিডিসিপ্লিনারী স্পেশালিস্ট হাসপাতাল দেখার মত। পাশেই আছে রাজিব গান্ধী জেনারেল হাসপাতাল, আছে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ।

আমারও main আকর্ষণ ছিল মোহন ডায়াবেটিস সেন্টার আর শংকর নেত্রালয় দেখা। ভেলর (আরেকটা শহর) খৃস্টান মেডিকেল কলেজ দেখার ইচ্ছে থ াকলেও দূরত্বের কারণে প্ল্যান বাতিল করলাম।

শহরে ঢুকেই সদ্য প্রয়াত জয়ললিতার অসংখ্য ছবি চোখে পড়বে। MGR নামটা কান ঝাঁঝিয়ে দেবে। মুখ্য মন্ত্রী জয়ললিতা এদের আম্মা আর উনার predicessor MG Ramachandan Peoples king এদের জনক। দুজনাই ফিল্মের জগতে বিখ্যাত এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। দুজনেই মেরিনা বিচে পাশাপাশি আছেন মেমোরিয়ালে।

মেরিনা বীচ বড়, ভীড় আছে। কিন্তু কক্সবাজারের তুলনায় কিছু না। সায়মনের মত বীচে ঢুকে বিল্ডিং নেই। উঁচ watch/torch টাওয়ার আছে, দর্শনার্থীর জন্য, ছবি তোলার জন্য। বীচে পাড় ঘেঁষে সেক্রেটারিয়েট, ইউনিভার্সিটি কলেজসহ সারি সারি অনেক প্রতিষ্ঠান।

শহর ঘুরলে দোকান মার্কেটের অন্ত নেই। আছে সুবৃহৎ মল। হায়দারাবাদীসহ বাহারী নামের বিরিয়ানীর দোকান অনেক।

নালী (nalli) সিল্ক প্রসিদ্ধ; শাড়ীর দোকান যে এতবড়, না দেখলে বোঝা মুস্কিল। দৃষ্টিনন্দন পোর্ট, পোর্ট অথোরিটি; রেল, রেল স্টেশন টুরিস্টের টানে। রিক্সা, ভ্যান নই। স্কুটি অনেক। লুঙ্গী পরে শাড়ী পরে দেদারসে চালাচ্ছে।

ট্রাফিক সিগন্যাল আছে পুলিশ নেই। চেন্নাই এক্সপ্রেস – লুঙ্গী ড্যান্সের লুঙ্গী পরা লোক রাস্তায় খুব একটা নেই, মায়ানমারের মত।

টেম্পল অনেক, ভীড়! গীর্জাও কম নয়। আর্চবিশপের আবাসের এলাকা দেখলে প্রতিপত্তি বোঝা যায়। মসজিদও দেখলাম। (hindu 82.6%, muslim 9.8%, christian 7.6) হিন্দী বলতে চায় না/পারে না। বিরক্ত হয় (কোলকাতার বিপরীত) শিক্ষিতের হার ৯২%, কেরালা ৯৮%।

সেমিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গান-ড্যান্স মনে থাকবে অনেকদিন। শিল্পীদের ঠাঁটবাট নেই। খামছা (আরবী খামছা অর্থ পাঁচ) নাচ, পাঁচ স্টেটের পঞ্চ ব্যঞ্জনায় প্রদর্শন করলো, উত্তর প্রদেশের কত্থক দিয়ে শুরু করে।

তামিল শুনলাম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে পুরানো সভ্যতা।

ডা. বিত্রব্য

বছর সত্তরের ভদ্রলোকটি আমার মতোই কোলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, তার উপর জহরকোট চাপানো, কম্বলটাকে পায়ের উপর জড়িয়ে বাবু হয়ে বসে এক মনে মোবাইলে টাইপ করে চলেছেন ... মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হাসছেন। বেশ কয়েকবার আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন, আবার মোবাইলে মনোনিবেশ করলেন। কেন জানিনা সেদিন 2nd AC ওই কামরাটি বেশ ফাঁকাই ছিল, ঠাণ্ডাটা একটু বেশিই লাগছিলো। রাত তখন এগারোটা হবে বাকিরা সবাই মোটামুটি ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছে বা দেবে

দেবে করছে। ভদ্রলোকটি চোখ থেকে হাই পাওয়ারের চশমাটা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি ঠাণ্ডা লাগছে my son ...? ভদ্রলোকটিকে দেখে আমার শিক্ষক বা প্রফেসর মনে হচ্ছিল ... বেশ একটা পারসোনালিটি তার সারা শরীরের ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছিল, তার উপর ওনার মুখে my son কথাটি শুনে আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম, বললাম তা একটু লাগছে। ভদ্রলোকটি বললেন এক্ষুনি লাস্ট কফিওয়ালা উঠবে একটু কফি খেয়ে নাও, দেখবে ভালো লাগবে। ঠিক তাই। দুজনেই কফি নিয়ে বসলাম, একে একে ধেয়ে এলো অতি পরিচিত কিছু প্রশ্ন – কোথায় থাকো? কি করা হয়? সন্তান কটি? তারা কিসে পড়ে? কথ ায় কথায় ভদ্রলোকটি বললেন উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বাংলার প্রফেসর ছিলেন। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ তারপর ভদ্রলোকটি শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগছে জীবনের স্বাদ? বাড়িতে সময় দেওয়া হয়? আমি কি বলবো তা ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না। ভদ্রলোকটি আমাকে একটু আশ্বস্ত করে বললেন আমি জানতে চাইছি জীবনটাকে মিষ্টি লাগছে না তেতো? আমি হাসতে হাসতে বললাম টক-ঝাল-মিষ্টি ... সকালে নয়টায় অফিস, তারপর ফিরতে ফিরতে সেই রাত আটটা। বাকি সময়টুকু হয় আমার সাথে বউয়ের ঝামেলা নয়তো মেয়ের সাথে মেয়ের-মায়ের ... সকালে ঘুম থেকে দেরি করে কেন ওঠা থেকে শুরু, homework কেন হয়নি? খাবার কেন থালায় পড়ে? স্কুলের ব্যাগ কেন গোছাও নি? খাটের চাদর কেন লণ্ডভণ্ড? বইগুলো ঠিক জায়গায় নেই কেন? পা না ধুয়ে কেন খাটে উঠেছ? কত TV দেখবে? একটা না একটা বিষয় নিয়ে লেগেই আছে, মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে মেজাজ যায় হারিয়ে ...

ভদ্রলোকটি ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কম্বলটি বুকের উপর তুলে বলল, এটাই তো জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় ... এটাকে অবহেলা করো না। টক-ঝাল-মিষ্টির এই অতুলনীয় স্বাদটাকে কব্জি ডুবিয়ে চেটেপুটে খাও একেবারে হাতের নখ থেকে কনুই পর্যন্ত। একটা সময় আসবে যখন ঘরে ঢুকে দেখবে চারিদিক নিঃশব্দ, বিছানার চাদরটা টান টান করে পাতা, মা-মেয়ের প্রতিদিনের খণ্ডযুদ্ধ কোনো এক অলৌকিক ইশারায় চিরতরে অবসান ঘটেছে, মনে হবে চাদরটা দু হাত দিয়ে আবার লণ্ডভণ্ড করে অপূর্ণ যুদ্ধের দামামা বাজাই ... বইয়ের তাকটা পরিপাটি করে সাজানো হালকা সাদা ধূলোর আস্তরণ বইগুলোতে লেপ্টে আছে ... মনে হবে সব বইগুলো পরিষ্কার টেবিলটার উপর আছড়ে ফেলে অসমাপ্ত অঙ্ক গুলোকে ছোটো ছোটো হাত দুটো ধরে আর একবার কষাই ... সব কিছু ঠিকঠাক কিন্তু চারিদিক মরুভূমির নিঃসঙ্গতা, সন্তানের পরিচিত গন্ধকে একটিবার পাওয়ার আশায় এঘর ওঘর শুধু ঘুরপাক খাওয়া, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পেছনে নড়বে না কোনো আদুরে হাতের টাটা, TVটা আপন মনেই চলতে থাকে কেউ কেড়ে নেয় না অযথা বাহানায়, খাবার টেবিলেই শুকোতে থাকে এটো হাত কেউ ছোবল দেয়

না আর ডিমের কুসুমে, মোবাইলের ওপারে আদুরে আওয়াজ প্রতিদিন থেকে প্রতি সপ্তাহে, প্রতি সপ্তাহ থেকে প্রতি মাসে গিয়ে ঠেকবে, দুদিনের জন্য আসবে যাবার সময় ব্যাগের ভিতর নিয়ে যাবে হাঁটি-হাঁটি পা-পা থেকে একটু একটু করে গড়ে তোলা সব স্বপ্ন ... দৃষ্টি শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পাবে, বাড়বে শুধু ওষুধের সংখ্যা, অনিদ্রায় চোখ দুটো হয়ে উঠবে আরো নিশাচর ... ভদ্রলোকটি প্রতিটি কথা ট্রেনের বিকট আওয়াজ পেরিয়ে বুকের ভিতর যেন তীরের মতো বিঁধছিল, আমি বললাম, তাহলে বাঁচার উপায়? ভদ্রলোকটি একটু ধরা গলায় বললেন, শীতের ঝরা পাতার মতো যদি ঝরে পড় তবে কেউ ফিরেও তাকাবে না ... উপরে সবুজ পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অচিরে বিলীন হবে মাটির বুকে ... সবুজ পাতার মতো ফুটে উঠতে হবে ওই জীর্ণ বট বৃক্ষে। পুরোনো বন্ধুদের সান্নিধ্যের আগুনে মনটাকে সেঁকতে হবে, ঠিক যেমন কনকনে শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে একটুকরো আগুনকে ঘিরেধরে একটু ভালোলাগার উষ্ণতা সারা শরীরে মাখতে ইচ্ছা করে ... একমাত্র বন্ধুই পারে তোমার ক্ষয়ে যাওয়া জীবনে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা প্রলেপ লাগাতে, তাইতো আমি সময় অসময় চোখ রাখি ওই মোবাইলের ছোটো জানালায় ... তাতে ভেসে ওঠা পুরোনো বন্ধুর এক একটা শব্দ সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসা এক একটি সূর্যরশ্মি। সযত্নে আগলে রেখো পুরোনো বন্ধুত্বকে। আজকের প্রতিদিনের কর্মযুদ্ধে হারিয়ে ফেলো না তাদের বন্ধুত্বের হাতছানি। আমি আজ যাচ্ছি আমাদের বন্ধুদের মিলন সমারোহে তিন মাস অন্তর অন্তর আমরা মিট করি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। গান, বাজনা, হাসির কোলাহলে ডুবে থাকি দুদিন ... খুঁজে পাই বেঁচে থাকার অক্সিজেন ...

পরদিন ভোর বেলায় যখন ভুবনেশ্বর স্টেশনে নামলাম দেখলাম গোটা পনেরো যুবক সত্তর বছরের ভদ্রলোকটিকে ঘিরে ধরেছে ... হাসতে হাসতে তারা এগিয়ে চলেছে নতুন ভুবন গড়তে। আমাকে দেখে ভদ্রলোকটি হাত নেড়ে বললো look my son এরাই আমার এক একটি সবুজ পাতা ... জানি না ২০ বছর পর আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে ?

জানি না মোবাইলে টাইপ করার শক্তি হাতে মজুত থাকবে কি না? হয়তো ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি আবছা হয়ে আসবে ... গ্রুপের গানের আসর হয়তো তখনো একই রকম ভাবে জমে উঠবে কিন্তু হঠাৎ করেই বেঈমান হয়ে উঠবে আমার শ্রবণ শক্তি, আস্তে আস্তে শিথিল হবে আমার স্মৃতিশক্তির বাঁধন ... তবু থেমে যেন না যায় বন্ধুত্ব...

নেপথ্যে দায়ী কে? ওয়ারশ নেই, ন্যাটো কেন?

১। এই যুদ্ধ অনায়াসে এড়ানো যেতো, যদি মার্কিন প্রশাসন/ন্যাটো ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়ার স্বাভাবিক নিরাপত্তা – উদ্বেগকে মেনে নিত। ন্যাটো ইউক্রেনকে তার সদস্য করতে চাইছে, যার অর্থ রুশ সীমান্তে থাকবে মার্কিন/ন্যাটোর বাহিনী, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র!

২। বর্ষশেষের সাংবাদিক বৈঠকেও পুতিন সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিলেন: আমরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই, পূর্ব দিকে ন্যাটোর আর কোনো অগ্রগতি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আর এতে কি কোনো অস্পষ্টতা রয়েছে? আমরা কী মার্কিন সীমান্তের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করতে গিয়েছি? না, আমরা তো যাইনি। বরং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আমাদের ঘরে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দোরগোড়ায়।

আমাদের ঘরের কাছে কোনো আঘাত করার ব্যবস্থা রাখা যাবে না, এই দাবি করা কী তাহলে ভুল হবে, খুব অস্বাভাবিক হবে।

৩। দায়ী তাহলে কে?

৪। সোভিয়েত পতনের এক বছর আগে, তৎকালীন মার্কিন বিদেশসচিব জেমস বেকার রাশিয়ার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ন্যাটো পূর্বদিকে এক ইঞ্চিও এগোবে না, যদি মস্কো দুই জার্মানির মিলনে সম্মতি দেয়। পূর্বদিকে এক ইঞ্চিও নয়। অর্থ: পূর্ব বার্লিনের পূর্বে এক ইঞ্চিও এগোবে না ন্যাটো।

৫। গর্বাচেভ সেই চুক্তিতে সহমত হয়েছিলেন। কিন্তু, ওয়াশিংটন তার কথা রাখেনি।

৬। সেদিন সবাই আশা করেছিলেন এবারে ন্যাটোকে গুটিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, যে উদ্দেশ্যে ন্যাটো তৈরি করা হয়েছিল, সেই সোভিয়েত ইউনিয়নই আর নেই। তাছাড়া, ন্যাটোর মোকাবিলার লক্ষ্যে যে ওয়ারশ চুক্তি হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিপর্যয়ের পর তারই যখন অবসান হয়েছে, তখন ন্যাটোর প্রাসঙ্গিকতা আর কোথায়? ধাপে ধাপে নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি কমানোর চুক্তিও সই হয়ে গিয়েছে। সেকারণে স্বাভাবিক ভাবনা ছিল ন্যাটোর আর কোনো প্রয়োজন নেই।

৭। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর পেরিয়ে গিয়েছে তিন দশক। ন্যাটোকে কেন সম্প্রসারিত করা হচ্ছে? ভেঙে দেওয়ার পরিবর্তে কেন সে নিজেকে সম্প্রসারিত করে চলেছে? ওয়ারশ নেই, তবে ন্যাটো কেন? আজ সোভিয়েত নেই, তাহলে শত্রু কে?

৮। লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়ার মতো বাল্টিক রাষ্ট্রসহ পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেক সাধারণতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, স্লোভানিয়া, রোমানিয়ার মতো পূর্ব ইউরোপের সাবেক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলোর অধিকাংশই এখন ন্যাটোর শৃঙ্খলে। যুগোস্লাভিয়ার উপর বর্বর বোমাবর্ষণসহ ন্যাটো একাধিক যুদ্ধ চালিয়েছে বলকান অঞ্চলে। আর এখন রাশিয়া সীমান্তে ইউক্রেন, জর্জিয়াকে তাদের সদস্য করতে চাইছে।

৯। ১৯৯০ থেকে ন্যাটো আজ বেড়ে হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। সদস্য সংখ্যা ষোল থেকে বেড়ে এখন ৩০। পূর্ব ইউরোপ, বলকান ছাড়িয়ে এমনকি সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে আফ্রিকায় এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায়। আফগানিস্তানে ন্যাটোর বর্বরতাকে দেখেছে গোটা দুনিয়া। নামে নর্থ অটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন। কোথায় উত্তর অতলান্তিক, আর কোথায় কাবুল!

১০। কেন লাগাতার যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়ে গেল ওয়াশিংটন, লন্ডন? যেমন প্রচার তোলা হয়েছিল ১৯৯৯-তে সাবেক যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে, ২০০১ সালে আফগানিস্তান, ২০০৩ সালে ইরাক এবং ২০১১ তে লিবিয়া এবং সিরিয়ার বিরুদ্ধে।

১১। শান্তিপূর্ণ পথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ডনবাস সমস্যার সমাধান হওয়া উচিৎ বলে দাবি জানিয়েছিলেন ইউক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পেত্রো সিমোনেঙ্কো। প্রশ্ন তুলেছিলেন, গত সাতবছর ধরে নিরাপত্তা পরিষদ কেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতিকে একবারের জন্যও আমন্ত্রণ জানাল না, যাতে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তির জন্য তিনি কী করেছেন, তা নিয়ে রিপোর্ট করতে পারেন? কেন একের পর এক সমরাস্ত্র বোঝাই মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান কিয়েভে (ইউক্রেনের রাজধানী) নামছে? ওরা কী আদৌ শান্তি চায়? মোটেই চায় না। আসলে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পোল্যান্ডের মধ্যে সম্প্রতি হয়েছে একটি ত্রিপাক্ষিক সামরিক জোট, যার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ইউক্রেনের নাৎসি-অলিগার্কের শাসক জামানা। তাঁর বক্তব্য, আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির নির্দেশে নতুন করে ইউরোপের পুনর্বন্টনের লক্ষ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর এই তৎপরতা। আর নেপথ্যে রয়েছে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ এবং ব্রিটিশ সংস্থা এম আই সিক্স। নাহলে কেন ২০০০ সালে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি লন্ডনে এম আই সিক্সের প্রধানের সঙ্গে কথা বলবেন? আর কেনই বা এবছর জানুয়ারিতে কিয়েভে সিআইএ-র প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করবেন?

লিখেছেন কোলকাতা থেকে
Santanu Dey

মহানবী (সাঃ)

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) ১৫০০ বছর আগে বলে যাওয়া, যে বাণীটির সত্য প্রমাণ খুঁজে পেল বিজ্ঞান -

জান্নাতের আটটি দরজার প্রত্যেকটিতে দুটি করে পাল্লা রয়েছে। নবী করিম (সা.) দুই পাল্লার মধ্যবর্তী জায়গা কতটা প্রশস্ত সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।

হাদিসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ মুসলিম শরিফের এক হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, জান্নাতের দরজার দুই পাল্লার মাঝখানের প্রশস্ততা মক্কা শরিফ থেকে বাহরাইনের হাজার অথবা মক্কা শরিফ থেকে সিরিয়ার বুশরার দূরত্বের সমান।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে মহানবী (সা.) এ বাণী দিয়েছেন। নবী যদি বলতেন, জান্নাতের দরজার দুই পাল্লার মধ্যবর্তী দূরত্ব মক্কা শরিফ থেকে হাজার পর্যন্ত। তাহলে এ নিয়ে এ মুহূর্তে হয়তো আলোচনা হতো না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, অথবা জান্নাতের দুই দরজার মধ্যবর্তী দূরত্ব মক্কা শরিফ থেকে বুশরার দূরত্বের সমান।

মহানবীর এ কথায় স্পষ্ট যে, মক্কা থেকে হাজার বা মক্কা থেকে বুশরার দূরত্ব সমান। সে সময় অক্ষরজ্ঞানহীন একজন মানুষের পক্ষে এতটা সুক্ষ্মভাবে বলাটা অসম্ভব, যদি না তাকে আল্লাহ ওহী মারফত জানিয়ে থাকেন।

সম্প্রতি স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে পাওয়া ছবিতেও দেখা গেছে মক্কা থেকে বুশরা এবং মক্কা থেকে হাজার একই দূরত্বে অবস্থিত।

রোববার ইসলাম প্র্যাকটিস নামে একটি ফেসবুক পেজ তাদের এক পোস্টে বিষয়টি তুলে ধরেছে। সেখানে স্যাটেলাইটে পাওয়া ছবিটি পোস্ট করা হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মক্কা থেকে সিরিয়ার বুশরার দূরত্ব এক হাজার ২০০ কিলোমিটার। অন্যদিকে মক্কা শরিফ থেকে বাহরাইনের হাজারের দূরত্বও এক হাজার ২০০ কিলোমিটার।

বাস্তবতা

ভারতের অপর নাম ইংরেজিতে #INDIA কেন..?

১. আমেরিকাকে ইংরেজিতে America বলে।
২. জাপানকেও ইংরেজিতে Japanই বলে।
৩. ভুটানকেও ইংরেজিতে Bhutanই বলে।
৪. শ্রীলংকাকেও ইংরেজিতে Sri Lankaই বলে।
৫. বাংলাদেশকেও ইংরেজিতে Bangladeshই বলে।
৬. নেপালকেও ইংরেজিতে Nepalই বলে।

শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী দেশ

7. পাকিস্তানকেও ইংরেজিতে Pakistan বলে।

তবে একমাত্র ভারতকেই ইংরেজিতে India বলা হয় কেন?
Oxford Dictionary এর ভাষ্যানুযায়ী.....
INDIA এর মিনিং নিম্নরূপ দেওয়া হলঃ
I, ইসলাম।
N, নে।
D, দি।
I, ইস মূলক কো।
A, আজাদী।
অর্থাৎ 'ইসলাম নে দি ইস মুলক কো আজাদী'
(ইসলামই এই দেশকে স্বাধীনতা দিয়েছে।)
এই হলো India- এর মিনিং।
ইতিহাস সাক্ষী মুসলমানরাই ইন্ডিয়া স্বাধীন করেছে। হিন্দুরা তো ইংরেজদের গোয়েন্দাগিরী এবং চামচামি করেই সময় পার করেছে।

ইউক্রেন

ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ইউক্রেন।

ইউক্রেনকে আমরা কতটুকু চিনি, এদেশ সম্পর্কে কতটুকু জানি? আমরা জানিই না, আমরা কী বিশাল তথ্য সম্বন্ধে কতটাই না অজ্ঞ!

আরসেনালনা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতর মেট্রো স্টেশন। যেখানে প্রতিদিন লাখো মানুষ জড়ো হয়।

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে অবস্থিত ম্যাকডোনাল্ড দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত রেস্টুরেন্টগুলোর একটি। এর বাইরে মাত্র গুটিকয়েক রেস্টুরেন্ট আছে; যেখানে এত মানুষ প্রতিদিন খেতে আসে।

দুনিয়ার সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষদের অন্যতম দেশ কোনটি জানেন? হুম, ইউক্রেন।

ইউক্রেন আগাগোড়া এক কৃষি প্রধান দেশ। দুনিয়ার শস্যভাণ্ডারের অন্যতম যোগানদাতা হল ইউক্রেন। ইউরোপের সবচেয়ে বেশি আবাদযোগ্য জমিও কিন্তু এই ইউক্রেনেই।

পৃথিবীর মহা গুরুত্বপূর্ণ মোট কালো মাটির ২৫ভাগ পাওয়া যায় এই অদ্ভুত সুন্দর দেশটায়; যা গোটা ইউরোপের হিসেবে তৃতীয়।

সূর্যমুখী ও সেই থেকে উৎপাদিত তেল – উভয়ই রপ্তানিতে দুনিয়ার শীর্ষ দেশটার নাম হলো ইউক্রেন।

ভুট্টা দুনিয়াব্যাপী মহা গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। উৎপাদনের দিক থেকে তৃতীয় আর রপ্তানির দিক থেকে চতুর্থ দেশটার নাম ইউক্রেন।

এই দেশটা আলু উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। জব উৎপাদনে সারা দুনিয়াব্যাপী পঞ্চম।

মধু উৎপাদনেও দুনিয়ায় পঞ্চম স্থানে থাকা দেশের নাম ইউক্রেন। ২০২১ সালে এই দেশ একা ৩১.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন গম উৎপাদন করেছে।
একইভাবে রপ্তানিতেও এই দেশ উপরের দিকে। বিশ্বে অষ্টম।
মুরগীর ডিম উৎপাদনে সারা দুনিয়ায় নবম।
পনির রপ্তানিতে সারা দুনিয়ায় ১৬ তম স্থান ইউক্রেনের।

দুনিয়ার ৬০ কোটি মানুষের খাবারের সংস্থান একা ইউক্রেন করতে পারে। তার মানে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ছাড়া বাকি সব দেশকে খাওয়াতে পারে ইউক্রেন। অথবা দারিদ্র্য পীড়িত অর্ধেক আফ্রিকাকে একা খাওয়াতে পারে ইউক্রেন। সেই ইউক্রেনে হামলার কি পরিণতি হবে ভাবতে পারি আমরা?

খাদ্যের দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

শিল্পায়নেও ইউক্রেন কৃষির মতোই প্রাগ্রসর এক দেশ।

স্টিল উৎপাদনে দুনিয়ায় দশম স্থান ইউক্রেনের। বছরে উৎপাদন করে সাড়ে ৩২ মিলিয়ন টন।

নিরাপত্তা সরঞ্জাম উৎপাদনে সারা দুনিয়ায় ইউক্রেনের স্থান নবম। খনিজ রপ্তানিতে দুনিয়ায় অষ্টম।

লোহাজাতীয় দ্রব্যাদি রপ্তানিতে সারা দুনিয়ায় চতুর্থ স্থান ইউক্রেনের। পলি রপ্তানিতে চতুর্থ।

রকেট লঞ্চার উৎপাদনে এই দেশটা সারা দুনিয়ায় চতুর্থ।

পরমাণু শক্তি উৎপাদন বিষয়ক স্থাপনা ও সরঞ্জাম বানানোর ক্ষেত্রে এই দেশের নাম চার নম্বরে আসে।

রড রপ্তানিতে সারা দুনিয়ায় তৃতীয়। গত ৫ বছরে প্রায় ১০০ ভাগ বেড়েছে রডের দাম। এবার কোথায় যাবে রডের দাম?

অপরদিকে রেল নেটওয়ার্ক স্থাপনে ইউরোপ ও বিশ্বে ইউক্রেন তৃতীয়। এই তালিকা আরও অনেক অনেক দীর্ঘ।

সেই দেশটা যখন আগ্রাসনে আটকে গেল, সেই ইউক্রেনকে যখন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করলো এই পরিবর্তিত পৃথিবী, তখন এই প্রভাব যে কতোটা সুদূরপ্রসারী হবে; তা সহজে অনুমেয়।

এই অদ্ভুত সুন্দর দেশটা ভাল থাকুক ...

Courtesy: Shah Parvez Aslam.

মূল- @Md Altab Hossain

নারী মহীয়সী

নোবেল জয়ী ব্রিটিশ সাহিত্যিক উইলিয়াম গোল্ডিং একবার বলেছিলেন যে, মেয়েরা বোকা দেখেই তাঁরা পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে। কারণ মেয়েরা জানে না তাঁরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর।

মেয়েদের আপনি যাই দেন না কেন, সে সেটাকে আরও উচ্চতর কিছু বানিয়ে দিবে।

আপনি মেয়েদের শুক্রাণু দিবেন সে আপনাকে সন্তান দিবে। আপনি তাকে একটা ঘর দিবেন সে সেটাকে বাড়ি বানিয়ে ফেলবে।

আপনি তাকে বাজার দিবেন সে আপনাকে রান্না করে খাবার বানিয়ে দিবে। আপনি তাকে হাসি দিবেন সে আপনাকে হৃদয় দিয়ে দিবে।

আপনি যাই দিবেন সে তাই কয়েকগুণ মহৎ করে ফেরৎ দিবে। আপনি যদি তাকে যন্ত্রণা দেন তবে রেডি থাকুন, সে আপনার জীবন জাহান্নাম বানিয়ে দিবে।

নারী মানে কন্যা, মেয়ে, মা জাতি, শান্তির গৌরব।

দুঃখী কবিগুরু

দুঃখ কাকে বলে এর প্রায় সবই কবিগুরু পেয়েছিলেন এক জীবনে। স্ত্রী মারা গেলেন কবির ৪১ বছর বয়সে। কবির ছিলো তিন মেয়ে, দুই ছেলে।

রথীন্দ্রনাথ, শমীন্দ্রনাথ আর বেলা, রাণী ও অতশী।

স্ত্রী'র পর অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন রাণী। এরপর কলেরায় মারা গেলো ছোট ছেলে শমী। পুত্রশোকে কবি লেখলেন

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।

কবির মনে হলো এই জোৎস্নায় কবি বনে গেলে হবে না। বরং তাঁকে জেগে থাকতে হবে, যদি বাবার কথা মনে পড়ে শমীর! যদি এসে কবিকে না পায়? তিনি লেখলেন –

আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে

যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।

রাণীর জামাইকে পাঠিয়েছিলেন কবি বিলেতে ডাক্তারী পড়তে, না পড়েই ফেরৎ আসলো। বড় মেয়ের জামাইকে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে, ব্যারিস্টারী পড়তে, না পড়েই ফেরৎ আসলো। ছোট মেয়ে অতশীর জামাইকেও আমেরিকায় কৃষিবিদ্যার উপর পড়াশোনা করতে পাঠালেন। লোভী এই লোক কবিকে বারবার টাকা চেয়ে চিঠি দিতো। কবি লেখলেন –

- জমিদারী থেকে যে টাকা পাই, সবটাই তোমাকে পাঠাই।

দেশে ফেরার কিছুদিন পর ছোট মেয়েটাও মারা গেলো।

সবচাইতে কষ্টের মৃত্যু হয় বড় মেয়ের। বড় জামাই বিলেত থেকে ফেরার পর ছোট জামাইর সাথে ঝগড়া লেগে কবির বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। মেয়ে বেলা হয়ে পড়েন অসুস্থ। অসুস্থ এই মেয়েকে দেখতে কবিগুরু প্রতিদিন গাড়ী করে মেয়ের বাড়ী যেতেন। কবিকে যত রকম অপমান করার এই জামাই করতেন। কবির সামনে টেবিলে পা তুলে সিগারেট খেতেন। তবু কবি প্রতিদিনই যেতেন মেয়েকে দেখতে। একদিন কবি যাচ্ছেন, মাঝপথেই শুনলেন বেলা মারা গেছে। কবি শেষ দেখা দেখতে আর গেলেন না। মাঝপথ থেকেই ফেরৎ চলে আসলেন। হৈমন্তীর গল্প যেন কবির মেয়েরই গল্প!

শোক কতটা গভীর হলে কবির কলম দিয়ে বের হলো -

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।

তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥

কবির মৃত্যু হলো অতিমাত্রায় কষ্ট সহ্য করে, প্রস্রাবের প্রদাহে। কি কারণে যেন কবির বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেষ বিদায়টাও পাননি। দূর সম্পর্কের এক নাতনি ছিলো কবির শেষ বিদায়ের ক্ষণে।

কবি জমিদার ছিলেন এইসব গল্প সবাই জানে। কবির দুঃখের এই জীবনের কথা ক'জন জানেন?

প্রথম যৌবনে যে গান লেখলেন, এইটাই যেন কবির শেষ জীবনে সত্যি হয়ে গেলো-

আমিই শুধু রইনু বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে,
রইল যা তা কেবল ফাঁকি ॥

শতায়ুর ছুঁ মন্ত্র

আমি তাকে বয়স জিজ্ঞেস করলাম!

সে বলল ৯৫ এবং আরও বল্লেন তার মা ১০৫ বেঁচে ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সুস্বাস্থ্যের রহস্য কী?

তিনি বললেন, অসুস্থ হবেন না! আমি বললাম, এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।

তিনি হেসে বললেন, আছে। আমি বললাম, আমাকে গোপন কথা বলুন, আমি তা অনুসরণ করব।

তিনি বললেন, বিসমিল্লাহ না বলে কিছু খাবেন না, এমনকি এক ফোঁটা পানি বা সামান্য টুকরোও, আমি চুপ ছিলাম।

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা কোন কারণ ছাড়াই কিছু সৃষ্টি করেন নি, তার সকল সৃষ্টির মাহাত্ম্য আছে।

বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলে আল্লাহতায়ালা খাওয়া থেকে সমস্ত ক্ষতিকর জিনিস তুলে নেন। খাওয়ার আগে সব সময় বিসমিল্লাহ বলুন এবং আপনার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন।

যখন আপনি খাওয়া শেষ করবেন, আপনার হাত তুলুন এবং আল্লাহ তায়ালাকে ধন্যবাদ জানান। আপনি কখনই অসুস্থ হবেন না।

তার কথা বলার পর আমার চোখ অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল। আমি যেতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সে আমার হাত ধরে বলল: শোন, খাবারের শেষ কথা।

আমি আবার বসলাম। তিনি বলেছিলেন যে, আপনি যদি কারো সাথে এক সাথে খান, আপনার মুখে কখনই খাবার আগে তুলবেন না, যতই ক্ষুধা লাগুক না কেন, অন্য ব্যক্তিকে খাবার নিতে দিন বা অন্য ব্যক্তিকে আগে দিন। ঐ ব্যক্তিকে খাওয়া শুরু করতে দিন, তারপর আপনি করুন।

আমি কারণ জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলেছিলেন – 'এটা আপনার জন্য খাদ্যের সদকা উপরন্তু আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর খুশি হবেন যে আপনি তার সৃষ্টির যত্ন নেন। সদা মনে রাখবেন খাদ্য আপনার শরীরের জন্য এবং বিসমিল্লাহ আপনার আত্মার জন্য।

এখন বলুন আপনি কিভাবে অসুস্থ হতে পারেন?

আমি যেতে যেতে ভাবছিলাম, আমাদের দ্বীন যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বলে তা আমরা পাত্তা দেই না এবং আমাদের সন্তানদেরও সেগুলো শেখাই না!!

'আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার অসুস্থতা থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের তার আনুগত্যশীল বান্দা বানান'।

মনই বড়

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বিল গেটস।

এই বিল গেটসকে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে ধনী আর কি কেউ আছে?

বিল গেটস বলেছিলেন, 'হ্যাঁ এমন একজন আছেন যিনি আমার চেয়েও ধনী'। এরপরে তিনি একটি গল্পের কথা বর্ণনা করলেন।
এটা এমন এক সময় ছিল যখন আমি ধনী কিংবা বিখ্যাত ছিলাম না।

একদিন আমি নিউইয়র্কের বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। তখন আমি একজন সংবাদপত্র বিক্রেতাকে দেখেছিলাম। আমি তার থেকে একটি সংবাদপত্র কিনতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার কাছে ভাংতি পয়সা অথবা খুচরা পয়সা ছিল না। তাই আমি কেনার ধারণাটি ছেড়ে সেটা বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাকে আমার কাছে যথেষ্ট অর্থ না থাকার কথা বলেছিলাম। সে বিক্রেতা আমাকে বলেছিলেন 'এটা আমি আপনাকে ফ্রী তে দিচ্ছি।' তার অনুরোধে আমি পত্রিকাটি নিয়েছিলাম।

কাকতালীয়ভাবে, দুই থেকে তিন মাস পরে আমি একই বিমানবন্দরে আবার অবতরণ করেছিলাম এবং সেদিনও পত্রিকা কেনার জন্য আমার কাছে ভাংতি ছিল না। বিক্রেতা আবার পত্রিকাটি আমাকে ফ্রী তে অফার করেছিলেন। আমি সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমি এটি নিতে পারবো না। কারণ আজও আমার কাছে যথেষ্ট অর্থ নেই। তিনি বলেছিলেন, 'আপনি পত্রিকাটি নিতে পারেন, আমি এটা আমার লাভ থেকে ভাগ করে দিচ্ছি। এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না।' আমি পত্রিকাটি নিয়েছিলাম।

১৯ বছর পরে আমি বিখ্যাত এবং মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠি। হঠাৎ করে মনে পড়লো সেই বিক্রেতার কথা। আমি তার সন্ধান শুরু করি এবং প্রায় দেড় মাস অনুসন্ধানের পরে আমি তাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?' তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ আপনি বিল গেটস'। আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মনে আছে আপনি আমাকে বিনামূল্যে একটি পত্রিকা দিয়েছিলেন? বিক্রেতা বললেন, 'হ্যাঁ মনে আছে'। 'আপনাকে দুই বার আমি পত্রিকা দিয়েছিলাম।'

আমি বলেছিলাম সে সময় আপনি আমাকে যে সাহায্যটা করেছিলেন তা আমি আজ ফিরিয়ে দিতে চাই। আপনি আপনার জীবনে কি চান বলুন, আমি সেটা পূরণ করবো বিক্রেতা বললেন 'স্যার, আপনি কি করে মনে করেন যে এটা করে আপনি আমার সাহায্যের সাথে মেলাতে পারবেন?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন?

তিনি বলেছিলেন 'আমি যখন দরিদ্র সংবাদপত্রের বিক্রেতা ছিলাম, তখন আপনাকে সাহায্য করেছিলাম আর আপনি আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন তখনই যখন আপনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। তাহলে কীভাবে আপনার সাহায্য আমার সাহায্যের সাথে মিলে?'

বিল গেটস বলেছিলেন, 'আমি সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম যে সংবাদপত্রের বিক্রেতা আমার চেয়ে বেশি ধনী ছিলেন। কারণ তিনি কাউকে সাহায্য করার জন্য ধনী হওয়ার অপেক্ষা করেননি।'

আমাদের বুঝতে হবে, সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি হলো তারা যাদের প্রচুর অর্থের চেয়েও ধনী একটি মন আছে।

দামী একটি মন থাকা, প্রচুর অর্থের চেয়েও প্রয়োজনীয়।

ভারতের যেসব বিখ্যাত ব্যক্তি বাংলাদেশের সন্তান

Bimala বাংলা মিডিয়া

বাংলাদেশের অনেক সন্তান, কারো জন্ম কিংবা পৈতৃক সূত্রে এই বাংলার রক্ত তাঁর শরীরে বয়ে চলছে।

বিশ্বের নানান দেশে এমন বিখ্যাত মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিশেষ করে ভারতে রয়েছে সবচেয়ে বেশি। তার রাজনৈতিক অনেক কারণও রয়েছে। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে শোবিজ অঙ্গনের তারকার সংখ্যাই বেশি। এমন কয়েকজন তারকার খোঁজ দেওয়া হলো:

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (সঙ্গীতজ্ঞ) – প্রথম যে বাঙালি সত্যিকার অর্থে ভারতবর্ষ জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। তিনি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

সত্যজিত রায় (চিত্র পরিচালক) – বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক। তার পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে।

কিশোর কুমার (গায়ক) – ১৯২৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারে তাঁর জন্ম। বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা অশোক কুমার ছিলেন কিশোর কুমারের বড়ভাই।

মিঠুন চক্রবর্তী (অভিনেতা) – মিস্টার ডিস্কো ড্যান্সার খ্যাত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুন চক্রবর্তী বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। অরিয়েন্টাল সেমিনারীতে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তিনি বরিশাল জিলা স্কুলেও পড়েছিলেন।

ঋত্বিক ঘটক (চিত্র পরিচালক) – ঢাকা শহরের ঋষিকেশ দাস লেনে তাঁর জন্ম। ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের পরে তাঁর পরিবার কোলকাতায় চলে যায়।

সুচিত্রা সেন – কিংবদন্তি ভারতীয় বাঙালি অভিনেত্রী। ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল পাবনা জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম ছিল রমা দাশগুপ্ত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (কবি এবং ঔপন্যাসিক) – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম মাদারিপুর জেলায়, কালকিনি থানার মাইজপারা গ্রামে।

অসিত সেন (চিত্র পরিচালক) – তিনি বহু বিখ্যাত বাংলা ও হিন্দী সিনেমা নির্মাণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন।

মিতালী মুখার্জি – জন্ম ময়মনসিংহ শহরের নতুন বাজারে। সেখানেই কেটেছে শৈশব। ভারতে পড়তে গিয়ে বিয়ে হয় পাঞ্জাবি ছেলের সঙ্গে। বিয়ের পর ঠিকানা হয় শ্বশুরবাড়ি।

গীতা দত্ত – ১৯৩০ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুরের এক জমিদার পরিবারে গীতা দত্তের জন্ম হয়। জন্মকালে তাঁর নাম ছিল গীতা ঘোষ রায়। বিখ্যাত অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক গুরু দত্তের সঙ্গে বিয়ের পর তিনি গীতা দত্ত হিসেবে পরিচিত হন।

তরুণ মজুমদার (চিত্র পরিচালক) – বাংলাদেশের বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এই বিখ্যাত চিত্র পরিচালক।

মৃণাল সেন (চিত্র পরিচালক) – ১৯২৩ সালের ১৪ মে মৃণাল সেন বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পড়াশোনার জন্য কোলকাতায় গেলে সেখানেই নাম ডাক করেন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় – বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে তার জন্ম। এই শহরে তাঁর জন্ম ও বেড়ে উঠার কিছুটা সময় পার হলেও পৈতৃক ভিটা ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে।

এস ডি বর্মন (গায়ক ও সুরকার) – উপ-মহাদেশের কিংবদন্তি গায়ক ও সুরকার শচীন দেববর্মণ ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর কুমিল্লার চর্থায় এক বিশাল রাজপ্রাসাদসম অট্টালিকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চর্থার বাসভবনেই শচীন বাবু তাঁর জীবনের প্রথম ১৯টি বছর অতিবাহিত করেন।

চিত্রনায়িকা সুস্মিতা সেন – বরিশালে তাঁর পৈতৃক নিবাস।

জয়া বচ্চন (অভিনেত্রী) – পৈতৃক আদি নিবাস নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলায়। ১৯৪৭-৪৮ সালের দেশ বিভাগের পূর্বে তাঁর বাবা তরুণ কুমার ভাদুরী কোলকাতায় চলে যান।

দেবব্রত বিশ্বাস (১৯১১-১৯৮০) গায়ক – ১৯১১ সালে ২০ আগস্ট কিশোরগঞ্জে তাঁর জন্ম।

সাগর সেন – (গায়ক) ১৯৩২ সালের ১৫ মে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বড় হয়েছেন কোলকাতায়।

উৎপল দত্ত (অভিনেতা) – ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এ অভিনেতা। হীরক রাজার দেশের রাজা, জয়বাবা ফেলুনাথ এর মগনলাল মেঘরাজ, আগন্তুক এর মনোমোহন মিত্র, পদ্মা নদীর মাঝির হোসেন মিয়া, অমানুষ এর মহিম ঘোষাল, দো আনজানেদর চিত্র পরিচালক, জনঅরণ্যের বিশুদা এমনি কত চরিত্রেই না অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি।

পি.সি. সরকার (জাদুশিল্পী) – টাঙ্গাইল জেলার অশোকপুর গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে টাঙ্গাইলের সাদাত কলেজ থেকে গণিতে অনার্স সহ বিএ পাশ করেন।

ভানু ব্যানার্জি (কমেডিয়ান) – ভানু জন্মেছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে ১৯২০ সালের ২৬শে আগস্ট। ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিস হাই স্কুল এবং জগন্নাথ কলেজে শিক্ষা শেষ করে ১৯৪১ সালে কোলকাতায় পাড়ি জমান। তিনি এমনই কমেডিয়ান ছিলেন যখন মারা যান তখন তাঁর মৃতদেহ দেখেও নাকি লোকে হেসে ফেলছিলেন!

হিরালাল সেন – ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বাংলা চলচ্চিত্রকার হিরালাল সেনের জন্ম মানিকগঞ্জের বগজুরী গ্রামে ১৮৬৬ সালে, এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে।

সাবিত্রী চ্যাটার্জী – উত্তম কুমারের সাথে জুটি বেঁধে কাজ করেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করা গুণী এই অভিনেত্রী।

শ্রেয়া ঘোষাল – বিক্রমপুরের হাসাড়া গ্রামে তাঁর দাদার বাড়ি। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের আগেই তার দাদা কোলকাতা চলে যান। সেখানেই তাঁর বাবা জন্মগ্রহণ করেন।

জ্যোতিবসু – পশ্চিম বাংলার দীর্ঘতম সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর আদি পুরুষের বাড়ী বারাদী গ্রাম, সোনার গাঁ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলা, ঢাকা বিভাগ।

শ্রাবন্তী – দাদু ও বাবার বাড়ি বরিশালে। সে হিসেবে তিনি বরিশালেরই মেয়ে। নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন।

নচিকেতা – বরিশালের ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলার উত্তর চেঁচরী গ্রামে রয়েছে তার বাপের ভিটা। কিছুদিন আগে সেখানে গিয়ে অঝোরে কেঁদেছেনও।

এছাড়া বলিউডের জনপ্রিয় মিউজিশিয়ান প্রীতম চক্রবর্তী, বাপ্পি লাহিড়ী, হারাধন বন্দোপাধ্যায়েরও আদি নিবাস নাকি বাংলাদেশে। বাংলাদেশের গর্ব করার মতো আরেক ব্যক্তি হচ্ছেন নাফিজ বিন জাফর। হলিউডের ব্যস্ত এই অ্যানিমেটর অস্কার জয় করেছেন।

Senior Citizens - 2022

When you get old, never teach anyone anything, unless requested, even if you are sure you are right.

Do not try to help unless asked for. Just be ready & available for it if possible.

Do not give unsolicited opinion all the time.

Do not expect everyone to follow your opinion, even though you feel your opinion was the best...

Don't impose yourself on anyone on any subject.

Don't try to protect your loved ones from all the misfortunes of the World. Just love them & pray for them.

Don't complain about your health, your neighbours, your retirement, your woes all the time.

Don't expect gratitude from children.

There are no ungrateful children, there are only stupid parents, who expect gratitude from their children.

Don't waste your last money on anti-age treatments. It's useless. Better spend it on a trip. It's always worth it.

Take care of your spouse, even if he/she becomes a wrinkled, helpless and moody old person. Don't forget he/she was once young, good looking and cheerful, may be he/she is the only one who really needs you right now.

Understand new technologies, obsessively follow the News, constantly study something new, a new skill, a new dish, a new indoor game, do not fall behind in time.

Don't blame yourself for whatever happened to your life or to your children's lives, you did everything you could.

Preserve your dignity & integrity in any situation, till the end.

Collected

বীরের জাতি বাঙালি - ডক্টর পাপার বাংলা অভিযান

ডক্টর পাপা, এই প্রচণ্ড কোভিডের সময় তুমি বোস্টন থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছো কি শুধু ঢাকা মেডিকেল কলেজে লেকচার দেয়ার জন্যে?

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির প্রাঙ্গণে ঢুকতে যেয়ে প্রশ্নটি করেছিলাম হার্ভার্ডের সাইকিয়াট্রির অধ্যাপক জর্জ পাপাকোস্টাস এম.ডি কে। কিছুক্ষণ আগে তাকে নিয়ে এখানে এসেছি তাঁর বিশেষ অনুরোধে।

আসার আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক টিটো মিয়া আর পেডিয়াট্রিক সার্জারীর অধ্যাপক টাবলু আব্দুল হানিফ Tablu Abdul Hanif আমাদেরকে বরণ করেছিলেন শেখ মুজিব শতবার্ষিকী ও ঢাকা মেডিকেলের উত্তরীয় প্রদান করে সাথে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে।

সেখানে আরেক আমেরিকান এমেরিটাস অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন আহমেদ এম.ডি ও বীরপ্রতীক কর্নেল সালামও সম্মাননা পেয়েছিলেন সেদিন।

মেডিকেল কলেজ বন্ধ তাও অনেক সাইকিয়াট্রির ডাক্তাররা এসেছিলেন। লেকচারের পর জুনিয়র ডাক্তারদের প্রশ্নের ধরণ ও জ্ঞানের গভীরতা দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছি। জর্জ পাপাকোস্টাসের ২৩৬ টি বিষয় নিয়ে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে গবেষণা থাকলেও ঢাকা মেডিকেলে তিনি উপস্থাপন করেছেন – চিকিৎসা সম্ভব নয় এমন মানসিক অবসাদগ্রস্ত কেসে কেটামিন দিয়ে নিরাময় ব্যবস্থা।

পাপা আমার প্রশ্নের জবাবে বললো, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হার্ভার্ডের চোখে একটি অত্যন্ত সম্মানীয় ইনস্টিটিউট। আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিলো সেই ইনস্টিটিউট দেখবো ও ছাত্রদের সাথে জ্ঞান বিনিময় করবো। তাদের মেধা ও অভিজ্ঞতা দেখে আমি অভিভূত। হাসপাতালে সে প্রায় দুঘন্টা ঘুরেছে, ডক্টর্স ক্যান্টিনে সিঙ্গারা-চা আড্ডাও মেরেছে জুনিয়রদের সাথে।

দ্বিতীয় কারণ ছিলো বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত বিভিন্ন মসজিদ দেখা। লালমনিরহাটের পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার পতিত জঙ্গলে ৬৯ হিজরীতে নির্মিত 'সাহাবায়ে কেরাম মসজিদ' খুঁজে পাওয়া গেছে ১৯৮৭ সনে। এটির একটি শিলালিপিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে – "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ", হিজরি সন ৬৯, লিপিটি রংপুরের তাজহাট জাদুঘরে আছে। তার মানে প্রায় ৬৮৯ খৃস্টাব্দের দিকে নির্মিত মসজিদটি দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো মসজিদ, এটি দেখতে আমি মূলতঃ তোমাদের দেশে এসেছি।

মাছি ঢুকে যাওয়ার মতো আমার হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে জর্জ বললো, সেই সময় একটি পুরোপুরি ধর্মপরায়ণ হিন্দু সমাজের পূর্বাঞ্চলের মানুষদের ব্যাপক সংখ্যায় ধর্ম পরিবর্তন করা তৎকালীন নব্য মুসলমানদের স্থাপত্য স্টাডি করে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বুঝতে চাচ্ছি, এটি আমার একটি গবেষণা – হার্ভার্ডের তত্ত্বাবধানে, এটি নিয়ে স্টাডি বের হলে তোমাকে জানাবো।

বললাম, ইন্টারেস্টিং! আরো কিছু কি বলা যায় আমাকে?

ডাক্তার পাপা বললো, তুমি তো জানো, ১০০০ শতক থেকে তোমাদের দেশে বাইরের সুফিদের আগমন হলে তোমরা মুসলিম হতে শুরু করো আর তখন পূর্ববাংলায় মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। আমি লক্ষ করেছি তোমাদের সেই সময়ের ও ষোড়শ

শতকের মসজিদগুলোর স্থাপত্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিলো। অনেক মসজিদের অলংকরণে পদ্মপাতা বা লোটাস আর্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ষাটগম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, আদম শহীদ মসজিদ, গোয়ালদী মসজিদ, বাংলাদেশের পাঁচ টাকার নোটে মুদ্রিত কুসুম্বা মসজিদ, শাহ জালাল মসজিদসহ আরো অনেক জায়গায় আমি এবার গিয়েছি গবেষণার উপাদানের জন্য। তোমাদের দেশে আদি ইসলাম প্রচার নিয়ে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা আছে যা আমাকে বিমোহিত করেছে, আদিম মসজিদগুলোর স্থাপত্যে তুমি সেই সময়কার মানুষের আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বের তথ্য ও ব্যাখ্যা পাবে।

আমার ভাবনামূলক মুখের দিকে তাকিয়ে পাপা বললো, তৃতীয় কারণটি জটিল। তুমি হয়তো আমার নামে বুঝতে পেরেছো আমি গ্রীক-আমেরিকান।

তাই আমার রুটস আমার প্রিয় বিষয়। তুমি এটিও নিশ্চই জানো, বাংলার সামরিক শক্তির পরিধিতে ভীত হয়ে ম্যাসিডোনিয়ান বীর আলেকজান্ডার খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারত থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। আমি তখনকার সেই সাহসী ও প্রতিরোধী বাংলাজাতির উত্তরসূরিদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে এসেছি।

বললাম, তাই নাকি! আলেকজান্ডারকে চ্যালেঞ্জ করা বাংলার কথা আমি প্রথম শুনলাম। আমি তো জানতাম, সিন্ধু নদীতে সকালে জোয়ার বিকালে ভাটা দেখে আলেকজান্ডার তাঁর এক সেনাপতি সেলুকাসকে বলেছিলেন, নদীর উল্টাপাল্টা গতি দেখে মনে হচ্ছে, এই বিচিত্র দেশের মানুষের মন সকাল-বিকাল বদল হয়, এখানে থাকা ঠিক না, বলে তিনি কেটে পড়েছিলেন।

জর্জ হেসে দিয়ে বললো, না এরকম কোন ঘটনাই নেই। রোমান কবি ভার্জিলের জর্জিক্স গ্রন্থে এবং পেরিপাস নামের একটি তথ্য বইতে গঙ্গা নদীর তীরে গঙ্গারিডাই বা ‘গঙ্গা অঞ্চলের মানুষ’ নামে একটি রাজ্যের কথা উল্লেখ করা আছে। রোমান ভূগোলবিদ টলেমি গঙ্গারিডাই শহর ও তাদের রাজাকে নিয়ে আরো লিখেছেন। এইসব ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গারিডাই বা গান্ডারিডাই এবং প্রসিওইয়ের শাসকরা ৮০ হাজার ঘোড়া, দুই লাখ স্থানীয় পদাতিক সৈন্য, ৮,০০০ যুদ্ধ রথ এবং ৬,০০০ হাতি নিয়ে আলেকজান্ডারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আলেকজান্ডার যখন (নদী) বিয়াসে পৌঁছে গঙ্গা উপত্যকা পার হবেন তখন গোয়েন্দারা গঙ্গারিডাই এবং প্রসিওয়ের রাজা বা রাজাদের এই শক্তিশালী সেনাবাহিনীর আক্কেল গুড়ুম করা তথ্য দেয়। আমাদের মেসিডোনিয়ান রাজা আর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত প্রবীণ সেনারা তখন সামনে না এগিয়ে ব্যাবিলনে ফিরে যেতে মনস্থ করে। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের অগ্রগতির উপযুক্ত জবাব দিতে প্রস্তুত ছিল যে অকুতোভয় বাংলার মানুষ, তাদেরকে দেখতে এসেছি।

পাপা বলে যাচ্ছিলো, তোমরাই ব্রিটিশদের ভারতে ঢুকিয়েছো নিজেদের নবাবের সাথে অসহযোগিতা করে, আবার তোমরাই ভাগিয়েছো সেই ব্রিটিশ রাজকে। এই সেদিন আরেক দখলকারী পাকিস্তানকে হটিয়েছো মাত্র নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে- আমেরিকার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে! অবিশ্বাস্য!

তোমাদের রাস্তা ঘাটে জটিল যানজটের ভিড় ঠেলে, তীব্র পলিউশনের মাঝে তোমাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার জীবনযুদ্ধকে আমি স্যালুট জানাই, আমি রাস্তায় হেঁটে হেঁটে দেখেছি তোমাদের সংগ্রামী সাধারণ মানুষদের মুখ, তাঁদের মনস্তত্ত্ব অনুভব করার চেষ্টা করেছি, বুঝেছি, এখনো সবার মস্তিষ্কে কি যেন এক ধরণের অব্যক্ত সংগ্রাম চলছে তোমাদের!

মনে মনে বললাম, রোগটি ঠিকই ধরেছে এই মনস্তত্ত্ববিদ, কিন্তু ধরতে পারেনি আমাদের মস্তিষ্কের সংগ্রাম সর্বস্তরে ঘুষ, দুর্নীতি, সামাজিক বৈষম্য এবং সর্বপ্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এটিও ধরতে পারেনি যে এই সংগ্রামে নয় মাস কেন, নব্বই বছরেও আমরা জিততে পারবো না, কারণ আমাদের সবার মনস্তত্ত্ব বিগড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সবাই নিজ নিজ মতের পথে চলতে গিয়ে, অন্ধ হয়ে, নষ্ট হয়ে, পথহারা হয়ে গেছে। তাই কোন পরিবর্তনেই জাতি ভেতরে বদলায় না, দেশের বহিরাবরণ বদলায় শুধু।

কিন্তু মুখে বললাম, ও মাই গড, তুমি তাহলে এতসব কারণের জন্যে আমাদের দেশ দেখতে এসেছো! কোভিড শেষ হওয়া পর্যন্তও অপেক্ষা করতে চাওনি!

– হ্যাঁ, আর তর সইছিলো না। আরেকটি কারণের জন্যে তোমাকে অনুরোধ করেছি আমাকে এই টিএসসি প্রাঙ্গণে নিয়ে আসতে। ওই যে মাঠের কোণায় প্রাচীন গ্রীক মন্দিরের মতো ছোট হলুদ কাঠামোটি দেখছো এটি ১৯০০ সনের দিকে নির্মিত হয়েছিল গ্রীক সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমির উপর। গ্রীসের বাইরে এই ধরণের কাঠামো একমাত্র একটিই আছে বলে মনে করা হয়।

ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রায় দুই শত গ্রীক সবার শেষে বাংলায় এসে পাট ও লবণের ব্যবসা করত। তাদের ব্যবসা ধ্বসে পড়লে অনেকে মারা যায়, তাদেরকে প্রথম গোর দেয়া হয় মিটফোর্ড হাসপাতাল বা সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল জমিতে। গ্রীকরা কবর দেয়ার বছর দুয়েক পরে তাদের দেহাবশেষটি তুলে খুব ছোট বক্সে আবার ঢোকায়। এটি করার সময় লন্ডনভিত্তিক গ্রীক কোম্পানী রালি ব্রাদার্স গ্রীক বণিকদের স্মরণে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করে রমনায় এবং বণিকদের মিনি কফিনগুলিতে রাখা দেহাবশেষ এইখানে এত ছোট জায়গায় সমাধিস্থ করা হয়।

আমি বললাম, বলো কি! ছোটবেলা আমরা র‍্যালি ব্রাদার্সের ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যেতাম হেঁটে, ওদের একটা জুট মিল ছিলো মনে হয় খুলনায়।

জর্জ বললো, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। চলো, ভেতরে ঢুকে দেখি।

দেয়ালের কালো পাথরে খোদাই করা নয়টি শিলালিপি আছে যেখানে মৃতদের নাম ও কাহিনী লেখা আছে। একটিতে তিন ভাইয়ের নাম আছে, যাঁদের মধ্যে একজন জন ডেমেট্রিয়াস এলিয়াস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৫ মাইল দূরে মিরপুরের জঙ্গলে বাঘ শিকার করার সময় একটি বাঘের আক্রমণে নিহত হন।

আমাকে তরজমা করে জর্জ বললো, কি ভয়ানক বাংলাদেশ, আমার ট্রাভেল এজেন্ট গতকালই মিরপুরে টেস্টি 'শওকতের কাবাব' স্ট্রিটফুড খাইয়েছে। ওখানে মানুষখেকো বাঘ ছিলো, তাদের একটি আবার আমার গ্রীক দাদু ভাইকেই খেয়ে ফেলেছে জানলে ওখানে যেতাম না!

আমি বললাম, বাংলার বাঘকে মারতে যাবার কি দরকার ছিলো তোমাদের গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড পাপার? তাঁর দোষটা দেখছো না!

মুখ গম্ভীর করে গলা ভারী বানিয়ে বললাম, জর্জ, সিরিয়াসলি, এখনো মিরপুরে বাঘ আছে!

জর্জ অবাক হয়ে বললো, বলো কি এতো মানুষের মধ্যে বাঘ থাকে কোথায়?

বললাম – মিরপুরের চিড়িয়াখানায়!

দুজনের হাতে হাই ফাইভ লাগানো অট্টহাসি শুনে চিক চিক সচকিত শব্দে উড়ে গেল এক ঝাঁক টিএসসির পাখি।

একটি গ্রীক শিলালিপিতে লেখা রয়েছেঃ "ধন্য তারা যাদেরকে আপনি (ঈশ্বর) বেছে নিয়েছেন এবং আপনার সাথে নিয়ে গেছেন।"

বললাম, কি আশ্চর্য এ দেখি আমাদের 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।' আরেকটিতে ইংরেজি শব্দে উর্দু উচ্চারণ লেখা কবিতায় এপিটাফ-

দুনিয়া কে জো মজা হ্যায় – পৃথিবীতে যে মজা আছে,

হারিজ কম না হোঙ্গে – তা কখনো কম হবে না।

চর্চা এহা রহেগা- এই উপভোগ চলতে থাকবে,

আফসোস হ্যায় হাম না হোঙ্গে – আফসোস আমি এখানে থাকবো না।

আমার অনুবাদ শুনে জর্জ পাপাকোস্টাস বললো, আফসোস, আমি কাল চলে যাবো সৌদি আরবে রিজাল আলমা ও নাজরান। বিশ্বাসী খৃস্টানদের পুড়িয়ে মারার সেই জায়গা দেখবো। বাংলাদেশকে মিস করবো।

বুঝলাম, সে যাচ্ছে কুরআনের সূরা বুরুজের ৪ থেকে ৮ আয়াত পর্যন্ত আসহাবুল উখদুদের কাহিনীর জায়গা দেখতে, বাইবেলেও এর উল্লেখ আছে।

আমি বললাম, আফসোস, এত বছর হয়ে গেলো, টিএসসিতে কতো কতবার এসেছি, একবারও ভাবিনি এই ছোট্ট স্থাপনার পেছনে এতবড় ইতিহাস ও রহস্য লুকিয়ে আছে।

শ্রদ্ধেয় আরিফ ভাই।

হেরে গিয়ে জেতা

সামারসেট মম-এর প্রথম গল্প "রেন"-এর কথাটা আমাদের সকলের জানা আছে। এই রেন অন্তত দশটা পত্রিকা থেকে ছাপার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে ফেরৎ এসেছিল। পরে এই রেনস্থ গল্প সামারসেট মমকে বিশ্ববিখ্যাত করেছিল। হামসুনের 'হাঙ্গার' উপন্যাসটি কেউই ছাপতে চায়নি। যার কাছে গেছেন সেই 'ধুর মশাই এটা লেখাই হয়নি' বলে ফেরৎ দিয়েছে। আমরা সবাই জানি যে, পরে এই হাঙ্গার উপন্যাসের জন্য নোবেল পেয়েছিলেন হামসুন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত মোনালিসা ছবিটি প্রথমে বাজে ও ফালতু বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই ছবিটির জন্য তিনি প্রথমে কোনোই পয়সা পাননি। ১৫০৩ থেকে ১৫০৭ সালের কোনো এক সময় ভিঞ্চি, ফ্রান্সেসকো দেল গিওকোন্ডা নামের এক কর্মচারীর পত্নীর ছবি আঁকেন। পত্নীর নাম মোনালিসা। মোনালিসা ঘেবার ভিনি। ছবি আঁকা শেষ হয় এক সময়। কিন্তু সেই ছবি দেখে গিওকোন্ডা ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। ভিঞ্চিকে পারে তো মারে – সেই অবস্থা। অবশেষে বাথরুমে টাঙানোর জন্য ছবিটি কেনেন সম্ভবত দয়াপরবশ হয়ে। এরকম হাজারো গল্প আছে হেরে যাবার পর যারা বিজয়ের মালাটি ... ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন।

শীত কাহাকে বলে (কানাডা)

ঘর, গাড়ী +২২ বা ২৩ ডিগ্রীতে set করা। ভিতরে সবাই পাতলা একটা কাপড় পরে থাকে। আমি ওদের অনুকরণ করতে চাইলাম। মোটা গেঞ্জিতে হলো না, ওপরে উলের শার্ট চাপালাম, হয়না। মিলিয়ে দেখলাম দেশে আমাদের বাসায় রুম টেম্পারেচার ২৬, ২৭, ২৮। এ কাপড়ে হবার কথা নয়। ৪র্থ দিনে উলের কোট চাপিয়েছি।

লন্ডনের ভাইয়ের দেয়া marks n spensor এর দুই পার্টের জ্যাকেট দিয়ে বোস্টনে ভাল কাটিয়েছি। ওখানে ছিল প্রথম দিন +৯, তারপর প্রতিদিনই মাইনাস তবে এক দুই, ম্যাক্সিমাম মাইনাস সিক্স। সেমিনার রুমে স্যুট সোয়েটারে কূলায় নাই, জ্যাকেট চড়াতে হয়েছে। মন্ট্রিল প্লেন থেকে দেখা গেল ন্যুড গাছ, বাড়ী, গাড়ীর ছাদ বরফে ঢাকা। লেক, নদী, নয়নজুলি সর্বত্র বরফ। গাড়ী চলার জন্য রাস্তা পরিস্কার রাখা হয়েছে। গাড়ী চলছে গরমের দিনের মত, লোকও হাঁটে তবে অনেক কম। ভাবা যায় মাইনাস ১৬ থেকে মাইনাস ত্রিশ। মাইনাস চল্লিশ

হলে সতর্ক করে দেয়, বাইরে পাঁচ মিনিটের বেশি কোথায়ও দাঁড়াতে না করে। উইনিপেগ এয়ারপোর্টে নামলাম মাফলার দিয়ে মাথা কান পেঁচিয়ে হুডিওয়ালা জ্যাকেট চাপিয়ে হাতমোজা পরে। ছেলে বলল ওটায় হবেনা, নেক কভার লাগবে কান ঢাকতে হবে। বিকেলে আমেরিকার ভাই (cross border) over coat আনলো। সন্ধ্যায় ভাইয়ের wife হুডিওয়াল ডাবল লেয়ার্ড জ্যাকেট দিল। ছোটভাই বলল সুপার মার্কেট গিয়ে চলেন নেক কভার কিনি। তৃতীয় ভাই সহ গেলাম। দুইজনার দু রকম পছন্দ। দুটোই নিলাম। গরম মোজাও একটা কেনা হলো। প্রথম দিন যেটা পরলাম, দ্বিতীয় দিন সেটা বদললাম। এভাবে চতুর্থ দিনে fixed হলাম। মাথায় নাক কভার সংযুক্ত হেড কভার, তার উপর নেক কভার সবার উপরে হুডি। গায়ে মোটা সাদা হাফ গেঞ্জির উপরে শার্ট তার উপরে হাফ গরম জ্যাকেট তার উপর ফুল জ্যাকেট হুডি সহ। সব কিছুর উপরে উলেন ওভার কোট। পরনে ইনার তার উপর প্যান্টের উপর প্যান্ট (double pant), পায়ে ডাবল মোজার উপরে জুতা। সৌদী আরবে পানি পানের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলে রোগীদের বলতাম যতক্ষণ না প্রস্রাব সাদা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত। এখন ভাবছি গরম না লাগা পর্যন্ত কাপড় চাপাতে হবে। সব চাপিয়ে বাইরে গেলে খারাপ লাগে না কিন্তু এখানে শীতই শুধু সহ্য করা কঠিন, বাকি সব গ্রীষ্মের মত। In fact, জীবনযাত্রা নির্বিঘ্নে চলছে পুরাদমে। সবচেয়ে মজা হলো সূর্য; brightest এই sun আমাদের ওখানে নাই; তবে sun deceiving পরিষ্কার আকাশ দেখে বাইরে গেলে ধরা খেতে হবে। ঠাণ্ডায় শেষ হতে হবে preparation না থাকলে। টেলিভিশনে অহরহ forecast জানাচ্ছে। ১৬ ডিগ্রী বলে বলছে feeling like ২৫ ইত্যাদি; বলছে পর পর তিনদিনের আভাষ। ঘন্টা প্রতি তাপমাত্রা, হিউমিডিটি ইত্যাদি; বলছে ফোরকাষ্ট রাখুন finguretip এ।

Morning shows the day – not always

স্কুল পালাতো রবীন্দ্রনাথ। নজরুল তো বেশি পড়তেই পারলেন নাই। লালন বুঝলোই না স্কুল কি জিনিস। অথচ আজ মানুষ তাঁদেরকে নিয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করছে।

অ্যান্ড্রু কার্নেগীকে তো ময়লা পোশাকের জন্য পার্কেই ঢুকতে দেয়নি। ৩০ বছর পরে উনি সেই পার্কটি কিনে ফেলেন আর সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেন – "সবার জন্য উন্মুক্ত"।

স্টিভ জবস শুধু মাত্র ১ দিন ভাল খাবারের আশায় ৭ মাইল দূরে পায়ে হেঁটে মন্দিরে যেতেন।

ভারতের সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকর নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন বলে স্কুলের বারান্দায় বসে বসে ক্লাস করতেন। তাঁকে ক্লাসের বেঞ্চে বসতে দেয়া হতো না, কোন গাড়ি তাঁকে নিতো না। মাইলের পর মাইল হেঁটে পরীক্ষা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান এর ক্যাডেট কলেজে ভর্তির টাকা হাটুরেদের নিকট থেকে টাকা তুলে যোগাড় করেছিলেন তার চাচারা। গরু না থাকায় তিনি নিজে জমিতে লাঙ্গল টেনেছেন একসময়।

সুন্দর চেহারার কথা ভাবছেন? শেখ সাদী এর চেহারা যথেষ্ট কদাকার ছিল, লতা মঙ্গেস্কারের চেহারা মোটেই সুশ্রী নয়। তৈমুর লং খোঁড়া ছিলেন, নেপোলিয়ন বেঁটে ছিলেন। শচীন টেন্ডুলকারের উচ্চতা তো জানাই আছে। আব্রাহাম লিঙ্কনের মুখ ও হাত যথেষ্ট বড় ছিল।

স্মৃতিশক্তির কথা ভাবছেন? আইনস্টাইন নিজের বাড়ীর ঠিকানা ও ফোন নাম্বার মনে রাখতে পারতেন না।

কিছুই আপনার উন্নতির পিছনে বাধা হতে পারে না। যদি কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে তা আপনার ভিতরের ভয়। ভয়কে দূরে রেখে জয় করা শিখুন। সাফল্য আসবেই আজ অথবা কাল!

মানবতা

দেখে দেখে শিখো মানবতা কোথায় ?

ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়কে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট উপাধি দিয়েছিল, রাহুল দ্রাবিড় সেটা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

শুধু ফিরিয়ে দিয়েছেন তা নয়, তার সাথে চমৎকার একটি বক্তব্য দিয়েছেন, তিনি বলেছেন – আমার স্ত্রী ডাক্তার, সে এই ডাক্তার ডিগ্রীর উপাধি পেতে অসংখ্য বিনিদ্র রজনী ও দিবস কাটিয়েছে। আমার মা স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক, তিনি এই ডিগ্রীর জন্য দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করেছেন, অধ্যবসায় করেছেন। ক্রিকেট খেলতে অনেক পরিশ্রম করেছি ঠিক, কিন্তু সেই পরিমাণ পড়াশুনা আমি করিনি, কাজেই এই ডিগ্রী আমি নেই কীভাবে?

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতার ফলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ৩০ লাখ এবং কোচিং স্টাফদের ২০ লাখ রুপি করে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে। প্রধান কোচ দ্রাবিড় হওয়ায় দ্রাবিড়কে ৫০ লাখ রুপি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। বিষয়টি দ্রাবিড়ের কাছে বৈষম্যের মনে হয়। তার মতে, দলকে জেতাতে দলের অন্যান্য কোচিং স্টাফরাও সমান ভূমিকা রেখেছে। তবে এই বৈষম্য কেন? পরে তার অনুরোধে দ্রাবিড়সহ দলের অন্যান্য কোচিং স্টাফদের সবাইকে ২৫ লাখ রুপি অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়।

মানুষ তো সবার ঘরে জন্মায়।

ফিলিপ মরিস কোম্পানি (মার্লবোরো সিগারেটের উৎপাদক) প্রতিদিন অনুদান প্রদান করে!!!

প্রতিদিন সকালে, ফিলিপ মরিস সিগারেট কোম্পানি তার লাভের ১২% ইসরায়েলকে প্রদান করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ধূমপায়ীরা ১০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ফিলিপ মরিস সিগারেট গ্রহণ করে। অতএব, মুসলিম বিশ্বের ধূমপায়ীরা প্রতিদিন সকালে ইসরায়েলকে ১২ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে, যা একটি নতুন F-16 যুদ্ধবিমানের দামের সমান, ৫০ মিলিয়ন ডলার। আমরা প্রতি ৪ দিনে একটি যুদ্ধবিমানের দাম দিতে হচ্ছে!! দুর্ভাগ্যবশত, তারা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য অনুদান সংগ্রহ করছে। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, এবং তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। আমরা সেই দুর্বল মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য কিছু সংগ্রহ করছি না। তোমরা তোমাদের অনুদান সংগ্রহ করতে চাও না। কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ইসরায়েলকে অনুদান দেওয়া এবং সমর্থন করা বন্ধ করো।

স্টারবাক্স
ম্যাকডোনাল্ডস
বার্গার কিং
কেনটাকি ফ্রাইড চিকেন
পিৎজা হাট
কোকা কোলা
পেপসি কোলা
ফুড্র্যাকার্স
মরিচ
আসুন, এক মাসের জন্য আমেরিকান এবং ব্রিটিশ পণ্য (শুধুমাত্র) কেনা বন্ধ করি। সকলের কাছে এটি পাঠান যাতে তারা জানতে পারে যে আমেরিকা প্রতিদিন ৬ বিলিয়ন ডলার হারায়, যখন আমরা তাদের পণ্য কিনি না (শুধুমাত্র এক মাস)।

দয়া করে অপেক্ষা করবেন না, আপনার পরিচিত সকলের কাছে এটি পাঠান এর মূল্য এক মাসে ৮ বিলিয়ন x ৩০ = ২৪০ বিলিয়ন!!!

আমি জানি তুমি এটা করতে পারো,
একজন সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে এটা করো, তোমার ভাই, পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবদের বলো এবং এক মাসের জন্য থামো... শুধু এক মাসের জন্য। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ পণ্য কেনা বন্ধ করো মাত্র এক মাসের জন্য। যদি তুমি মুসলিম হও ...

Cricket news #1983WorldCup
#kapildev

একটা সময় ছিল, যখন বিশ্বকাপ মানেই ভারতের কাছে শুধু অংশগ্রহণ। কেউ তাদের গুরুত্ব দিত না। ১৯৮৩ সালে সেই অবহেলিত ভারত দলই পৌঁছে গেল ফাইনালে – প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আগের দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। দানবের মতো এক দল। ভিভ রিচার্ডস, ক্লাইভ লয়েড, মার্শাল, হোল্ডিং – নাম শুনলেই ভয় ধরত।

২৫ জুন, লর্ডস। টস জিতে কপিল দেব ব্যাটিং নেয়। সাহসী সিদ্ধান্ত, কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা – গাভাসকার আউট ২ রানে। এরপর একে একে পড়তে থাকল উইকেট। শ্রীকান্ত বুক ঠুকে ৩৮ রান করলেন, বাকিরা যেন ছায়া। মাত্র ১৮৩ রানে গুটিয়ে গেল ভারত। গ্যালারিতে নীরবতা, টিভির সামনে কোটি মানুষের নিঃশ্বাস বন্ধ। ভারতের ড্রেসিংরুমেও নীরবতা। শুধু একটাই কথা – কপিল দেবের গলা থেকে বেরোল, "লড়াই করব… হারলেও বুক চিতিয়ে হারব।"

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাট করতে নামল। শুরুতেই উইকেট – গ্রিনিজ বোল্ড! হায়েন্স ফেরেন। মাঠে এলেন ভিভ রিচার্ডস – সাদা প্যাড, চোখে আগুন। তিন, চার আর একটা ছক্কায় ভারতীয় শিবিরে আতঙ্ক। মনে হচ্ছিল একাই ম্যাচ শেষ করে দেবেন।

আর ঠিক তখনই ইতিহাস লেখা শুরু হয়। মদন লালের বল – রিচার্ডস হুক করেন – বলটা উড়ল আকাশে। কপিল দৌড়াতে থাকলেন ৪০, ৫০ গজ দুই হাত তুলে বলটা ধরে ফেললেন।

রিচার্ডস আউট!

লর্ডস যেন ফেটে পড়ল! ভারতীয়রা বিশ্বাস করল – এটা সম্ভব!

এরপর শুরু হল ধ্বংস – একে একে লয়েড, গোমস, মার্শাল, হোল্ডিং – সবাই গেলেন ফিরে। অমরনাথ বল করছিলেন প্রাণ ঢেলে – সিন্ধু, রজার বিনি, মদন লাল – সবাই যেন যোদ্ধা।

শেষ উইকেট – হোল্ডিং। অমরনাথ বল করলেন – প্যাডে লাগল – আম্পায়ার হাত তুললেন – আউট!!

ভারত জিতে গেল ৪৩ রানে!

কপিল দেব ট্রফি তুললেন – সেই ট্রফি ছিল না শুধু সোনা-রূপার মিশেল – সেটা ছিল একটা জাতির বিশ্বাস, এক দেশের স্বপ্ন।

ভারতীয় ক্রিকেটের জন্ম সেদিনই –

১৮৩ রানের ছোট ইনিংসে লেখা হয়েছিল এক বিশাল ইতিহাস। সেদিন লর্ডস কেঁপেছিল – ব্যাট-বলের শব্দে না, একটি জাতির আবেগে, সাহসে আর জেদে।

জাপানে – ট্রেনে একদিন

জাপানে আছি প্রায় বছর সাতেক হয়ে গেল। টোকিও থেকে কোয়েটো যাব বলে, ট্রেনে উঠেছি। নাহ, বুলেট ট্রেনে নয়। সাধারণ ট্রেনে। স্পিড মন্দ নয়। বুলেট ট্রেনগুলোর প্রচুর ভাড়া। হাতে সময় আছে। অতিরিক্ত খরচ না করাই ভালো।

জাপানে সাধারণ ট্রেনগুলোতে ভালোই ভিড় হয়। তাও, উইন্ডো সিট পেয়েছি। টোকিওর পরিমিত কোলাহল ছাড়িয়ে ট্রেন ক্রমশ – সবুজের ছোঁয়া পাচ্ছে।

বর্ডার ফিল্মটা – আমার খুব প্রিয়। মোবাইলে দেখছি। প্রায়ই দেখি। দেশ ছেড়ে আসার পর দেশের প্রতি টানটা যেন বড্ড বেড়েছে ! তাছাড়া, কিছু মানুষ নিজেদের পরিবার পরিজনকে পেছনে রেখে দেশের জন্য নিজেদের জীবন দিয়ে দিচ্ছেন – এমন ভাবনা, আমাকে মোহিত করে।

আমার পাশে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। মুখে স্মিত হাসি। মাঝে মাঝে বোধহয় আমার মোবাইল স্ক্রিনের দিকে একঝলক তাকাচ্ছেন। চোখে চোখ পড়াতে, একটু ঝুঁকে বললেন – হ্যালো।

আমিও পাল্টা সৌজন্য দেখিয়ে জানালাম যে আমি শুভ, একজন ভারতীয়। বৃদ্ধ স্তিমিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন – আমি, নিশিজাকি । তুমি কি ওয়ার ফিল্ম পছন্দ করো!

আমি মাথা ঝাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ। আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সৈন্যরা, নিজেদের দেশের জয়গান করতে করতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে, এর থেকে বড় স্যাক্রিফাইস আর কী হতে পারে !

বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে বললেন – তুমি কোনও দিন যুদ্ধ দেখেছো !

আমি দু দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে – না বললাম।

উনি নিজের মাথাটা সামান্য নামিয়ে, মাটির দিকে চেয়ে বললেন – ১৯৪২ সালে, আমার বয়স ছিল মাত্র পনেরো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারা বিশ্বকে নিজেদের পদানত করার জন্য, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য, শাসকের ইচ্ছেতে, আমাদের মরতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সিম্পলি মরতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি জাপানের নৌবাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে, বাড়ি ছাড়ার সময় মা'র সাথে আমার একটা চুক্তি হয়েছিল।

চুক্তি ! মায়ের সাথে ! সত্যিই ! অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

বৃদ্ধ গোল্ডেন ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – মা বলেছিলেন, “ তোমাকে কথা দিতে হবে, তুমি বেঁচে থাকবে আর বাড়ি ফিরবে ..” । পুরো প্যাসিফিক রিজিয়ন জুড়ে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। নৌবাহিনীতে থাকাকালীন একবার ওকিয়ামা-তে (জাপানি দ্বীপপুঞ্জের অংশ) আমাকে একটা সুইসাইড মিশনে যাওয়ার জন্য – বাধ্য করা হয়। মিশন ব্যর্থ হয়। আমরা ধরা পড়ি।

আমি অবাক চোখে সাদা জামার ওপর নীল সোয়েটার পরিহিত বৃদ্ধের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

উনি বলে চললেন, আমাদের সকলকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেছে বেছে গুলি করে মারা হয়েছিল আমার সহকর্মীদের। আমাকে কেন সেদিন মেরে ফেলা হয় নি, আমি জানি না। হয়তো মায়ের সাথে চুক্তি ছিল যে আমাকে বেঁচে থেকে বাড়ি ফিরতে হবে, সেজন্যই হয়তো ...!!!

বৃদ্ধ আসন ছেড়ে উঠে পড়তে উদ্যত হলেন। পরের স্টেশনে নামবেন সম্ভবত। ওঠার সময় , আমার কাঁধে হাত রেখে কানের সামনে মুখটুকু এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন – সিনেমার পর্দায় একজন ডায়িং সোলজারের মুখে কী ডায়লগ বসানো হয় আমি জানি না, কারণ আমি ওয়ার ফিল্ম দেখি না ...তবে, মাই ফেলো ফ্রেন্ড, একটা কথা আমি বলতে পারি যে যুদ্ধে আমি চোখের সামনে, নিজের দেশের বা বিপক্ষের বহু সৈন্যদের, মরতে দেখেছি...

... মারা যাওয়ার আগে বা গুলি খাওয়ার আগে, যারা তোমার মতন বা তোমার থেকেও তরুণ ছিল, তাঁরা তাঁদের মায়ের নাম ধরে চিৎকার করত...

... আর যারা বয়সে অপেক্ষাকৃত বড় ছিলেন, তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাওয়ার আগে নিজেদের সন্তানদের নাম ধরে চিৎকার করতেন... নিজেদের শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে চিৎকার করতেন... স্যরি , মাই ফ্রেন্ড আমি নিজে সৈনিক হিসেবে, এমন কোনও সৈনিককে দেখিনি যিনি মৃত্যুর আগে – নিজের দেশ বা শাসকের নাম ধরে চিৎকার করেছেন ... বিলিভ মি...

আমাকে স্তম্ভিত করে, বৃদ্ধ ক্রমশ ধীর পায়ে, দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বগিটা বোধহয় একটু বেশিই দুলছিল সেদিন।

আমি মোবাইলটা – সুইচ অফ করে দিলাম।

পুনশ্চ : বিরাশি বছরের জাপানি ওয়ার ভেটারেন নোবুও নিশিজাকি , বর্তমানে বিশ্বে বেঁচে থাকা গুটিকয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সেনানীদের মধ্যে একজন।

বাটা কোম্পানির বিনিয়োগ

বাংলাদেশে বাটা কোম্পানির বিনিয়োগ অন্তত ৫-১০ হাজার কোটি টাকা। বাটা সরকারকে রাজস্ব দেয় এক থেকে দেড় হাজার কোটি টাকা। তাছাড়া বাটায় ২ হাজারের অধিক মানুষের কর্মসংস্থান আছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাটা একটি ইউরোপীয় কোম্পানি। (কারো সন্দেহ থাকলে এখনি গুগল করুন)

তাহলে বাটাকে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠান বলে লুটপাট চালাচ্ছে কারা? সারাদেশে ফিলিস্তিনের পক্ষে সমাবেশের নামে শতাধিক দোকানপাট লুটপাট করেছে কথিত তৌহিদি ও ছাত্রজনতা। এদের লাগাম কোথায়? প্রশাসন কি করে? সরকার কি করে?

এই কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ বন্ধ করলে ফিলিস্তিনে শান্তি নেমে আসবে? বাহ!! এটার নামই বোধহয় স্বাধীনতা। যখন ইচ্ছে যাকে ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে মব তৈরি করে লুটপাটের নামই বোধহয় স্বাধীনতা।

এরা আরেকটু সুযোগ পেলে দেশকে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলবে।

এমন প্রেসিডেন্ট দরকার

বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম বুরকিনা ফাসো। পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম প্রধান এই দেশটি একদা ফরাসি উপনিবেশ ছিল। সম্প্রতি দেশটি আলোচনায় এসেছে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ত্রাওরের কিছু কাজ ও সিদ্ধান্তের কারণে।

প্রেসিডেন্ট ত্রাওরে সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তাঁর বয়স মাত্র ৩৭, ক্ষমতা গ্রহণের সময় বয়স ছিল ৩৫ বছর। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে কম বয়সী প্রেসিডেন্ট এবং দ্বিতীয় কনিষ্ঠ সরকার প্রধান। কিছুদিন আগে সৌদি আরব সেদেশে ২০০ মসজিদ তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ত্রাওরে সবিনয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, তাঁর দেশে যথেষ্ট পরিমাণ মসজিদ রয়েছে। তাঁর দেশের প্রয়োজন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের উন্নতি। প্রয়োজন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বিনিয়োগ, যাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তিনি সৌদি আরবকে এসব অগ্রাধিকার খাতে সহায়তা ও বিনিয়োগের অনুরোধ জানান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পেয়েও তিনি যাননি। পরের মাথায় পালক পরাতে গিয়ে রাষ্ট্রের অর্থনাশ করা তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। হোক সে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের রাষ্ট্রপতি।

তিনি ক্ষমতায় এসে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ৫০% বাড়িয়েছেন কিন্তু এমপি, মন্ত্রী ও রাজনীতিকদের বেতন কমিয়েছেন ৩০%। নিজে প্রেসিডেন্টের বেতনভাতা না নিয়ে সেনাবাহিনীতে যে বেতন পেতেন সেটাই নিচ্ছেন। তিনি দেশের কারা আইনে ব্যাপক সংশোধন এনেছেন। কারাবন্দীদের কারাবাসের মেয়াদ কমানোর বিনিময়ে কৃষিখাতে শ্রম দেওয়ার নীতি চালু করেছেন। একমাস কাজের বিনিময়ে তিনমাসের কারাবাস মওকুফের এই সিদ্ধান্ত কৃষিখাতে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তিনি দেশের স্বর্ণ ও ম্যাঙ্গানিজসহ খনিজসম্পদের ওপর পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে দিতে সফল হয়েছেন। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইউএসএআইডি-এর ফান্ডিং বাতিল করলে প্রেসিডেন্ট ত্রাওরে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আমরা মার্কিন সাহায্যের জন্যে

লালায়িত নই। বিদেশি সাহায্য জাতিকে পরনির্ভর করে। মেরুদণ্ড দুর্বল করে। গত তেষট্টি বছর ফ্রান্স আমাদের সাহায্য দিচ্ছে কিন্তু আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি।

ইব্রাহিম ত্রাওরেকে বলা হয় আফ্রিকার দরিদ্রতম প্রেসিডেন্ট। জীবন যাপনে তিনি সাধারণ সৈনিকের মতো। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের কখনো মিডিয়ার স্পটলাইটে দেখা যায়নি। কোনো রাষ্ট্রীয় সফরেও তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যান না। পরিবারের প্রটোকল সুবিধা নিজেই বাতিল করেছেন। কোনো আত্মীয় প্রেসিডেন্টকে ভাঙালে কঠোর শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন। মিডিয়ার প্রাইম টাইমে প্রেসিডেন্টের মুখ দেখা যায় না বললেই চলে।

সংস্কার বাস্তবে করে দেখাতে হয়, কাগুজে রিপোর্ট কিংবা তর্জন-গর্জন দিয়ে কিছু হয় না। প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ত্রাওরে একথাটি প্রমাণ করেছেন।

শেখ হাসিনা যদি ডক্টর ইউনূসকে দোষারোপ করে দূরে সরিয়ে না রাখতেন, পদ্মায় চুবাতে না চাইতেন, যদি কাছে ডেকে বলতেন, ইউনূস ভাই, যা হবার হয়ে গেছে, সব ভুলে যান, আসেন একত্রে মানুষের জন্যে কাজ করি, তাহলে আজকের ইতিহাস আজকের মতো হতোনা।

ভারতের বুদ্ধিমান চাণক্য বিশারদ বিদেশ মন্ত্রকের পণ্ডিতগণ হয়তো নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন অথবা কৌটিল্য বদলেছেন, তাই মোদীজি ডক্টর ইউনূসকে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের ‘এক্সেলেনসি’ সম্মোধন করে ঈদী শুভেচ্ছা জানালেন একটি ঐতিহাসিক চিঠি পাঠিয়ে।

এই চিঠির মাধ্যমে ভারতের মিডিয়ার কিছু মহল থেকে শেখ হাসিনাকে এখনো ‘প্রধানমন্ত্রী’ সম্মোধন করার সময় শেষ হয়ে প্রাক্তন শব্দ যুক্ত হয়ে গেলো।

ডক্টর ইউনূস বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বীকৃতির মুকুট পেয়ে গেলেন মোদীজির তরফ থেকে। ঈদের দিনে বাড়তি একটি আনন্দ যুক্ত হলো।

জয় ইনকিলাব। চিঠির অনুলিপি সূত্রঃ জুলকার্নাইন সায়ের।

টলস্টয় ও তার বই

মৃত্যুকালে টলস্টয়ের বুকপকেটে পাওয়া গিয়েছিল যে বইটি টলস্টয়কে চিনিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। রুশ সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যেও তিনি অনন্য এক নাম। ইতিহাসখ্যাত এই সাহিত্যিক মারা যান এক রেল স্টেশনে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়াকালে তার পরনে ছিল একটি ওভারকোট, যার বুকপকেটে পাওয়া যায় এই বই। বইটি নিয়ে সেসময় সৃষ্টি হয় তীব্র এক বিস্ময়!

"দ্য সেয়িংস অফ মুহাম্মাদ" নামের সেই বইটি এরপর থেকে স্থান পেয়ে যায় ইতিহাসের পাতায়। পাবেই বা না কেন? একজন বিখ্যাত খৃস্টান লেখকের পকেটে পাওয়া গেল রাসূলুল্লাহ-এর হাদীসের গ্রন্থ! তবে আমাদের পাঠকরা আরো অবাক হবেন, যখন জানবেন যে, এই বইয়ের লেখক হচ্ছেন ঢাকায় জন্ম নেওয়া স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন সোহরাওয়ার্দী। লন্ডনে পড়তে গিয়ে এই বইটি তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন। আর সেই বইতেই মজে যান টলস্টয়ের মতো মানুষ।

প্রথম প্রকাশের ১১৫ বছর পর এবার বাংলায় এলো এই বইটি। প্রায় সাড়ে চারশ হাদীসের এই সংকলনটি প্রস্তুত করা হয়েছিল পশ্চিমকে ইসলাম চেনাতে, যার হাদীসগুলো মুগ্ধ করেছিল ইসলাম সম্পর্কে কমজানা মানুষগুলোকে!

দ্য সেয়িংস অফ মুহাম্মাদ (স.)
লেখক : আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ, আল্লামা স্যার আবদুল্লাহ আল-মামুন সোহরাওয়ার্দি
প্রকাশনী : ছায়াবীথি

ক্লিনটন – বারাক ওবামা : দর্শক গ্যালারীতে একসাথে তিন বেকার

এরা তিনজনে মোট "চব্বিশ বছর" আমেরিকা শাসন করেছিল। কিন্তু এদের কেউ টাকা পয়সা চুরি করে নিজেদের নামে সম্পদ করে নাই। তাই এখন বসে বসে সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেকার ভাতা খায় আর ঘোরাঘুরি করে। এই তিনজন ভিন্ন মত ও দলের মানুষ হলেও একটা জায়গায় সবার নীতি এক ছিল – তা হলো "যেকোন পন্থায় আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করা"...। তাই বহির্বিশ্বে অনেকের চোখে ভিলেন হলেও, স্বজাতির চোখে তারা আজও সমাদৃত। সবচেয়ে বড় কথা, এরা কেউ দেশের সম্পদ চুরি করে বিদেশে পাচার করে নাই। বরং যতটা পেরেছে নিজেদের দেশকে দুর্নীতিমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী করার চেষ্টা করেছে। এদের তিন জনই ২বার করে দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

শিমলা চুক্তি বাতিল

কাশ্মীরের জন্য আশাবাদ, বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা পাকিস্তান সম্প্রতি ঐতিহাসিক শিমলা চুক্তি (১৯৭২) বাতিল করেছে। অনেকেই বুঝে না বুঝে হইচই শুরু করেছে, কিন্তু সময় এসেছে সত্যিটা বিশ্লেষণ করার।

১. শিমলা চুক্তি আসলে কী ছিল? ১৯৭১ সালে বাংলাশে স্বাধীনতা অর্জন করে। তখন পাকিস্তানি বাহিনী ভারতীয় সেনা ও বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ থেকে আত্মসমর্পণ করা ৯০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ভারত বন্দি করে রাখে। এই বিপুল সংখ্যক বন্দির বিনিময়ে ভারত ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের সাথে 'শিমলা চুক্তি' করে। এতে ভারত পাকিস্তানকে দয়া করে ক্ষমা করে দেয় এবং বন্দিদের ফেরৎ

পাঠায়। বিনিময়ে পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যু আন্তর্জাতিক ফোরামে না তোলার অঙ্গীকার করে এবং ভারত তা ব্যবহার করে কাশ্মীরকে কার্যত স্থায়ীভাবে দখল করে নেয়। মানে, বাংলাদেশের কাঁধের উপর বন্দুক রেখে কাশ্মীর দখল করে নেয়া হয় পাকিস্তানের কাছ থেকে।

২. বাংলাশের এখানে ভূমিকা কী ছিল? এই চুক্তিতে বাংলাশের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। অথচ পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, আমাদের লাখো মানুষ শহীদ হয়েছিল, মা-বোনদের ইজ্জত হারিয়েছিল, দেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল – তার বিচার না চেয়ে ভারত বরং পাকিস্তানের সাথে "বন্ধুত্ব" চুক্তি করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত কৌশলে ব্যবহার করেছে নিজের আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত স্বার্থে।

৩. চুক্তি বাতিলের তাৎপর্য কী? শিমলা চুক্তি ভাঙার মাধ্যমে পাকিস্তান এখন কাশ্মীর ইস্যুতে নতুন করে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করতে পারবে। কাশ্মীরিদের জন্য এটি ইতিবাচক বার্তা। তবে কেউ কেউ অযথা বাংলাদেশের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ছে, যেন পাকিস্তান আবার আমাদের দাবী করে বসবে! এটি ভিত্তিহীন ভয়। পাকিস্তান কৌশলে ভারতের ওপর চাপ বাড়াতে এমন বার্তা দিতে পারে, তবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য এর কোনো বাস্তব হুমকি নেই।

৪. শিক্ষণীয় দিক শিমলা চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই নিজেদের স্বার্থ দেখেছে, আর সবচেয়ে বড় ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে। আজকের দিনে আমাদের দরকার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া – যেন আর কেউ আমাদের রক্ত, আত্মত্যাগ আর সংগ্রামকে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনীতি চালাতে না পারে।

মানে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার ব্যবসা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে সর্বপ্রথম ব্যবসা শুরু করেছিল ভারত। আর আমারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিক্রি করে পাকিস্তানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর। কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর এই নির্মম নির্যাতন-নিপীড়ন সবগুলো বৈধতা শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কাশ্মীরের বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হয় পাকিস্তানের কাছে।

শিমলা চুক্তির বাতিল আমাদের জন্য হুমকি না, বরং আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় – কিভাবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে স্বার্থসিদ্ধির খেলায় ছোট জাতিদের আত্মত্যাগ বিক্রি হয়ে যায়।

চার্লি চ্যাপলিন

১৯৭২ সালে ৮৩ বছর বয়সে যখন অস্কার নিতে মঞ্চে ওঠেন, টানা বারো মিনিট হাততালির ঝড় বয়ে যায় অস্কার মঞ্চে। অস্কারের ইতিহাসে সেটাই ছিল দীর্ঘতম অভ্যর্থনা। আবেগে প্রায় কিছুই তিনি বলতে পারেন নি সেদিন।

ব্রিটিশ এই কিংবদন্তী মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে কুড়ানো তুমুল জনপ্রিয়তাকে সঙ্গী করে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। সেই দেশ কত চেয়েছে তাকে নাগরিকত্ব দিতে। তিনি নেননি। তিনি কখনই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে চাননি। পরে যুক্তরাষ্ট্র একসময় 'কমিউনিস্ট' বলে 'গালি দিয়ে' তার জন্য দরজা বন্ধ করে দেয়। তাই বাকি জীবন কাটানোর জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন সুইজারল্যান্ডকে।

যখন খ্যাতির শীর্ষে তখন একবার দুই দিনের জন্য জন্মভূমি ইংল্যান্ডে গেলেন। আর এই সময়ের মধ্যে ঘটে গেল অবাক কাণ্ড। মাত্র দুদিনে তাঁর কাছে প্রায় ৭৩ হাজার চিঠি আসে !

তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁর কাছে সৌন্দর্য মানে নর্দমায় ভেসে যাওয়া একটা গোলাপ ফুল। এই যে বীভৎস দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্টি হওয়া সৌন্দর্য, এখানেই বাস্তবতার সব নিষ্ঠুর দরজা খুলে যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দুঃসহ শৈশব বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। যেখানে তাঁর মাতাল বাবা, মাকে নির্যাতন করত ছোট্ট শিশুটির সামনেই। একসময় সেই বাবা মাকে ছেড়ে যায়, তাতে সামান্য সময়ের জন্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? পরেরবার খিদে লাগার আগে পর্যন্ত!

মা কখনও সস্তা নাটকে অভিনয় করতেন, কখনও সেলাই করতেন, কখনও বা মা-ছেলে মিলে ভিক্ষা করতেন। কখনও নরম নিষ্পাপ হাতে দিব্যি চুরি করতেন। এর মাঝেই অসুখে পড়ে ভুগে মারা যান মা। আর তাঁর নির্বাক কমেডি নাড়া দিতে থাকে সমগ্র ইংল্যান্ডকে। তাই তো তিনি বলেছেন, সত্যিকারের কমেডি তখনই করা যায়, যখন নিজের সব দুঃখ, বঞ্চনা সফলভাবে গিলে ফেলা যায়।

আর তাঁর জনপ্রিয়তা?

রাশিয়ার এক ভক্ত নভোবিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কৃত উপগ্রহের নাম রাখেন ৩৬২৩ চ্যাপলিন! আর এদিকে জাঁদরেল চলচ্চিত্র নির্মাতা জাঁ লুক গদার চ্যাপলিনকে তুলনা করেছিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সঙ্গে।

তিনি কমেডিয়ান নন, অভিনেতা নন, সব ছাপিয়ে তিনি মহান শিল্পীর ঢিলেঢালা কোট গায়ে এক তুখোড় বিপ্লবী। তিনি চার্লি চ্যাপলিন।

তুমি আদৌ বিষয়টি পরিস্কারভাবে, প্রমাণসহকারে জানো কিনা?

- সাবেক মিশরীয় রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের হত্যাকারীকে প্রশ্ন করেছিলেন বিচারক, "প্রেসিডেন্ট সাদাতকে কেন হত্যা করেছ তুমি?"
- হত্যাকারী জবাব দিয়েছিল, "কারণ সে সেক্যুলার ছিল।"
- বিচারক তখনই পরের প্রশ্নটি করলেন, "সেক্যুলার মানে কী?"
- হত্যাকারী জানালো, "আমি জানি না।"
- প্রয়াত মিশরীয় লেখক নাগিব মাহফুজকে ছুরি মেরে হত্যা-চেষ্টাকারীর একজনকে প্রশ্ন করেছিলেন বিচারক, "নাগিব সাহেবকে তুমি ছুরিকাঘাত করেছ কেন?"
- জবাবে সন্ত্রাসী বলেছিলো, "কারণ সে ধর্মবিরোধী *চিলড্রেন অব গেবালাবি* উপন্যাসটি লিখেছে।"
- বিচারক আগ্রহ দেখালেন, "উপন্যাসটি পড়েছ তুমি?"
- অপরাধী জবাব দিয়েছিলো, "না।"
- মিশরীয় সাহিত্যিক ফারাজ ফাউদাকে হত্যাকারী সন্ত্রাসীটিকে বিচারক প্রশ্ন করেছিলেন, "ফারাজ ফাউদাকে মেরে ফেললে কেন?"
- হত্যাকারী জবাব দিয়েছিল, "কারণ তার ঈমান নাই।"
- বিচারক জানতে কৌতূহলী হলেন, "তুমি কিভাবে বুঝলে যে তাঁর ঈমান নেই?"
- সন্ত্রাসীর জবাব ছিল, "তার বইগুলা পড়লেই সব বোঝা যায়।"
- বিচারকের কৌতূহল বেড়ে গেলো, "তাঁর কোন বইটিতে তুমি তাঁর ঈমানহীনতার প্রমাণ পেলে?"
- হত্যাকারী স্বীকার করলো, "বইয়ের নাম আমি জানি না। আমি পড়িনি ওসব।" বিচারক বিস্মিত হলেন, "কেন পড়োনি?"
- খুনীটি বলেছিলো, "আমি লিখতে-পড়তে জানি না।"
- ঘৃণা, কখনোই জ্ঞানের মাধ্যমে ছড়ায় না। ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে অজ্ঞতার মাধ্যমে। সমাজ অজ্ঞতার খেসারত এবং অজ্ঞ করে রাখার খেসারত এভাবেই দেয়।
- সুতরাং কারো বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্য করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, "তুমি আদৌ বিষয়টি পরিস্কারভাবে, প্রমাণসহকারে জানো কিনা?"

মাহমুদ আহমাদিনেজাদ

মাহমুদ আহমাদিনেজাদ। চিনতে পেরেছেন এই ভদ্রলোক টি কে?

এটি কোন কাল্পনিক গল্প নয়, যদি চিনে থাকেন তাহলে আপনি চাইলেই তাঁর গল্পের সত্যতা যাচাই করতে পারবেন!!

বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর এবং সম্পদশালী একটি দেশের দুই মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ছিলেন! বর্তমানে তিনি স্বেচ্ছায় মেষ পালন করেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রাপ্য ভাতা (প্রতি মাসে) তিনি গ্রহণ না করে দান করে দিয়েছেন! প্রেসিডেন্সীর মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে ইউনিভার্সিটিতে খণ্ডকালীন শিক্ষকতায় ফিরে যান। তখন তার মাসিক বেতন ছিলো বর্তমান সময়ে আনুমানিক ২৫০ ডলার! এর বাইরে আর কোন আর্থিক সুবিধা পেতেন না, যেহেতু অস্থায়ী টিচার ছিলেন।

ব্যক্তি জীবনে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক সম্পন্ন করার পর সেই ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন। ডক্টরেট করেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ট্র্যাফিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিংয়ে। দেশের নগর জীবনের উন্নয়নের জন্য রাজধানীর মেয়র হন। এরপর ব্যাক টু ব্যাক দুই মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হয়ে দেশের মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণায় বিপ্লব ঘটান তিনি! পরমাণু এবং ধাতব শিল্পে তার দেশ এখন এক্সাম্পল।

এই ব্যাক্তি কোথাও কাজে বা বেড়াতে গেলে সবচেয়ে কমদামী হোটেলের কমদামী রুমে উঠেন। খাট-পালঙ্ক ছাড়া রুমে থাকার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস, যত কম ভোগ-বিলাস করবেন তত কম হিসেব দিতে হবে পরকালে! চলাচল করেন বাসে, কারণ তাঁর ব্যাক্তিগত পিউজিয়ট গাড়িটি বিক্রি করে দিতে হয়েছে টাকার জন্য। তাঁর স্ত্রী একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। দুই ছেলে এক মেয়ে! সন্তানদের তিনি কোন রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করতে দেননি!

পরপর দুই মেয়াদে প্রেসিডেন্ট থাকার সুবাধে তিনি চাইলেই, তাঁর দেশের আইনানুযায়ী বৈধভাবে, তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক অনেক উন্নতি করতে পারতেন। তাঁর দেশের আইনে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য এইটুকু ছাড় জনগণের সম্মতি নিয়েই করা হয়েছে। তবুও তিনি সেটা নেননি! এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন – "একজন নেতার জীবনযাপন এমন হওয়া উচিৎ যেমন তাঁর জনগণ যাপন করেন!"

"পাকিস্তানের হয়ে জয় বাংলা স্টিকার নিয়ে মাঠে নেমে দুনিয়া চমকে দিলেন"
রকিবুল হাসান

আইয়ুব খান মেড আ মিসটেক, হি শুড কিলড দ্য মুজিব। কথাটা বলার পর এক সেকেন্ড দেরি হলো না। রকিবুল হাসানের প্রচন্ড ঘুষি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো কামরান রশীদ। তারপর ভয়ংকর পিটুনি। পেটাতে পেটাতে কামরানকে টিলার নিচে নিয়ে এলেন রকিবুল হাসান, হাতের কাছে যা পেলেন, তাই দিয়ে চললো আঘাতের পর আঘাত। অবশেষে, রক্তাক্ত কামরান জীবন ভিক্ষা চেয়ে রকিবুলের হাত থেকে বেঁচে যান। সময়টা ১৯৭০।

এই বাংলার সন্তান, বাঙালীর সন্তান ১৮ বছরের টগবগে যুবক, ক্রিকেটার
রকিবুল হাসান

করাচীতে পাকিস্তান অনুর্ধ - ২৫ দলের ক্যাম্পে তখন। ক্যাম্পের সেই সন্ধ্যায় আড্ডা চলছিল। পাকিস্তানের রাজনীতি তখন উত্তাল। ক্রিকেটারদের সেই আড্ডায় চলে আসে রাজনীতি। বাঁহাতি স্পিনার পেশোয়ারের কামরান রশীদ যখন বলে উঠে – আইয়ুব খান মেড আ মিসটেক, হি শুড কিলড দ্য মুজিব। তখন খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এই দুঃসাহসী প্রতিবাদের ঘটনা ঘটিয়ে দেন বাঙালী যুবক রকিবুল হাসান।

করাচিতে বসে একজন বাঙালির এই রুদ্রমূর্তি দেখে যেন বিস্ময়ে, আতংকে পাথর হয়ে রইলো পাকিস্তানে ক্রিকেটাররা। পরদিন কোর্ট মার্শালে ডাক পড়ল রকিবুল হাসানের। মেজর সুজা জিজ্ঞাসা করলেন – তুমি কেন এমন করেছ ?

রকিবুল মেজরের চোখে চোখ রেখে উত্তর দিল – ও আমার নেতা কে নিয়ে বাজে কথা বলেছে বাঙালির নেতা কে গালি দিয়েছে। যতবার গালি দিবে ততবার আমি এমন করবো। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

আন্তর্জাতিক একাদশের বিপক্ষে পাকিস্তানের টেস্ট ম্যাচ, ঢাকা স্টেডিয়ামে। বাঙালি হওয়ার অপরাধে বার বার বঞ্চিত হয়ে সেই টেস্ট খেলায়, পাকিস্তান টিমে প্রথম একাদশে প্রথম ডাক পান রকিবুল হাসান। আনন্দে রাতে ঘুম হয় না রকিবুলের। কিন্তু সব স্বপ্ন মাটি হয়ে গেলো ম্যাচের আগের দিন। পাকিস্তান দলের সব খোলোয়ারকে দেওয়া হয়েছে গ্রে নিকোলস ব্রান্ডের ব্যাট, ব্যাটের উপরে লাগানো আছে আইয়ুব খানের নির্বাচনী প্রতীক তলোয়ার। রকিবুলের মাথায় রক্ত উঠে গেলো। এইতো সেদিন নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুরো

পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। বাঙালির সরকার গঠনের অপেক্ষা। না না না, ব্যাটে আইয়ুব খানের নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে মাঠে নামা যাবে না। রাতেই পূর্বাণী হোটেল থেকে বের হয়ে বন্ধু শেখ কামালের সাথে পরামর্শে বসলো রকিবুল – কী করা যায়!!

২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল, ঢাকা স্টেডিয়াম। হাজার হাজার বাঙালি দর্শক গ্যালারীতে। পশ্চিম পাকিস্তানি আজমত রানাকে নিয়ে ব্যাটিং শুরু করতে নামলো রকিবুল। একজন ফটোগ্রাফার প্রথম খেয়াল করলো ব্যাপারটা। ছুটে এলেন ছবি তুলতে। মুহূর্তে স্টেডিয়াম জুড়ে খবর ছড়িয়ে পড়ল - রকিবুল তার ব্যাটে তলোয়ারের বদলে "জয় বাংলা" স্টিকার লাগিয়ে খেলছে। স্টেডিয়াম জুড়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠলো, জয় বাংলা, জয় বাংলা। জ্বলে উঠলো দেশি-বিদেশি ক্যামেরার ফ্লাশ। পরদিন বিশ্ব জুড়ে বড় বড় করে পত্রিকার হেডিং "পাকিস্তানের হয়ে জয় বাংলা স্টিকার নিয়ে মাঠে নেমে দুনিয়া চমকে দিলেন রকিবুল হাসান" মার্চ এলেই লাল-সবুজের পতাকার দিকে চোখ পড়তেই, স্মৃতি রকিবুল হাসানকে নিয়ে যায় সেই ১৯৭১ সালে। সেই ম্যাচ পন্ড হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানি খেলোয়ার জহির আব্বাস ফিরে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে - যাওয়ার সময় জহির হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন – রকিবুল, করাচিতে দেখা হবে আবার। রকিবুল হাসান দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন – অবশ্যই দেখা হবে। তবে আমার সঙ্গে তখন থাকবে নতুন পাসপোর্ট। কথা রেখেছিলেন আমাদের রকিবুল হাসানেরা। নয় মাস যুদ্ধ করে, নতুন পাসপোর্টের মালিক হয়ে তবেই ঘরে ফিরেছিলেন। এইসব বীরত্ব গাঁথ ায় গর্বিত হই। নতুন প্রজন্মকে জানিয়ে যেতে চাই। প্রতি বছর ২৬ মার্চের সকালে, পতপত করে উড়তে থাকা লাল-সবুজের পতাকার দিয়ে তাকিয়ে চোখের কোণায় চিক চিক পানি জমে। একটা দেশের স্টুডেন্ট মুভমেন্টে অন্য একটি দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির স্নাইপার আসলো। ছাত্র-ছাত্রীরা হার না মেনে লাশের সংখ্যা বাড়িয়ে গেলো। দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে যাওয়া এক আবু সাইদকে গুলি করলো। এরপর প্রতি মিছিলের সামনে হাত মেলে দিয়ে একেকজন আবু সাইদ হতে লাগলো।

পানি খাওয়ানো একটা মুগ্ধকে মেরে ফেললো। অলিতে-গলিতে পানির বোতল হাতে নিয়ে শত মুগ্ধ বেরিয়ে আসলো। ইউনিভার্সিটিগুলোতে নেট বন্ধ। দোকান, বাসাবাড়ির সব ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড ওপেন করে দেওয়া হলো। শেষমেশ আর কিছুতে না পেরে পানি ছেড়ে বন্যা বানালো। সারাদেশ থেকে হাজার হাজার অপেশাদার রেসকিউ টিম এগিয়ে আসলো। বন্যার ফলে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিল। ফান্ড কালেকশনে শত শত সংগঠন নেমে আসলো। এক টিএসসির ফান্ডেই আজকের জমা তিরিশ লাখের কাছাকাছি। পুকুরের পানি ছাদে উঠেছে। ছেলেপেলে ট্রাকভর্তি নৌকা নিয়ে হাজির। ট্রাক নিতে জ্বালানি লাগবে। পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছে। ফাস্ট রেসকিউর জন্য স্পিড বোটের দরকার।

কর্ণফুলী শিপিং কোম্পানি বোট দিচ্ছে। ত্রাণ কিনতে টাকার দরকার। সবার অবস্থান থেকে সাহায্যে ত্রাণ বাক্স ভরে উঠছে। ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের গাড়ি দরকার। একুশে এক্সপ্রেস ফ্রিতে টিকেট দিচ্ছে। যোগাযোগের জন্য ফোনে নেট দরকার। অপারেটর কোম্পানি ফ্রিতে নেট দিচ্ছে। দেবার জন্য উদাহরণ দরকার? ছোট্ট এক বাচ্চা ছেলে ওমরাহর জন্য জমানো সাড়ে চৌদ্দ হাজার টাকা ত্রাণ বাক্সে দিয়ে দিচ্ছে। অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দরকার? পিচ্চি ইহান তিন বছরের জমানো পয়সা প্লাস্টিকের ব্যাংক সহ বাক্সে দিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রীতির চিহ্ন দরকার? দুর্গাপূজার ফান্ড থেকে একটি ইসলামিক সংগঠনের ত্রাণ তহবিলে ত্রাণ কেনার টাকা আসছে। অসীম নিদর্শন দরকার? সারাদিন পরিশ্রম করে পাওয়া ৪০০ টাকার সবগুলোই ত্রাণ তহবিলে দিতে ওমর ফারুক নামে এক রিক্সা চালক ছুটে আসছে। মানসিকতা দরকার? সারাদিন ভিক্ষা করা প্রতিবন্ধীটাও তার ভিক্ষার ভাগ থেকে ত্রাণবাক্সে টাকা ফেলছে। কি ভেবেছেন? এ জাতি এতই ভঙ্গুর? এতই অথর্ব? এতই ঠুনকো? আশি হাজার বছর ধরে জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করা এই জনপদ বৃটিশদের কামানে টলেনি। পাকদের গোলায় ধ্বসেনি। স্বৈরাচারের ভয়ে দমেনি। ভারতের আগ্রাসনে গুটিয়ে যাবে? তাদের কাছে হাতজোড় করবে? ভুল। এই জাতিই একটা দৃষ্টান্ত। একটা উদাহরণ। একটা নজির। বীরের বেশে মহাবীর। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।

সততার বীজ

ষাটোর্ধ একজন CEO অবসর নেয়ার আগে তার স্বনামধন্য কোম্পানীর উত্তোরাধিকার হিসেবে একজন সৎ ও যোগ্য CEO নির্বাচন করতে চাইলেন। তবে চিরায়ত নিয়মে তিনি তার পরিচালক পর্ষদ বা ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে কাউকে উত্তরাধিকার না করে ভিন্নধর্মী কিছু করার চিন্তা করলেন। তাই একদিন সকল এক্সিকিউটিভদের বললেন "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাদের মধ্য থেকে একজন পরবর্তী CEO নিয়োগ করবো।

"শুনে তো সবাই হতবাক! তবে আবার খুশীও হল। CEO হওয়ার স্বপ্নে তাদের মন উৎফল্লিত হলো। তিনি বলে চললেন, "আমি আপনাদের প্রত্যেককে একটি করে 'বীজ' দেব। এই বীজ আপনারা টবে রোপণ করবেন, পানি দিবেন, যত্ন করবেন আর ঠিক এক বছর পর তা আমার নিকট নিয়ে আসবেন। আমি তখন সেই বীজ থেকে বেড়ে ওঠা চারাগাছ দেখে বিচার করবো কে হবে পরবর্তী CEO।"

সেইখানে অলিভার নামে একজন ছিল যে আর সবার মতই বীজ নিয়ে বাসায় ফিরলো। তার স্ত্রী একটি টব, মাটি ও সার জোগাড় করলো এবং সেই টবে অলিভার বীজটি রোপণ করলো। প্রতিদিন সে বীজটির খুব যত্ন করতে লাগল। নিয়মিত পানি দিল। সপ্তাহ তিনেক পর তার সহকর্মীরা এক অন্যের সাথে তাদের বীজ থেকে বেড়ে ওঠা চারাগাছ সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগল।

কিন্তু হায় অলিভারের বীজ থেকে তো কিছুই জন্মাচ্ছে না। এভাবে তিন সপ্তাহ, চার সপ্তাহ করে পাঁচ সপ্তাহ পার হয়ে গেল। সে নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে শুরু করলো। নিজের মনেই বলল "আমি বোধ হয় রোপণের সময় বীজটি নষ্টই করে ফেলেছি।" সে তার সহকর্মীদের সাথে লজ্জায় এ বিষয়ে কোন কথাও বললো না।

অবশেষে একটি বছর পার হলো। কোম্পানীর সব এক্সিকিউটিভগণ তাদের বড় হয়ে যাওয়া চারা গাছটি তাদের CEO এর নিকট নিয়ে এলো।

এই খালি টব নিয়ে অলিভারের পক্ষে অফিস যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু স্ত্রী তাকে যা ঘটেছে সে বিষয়ে সৎ থাকার পরামর্শ দিল এবং বললো যা সত্য তাই তোমার CEO কে বলবে। সে আজ খুবই বিব্রত হবে – এই দুশ্চিন্তায় অলিভার অসুস্থ বোধ করতে থাকলো। কিন্তু সে এও জানে তার স্ত্রী ঠিক কথাই বলেছে। সে তার খালি টব নিয়ে বোর্ডরুমে ঢুকে দেখলো সকলের টবে কী সুন্দর সুন্দর গাছ! অলিভার তার টবটি রুমের মেঝেতে রাখল। অনেকেই হাসাহাসি করল, কেউ কেউ আবার দুঃখ প্রকাশও করলো। CEO রুমে এসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরো রুম পরিদর্শন করলেন। "ও মাই গড, আপনারা কী সুন্দর চারাগাছ ও ফুল জন্মিয়েছেন!" হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়লো অলিভারের দিকে। অলিভার লজ্জায় পেছনে কোথাও লুকানোর চেষ্টা করলো। CEO তাকে সামনে আসতে বললেন।

অলিভার খুব ভীত হয়ে পড়লো। নির্ঘাৎ সে আজ তার চাকুরী হারাবে। CEO জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার অলিভার, আপনার বীজের কী হয়েছে?" অলিভার তাকে সব খুলে বললেন। CEO সবাইকে বসতে বললেন, শুধু অলিভারকে বললেন দাঁড়িয়ে থাকতে। তিনি অলিভারের দিকে তাকিয়ে বললেন সবাই আমাদের নতুন CEO কে ভালো করে দেখুন, তার নাম অলিভার!

অলিভার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না! সে তো কোন চারাগাছের জন্মই দিতে পারে নি!

সবাই বলাবলি করলো, "সে কিভাবে CEO হলো?"

CEO বললেন, "এক বছর আগে আমি প্রত্যেককে যে বীজ দিয়েছিলাম তা সবই ছিল মৃত। কারণ সেগুলো ছিল সিদ্ধ করা। তাই কোন চারা অঙ্কুরিত না হতে দেখে হতাশ হয়ে আপনারা আমার দেয়া বীজটি ফেলে দিয়ে নতুন বীজ লাগিয়েছেন, শুধুমাত্র অলিভার সাহস ও সততার সাথে খালি টব নিয়ে এসেছে যে টবে আমার দেয়া বীজটিই রয়েছে। সবাই করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করুন।"

"যদি সততা রোপণ করেন, তবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবেন", "যদি সৎগুণ রোপণ করেন, তবে ভালো বন্ধুত্ব অর্জন করবেন", "যদি কঠোর শ্রম রোপণ করেন, তবে সাফল্য অর্জন করবেন", "যদি সুবিবেচনা রোপণ করেন, তবে আপনি যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন"। তাই কী রোপণ করছেন সে বিষয়ে সতর্ক

থাকুন, তা নির্ধারণ করে দিবে ভবিষ্যতে আপনি কী অর্জন করবেন। জীবনকে আপনি যা দিবেন, জীবন আপনাকে তাই ফেরৎ দিবে।

Canada welfare state : অটোয়া

কানাডার বর্তমান রাজধানী। ডাউন টাউন অন্যদেশ, অন্যশহরের মত। বিল্ডিংগুলো ইউরোপিয়ান স্টাইল জার্মান আর রোম সভ্যতা মিলিয়ে। বিল্ডিং এর কপারে মোড়া মাথা weather এর কারণে সবুজ হয়ে গেছে। একটি সুন্দর দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ (পোর্টেজ ব্রীজ) দিয়ে কুইবেকের গ্যাটিনিউ শহর যুক্ত। প্রথমেই মনে হয়েছিল পিরোজপুরের সাথে মোড়লগঞ্জের সংযোগ ছোট্ট অতি ক্ষুদ্র ব্রিজটির কথা। পার্লামেন্ট বিল্ডিং নূতন। কানাডার ১০টি প্রদেশ আর তিনটি টেরিটরির সবার একটা করে রাজধানী। অটোয়া কানাডার চতুর্থ বৃহত্তম নগরী; অন্টারিও প্রদেশের দ্বিতীয় এ শহরে সরকারী চাকুরে বেশী। সব অঞ্চলের প্রাচীনতম ঐতিহ্য আর জাতিসত্ত্বা (আদিবাসী) আছে। আদিবাসীর শব্দ (এলগনকুইন) যার অর্থ ব্যবসা (ট্রেড) থেকে অটোয়া এসেছে; সব অঞ্চলেরই নামের শানে নযুল আছে। অটোয়া আসলে ফরাসি ভাষা অধ্যুষিত কানাডা আর ইংরেজী ভাষা জানা কানাডীয়দের সংযোগ স্থল। ১৮৫৯ রানী ভিক্টোরিয়ার পছন্দে রাজধানী হয়। ১৯০০ সালে আগুনে পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বলতে গেলে তারপর থেকে অটোয়ার বিবর্তন।

সিটি সেন্টার : লন্ডনের West Minister Cityর মত এখানে পার্লামেন্ট হিল, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম পাশাপাশি। প্যারিসের দ্য গল সেন্টার, মিউনিখের সিটি সেন্টার, নয়া দিল্লির ইন্ডিয়া গেট এক সময়ের বাংলাদেশের গুলিস্তান এভিনিউ, সবার উদ্দেশ্য এক (ভিউ ভিন্ন হলেও)। জমায়েত আড্ডা সব এক জায়গায়; অটোয়ার সিটি সেন্টারে দেখলাম মিছিল, স্লোগান।

ক্লক টাওয়ার : লন্ডনের বিগ বেনের মত এখানেও আছে ক্লক টাওয়ার। ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তার আগের ট্রাডিশন অনুযায়ী নির্মিত ক্লক টাওয়ার সেই শহরের বিখ্যাত জিনিষ। ২০১২ সালে নির্মিত সৌদী টাওয়ারটি পৃথিবীর বৃহত্তম। আমাদেরটা ডিআইটিস্থ ক্লক। বিখ্যাত না হলেও পৃথিবীর বিখ্যাত ১০ টি টাওয়ারের একটি অটোয়ার ঘড়ি। এখানে অন্যগুলির মত ঘন্টা বাজে।

অলিম্পিক টাউন : লন্ডনের অলিম্পিক সুইমিং পুলের পাশের ক্যানাল অটোয়ার রাইডু ক্যানালের মত যদিও purpose নির্মাণের ইতিহাস ভিন্ন। দৃষ্টিনন্দন ক্যানালের দুপাশ দিয়ে ধানমন্ডি রমনার মত walk way প্যারিস, সিংগাপুর, থ াইল্যান্ডের মত লেক দিয়ে শহর দেখার ক্রুজের ব্যাবস্থা বিদ্যমান।

কানাডা : আয়তনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ; লোক সংখ্যা সাড়ে তিনকোটি-per capita income ৫০০০০.০০. ডলার। সম্ভাবনা অপার। Welfare country.

PR/Passport পেলে রাষ্ট্র আপনার দায়িত্ব নেবে। আপনি কি হবেন নির্ভর করবে eligibilityর উপর; eligibility depend করবে আপনার plan আর perseverance এর উপর।

বিশ্ব শ্রেষ্ঠ

বিশ্বের সর্বোচ্চ পতিতাবৃত্তির দেশঃ

১। থাইল্যান্ড (বৌদ্ধ ধর্ম)
২। ডেনমার্ক (খৃস্ট ধর্ম)
৩। ইতালি (খৃস্ট ধর্ম)
৪। জার্মান (খৃস্ট ধর্ম)
৫। ফ্রেঞ্চ (খৃস্ট ধর্ম)
৬। নরওয়ে (খৃস্ট ধর্ম)
৭। বেলজিয়াম (খৃস্ট ধর্ম)
৮। স্পেন (খৃস্ট ধর্ম)
৯। ইউকে (খৃস্ট ধর্ম)
১০। ফিনল্যান্ড (খৃস্ট ধর্ম)

বিশ্বের সর্বোচ্চ চুরির হারঃ

১। ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ড (খৃস্টান)
২। জিম্বাবুয়ে (খৃস্ট ধর্ম)
৩। অস্ট্রেলিয়া (খৃস্ট ধর্ম)
৪। কানাডা (খৃস্ট ধর্ম)
৫। নিউজিল্যান্ড (খৃস্ট ধর্ম)
৬। ভারত (হিন্দু ধর্ম)
৭। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস (খৃস্টান)
৮। ইউএস (খৃস্ট ধর্ম)
৯। সুইডেন (খৃস্ট ধর্ম)
১০। দক্ষিণ আফ্রিকা (খৃস্ট ধর্ম)

পৃথিবীর সর্বোচ্চ অ্যালকোহল আসক্তিঃ

১। মোলদাভিয়া (খৃস্টান)
২। বেলারুশিয়া (খৃস্টান)
৩। লিথুয়ানিয়া (খৃস্টান)
৪। রাশিয়া (খৃস্টান)
৫। চেক প্রজাতন্ত্র (খৃস্টান)
৬। ইউক্রেন (খৃস্টান)

৭। অ্যান্ডোরা (খৃস্টান)
৮। রোমানিয়া (খৃস্টান)
৯। সার্বিয়া (খৃস্টান)
১০। অস্ট্রেলিয়া (খৃস্টান)

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি খুনের হার:
১। হন্ডুরাস (খৃস্টান)
২। ভেনেজুয়েলা (খৃস্টান)
৩। বেলিজ (খৃস্টান)
৪। এল সালভাদর (খৃস্টান)
৫। গুয়াতেমালা (খৃস্টান)
৬। দক্ষিণ আফ্রিকা (খৃস্টধর্ম)
৭। সেন্ট কিটস এবং নেভিস (খৃস্টান)
৮। বাহামা (খৃস্টান)
৯। লেসোথো (খৃস্টান)
১০। জ্যামাইকা (খৃস্টান)

বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দল:
১। ইয়াকুজা (কোন ধর্ম নেই)
২। আগ্বেরাস (খৃস্টান)
৩। ওয়াহ সিং (খৃস্টান)
৪। জ্যামাইকা বসএঁ (খৃস্টান)
৫। প্রাইমেরো (খৃস্টান)
৬। দ্য আরিয়ান ব্রাদারহুড (খৃস্টান)

বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাদক দল:
১। পাবলো এসকোবার - কলম্বিয়া (খৃস্টান)
২। আমাদো ক্যারিলো - কলম্বিয়া (খৃস্টান)
৩। কার্লোস লিডার জার্মেন - (খৃস্টান)
৪। গ্রিসেল্ডা ব্ল্যাঙ্কো - কলম্বিয়া (খৃস্টান)
৫। জোয়াকুইন গুজম্যান - মেক্সিকো (খৃস্টান)
৬। রাফায়েল ক্যারো - মেক্সিকো (খৃস্টান)

অথচ বলা হয় ইসলাম এবং মুসলমানরা পৃথিবীতে সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের কারণ এবং তারা চায় সবাই যেন তাই বিশ্বাস করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু কে করেছে? মুসলিমরা নয়... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে শুরু করেছে? মুসলিমরা নয়... প্রায় ২০ মিলিয়ন স্থানীয় অস্ট্রেলিয়ানকে কে হত্যা করেছে? মুসলিমরা নয়... জাপানের নাগাসাকি এবং হিরোশিমায় কে বোমা ছুঁড়েছে? মুসলিমরা নয়... দক্ষিণ

আমেরিকায় প্রায় ১০০ মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানদের কে হত্যা করেছে? মুসলিমরা নয়... উত্তর আমেরিকায় প্রায় ৫০ মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানদের কে হত্যা করেছে? মুসলিমরা নয়... আফ্রিকা থেকে ১৮০ মিলিয়নেরও বেশি আফ্রিকানকে যারা অপহরণ করেছিল, তাদের মধ্যে ৮৮% মারা গেছে এবং সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে! কে করেছে এ কাজ? মুসলিমরা নয়...

সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গীবাদের সূচনা মুসলিমদের দ্বারা হয়নি অথচ সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তাদেরকে। অমুসলিম সন্ত্রাসী কাজ করলে অপরাধ! কিন্তু মুসলিমরা অধিকার আদায়ে চেষ্টা করলে বলে সন্ত্রাস..! এ এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নয় কি!!!???

আসুন; শান্তি, সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও হৃদয়তাপূর্ণ এক আলোকিত পৃথিবী বিনির্মাণে আমরা হই ঐক্যবদ্ধ, গ্রহণ করি স্বচ্ছ শপথ, মাঠে ময়দানে থাকি সোচ্চার।

আবদুল গাফফর খান

গাফফর খান সেদিন শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে গান্ধীজীকে তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'এক অকপট সরলতার' মানুষ এই গাফফর খান'। তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। রবীন্দ্র প্রয়াণের খবর পেয়ে এই মানুষটি পেশোয়ার থেকে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানিয়েছিলেন,

Peshaar 12th August 1941
Dear Mr. Tagore,
I am deeply grieved to hear of the sad demise of Gurudev. In him India has truly lost the greatest philosopher, poet and a nationalist. I heartily condole with you in your sad bereavement. May God bless his soul and give strength in your present trial.

Yours sincerely,

Abdul Ghaffar Khan

এই ঘটনার প্রায় পয়ত্রিশ বছর পর গাফফর খান আবার শান্তিনিকেতন এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৭৯। ক্লান্তিময় বার্ধক্য জাঁকিয়ে বসেছে শরীরে। স্বাধীন পাকিস্থান সৃষ্টির ১৭ বছরের মধ্যে ১৫ বছর কেটেছে তাঁর কারাগারে। তিনি 'হিন্দু ও বিশ্বাসঘাতক' এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ! অধিকাংশ সময় তাঁর কেটেছে নির্জন কারাগারে নয়তো নজরবন্দি হিসেবে। ১৯৬৪ সালে স্বেছা নির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন আফগানিস্থানের একটি ছোট্ট গ্রাম জালালাবাদে। মনস্থির করেছিলেন সেখানেই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর জীবন দর্শন সম্বল করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন।

বছর পাঁচেক পর ১৯৬৯ সালে 'গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি'র সভাপতি হিসেবে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান। তিনি সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বাইশ বছর পর

বিপর্যস্ত স্বপ্ন ও আদর্শ আর ভাঙা মন নিয়ে তিনি সেই ভারতের মাটিতে পা রেখেছিলেন। নয়াদিল্লিতে নেহেরু কন্যা প্রিয় ইন্দুকে বলেছিলেন, তাঁকে যেন একটিবার শান্তিনিকেতন যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

শান্তিনিকেতন কেন?

মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, কেন জানো? ১৯৩৪ সালে প্রথম যখন যাই, গুরুদেবের কাছ থেকে স্নেহ-ভালোবাসা পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬৯। সেই আগের মতোই রেলের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা মধ্যরাত্রে বোলপুর স্টেশনে এসেছিল তাঁকে নিয়ে। বাকি রাত সেটি সাইডিং-এ রেখে দেওয়া হয়। গাফফর খান সেখানেই রাত্রি অতিবাহিত করেন। পরদিন ১৫ই ডিসেম্বর সকাল আটটায় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীণ মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে যান প্রাণের শান্তিনিকেতন। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় উদয়নের সেই ঘরে, যে ঘরে ৩৫ বছর আগে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে কেটেছিল তাঁর একটি সম্পূর্ণ দিন। তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্বভারতীর আম্রকুঞ্জে। সেখানে তাঁকে চিরাচরিত ধারায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনার প্রতিউত্তরে খান আবদুল গাফফার খান বলেছিলেন, '... ৩৫ বছর আগে যখন আমি প্রথম এখানে এসেছিলাম গুরুদেবের যে স্নেহ, ভালোবাসা পেয়েছি তা আমার অন্তরে আজও বিরাজমান ...'।

গাফফার খান আশ্রমিকদের বিদ্যার্থীভবন, কলাভবন, বিচিত্রা প্রভৃতি ঘুরে দেখেন। 'বিচিত্রা'য় এসে একটি কাঠ খোদাই মানবমূর্তির সামনে দাঁড়ালে তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামে। বারবার চোখ কচলে মূর্তিটি পরখ করতে থাকেন। এ মূর্তি যে গড়েছেন তাঁর পুত্র নন্দলাল বসুর শিষ্য আবদুল গনি। গাফফর খান ছেলেকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন কবিগুরুর কাছে। পিতা গাফফর খানের মতোই স্বভাব পেয়েছিল গনি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সবার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে সে। তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন নন্দলাল বসু। কলাভবনের আনাচে-কানাচে এখনো গনির ভাস্কর্য দেখা যায়। রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য রাণী চন্দের লেখাতেও মিলবে গাফফরপুত্র 'গনি'র কথা। তিনি ঘুরলেন শ্রীনিকেতনও। বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁকে একনজর দেখতে। স্বল্প একটি বক্তৃতাও দিলেন।

ফেরার পথে বিশ্বভারতীর উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্যের কাছে সাঁওতাল পল্লী দেখাবার একান্ত অনুরোধ জানালেন।

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোল ভুবনডাঙ্গায়। সাঁওতালদের সাথে গাফফর খান মিলিত হলেন।

জানতে চাইলেন, স্বাধীনতার আগে যেমন আপনাদের দিন কেটেছিল, আজ তার কী কোনও পরিবর্তন হয়েছে? স্বাধীনতা কি আপনাদের জীবনের স্বাদ বদলে দিতে

পেরেছে? দোভাষীর মাধ্যমে তিনি যে জবাব পেয়েছিলেন তাতে তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিলো। হায় গুরুদেব! হায় স্বাধীনতা! বুক ভরা আক্ষেপের মধ্যে সেদিন তাঁর কাছে শুধু এক টুকরো শান্তি ছিল এই শান্তিনিকেতন পরিক্রমা।

আজ খান আবদুল গাফফর খানের প্রয়াণ দিবস। তাঁর জন্মদিন বা প্রয়াণ দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয় না। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে চিনতেন 'সীমান্ত গান্ধী' হিসেবে। তাঁর প্রয়াণের পর সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিলো,

"সীমান্ত গান্ধী প্রয়াত হয়েছেন ... যাঁর নিজের কোনো সীমান্ত ছিল না"।

বিনম্র শ্রদ্ধা
সৌজন্যে সোনাঝুরি

সত্য সবসময় সুন্দর

লুসিড ড্রিম
মে ৩১, ২০২৫

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী 'তাওয়াক্কুল কারমান'- কে হিজাব পরা সম্পর্কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন সুন্দরভাবে পরিষ্কার ভাষায়, যা পৃথিবীর সভ্য মানুষকে করেছে মুগ্ধ।

তাঁর উত্তরটা ছিল এরকম – "আদিকালে মানুষ প্রায় নগ্ন ছিল এবং মানুষের বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে সে পোশাক পরতে শুরু করে।"

"আমি আজ যে অবস্থানে আছি এবং আমি যা পরেছি তা মানুষের উচ্চতর চিন্তা ও সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে, যা মানুষ অনেক বছর সাধনা করে অর্জন করেছে। এটি পশ্চাৎমুখিতা নয়; বরং পোশাকের অপসারণ করাই পশ্চাৎমুখিতা এবং প্রাচীন যুগের অসভ্য আচরণে আবার ফিরে যাওয়া।" সভ্যতা মানে শুধু আধুনিক পোশাক নয়, বরং মর্যাদা, আত্মসংযম আর নিজের বিশ্বাসকে সম্মানের সাথে ধারণ করা। নিজের শালীনতা রক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া; আর উল্টোটা হলো পশ্চাৎপদতায় ফেরা।

তিনি হিজাব পরাকে কেবল একটি ব্যক্তিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রকাশ হিসেবেই উপস্থাপন করেননি, বরং একটি মানুষ কতটা সভ্য ও চিন্তাশীল হতে পেরেছে – তার একটি প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন।

যারা পোশাকের স্বাধীনতার কথা বলে এবং সেই সাথে বলে পোশাকের স্বাধীনতা তাদের সভ্যতা ও আভিজাত্যের প্রতীক। তারা তাওয়াক্কুল কারমান এর বলা এই গুটিকয়েক শব্দ, বাক্য নিয়ে চিন্তা করলেই উত্তর পেয়ে যাবে যে, আসলে পোশাকের স্বাধীনতা তাদের সভ্য করছে নাকি সভ্যতার নামে আদিকালের সেই নগ্নতায় তাদের ফিরিয়ে নিচ্ছে।

উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম

কমলাপুর রেলস্টেশনের পাশে গাড়ি থেকে নামতেই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলমের কাছে দৌড়ে আসলো একটা ছিন্নমূল ছেলে। এসে উনার পা ধরতে গিয়ে বলল, স্যার আমার জন্য দোয়া কইরেন। জাহাঙ্গীর সাহেব হাত দিয়ে ছেলেটার মাথা মুছে দিয়ে পাশে থাকা সহকারীকে বলল, টাকা আছে? সহকারী মানিব্যাগ থেকে ৫০০ টাকার নোট বের করতেই ছেলেটা দৌড়ে চলে যেতে লাগল - না, না স্যার, টাকা নিমু না। আপনি আমার জন্য শুধু দোয়া কইরেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অনেক বললেন, সে টাকাটা নিলোই না। এটা তোমার জন্য ঈদ উপহার বলব - তাও না। পাশে থাকা পুলিশ অফিসারও রিকুয়েষ্ট করতে থাকলেন টাকা নিতে, কিন্তু ছেলেটা লজ্জায় পড়ে গেল। ও টাকা নিলোই না।

পরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তার মাথাটা মুছে দিয়ে চলে গেলেন। এরপর সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি টাকা নিলে না কেন? উনি কে চিনো?

ছেলেটা হাসিতে খুব সারল্য উত্তর দিলো, উনারা কষ্ট করে দেশ চালায় না! টাকা নিলে মানুষে খারাপ বলবো। দোয়া করলে চলতে পারবো, টাকা নিলে দুই দিনে শেষ হয়ে যাইতো।

এ ছিন্নমূল ছেলেটার সরলাপনা মুগ্ধ করেছে। বাড়িঘর নাই, খাওন-দাওনের কোনো ঠিকঠিকানা নাই, রাস্তায় ঘুরে, তার মাথায় এ সেন্স কাজ করছে, টাকা নিলে মানুষে খারাপ বলবে। দোয়া করলে সারাজীবন থাকবে। টাকাটা নিলে দুই দিনে শেষ হয়ে যাবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে এসব ছিন্নমূল ছেলেরা আন্দোলনের একটা বড় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এরা পুলিশের সাথে ফাইটে ছাত্রদের সামনের সারির যোদ্ধা ছিল। এখনো অনেক ছিন্নমূল ছেলের ছবি চোখে ভাসে। এরা ছিল রাস্তায় তেজোদীপ্ত; সাহসী। প্রায় ১৬০ জনের মতো ছিন্নমূল ছেলে শহীদ হয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে। রাস্তায় কোনো ছিন্নমূল ছেলে দেখলেই মায়া হয়; মনে পড়ে জুলাই-আগস্টের কথা।

এ ছেলেটির প্রতি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলমের মমতা দেখে খুশি হয়েছি। রাষ্ট্রনেতারা এরকম দয়ালু, সহজ-সরল ও স্নেহপরায়ণ হৃদয়ের হতে হয়।

নাম না-জানা ছিন্নমূল ছেলেটির প্রতি ভালোবাসা, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের প্রতি সম্মান।

লক্ষ্ণৌ হাসপাতাল

লক্ষ্ণৌ হাসপাতাল মিরাকেল করলো! কিং জর্জেস মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির চিকিৎসকরা ৬ মিনিটের জন্য রোগীকে মৃত করে অপারেশন, অসম্ভবকে সম্ভব করলেন!

১ বছর আগে হৃদযন্ত্রের ২টি ভালভ বদল করা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ১ বছরের মধ্যেই তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করলে চিকিৎসকের কাছে হাজির হন। চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেন হৃদযন্ত্রের ভালভের একটি অংশে একটি ছোট্ট ফুটো তৈরি হয়েছে। যা দ্রুত বুজিয়ে ফেলতে হবে। নাহলে জীবন সংশয় হতে পারে।

কিন্তু এ এমন এক অপারেশন যে মনে হবে ছোট্ট অপারেশন, কিন্তু এই ফুটো বোজাতে গেলে যে কোনও সময় রোগীর মৃত্যু হতে পারে। এখানেই চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নেন মৃত্যু হওয়া রুখতে রোগীকে কিছুক্ষণের জন্য মেরে ফেলতে হবে। এটা কোনও অ্যানাস্থেসিয়া নয়। প্রকৃত অর্থেই মৃত করে দিতে হবে রোগীকে।

এই পদ্ধতিতে রোগীর দেহের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে তাঁর শরীর মৃতের মত ঠান্ডা করে ফেলা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় রক্ত সঞ্চালন। ওষুধ দিয়ে মস্তিষ্ককেও অচল করে দেওয়া হয়। শরীরের তাপমাত্রাকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে আনা হয়।

রোগীকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে মৃত করে ফেলতে হয়। একে বলা হয় ডিপ হাইপোথার্মিক সার্কুলেটরি অ্যারেস্ট বা ডিএইচসিএ।

এই পদ্ধতিতে পা দেওয়া মানে কার্যত রোগীকে মেরে ফেলা। সেটাই করেন লখনউয়ের কিং জর্জেস মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির চিকিৎসকেরা। এই প্রথম এই হাসপাতালে এমন চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হল।

৬ মিনিটের জন্য ২৮ বছরের যুবতী আশাকে এভাবে মৃত করে ফেলা হয়। তারপর ওই ৬ মিনিটকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত অপারেশন সেরে ফেলেন চিকিৎসকেরা। তারপর ফের আশার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
সূত্রঃ- *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*

বিদায় হজ্জের ভাষণ

বিদায় হজের ভাষণ ইতিহাসের এক অনন্য দলিল, যা মানবজাতির সর্বজনীন অধিকার, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদার মূর্তপ্রতীক। প্রায় এক লাখ ১৪ হাজার সাহাবির উপস্থিতিতে এই ভাষণ দেন তিনি। এটি ছিল মহানবীর (স.) জীবনের শেষ হজ এবং তাঁর বিদায়ী ভাষণ। যা তিনি মসজিদে নামিরাতে ও জাবালে রহমতের ওপরে এবং পরদিন দশম জিলহজ ঈদ ও কোরবানির দিন মিনাতে প্রদান করেছিলেন। (সিরাতুন নবী (স.), ইবনে হিশাম (র.), খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা: ২৭৩-২৭৭)।

ভাষণের মূল বিষয়বস্তু
বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স.) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন, যা আজও মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, ইসলামের সুমহান আদর্শে অটল থাকার শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন হাদিস থেকে নবীজির বিদায় হজের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলো এখানে তুলে ধরা হলো।

মানবিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ
নবীজি (স.) বলেন- হে মানুষ! তোমাদের প্রভু একজন। তোমাদের পিতা একজন। আরবের ওপর কোনো অনারবের এবং অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গেরও নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ
নবীজি (স.) বিদায় হজের ভাষণে নির্দেশ দেন, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

নারীর অধিকার
বিদায় হজের ভাষণে নারীর অধিকার সুরক্ষায় মহানবী (স.) বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নারীদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের অধিকার রক্ষা করতে।

প্রাণ ও সম্পদের সুরক্ষা
মহানবী (স.) উল্লেখ করেন, মানুষের জান-মাল ও সম্মান অপরাধ ছাড়া হরণ করা যাবে না। তিনি বলেন, তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান একে অপরের জন্য হারাম, যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহর বিধান থাকে।

অধীনস্থদের প্রতি সদাচরণ
মহানবী (স.) অধীনস্থদের সাথে সদাচরণ করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তাদের প্রতি সদাচরণ করলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। আরও বলেন, তাদের ওপর অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে তাদেরও তাই খাওয়াবে; যা পরবে তাই পরাবে। ভুলো না, তারাও তোমাদের মতো মানুষ।

ঋণ ও আমানত রক্ষা
তিনি (স.) ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আমানতের খেয়ানত না করতে নির্দেশ দেন।

সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার
নবীজি (স.) সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং বলেন, কেউই জন্মগতভাবে শ্রেষ্ঠ বা নিম্নমানের নয়; বরং তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতাই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণ করে।

কোরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ
নবীজি বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। 'আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে তখন তোমরা কি বলবে?' তারা বলল, 'আমরা সাক্ষ্য দেব যে আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন।' তারপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।' তিনি তিনবার এরূপ বলেন।

শিরক বিদআত, চুরি-ডাকাতি, জিনা থেকে পবিত্র থাকার নির্দেশনা
নবীজি বলেন, সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। শিরক করো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা কথা বলো না, জেনা-ব্যাভিচার করো না। সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করো। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হয়ো। নবীজি বলেন, জাহিলী যুগের যত রসম রেওয়াজ, শোন, (আজ থেকে) সব আমার পায়ের নিচে পদদলিত।

সুদ নিষিদ্ধ
নবীজি বলেন, জাহিলিয়াতের সকল সুদ আজ বিলুপ্ত করা হল। সর্বপ্রথম আমি যে সুদ বিলুপ্ত করছি তা আমারই বংশের আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ।

অহংকার করো না
নবীজি বলেন, যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর এক বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয়, আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর নেমে আসে।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ কাউকে দেওয়া যাবে না
বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স.) উল্লেখ করেন যে, একজন স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ কাউকে দিতে পারবেন না। এটি পরিবারের মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সম্মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

একজনের অপরাধের দায় অন্যজনের নয়
নবীজি (স.) বিদায় হজের ভাষণে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, কোনো অপরাধীর অপরাধের দায় তার পিতা বা সন্তান বহন করবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী।

নেতার আনুগত্যের নির্দেশ
নবীজি (স.) বিদায় হজের ভাষণে মুসলমানদেরকে তাদের নেতার প্রতি আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। এমনকি সেই নেতা যদি ক্রীতদাসও হন।

মুসলমানরা ভাই ভাই হয়ে থাকবে
বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স.) মুসলমানদের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকতে বলেন, আরও বলেন, মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। তোমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করো না।

নবীজির এই বিদায়ী বার্তা সবার কাছে পৌঁছানোর নির্দেশনা
নবীজি বলেন, যারা উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিত সব মুসলমানের কাছে আমার এই সব বাণী পৌঁছে দিয়ো। হয়তো অনেক অনুপস্থিত লোক উপস্থিত শ্রোতা অপেক্ষা অধিক হেফাজতকারী হবে।'

কোরআনের আয়াত নাজিল
ভাষণশেষে ভাবের আতিশয্যে নবী (স.) নীরব হন। জান্নাতি নূরে তাঁর চেহারা আলোকদীপ্ত হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে নাজিল হয় – 'আজকের এই দিনে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমাদের ওপর দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সুরা মায়েদা: ৩)

বিশাল জনতা নীরব। কিছুক্ষণ পরে তিনি চোখ মেলে করুণ স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সেই জনসমুদ্রের প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'বিদায়!' একটা অজানা বিয়োগ-বেদনা সবার হৃদয়ে ছায়াপাত করল।
(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৯৮ ও ৩২০-৩৪২)

বিদায় হজের ভাষণ মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন আদর্শ। এতে যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি মহান শিক্ষণীয় দলিল।

হেনরি কিসিঞ্জার
বাংলাদেশের অন্যতম (হয়তোবা একমাত্র এই অসাময়ী) লেখক এবং রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন সেদিন চ্যানেল আইয়ের সংবাদ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে একটি চমকপ্রদ এবং বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছেন যা এর আগে কেউ কখনও বলেনি!

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অযাচিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভিলেইন বানিয়ে রেখেছে, আওয়ামী লীগ-ভারত-রাশিয়া চক্র!

হেনরি কিসিঞ্জার তার বইতে বিস্তারিত লিখে গেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেনি! তাদের শুধু টাইমিংটা নিয়ে ভারত আর রাশিয়ার সংগে দ্বন্দ্ব ছিলো! ভারত যাচ্ছিলো এর পুরো কৃতিত্ব নিতে! আর অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছিলো আর কিছুদিন ডিলে করে বাংলাদেশ স্বাধীন হউক, কারণ তারা তখন পাকিস্তানকে বিপদে ফেলতে চায়নি। কারণ ইয়াহিয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র চায়নার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছিলো। একারণেই যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিলো বাংলাদেশ ৭২সালের মার্চ-এপ্রিল এর দিকে স্বাধীন হোক।

কিন্তু ভারত এমনভাবে কাজটা করে যে যুক্তরাষ্ট্র আজীবনের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ হয়ে যায় আর সাথে ভারত-রাশিয়ার অনুকম্পায় বাংলাদেশ স্বাধীন হইছে এই বয়ান দিয়ে বাংলাদেশকে বসে রাখার কৌশল নেয় এবং তারা সফলও হয়!

এই প্রসঙ্গে আরও বলে রাখি, সম্প্রতি ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির উপর একটি বায়োপিক রিলিজ করছে নেটফ্লিক্স, নাম “ইমার্জেন্সি”। এটা দেখলে মনে হবে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বলে যা বলা হয়, তার কিছুতেই হয়নি, বরং ভারতের তৎকালীন মহাপরক্রমশালী(!) সেনাপ্রধান মানেক শ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে মাত্র ১৩ দিনের অতি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক একটি ভূখণ্ড উপহার হিসেবে দিয়েছেন!

ইতিহাস বিকৃতি কাহাকে বলে, কত প্রকার এবং কি কি, ওখানে দেখতে পাবেন!

বি:দ্র: লেখক মহিউদ্দিন তার ফেসবুক ওয়ালে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবী তুলে ধরেছেন, নিচে সেটা শেয়ার দিলাম!

‘৫৪ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসা যথেষ্ট হয়েছে, এটি আর নয়’- বলে মন্তব্য করেছেন লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ। বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নিজের লেখা বই *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*-এর একটা ছবি জুড়ে দিয়ে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসে এ মন্তব্য করেন তিনি।

এতে তিনি লিখেন, ‘অনেক সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাননি। আমিও তাদের একজন। আমি একাত্তরের ৩১ জুলাই অস্ত্র নিয়ে দেশে ঢুকেছিলাম। অথচ ডিসেম্বরের ১৬ তারিখের পরে ভারত থেকে আসা লোকেরা রাইফেল হাতে পোজ নিয়ে ছবি তুলে দিব্বি ভাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। একটা সার্টিফিকেটের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, এটা কখনো মাথায় আসেনি।’

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব জানিয়ে তিনি ওই স্ট্যাটাসে আরও লিখেন, ‘অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বছরের পর বছর গরিবের ট্যাক্সের টাকায় পেনশন নিচ্ছে। কয়েক বছর পরপর সরকার বদল হয় আর দলীয় বিবেচনায় মুক্তিযোদ্ধার তালিকা বদলায়। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।’

আমার প্রস্তাব:

১. মুক্তিযোদ্ধা ভাতা অবিলম্বে বন্ধ করুন। কারণ এই ভাতার গন্ধেই ধান্দাবাজেরা জুটেছে।

২. জামুকা এবং মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করুন। এরা টাকা খেয়ে অনেককে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়েছে।

৩. দুর্নীতির আখড়া মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ভেঙে দিন এবং এই সংস্থার আয়ত্বে থাকা সকল বাণিজ্যিক স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান নিলাম ডেকে বেচে দিন।

তিনি আরও লিখেন, 'আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছি বিবেকের তাড়নায়। ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য নয়। যারা বেতন-ভাতা, পদ-পদোন্নতির জন্য যুদ্ধ করে, তাদের আমরা মার্সেনারি বা ভাড়াটে যোদ্ধা বলি। ৫৪ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায় যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।'

কেন ক্ষমা চাইবো আমি? বরং রাষ্ট্রপতির উচিৎ আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

মীর কাশেম আলী।

কথাটি পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সেরা উক্তি বলে মনে করা হয়। জালিমের হাতে বন্দি থেকে কেবলমাত্র একজন নির্ভীক আল্লাহর গোলামের পক্ষেই এমন করে বলা সম্ভব।

এই রাষ্ট্র আমার প্রতি ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই রাষ্ট্র আমার ছেলেকে নিরাপত্তা দেয়ার পরিবর্তে তাকে অপহরণ করে প্রমাণ করেছে আমার প্রতি তারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায়। অতএব ক্ষমা কে চাইবে আপনারাই বলুন?

তোমরা কী ভেবেছো?
আমি রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইবো? কেন ক্ষমা চাইবো? আমি তো কোন অপরাধ করিনি!

বরং এই বাংলাদেশকে আমি তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ সিঙ্গাপুরের মত বানাতে চেয়েছি। উদ্যোক্তা হিসেবে অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল গড়ে তুলেছি।

বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল করেছি। যাতে এদেশের মধ্যবিত্তরা বিদেশে চিকিৎসার জন্য ব্যর্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।

আমাদের ইবনে সিনা হাসপাতাল দেখে আজ অনেকেই বড় বড় হাসপাতাল বানিয়েছে। আমরা তাদের সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আমি অগ্রপথিক তা কিন্তু মানতে হবে।

তাদের হাসপাতাল উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে হয়ত আমার ইবনে সিনাকে ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু সেবায় কি ইবনে সিনাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে?

আমাদের *নয়াদিগন্ত* পত্রিকা, দিগন্ত টেলিভিশন যেমনি জনপ্রিয় তেমনি পেয়েছে গ্রহণযোগ্যতা। আমি কতভাবেইনা এই বাংলাদেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চেয়েছি।

আমাদের ইসলামি ব্যাংক যা কিনা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। সমাজ থেকে দারিদ্র ও বৈষম্য ঘুচাতে ইসলামি ব্যাংকের কত শত প্রজেক্ট ছিল, সেবাগ্রহীতাদের মাঝে ইসলামি অনুশাসন মেনে চলার তীব্র অনুভূতি জাগিয়ে তোলার নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি ছিল। আজ সে ব্যাংক সরকারের সবচেয়ে বড় ডোনার।

বিশ্বাস করুন এই ব্যাংকে যারা ব্যাংকিং ভাল বোঝে তাদের নয় বরং ইসলাম ভাল বোঝে এমন লোকদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। কত পরিক্ষিত ত্যাগী ভাইদের জড়ো করেছিলাম, বিবিএ-এমবিএ বাধ্যতামূলক ছিল না, মাদ্রাসার কামেল পাশ, ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স পাশ ভাইদের নিয়োগ দিয়েছিলাম যাতে তারা ব্যাংক নয় ইসলামকে রক্ষা করে চলতে পারে।

কিন্তু আফসোস! কী চেয়েছিলাম আর কী হলো?

মৌমাছিরা মৃত্যুর জন্য মোটেও ভয় পায় না। একজন মানুষকে মারতে হলে প্রায় ১১০০ হুলের বিষ প্রয়োজন। আনুমানিক ১ কেজি মধু সংগ্রহের জন্য ১১০০ মৌমাছি প্রায় ৯০ হাজার মাইল পথ ঘুরতে হয়। যা কিনা চাঁদের কক্ষপথের প্রায় তিনগুণ!

ফুলের হিসাব করলে দেখা যায় ১ কেজি মধু সংগ্রহের জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ ফুলের পরাগরেণু স্পর্শ করতে হয়। সবকিছু ঠিক থাকলে ভালো মৌসুমে প্রায় ৫৫ কেজি মধু জমা হয়। এসব তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি কর্মী মৌমাছি কি পরিমাণ পরিশ্রমী।

অপরদিকে রাণী মৌমাছি শুধু খায় আর ডিম পাড়ে! রাণী প্রতিদিন ১৫০০ থেকে ২৫০০ ডিম দেয়। পুরুষ মৌমাছির স্বভাব বেশ অদ্ভুত। এরা জীবনেও কোন কাজ করে না, এমনকি কর্মী মৌমাছিকে এদের খাবার পর্যন্ত মুখে তুলে দিতে হয়। এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ হলো রাণী মৌমাছির সাথে মিলিত হওয়া!

মিলন মৌসুমে প্রতিদিন দুপুরবেলা চাকের সর্বাধিক সক্ষম পুরুষ মৌমাছিগুলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভিড় জমায় যাকে বলা হয় পুরুষ ধর্মসভা!

ঠিক একই সময়ে চাক থেকে রাণী মৌমাছি ঘুরতে বের হয়, যাকে বলা হয় "দি মিটিং ফ্লাইট"।

রাণী মৌমাছি হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে পুরুষ ধর্মসভা এলাকায়। সে এসেই এক বিশেষ ধরণের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে শত শত পুরুষ মৌমাছি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এর পরপরই রাণী মৌমাছি উড়ন্ত অবস্থায় পছন্দমত পুরুষের সাথে মিলন করে। রাণী মৌমাছি একেবারে পর্যায়ক্রমে ১৮-২০টা পুরুষ মৌমাছির সাথে মিলিত হতে পারে!

অদ্ভুত ব্যাপার হল, যৌন মিলনের সময় পুরুষ মৌমাছির এন্ডোফেরাস বা যৌনাঙ্গ ভেঙ্গে যায় এবং তখনই মারা যায় পুরুষ মৌমাছি। এজন্যই এই মিলনকে বলা হয় "দি ড্রামাটিক সেক্সুয়াল সুইসাইড"।

একটি মৌচাক একটি মাত্র রাণী স্ত্রী মৌমাছি থাকে। রাণীকে কেন্দ্র করেই মৌচাক গড়ে ওঠে।

যদি কোনো ডিম থেকে স্ত্রী মৌমাছির জন্ম হয় সে শিশু স্ত্রী মৌমাছিকে কর্মী মৌমাছিরা লুকিয়ে রাখে যেন রাণীর নজরে না আসে। রাণীর নজরে পড়লে ঐ শিশু স্ত্রী মৌমাছির নিশ্চিত মৃত্যু। শিশু রাণী মৌমাছিটি বড় হলে দুই রাণীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এতে দুটি পথ খোলা থাকে। হয় যুদ্ধে মৃত্যু (একজন অপরজনকে হত্যা করে মৌচাকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে) না হয় দুজন আলাদা হয়ে পৃথক দুটি মৌচাক গড়ে তোলা।

অনাকাঙ্খিতভাবে যদি কোন রাণী মৌমাছি মারা যায় তবে সে খবর ১৫ মিনিটের মধ্যে সকল কর্মী মৌমাছি জানতে পারে এবং সম্মিলিতভাবে নতুন রাণী মৌমাছি তৈরি করার উদ্যোগ নেয়।

আরো কিছু অদ্ভুত বিষয় রয়েছে, যা জানলে আপনারা অবশ্যই অবাক হবেন,,, ৫০০ গ্রাম মধু তৈরিতে ২০ লক্ষ ফুল লাগে। শ্রমিক বা কর্মী মৌমাছি সারা জীবনে আধা চা চামচ মধু তৈরি করতে পারে। আরো একটা মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবীতে মধু একমাত্র খাদ্য যা কখনোই পচে না!

সুবহানাল্লাহ!

কিয়ার স্টারমারের নৈতিক পরাজয়! ব্রিটেন কেন অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গেল?

নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস লন্ডনে এসেছিলেন বাংলাদেশের লুট হওয়া প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার উদ্ধারের ব্যাপারে কথা বলতে। তাই তিনি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং দুদকের চেয়ারম্যানকে। এর

আগেও গভর্নর মনসুর সাহেব নিজেই এসেছিলেন পাচার হওয়ার অর্থের খোঁজ করতে কিন্তু তখনই তিনি ব্রিটেনে অসহযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। পত্রিকায় এখবর এসেছিলো। এখানে বিপুল মানি লন্ডারিং এর প্রশ্ন জড়িত।

ব্রিটিশ দৈনিক *Financial Times* জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের সম্পত্তি, ব্যাংক ও অফশোর কোম্পানিতে এসব অর্থ লুকানো হয়েছে, যার সঙ্গে বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী যুক্ত। এই পাচারকৃত অর্থের মধ্যে লেগে আছে অনেক মানুষের খুনের রক্তের দাগ, গুম হয়ে যাওয়া মানুষের আর্তনাদ, ব্যাঙ্ক , শেয়ার বাজার লুটে নিঃস্ব হওয়া শত শত মানুষের কান্না।

কিন্তু তবুও প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে দেখা করলেন না।

কেন?

কারণ এই আলোচনা হলে প্রশ্ন উঠে যেত লুট হওয়া অর্থের সঙ্গে যুক্ত কিছু প্রবাসী বাংলাদেশি প্রভাবশালী ও লন্ডনভিত্তিক রাজনৈতিক মহলের সম্পর্কের ব্যাপারে। অনেকেই মনে করছেন, এ নিয়ে কথা উঠলে লেবার পার্টির নির্বাচনী তহবিলেও আঁচ পড়তে পারত।

তবু ন্যায়বিচার কি রাজনীতির বলি হবে?

যদি “গ্লোবাল ব্রিটেন” সত্যিই ন্যায় ও স্বচ্ছতার পক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে ১৮ কোটি বাংলাদেশের গরিব জনগণের লুট হওয়া অর্থ ফেরানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা যুক্তরাজ্যের নৈতিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশ দেখছে। বিশ্ব দেখছে। ইতিহাস একদিন এই প্রশ্ন করবেই – কে কে অপরাধীদের পাশে ছিল, আর কে ছিল মানুষের পাশে।

বৃদ্ধ বয়সে ভালো থাকার ২০ উপায় :

১. সন্তানদের জীবনে বেশি জড়িয়ে পড়বেন না।

২. নাতি-নাতনিদের লেখাপড়ার বিষয়ে বেশি নাক গলাবেন না।

৩. পুত্রবধূ ও জামাইকে ভালোবাসুন, ওরা আপনার ছেলেমেয়েদের পছন্দের মানুষ।

৪. সন্তানদের বৈবাহিক ব্যাপারে বেশি মতামত দেবেন না।

৫. ঘ্যানঘ্যানে স্বভাব বর্জন করুন।

৬. একাধিক সন্তান থাকলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন। পক্ষপাতিত্ব বা দলাদলি করবেন না।

৭. আমাদের সময়ে এটা হতো ওটা হতো সারাদিন এসব কথা বলবেন না। ওগুলো অতীত, আপনার ইতিহাস যা নিয়ে কেউ ইন্টারেস্টেড নয়।

৮. রাজনীতি নিয়ে বেশি মাতামাতি করবেন না। আপনি কিছুই পাল্টাতে পারবেন না।

৯. নিজের অসুস্থতা নিয়ে যতটা সম্ভব কম কথা বলুন।

১০. উপার্জন থাকলে প্রতি মাসে সঞ্চয় করুন।

১১. নিজের ভবিষ্যৎ চিকিৎসার জন্য আলাদা সেভিংস রাখুন।

১২. নিজের শেষকৃত্যের জন্য সুব্যবস্থা করে রাখুন।

১৩. ভবিষ্যতের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখুন। বুড়ো হয়েছেন বলে আপনার সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি।

১৪. আনন্দের জন্য সিনেমা দেখুন বা গান শুনুন।

১৫. কোনো সংবাদেই বিচলিত বা উত্তেজিত হবেন না। জীবনকে নির্মোহ এবং নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করুন।

১৬. কিছু না করে চুপ করে বসে থাকবেন না। কর্মচঞ্চল থাকার চেষ্টা করুন। বাগানের কাজ করুন, পারলে রান্না করুন, ব্যায়াম করুন বা হাঁটতে যান।

১৭. ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। শরীরের যত্ন নিন। সাজগোজও চালু রাখুন।

১৮. বয়সকে সাদরে গ্রহণ করুন। প্রতিদিন আনন্দ নিয়ে বাঁচুন।

১৯. নিজেকে কারো দয়ার পাত্র বানাবেন না।

২০. বেড়াতে যাওয়া, বাইরে খাওয়া বা অন্য কোনো আনন্দের সুযোগ নষ্ট করবেন না। হাতে আর সময় নাও থাকতে পারে।

বিশ্বাস করুন আর নাই বা করুন, বাংলাদেশে এই নামের নদীগুলো আছে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে আছে 'পাগলা' নদী আর কুমিল্লায় আছে 'পাগলি'। 'সতা' নদ আছে নেত্রকোনায়, 'সতি' আছে লালমনিরহাটে, 'মহিলা' নদী দিনাজপুরে, 'পুরুষালি' নদী ফরিদপুরে, 'মাকুন্দা' আবার সিলেটে।

সিলেটে আছে 'ধলা' নদী আর দিনাজপুরে আছে 'কালা' নদী, হবিগঞ্জে আছে 'শুঁটকি' নদী, পঞ্চগড়ে আছে 'পেটকি', আবার পাবনায় আছে 'চিকনাই' নদী। 'বামনী' নদী আছে নোয়াখালীতে, 'ফকিরনি' আছে নওগাঁয়।

চুয়াডাংগায় ‘মাথাভাঙ্গা’, নীলফামারীতে ‘চুঙ্গাভাঙ্গা’, হবিগঞ্জে ‘হাওরভাঙ্গা’, সাতক্ষীরায় ‘হাঁড়িয়াভাঙ্গা’, পটুয়াখালীতে ‘খাপড়াভাঙ্গা’, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ‘নাওভাঙ্গা’, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছে ‘ছিটিভাঙ্গা’।

বাগেরহাটে ‘পুঁটিমারা’ লালমনিরহাটে ‘সিঙ্গীমারা’, খুলনায় ‘শোলমারা, খাগড়াছড়ির ‘গুইমারা’, সাতক্ষীরায় ‘সাপমারা’, পঞ্চগড়ে ‘ঘোড়ামারা’, হবিগঞ্জে ‘হাতিমারা’, চুয়াডাঙ্গায় ‘ভাইমারা’ ও সুনামগঞ্জে ‘খাসিয়ামারা’ নামে নদী আছে।

ফরিদপুরে আছে ‘কুমার’, চট্টগ্রামে আছে ‘ধোপা’, নওগাঁয় আছে ‘গোয়ালা’, আর সিরাজগঞ্জে আছে ‘গোহালা’।

‘ঢাকী’ আছে খুলনায় আর ‘বংশী’ নদী আছে সাভারে। ‘লুলা’ নদী সিলেটে, ‘খোড়া’ নদী নীলফামারী, ‘বোকা’ নদী ছাতক আর ‘খ্যাপা’ নদী সিলেটে।

আবার ‘মগরা’ নদী নেত্রকোনা, ‘ফটকি’ নদী মাগুরা, মঘা’ নদী ময়মনসিংহ, ‘ল্যাঙ্গা’ নদী গাইবান্ধা, ‘হাবড়া’ নদী সাতক্ষীরা, এবং ‘হোজা’ নদী রাজশাহী।

লঙ্কা’ নদী বরিশালে, ‘গুড়’ নদী নাটোরে। ‘ক্ষীর’ নদী ময়মনসিংহে, ‘লোনা’ নদী ঠাকুরগাঁওয়ে। ‘নুনছড়া’ আছে সিলেটে, ‘কালিজিরা’ বরিশালে, সুনামগঞ্জে আছে ‘লাউগাং’ আর ‘লাচ্ছি’ নদী আছে ঠাকুরগাঁওয়ে।

পটুয়াখালীতে আছে ‘পায়রা’, খুলনায় আছে ‘ময়ূর’, দিনাজপুরে আছে ‘শুক’ (টিয়া), সিলেটে ‘সারি’ (শালিক), বাগেরহাটে আছে ‘বগী’, সিলেটে ‘কুড়া’, রাজশাহীতে আছে ‘কোয়েল’, রাজবাড়ীতে ‘চন্দনা’, পঞ্চগড়ে আছে ‘ডাহুক’, সুনামগঞ্জে ‘ডাহুকা’, মৌলভীবাজারে আছে ‘মুনিয়া’।

পাবনায় আছে ‘কমলা’, সুনামগঞ্জে ‘খুরমা’, কুমিল্লায় ‘কালাডুমুর’ নদী। সিলেটের জকিগঞ্জে আছে ‘তাল’ ও ‘কুল’ নামে দুই গাং। ফেনীতে আছে ‘মুহুরী’, মৌলভীবাজারে ‘জুড়ী’, রংপুরে আছে ‘কাঠগড়া’ নদী।

আর যশোরে আছে ‘টেকা’, বরিশালে ‘পয়সা’, সিরাজগঞ্জে ‘দশসিকা’, জামালগঞ্জে আছে ‘দশানী’ নদী। ‘বিষখালী’ নদী ঝালকাঠি/বরগুনায় আর ‘নির্বিষখালী’ নদী মাগুরায়। বালু নদী গাজীপুরে, বালিখাল হবিগঞ্জে, বালুখালী চট্টগ্রামে আর বালুভরা নওগাঁয়।

‘ঘাগড়া’ আছে পঞ্চগড়ে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ‘ঘুঙ্গুর’, আর নরসিংদীতে ‘কাঁকন’। আবার ‘ছেঁড়া’ নদী খুলনায় ‘ফুটা’ নদী টাঙ্গাইলে। ভোলায় ‘কলমি’, শরীয়তপুরে ‘পালং’, মাদারীপুরে ‘ময়নাকাঁটা’, বরিশালে ‘লতা’ আর সিলেটে আছে ‘শ্যাওলা’ নদী। কলকলিয়া হবিগঞ্জে, হলহলিয়া কুড়িগ্রামে, ঝনঝনিয়া গোপালগঞ্জে, ঝপঝপিয়া খুলনায়, জিরজিরা জামালপুরে, গড়গড়া গাজীপুরে। পড়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।

তথ্যচিত্র: সংগ্রহীত

উনার নাম সৈয়দ আলী

উনার নাম সৈয়দ আলী। উনি ইরানের খোমাইন শহরে জন্ম গ্রহন করেন তাই তাকে আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনি বলা হয়। উনি ইসলামী সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছেন ইরাক ও ইরানের বিখ্যাত মাদ্রাসা হতে। তার উপাধী আয়াতুল্লাহ যা ফিকাহবিদ/ মুজতাহিদ/ আল্লামা সমতুল্য। তাছাড়াও তিনি নবী সাঃ এর ৩৮ তম বংশধর। নবী সাঃ এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন রাঃ এর ছেলে ইমাম জয়নাল আবেদীন এর বংশধর। উনার মাথায় কালো পাগড়ী তাঁর চিহ্ন বহন করে। উনি শিয়া মাজহাবে প্রচলিত বেশ কিছু বিতর্কিত বিষয় সমাধান করে শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করতে ভালো কিছু ফতোয়া জারি করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে সাহাবীদের গালি না দেয়া, মহররমে শরীর থেকে রক্ত না ঝরানো, সকল মাজহাবের মুসলিম একই মসজিদে নামাজ পরার তাগিদ ইত্যাদি যা মুসলিম ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান হয়ে থাকবে।

Knowledge

....মিথিলেশ কুমার শ্রীবাস্তব, যিনি “নটবরলাল” নামে অধিক পরিচিত, ছিলেন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম কুখ্যাত প্রতারক। তিনি ১৯১২ সালে বিহারের সিওয়ান জেলার জিরাদাই গ্রামের বাংরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা রঘুনাথ প্রসাদ ছিলেন একজন রেলওয়ে কর্মচারী। ছোটবেলা থেকেই মিথিলেশ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন এবং স্বাক্ষর জাল করার দক্ষতা অর্জন করেন। তার প্রতারণার জীবন শুরু হয় যখন তিনি তার গ্রামের এক ব্যক্তির স্বাক্ষর জাল করে ব্যাংক থেকে ১,০০০ টাকা তুলে নেন, যা ১৯৩০-এর দশকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছিল।

মিথিলেশ কলকাতায় পালিয়ে যান এবং সেখানে আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি স্টক ব্রোকার হিসেবেও কাজ করেন এবং ব্যাংকিং ও ব্যবসায়িক ব্যবস্থার ফাঁকফোকর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এই জ্ঞান ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতারণা চালিয়ে যান। তিনি ৫০টিরও বেশি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর নিখুঁতভাবে জাল করতে পারতেন।

নটবরলালের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে তাজমহল তিনবার, লালকেল্লা দুইবার, রাষ্ট্রপতি ভবন এবং সংসদ ভবনসহ ৫৪৫ জন সংসদ সদস্যকে বিক্রি করা। তিনি ধীরুভাই আম্বানি, টাটা ও বিড়লা গ্রুপের মতো বিশিষ্ট শিল্পপতিদের স্বাক্ষর জাল করে মানুষকে ঠকিয়েছেন।

নটবরলালের বিরুদ্ধে ভারতের আটটি রাজ্যে ১০০টিরও বেশি মামলা দায়ের হয়েছিল এবং বিভিন্ন মামলায় তার মোট ১১৩ বছরের কারাদণ্ড হয়। তবে তিনি

মাত্র ২০ বছর জেল খেটেছেন এবং নয়বার জেল থেকে পালিয়ে গেছেন। ১৯৯৬ সালে, ৮৪ বছর বয়সে, কানপুর জেল থেকে দিল্লির এমস হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি নিখোঁজ হন। তার মৃত্যুর সঠিক সময় ও স্থান নিয়ে আজও ধোঁয়াশা রয়েছে।

নটবরলাল তার গ্রামের দরিদ্রদের সাহায্য করতেন এবং অনেকেই তাকে "রবিন হুড" হিসেবে দেখতেন। তবে তার প্রতারণার কাহিনী আজও ভারতের ইতিহাসে একটি রহস্যময় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।....

PK das wall

ÒIn a moment that should've stopped time, Jimmy Carter—quiet as a monk, sharp as a scalpel—offered a truth so unassuming, most missed the incision. He was speaking to Trump, but really, he was speaking to all of us.

Carter's point was this: While China has spent decades laying tracks for the future, we've been digging graves in the past. They've built cities, schools, trains that move faster than thought. We've built military bases, debt, and an empire of rust.

It wasn't a boast. It was an autopsy.

China chose infrastructure. We chose interference. They built railways across continents. We bombed bridges across borders. They invested in AI, medicine, and education. We invested in overthrowing oil-rich governments, branding it freedom.

We spent $300 billion trying to bend the world to our will. They spent it making their own nation unshakable.

We don' have high-speed trains. We don' have roads that last. We don' have universal healthcare, or education systems that top the charts. But we do have the most advanced weapons on Earth, pointed at every direction but inward.

If we'd used even a fraction of that money on ourselves, our cities would hum like circuits. Our schools would shine. Our hospitals would heal. Our people might feel something we haven't felt in a long time—progress.

That was Carter' quiet bombshell: the war we're losing isn't to China. It's to our own addiction to dominance. And our refusal to invest in anything we can't control.'

Author unknown

সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি, এমন সময় আমার স্ত্রী বলে উঠল, আজ তুমি তিয়াশার স্কুলে যাবে। অংকের ম্যাডাম নাকি ডেকেছেন।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। আর আমার স্ত্রী একটা সরকারি হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। স্বভাবতই,দুজনেই বেশ কড়া ধাঁচের মানুষ, বিশেষত সকালে।

তিয়াশা ক্লাস ফাইভে পড়ে। এমন কিছু ভয় পাওয়ার ছিল না, তবুও মনে হল ম্যাডাম যখন আলাদা করে ডেকেছেন, নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর বিষয়।

স্কুলে গিয়ে দেখি বিশাল একটা ঘর। এক কোণে বসে আছেন গম্ভীর মুখে চশমা পরা অংকের ম্যাডাম। ঠিক যেন কোনও জজ সাহেব। পেছনে অভিভাবকদের সারি। এক এক করে নাম ডাকা হচ্ছে, বিচার চলছে।

প্রথমেই উঠল ঈশানীর মা। ঈশানীর তিনটা অংক ভুল হয়েছে শুনেই বলে উঠলেন, বাড়ি গিয়ে দেখিস!এবার তোর সব টিউশন বন্ধ করে দেবো।

তারপর রিয়া। ম্যাডাম বললেন, ভুলভাল অঙ্ক কষছে। তখনই রিয়ার বাবা গর্জে উঠলেন,আজ থেকে মোবাইলটা খেলার বদলে বই পড়বি, না হলে!

বাচ্চারা একে একে ডেকে নিয়ে অপমানিত হচ্ছে, আর অভিভাবকেরা যেন সেই অপমানকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কারও কাঁধে হাত রেখে বোঝানোর ভাষা নেই।

অবশেষে ডাক এল তিয়াশার।

আমি শান্তভাবে এগিয়ে গেলাম।

ম্যাডাম বললেন,আপনার মেয়ে বেশ কিছু অংক পারেনি। ওর মনোযোগ ঠিক নেই মনে হচ্ছে।

আমি হাসলাম। বললাম, ম্যাডাম, অর্ধেক অংক তো শিখেছে!বাকিটা সময়ের সঙ্গে শিখে নেবে। আমরা তাকে শেখার আনন্দটা নষ্ট হতে দিতে চাই না।

তিনি বিস্মিত মুখে তাকালেন, আপনি নিশ্চিন্ত এতটা?

আমি নিজে মাধ্যমিকে অংকে পঁচিশ পেয়েছিলাম। আমার স্ত্রী পেয়েছিল সাতাশ। অথচ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, আর ও বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। তাই না ম্যাডাম, জীবনের রেজাল্ট সব সময় নম্বরে মাপা যায় না!

তিয়াশা আমার হাত চেপে ধরল। মুখে ছোট্ট একটা হাসি। আর আমার হৃদয়টা ভরে উঠল।

ফিরে আসার সময় তিয়াশা বলল,বাবা, আজ চিকেন খেতে পারি?

আমি বললাম,শুধু তুই না, রিয়াকেও ডাক। ওর বাবার কথা শুনে মনে হল আজ খেতে পাবে না ও।

বাচ্চারা বইয়ের পাতার চেয়ে বড়ো কিছু তাদের মন, তাদের প্রশ্ন, তাদের আবেগ।অঙ্ক ভুল করলে ভয়ের নয়,ভুল শুধরে নিতে শেখাটাই বড়ো।

চাপ দিয়ে নয়, পাশে থেকে শেখালে ওরাই একদিন আমাদের থেকেও বড়ো হয়ে উঠবে।

সাল-সারা (সিরিয়া)

মধ্যপ্রাচ্যের ধূলিমলিন যুদ্ধক্ষেত্রে সিরিয়া এখন এক নাটকীয় মঞ্চ। সিরিয়ার রাজপথে বাশার আসাদের পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছিল। দীর্ঘদিনের দমননীতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং স্বাধীনতার অভাব সাধারণ মানুষের মনে বিদ্রোহের বীজ বুনেছিল। কিন্তু এই ক্ষোভের ছায়ায় লুকিয়ে ছিল আমেরিকা ও ইসরায়েলের গভীর কৌশল। তাদের লক্ষ্য ছিল সিরিয়ার জনগণের মুক্তি না, বরং ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব ভাঙা। সিরিয়া ছিল ইরানের জন্য একটি লাইফলাইন – হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো সংগঠনগুলোর অস্ত্র ও সমর্থনের পথ। আসাদের পতন এই পথ বন্ধ করার একটি মাস্টারস্ট্রোক ছিল। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আল-শারার নেতৃত্বে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) দামেস্কে প্রবেশ করে আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে, এবং এই পতনে ইসরায়েলের দক্ষিণ-পশ্চিম সিরিয়া দখলের কৌশলগত সমর্থন ছিল স্পষ্ট। আপামর বাঙালি তো বটেই, অনেক দেশের মানুষ তখন বুঝে না বুঝে বিজয় উল্লাস করেছিল। কেউ কেউ তো হাসিনার সাথে ও আসাদের তুলনা করেছিল।

একসময় আল-কায়েদা-ইরাকের সংগঠক হিসেবে আমেরিকার কারাগারে বন্দি আহমেদ আল-শারা ২০১১ সালে মুক্তি পান। কী আশ্চর্য, পরের বছরই তিনি সিরিয়ায় আল-নুসরা ফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তরাষ্ট্র একসময় তার মাথার জন্য ১০ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, কিন্তু ২০২৫ সালের ১৪ মে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার সঙ্গে সৌদি আরবে বৈঠক করেন, যেখানে সিরিয়ার উপর থেকে সমস্ত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এই বৈঠক ছিল একটি ঐতিহাসিক পালাবদল – একজন প্রাক্তন জঙ্গি নেতা থেকে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট, যিনি এখন আমেরিকা ও ইসরায়েলের কৌশলগত মিত্র। আল-শারার এই রূপান্তর যেন এক নাটকীয় প্লট টুইস্ট, যা প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করে: সিরিয়ায় এটি কি সত্যিই বিপ্লব, নাকি একটি বড় পরিকল্পনার অংশ?

চলতি যুদ্ধে সিরিয়ার আকাশসীমা হয়ে উঠেছে একটি মুক্ত করিডোর। ইরান যখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, তখন সেগুলোর বড় অংশ সিরিয়ার আকাশেই ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। এই ধ্বংসাবশেষ

পড়ছে সিরিয়ার গ্রাম-শহরে, কুনেইত্রা ও দারার মতো অঞ্চলে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু আল-শারার সরকার এই হামলার বিরুদ্ধে নীরব, যা ইসরায়েলের জন্য একটি সোনার সুযোগ। ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো সিরিয়ার আকাশে এয়ার-টু-এয়ার রিফুয়েলিং সুবিধা নিচ্ছে, এবং ব্রিটেন সম্প্রতি এই প্রক্রিয়ায় বাড়তি ট্যাঙ্কার সরবরাহ করছে। সিরিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয়, সীমান্ত চৌকি ৯ কিলোমিটার পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে – এসবই ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ভৌগোলিক বাধা দূর করছে। এই নাটকের এই দৃশ্য যেন একটি যুদ্ধের ক্লাইম্যাক্স, যেখানে সিরিয়া হয়ে উঠেছে ইসরায়েলের কৌশলগত ঢাল।

এই নাটকের সবচেয়ে চমকপ্রদ মোড় এলো যখন আল-শারা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইরান ও তার মিত্র সংগঠনগুলো – হামাস, হিজবুল্লাহড়কে 'আঞ্চলিক হুমকি' ঘোষণা করেন। এই বক্তব্য তেল আবিবের জন্য ছিল এক উল্লাসের মুহূর্ত। ইসরায়েল, যারা বছরের পর বছর ধরে সিরিয়ায় ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে, এখন একটি সহযোগী সরকার পেয়েছে। মে মাসে সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি নিরাপত্তা আলোচনা এই সম্পর্কের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ইসরায়েল দক্ষিণ সিরিয়ায় ৪০০ বর্গ কিলোমিটার বাফার জোন দখল করেছে, যা ইরানের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে। এই নতুন রসায়ন ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি বড় ধাক্কা, কারণ ইরানের দুর্বলতা তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এই যুদ্ধে সিরিয়ার পাশাপাশি ইরাক, জর্ডান এবং লেবাননের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসরায়েল থেকে ২০০০ কিমি দূরে ইরান পারি দিতে মাঝে এসব দেশ। ইরাক, যেখানে ২০০৩ সালে সাদ্দামের পতনের পর শিয়া-প্রধান সরকার ক্ষমতায় এসেছে, ইরানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। তবে, আমেরিকার সামরিক ঘাঁটির উপস্থিতি ইরাকের আকাশসীমাকে ইসরায়েলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। জর্ডান, আমেরিকার দীর্ঘদিনের মিত্র, ২০২৪ সালে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সময় তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে ইসরায়েলের পক্ষে ড্রোন ভূপাতিত করেছে। লেবানন, হিজবুল্লাহর প্রভাবের কারণে, ইসরায়েলের জন্য জটিল ক্ষেত্র, তবে সিরিয়ার মাধ্যমে হিজবুল্লাহর সরবরাহ পথে হামলা চালিয়ে ইরানকে দুর্বল করা হচ্ছে। এই দেশগুলোর আকাশসীমা এবং কূটনৈতিক সমর্থন আমেরিকা ও ইসরায়েলের জন্য ইরানের বিরুদ্ধে একটি কৌশলগত সুবিধা তৈরি করছে।

সিরিয়ার এই নতুন সরকারের নীরবতা অভ্যন্তরীণ ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। কুনেইত্রা ও দারায় ধ্বংসাবশেষ পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। স্থানীয় কর্মী এমাদ আল-বাসিরির মতো অনেকে ইসরায়েলি পেট্রোলিং এবং গ্রেফতারের ভয়ে ক্ষুব্ধ। তবু, আল-শারার সরকার এই সংকটের মুখে চুপ। এই নাটকের শেষ কোথায়? সিরিয়ার জনগণ কি আবারও একটি পরাধীনতার শিকার হচ্ছে, নাকি

এটি একটি নতুন স্বাধীনতার সূচনা? পাঁচ বছরের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনের পর নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি কি পূরণ হবে, নাকি এটি আরেকটি কৌশলগত খেলার অংশ?

বুদ্ধিমানরা ১৫-২০ বছর আগে থেকেই প্ল্যান করে বছর বছর ধরে সেটার বাস্তবায়ন করে। বুদ্ধির এই খেলা সাধারণ মানুষ বুঝে না কিংবা বুজলে ও অনেক দেরি হয়ে যায়। সাদ্দাম হোসেনের পতন, আসাদের পতন, আরব বসন্ত, গাদ্দাফির পতনের নেপথ্যে কত খেলা সেগুলো বুঝার জন্য যে দূরদর্শিতা প্রয়োজন বোধকরি আমি/ আমরা সহ বেশিরভাগ মানুষেরই সেটা নেই।

দালাল

Miraz Ahmed

যারা মাথা নত করে, তারা বাঁচে না ইতিহাসে – ইরানকে আয়েশা গাদ্দাফি লিবিয়ার প্রয়াত নেতা কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফির কন্যা আয়েশা গাদ্দাফি ইরানের জনগণের প্রতি এক আবেগময় আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

"ওহে ইরানের গর্বিত ও সংগ্রামী জনগণ!

আমি এমন একজন নারী, যার দেশ ধ্বংস হয়েছে শত্রুর হাতে নয়, বরং পশ্চিমাদের মিষ্টি কথার ফাঁদে। তারা আমার বাবাকে বলেছিল, 'পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ত্যাগ করো, বিশ্ব তোমার জন্য খুলে যাবে।'

আমার বাবা বিশ্বাস করে ছিলেন, কিন্তু ফলাফল ছিল বেদনাদায়ক – ন্যাটোর বোমায় লিবিয়া ছারখার হয়ে গেল। আমরা হারালাম স্বাধীনতা, সম্মান আর ঘরবাড়ি।

ইরানের ভাই ও বোনেরা!

তোমাদের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা এই উপমহাদেশে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যারা মাথা নত করে, তারা ইতিহাসে হারিয়ে যায়; আর যারা সংগ্রাম করে, তারা চিরকাল বেঁচে থাকে মানুষের হৃদয়ে।

আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিরোধই জাতির গৌরব। পশ্চিমাদের প্রতিশ্রুতি যতই মধুর হোক না কেন, তারা শেষমেশ ধ্বংসই ডেকে আনে।

ভালবাসা ও সংহতিতে – আয়েশা গাদ্দাফি"

ইজ-রায়েল স্বীকার করেছে

ইজ-রায়েল স্বীকার করেছে যে আইরন ডোমের ইন্টারসেপশন রেট ৬৫% এ নেমে এসেছে যা আগের দিনেও ছিল ৯০%। গতকালের হামলা বিগ ব্লো ছিল দেশটির জন্য।

একটা বিষয় পরিস্কার করা জরুরি-

ইজ-রায়েল আরব বিশ্ব রুল করে ভীতির মাধ্যমে। শুধুমাত্র আইরন ডোমকেই এমনভাবে কম্ব্যাট প্রুভেন হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং ইজ-রায়েলের ডিফেন্সিভ ক্যাপাসিটি এমনভাবে বলা হয়েছে যেন ইনভিন্সেবল। এই আইরন ডোমের সফলতা এমনভাবে প্রচারিত যে, খোদ তুরস্ক এর এরদোয়ান কপি করে নিজস্ব স্টিল ডোম বানানোর ঘোষনা দিয়েছিল। এরপর ট্রাম্প ঘোষনা দিল গোল্ডেন ডোমের।

এই সব ধারনা উৎপত্তি কিন্তু এই আইরন ডোম যেটা ফিলিস্তিন বা লেবানন থেকে ছোড়া রকেট প্রোজেক্টাইল গুলি ঠেকাতে অসম্ভব রকমের ভাল পারফরম্যান্স করেছিল। এমনমি ড্রোন গুলির ক্ষেত্রেও আইরন ডোম দারুন ইফেক্টিভ হিসাবে কম্ব্যাট প্রুভেন হয়।

প্রশ্ন হল, এই কম্ব্যাট প্রুভেন হওয়াটা হয়েছে হামাস আর হিজিবুল্লাহর খুবি লো টেক রকেট ও ড্রোন ইন্টারসেপশনের জন্য। আধুনিক প্রযুক্তির ম্যানুভারেবল মিসাইলের বিরুদ্ধে কার্যত এর ইফেক্টিভনেস প্রশ্নবিদ্ধ।

এখন প্রশ্ন হল, এই যে ইজ-রায়েলের আঞ্চলিক হেজমনি সৃষ্টির পেছনে ত্রাস সৃষ্টি, অফেন্সিভ এক্টিভিটি, ভীতি ঢোকানোর জন্য আন্তর্জাতিক সকল আইন অমান্য করে একের পর এক জায়গা দখল, স্কুল, হসপিটাল ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠা, অর্ধ লক্ষ মানুষ কে হত্যা করেও ইমিউনিটি, এই পুরো ব্যাপারটা ইজ-রায়েলের জন্য আরব বিশ্বে একটা ন্যারেটিভ সৃষ্টি করতে পেরেছে যে, ইজ-রায়েলের হ্যাডম আছে যা ইচ্ছা তাই করার। সেই সক্ষমতা কারো নেই। তাই চুপ চাপ থাকো।

ইরান এসে ঠিক সেই ন্যারেটিভ চুরমার করে দিয়েছে। এরো-৩, থাড, আইরন ডোম যদি ব্যর্থ হয় তবে মনে হয়না বিশ্বে আর কোন এডি সিস্টেম আছে যেটা সিকিউরিটি এনশিউর করতে পারে।

পূর্বের লেখায় বলেছিলাম, ইজ-রায়েলকে সমীহ করে চলার কারন ঈর্ষনীয় ডিফেন্সিভ ক্যাপাসিটি ও বর্ডারে হামাস, লেবানন, সিরিয়ার মত দেশের সাথে অফেন্সিভ ক্যাপাসিটি।

ইরানের ক্ষেত্রে এর উলটা। ইরানের মিলিটারি ডক্ট্রিন মূলত দুরপাল্লায় ইজ-রায়েলকে টার্গেট করেই অফেন্সিভ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির উপর দাঁড়িয়ে ফলে বিশাল মিসাইলের বহর রয়েছে ইরানের।

শুরুতে হুথিদের কিছু মিসাইল হিট করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে ইজ-রায়েল প্রতিটি মিসাইল ইন্টারসেপ্ট করেছে দুই একটা বাদে। এটাও তাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, যেটা তাদেরকে ইরানে হামলার ঝুকি নিতে উৎসাহ দিয়েছে।

এই প্রাইড বিগত ৩-৪ দিনে ইরানের কাছে শেষ হয়েছে। তেল আবিবে গাজার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। সবাই প্রশ্ন করেন, ইরানের কি ক্ষতি হয়নি? অবশ্যই ইরানের ক্ষতি ইজ-রায়েলের থেকে অনেক বেশি। দেশটি এক যুগ পিছিয়ে গেছে। যেহেতু তাদের ডিফেন্সিভ ক্যাপাসিটি দুর্বল এটা প্রত্যাশিতই ছিল। যেখানে রাশিয়া নিজ দেশে এয়ার সিকিউর করতে পারছেনা ইউক্রেনের সাথে, সেখানে ইরান পারবে এই আশা কখনোই করিনি। যা প্রত্যাশিত সেটা খুব বড় খবর নয়। সেটা হবারি কথা। আর ইরান নিজেও জানে। ফলে তারা এই ক্ষতি এফোর্ড করতে পারবে। তারা এটাও জানে যুদ্ধ শেষ হলে অর্থনৈতিক ক্ষতি চীনের সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে দ্রুতই পুষিয়ে নিতে পারবে। তারা লাক্সারি লাইফ ও লিড করেনা ইজ-রাইলিদের মত।

কিন্তু ইজ-রায়েলের রাজধানী কেপে উঠা, স্টক এক্সচেঞ্জ, রিফাইনারি, মিলিটারি কমান্ড, ইনল্টেলিজেন্স হেড কোয়ার্টার উড়ে যাওয়া এগুলা বিগ খবর। কারন এটা সাধারন কল্পনায় কেই আনেনি দেশটির সুপার ইমপ্রেসিভ ডিফেন্সিভ ক্যাপাসিটির জন্য।

ইরানে হামলায় এই ডিফেন্সিভ ক্যাপাসিটি বিশ্রিভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সেই সাথে ভীতি ছড়ানোর মাধ্যমে ইজ-রায়েল যেই আঞ্চলিক হেজমনি গড়ে তুলেছিল সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যেই দেশটিকে আনটাচেবল ভাবা হচ্ছিল সেই দেশটির প্রধান নেতানিয়াহু নিজেই বলেছেন, ইজ-রায়েল পেইনফুল লস সাফার করেছে।

এই যে ইজ-রায়েল দুর্বল, এই ন্যারেটিভ সকলের কাছে পরিস্কার করে দিতে পারাটাই ইরানের জয়। এটা প্রমাণ করতে পারাই বড় নিউজ যে ইজ-রায়েল দুর্ভেদ্য ও অজয় কিছু না। ইজ-রায়েল কেও আঘাত করা যায়। সেখানেও বলে কয়ে ইভ্যাকুয়েশন নোটিশ দেয়া যায়।

ইজ-রায়েল লেবানন আর গাজায় ইভ্যাকুয়েশন নোটিশ দিয়ে অভ্যস্ত। তারা নোটিশ পেয়ে অভ্যস্ত না। এজন্যই দেশটি ছেড়ে স্রোতের মত মানুষের পালানোর চেষ্টাও ইরানের সফলতা এবং ইজ-রায়েলের আঞ্চলিক হেজমনি ধরে রাখার ক্ষেত্রে বড় হুমকি। এতদিন এই পালানোর ভিডিও শুধু ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে দেখা যেত। এখনো খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে দূর্ভীক্ষ সৃষ্টি করে রেখেছে। এইড নিতে গেলে সেখানেও ইচ্ছে মত শিশু বা বালকদের শুট করে মারতেছে। এই পুরো সিনারিও ইজ-রায়েলের ক্ষেত্রে বুমেরাং হিসাবে আসবে বা আসতে পারে সেটা দেখিয়ে দেয়ার ফলে দীর্ঘমেয়াদে ইজ-রায়েল দারুনভাবে অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়বে।

এই ন্যারেটিভের কারনেই ইজ-রায়েল দুর্বল এটা তারা প্রমাণ করতে দিতে চাইবেনা। এজন্যই মিডিয়ার উপর এত কড়াকড়ি। ৩০ মাস পর্যন্ত জেল জরিমানার ঘোষনা দিয়েছে যারা ইরানের আঘাতের ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেবে তাদের

বিরুদ্ধে। ইজ-রায়েলের হেজমনি ধরে রাখার জন্যই আমেরিকা প্রতিটি ডিফেন্স এসেট মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র মুসলিম দেশগুলির কাছে যেটা বিক্রি করে, ইজ-রায়েলের কাছে তার থেকে উন্নত প্রযুক্তি আছে সেটা নিশ্চিত করেই বিক্রি করে। এমনকি কিছু ক্লেইম দাবি করছে ইজ-রায়েলের অপারেট করা এফ-৩৫ আধির ও অন্যান্য এফ-৩৫ এর থেকে উন্নত এবং আরো লং রেঞ্জে অপারেশন চালাতে সক্ষম।।

ইরান সেখানেই হামলা করেছে। যুদ্ধের শুরুর দিকে স্ট্রাটেজির ক্ষেত্রে যেসব করা উচিত বলেছি, কম বেশি সেগুলাই ইরান করছে। টাইম ও স্পেস না দিয়ে অনবরত মিসাইল ও ড্রোন ওয়েভ পাঠাচ্ছে। ইকোনমিক ইনফ্রাসট্রাকচারে টার্গেটিং করে ধ্বংস করেছে। এই সক্ষমতা ইজ-রায়েলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে কেউ করে দেখাতে পারেনি। আর এজন্যই ইজ-রায়েলের ক্ষতি অনেক বড় খবর যার তুলনায় ইরানের ক্ষতি বেশি হলেও বিগ নিউজ না। এক্সপেক্টেড নিউজ।

ইরানীর ছাত্রী

– গতকাল কথা হচ্ছিলো এক ইরানীর ছাত্রীর সাথে। মাহাদ পিএইচডি করেছে আমার সিনিয়র কলিগের সাথে। আধুনিক খোলামেলা পোষাকের মেয়ে মাহাদ বর্তমান ইরানী ইসলামী সরকারের ঘোর বিরোধী। প্রচুর মেধাবী, এখন কাজ করে জার্মান এক কম্পানীতে

– বললাম তোমার দেশের তো খারাপ অবস্থা। ভাবছিলাম, তার অপছন্দের সরকারের দুরাবস্থা নিয়ে ২-৪টা কথা বলবে। “মোল্লা” সরকারকে গাল মন্দ করবে। ই**সলি-আমেরিকার প্রসংশা করবে। নাহ! অবাক করা বিষয় সে ই*রানী সরকারের কোন সমালোচনা দূরের থাকুক, সাপোর্ট করছে !

– তার মতে এই সরকার পরিবর্তন তো দূরের কথা, বর্তমান সরকার ই**সলি-আমেরিকা নিয়ে যা করছে তাতে তার মতো সরকার বিরোধীরাও সাপ্পোর্ট করছে !

-- বললো, আমরা ইউরোনিয়াম গবেষণা করবো, নাকি বো**মা বানাবো এটা আমাদের ব্যাপার, ওদের কথায় চলবো নাকি !

– বললাম, তোমার দেশ তো শেষ হয়ে যাবে। তার চোখে মুছে আগুন দেখলাম, “আমরা হাজার বছর ধরে আছি, থাকবো। আমরা কোন সরকার চাই, সেটা কি আমেরিকা-ই**সলি ঠিক করে দিবে?”

– বললাম, পুরান শাহ আমল নাকি আবার ফিরে আসবে ! তার মতে, হা আমরা আগের শাহকে অনেকেই পছন্দ করি। কিন্তু বর্তমান শাহ’র ছেলে সেই শাহ না, এটা ‘ই**সলি থেকে আমদানি করা শাহ’। তার সাথে আমাদের কোন সম্মর্ক নাই!

– কয়েকদিন আগে আমেরিকার এক সাবেক মন্ত্রী বলছে ১০জন ইরানী বিজ্ঞানীকে মেরে ফেললে কি হবে? পার**মানবিক মাল মসলা নিয়ে গবেষণা করতে পারেন

এমন বিজ্ঞানীর সংখ্যা ইরানে ১০০০ও বেশী হবে। ২-৪ জনকে মে"রে কিছু করা যাবে না।

– কথা হচ্ছে দুনিয়ার সব কিছুই হচ্ছে "জ্ঞান" যা ধ্বংস করা যায় না। কেড়ে নেয়া যায় না। আত্ন-সম্মান, জাতিবোধ এগুলো অন্যদেশ থেকে ধার করা যায় না। এগুলো সেই মাটি মানুষের নিজস্ব জিনিস।

– দুনিয়ার প্রাচীন সভ্যতার ও জ্ঞান কেন্দ্রের একটি পারস্য বা বর্তমান ইরান। ইসলামের স্বর্নযুগে বাগদাদ-কেন্দ্রিক জ্ঞান এসেছে মূলত পারস্য থেকে। কে জানি সেদিন বলছিল, " আমেরিকার জন্মই তো হলো এই সেদিন, ৫০০ বছর, আর আমরা (ইরানীরা) বেশ দাপটের সাথে বেঁচে আছি কম করে হলেও ৫০০০ বছর ধরে। তোমরা কাকে ভয় দেখাচ্ছ? '

ইতিহাস সবার জানা উচিত

ইতিহাস সবার জানা উচিত, বাচ্চাদের জন্য নিজের ওয়ালে জমা রাখলাম।

ইহুদী ধর্মের জাতির পিতা এবং ইসলাম ধর্মের জাতির পিতা একজন ই, হযরত ইবরাহীম(আঃ)।

ইবরাহীম(আঃ) এর দুই পুত্র, ইসহাক(আঃ) আর ইসমাইল(আঃ)।

হয়রত ইসহাক(আঃ) এর পুত্র ছিলেন হযরত ইয়াকুব(আঃ), উনার আরেক নাম ইস/রা/ইল। এই ইয়াকুব(আঃ) এর বংশকে আল্লাহ্ তা'আলা বনি-ই/সরা/ইল নামে সম্বোধন করেছেন।

হযরত ইয়াকুব(আঃ) এর ১২সন্তানের মধ্যে ১জনের নাম ছিলো ইয়াহুদা। এই ইয়াহুদা এর বংশই পরবর্তীতে সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে।

তাই, বনি-ই/সরা/ইল এর আরেক নাম ই/হু/দী।

ই/হু/দী ধর্ম আর বংশ দুটো আলাদা।

সব ইহুদী বংশের লোক ইহুদী ধর্মের হলেও সব ইহুদী ধর্মের লোক ই ইয়াহুদার বংশ নয়।

এই ইয়াহুদা ই কিন্তু তার আপন ভাই ইউসুফ(আঃ) কে কূপে ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিল!

৪ হাজার বছর আগে ইসহাক(আঃ) এর মৃত্যুর পর ইয়াকুব(আঃ) আল্লাহ্'র নির্দেশে শামনগরী (সিরিয়া) থেকে কেনানে হিজরত করেন। এই কেনান ই বর্তমানের ফিলিস্তিন।

এরপর কেনানে (ফিলিস্তিন) দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইয়াহুদা তার সব ভাই এর সাথে মিশরে চলে যায় এবং মিশরে বসবাস শুরু করে।

মিশরের তখনকার রাজা ছিলেন ইউসুফ(আঃ), যিনি ইয়াকুব(আঃ) এর ১২সন্তানের মধ্যে ১১তম। সেই কারণে ইয়াহুদা ও তার বংশ মিশরে অনেক দাপটের সাথে থাকতে শুরু করে।

তারপর কালের পরিক্রমায় ক্ষমতা যায় ফারাও রাজাদের হাতে। ফেরাউন এসে বনি-ই/সরা/ইলদের এত অত্যাচার শুরু করে যে এরা সারাদিন 'ইয়া নাফসী' 'ইয়া নফসী' করতো।

তখন আল্লাহ্ তাদের কাছে পাঠালেন মূসা(আঃ) আর তাওরাত কিতাব। মুসা(আঃ) ফেরাউনকে নীলনদে ডুবানোর মাধ্যমে বনি-ই/সরা/ইল মুক্তি পায়।

তারপর মূসা(আঃ) সবাইকে নিয়ে কেনানে (ফিলিস্তিন) ফিরে যান। পরে তারা সেখানে গিয়ে আল্লাহ্'র অশেষ রহমত পাওয়া সত্ত্বেও মুসা(আঃ) এর ওফাতের পর আবার আল্লাহ্ কে ভুলে যায়, গরুপূজা সহ নানা রকম অনাচার শুরু করে।

তারপর তাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভে নিজেদের একতা ভেঙ্গে যায়, ভিনদেশীরা তাদের এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের আবার গোলাম বানিয়ে অত্যাচার করতে থাকে।

এর ১০০বছর পরে দাউদ(আঃ) আর উনার ছেলে সুলাইমান(আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আবারও এই অত্যাচার থেকে তাদেরকে মুক্তি দেন।

কিন্তু সুলাইমান(আঃ) এর মৃত্যুর পর ই/হু/দীরা আবার শয়তানের পূজা শুরু করে। তাদের ভিতরে থাকা ধর্ম ব্যবসায়ীরা তাওরাত কিতাবের মধ্যে নিজেদের সুবিধামত সংযোজন-বিয়োজন করার মতন ধৃষ্টতা দেখায়।

তারা তাওরাতে সংযোজন করে যে, "আল্লাহ্ তায়ালা ইসহাক(আঃ) এর স্বপ্নে কেনানকে ইহুদীদের জন্য প্রমিজ ল্যান্ড হিসেবে দিয়েছেন, এটা তাদের জয় করে নিতে হবে।"

এটাকে তারা 'জেকব লেডার ড্রিম' বলে।

তাদের এমন নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতার কারণে তারা বারবার আল্লাহ্'র শা/স্তির মুখে পড়েছে। যেমনঃ

কখনো গৃহহীন হয়ে যাযাবরের মতো ঘুরেছে,

ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্যের দ্বারা গণহ/ত্যার শিকার হয়েছে,

রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা সিরিয়া থেকে আরব দেশে বিতাড়িত হয়েছে।

মহানবী(সাঃ) এর সময় তারা আরব দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে যায় ইউরোপে।

আর উমার(রা:) ফিলিস্তিন ও আল-আকসা বিজয় করেন।

আজ ইস/রা/য়েলের এতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইউরোপও তখন তাদেরকে আশ্রয় দেয়নি।

বনি-ইস/রা/ইলের এমন পরিণতির কারণ আল্লাহ তায়ালা এর শা/স্তির পাশাপাশি তাদের ব্যবহার!

তখনকার লোকদের ভাষ্যমতে, তারা অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ ছিল।

তাদেরকে যে জায়গায় আশ্রয় দেয়া হতো সেই জায়গাতেই তারা তাদের প্রতিবেশীর জমি দখল করতো!

ই/হু/দীরা বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ছিল আর তাদের ব্যবসা অন্যদের থেকে কৌশলগতভাবে আলাদা ছিলো, যার কারণে যাযাবরের মতো ঘুরলেও তাদের অর্থ-সম্পদ ভালোই ছিল। সেই অর্থ-সম্পদ এর দাপট দেখিয়ে তারা সেইসব এলাকার স্থানীয় লোকদের উপরই ছড়ি ঘুরাতো।

তাই তারা সেইসব এলাকার রাজা ও বাসিন্দাদের দ্বারা বার বার বিতাড়িত হতো।

বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার পর তারা একসময় বুঝতে পারে যে, যেকোনো সমাজকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে শিক্ষা ও অর্থের বিকল্প নেই।

তাই তারা শিক্ষা অর্জন ও অর্থ উপার্জনের উপর গুরুত্ব দেয়।

তারা বিশ্বাস করে, কেনান তাদের জন্য সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভূমি।

তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, একসময় তাদের একজন মসিয়াহ্(দাজ্জাল) এসে তাদের এই ভূমিকে উদ্ধার করে দিবে।

১৮ শতাব্দীতে ই/হু/দীরা তাদের ধর্ম-পরিচয় গোপন করে ইউরোপে বসবাস শুরু করে।

তখন থিওডোর হার্জেল নামে তাদেরই একজন ব্যবসায়ী ফিলিস্তিনকে নিজেদের দখলে আনার লক্ষ্যে ১৮৯৭ সালে জিওনিজম আন্দোলন শুরু করে ই/হু/দীদেরকে আবারও নতুন করে স্বপ্ন দেখানো শুরু করে।

এই আন্দোলনকে যারা সমর্থন করে, তাদেরকে জিওনিস্ট বলে।

যেহেতু ই/হু/দীরা অনেক শিক্ষা অর্জন আর অর্থ উপার্জন করেছিলো, তাই তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ ইউরোপে ধর্ম গোপন করে থাকলেও কেউ কেউ মেধার জোরে ইউরোপে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করতে, বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে।

তখন তারা শুধুমাত্র পদ দখল করেই থেমে থাকেনি, সেই সাথে নিজেদের একটা রাষ্ট্র গঠনেও প্রচুর সমর্থন সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে থাকে।

তখন ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো, তাদেরকে আফ্রিকার উগান্ডায় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে।

ঠিক এমন সময় শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যুক্তরাজ্য নিজেদের অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য এক ধরনের গ্লিসারিন ইউজ করতো, যেটা আসতো জার্মানি থেকে।

কিন্তু যুদ্ধের সময় জার্মানি যুক্তরাজ্যের বিপক্ষে থাকায় গ্লিসারিন সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

তখন যুক্তরাজ্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে চাইম ওয়াইজম্যান নামক একজন ই/হু/দী গবেষক ও ব্যবসায়ী। তিনি গ্লিসারিন এর বদলে এসিটোন দিয়ে অস্ত্র সংরক্ষণের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন এবং যুদ্ধে প্রচুর অর্থ সহায়তা দেন।

তার এমন অভুতপূর্ব অবদানের জন্য যুদ্ধের পর যুক্তরাজ্য যখন তাকে পুরস্কৃত করতে চায়, তখন সে জানায় যে তার একমাত্র পুরস্কার হবে তাদের প্রমিজল্যান্ড মানে ফিলিস্তিনে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দেয়া!

এখানে উল্লেখ্য, চাইম ছিলেন জিওনিজম আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

ফিলিস্তিন তখন ছিল উসমানী সালতানাতের দখলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর তুরস্কের ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। সেই সুযোগে ধাপে ধাপে ই/হু/দীরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে থাকে।

প্রথমে তারা ফিলিস্তিনিদের কাছে ঘর ভাড়া করে থাকতে শুরু করে, তারপর বেশি দামের লোভ দেখিয়ে সেগুলো কিনতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজয়ের পর পুরো বিশ্বের ক্ষমতা ইউরোপের হাতে চলে যায়।

ই/হু/দীরা তখন স্থানীয় ফিলিস্তিনিদেরকে অত্যাচার-জোর-জবরদস্তি করা শুরু করলে ফিলিস্তিনিরা প্রতিবাদ করে।

তখনই ইউরোপ থেকে ঘোষণা আসে, পুরো ফিলিস্তিনের ৫৫ ভাগ থাকবে ফিলিস্তিনিদের দখলে আর বাকি ৪৫ ভাগ হবে ই/হু/দীদের।

৬লাখ ই/হু/দীর জন্য ৪৫% আর ১২কোটি ফিলিস্তিনির জন্য ৫৫% জায়গা!

জাতিসংঘ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর ই/হু/দীরা ইজ/রা/য়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।নবগঠিত এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয় চাইম ওয়াইজম্যান।

ইজ/রায়ে/ল রাষ্ট্র গঠন হওয়ার ঠিক ৬ মিনিটের মধ্যে আমেরিকা তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়!

আর এভাবেই যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে তারা ইয়াকুব(আঃ) এর সাথে কেনানে আসা যাযাবর থেকে আজকে গাজাকে ধ্বংসকারী দানবে পরিণত হয়েছে!

আর বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানেরা মুখে কুলুপ এঁটে চুপ করে বসে আছেন আর চোখে ঠুঁলি পরে সবকিছুকে না দেখার ভান করছেন!

জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ফাঁসি দেয়ার জন্য এস,কে সিনহার মেয়ের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রায় লিখতে বাধ্য করা হয়েছে।

একজন বিচারকের নিজের বক্তব্য...

যে দিন আমার বন্ধু এস,কে সিনহার মেয়ের মাথায় নাইন এমএম পিস্তল ঠেকিয়ে জামায়াতের নেতাদের রায় নেওয়া হয়। সেদিন রাত আনুমানিক ২ টা বাজে সিনহা আমাকে কল দিয়ে পুরো ঘটনা-টা বলে এবং সে আফসোস করে আমাকে বলে "বন্ধু আজ তারা পুরো মুসলিম জাতির কাছে আমাকে ভিলেন বানিয়ে দিয়েছে।"তখন আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি তাদের পরের টার্গেট আমি। আমার মেয়েটা ছোট, তখন সে ক্লাস নাইনে পড়ে; তাই এ নিয়ে আমি আমার মেয়েকে সাবধান করতে গিয়েছিলাম। তখন আমার এই ছোট্ট মেয়েটি আমাকে বলে..

'বাবা আমি জানি তুমি আমাকে নিয়ে খুব টেনশনে আছো। বাবা আমি এটাও জানি সিনহা আঙ্কেলের মেয়ের মতো কেউ হয়তো আমার মাথায়ও পিস্তল ঠেকিয়ে তোমাকে অন্যায় রায় লিখতে বাধ্য করতে পারে।

কিন্তু বাবা জানো? আমার স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল যখন সবার সামনে এসে তোমার প্রশংসা করতে থাকে তখন আমার এত ভালো লাগে যে বলে বোঝাতে পারব না।

বাবা কখনো যদি এমন হয় তুমি রায় লিখার সময় কেউ আমার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তোমাকে তাদের ইচ্ছে মতো রায় লিখতে বলে তুমি তাদের কথা শুন-

বেনা।

বাবা তুমি তোমার রায়'ই লিখবে। যদি তখন ওই খারাপ লোকেরা আমাকে মেরে ফেলে তাহলে তখন তো আমি আল্লার কাছে চলে যাব। আর যখন আল্লাহর কাছে থাকব তখন আল্লাহকে আমি বলবো আল্লাহ যেন তোমার হায়াত বাড়িয়ে দেন এবং তুমি যেন তাদের বিচার করতে পারো।'

আমি খুব শক্ত মনের মানুষ আমার চোখের পানি কখনো আমার সহধর্মিণীও দেখেনি কিন্তু সেদিন-- আমার মেয়ের মুখে এ-ই কথা টা শুনে ভাবতে লাগ লাম জীবনে কোন ভালো কাজের প্রতিফল হিসেবে-- আল্লাহ আমাকে এই মেয়ে দিলেন। আর নিজের-- অজান্তেই চোখের পানি বেরিয়ে আসে অনবরত।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক জনাব এম রহমান

সন্তানকে না বলা মায়ের কিছু কথা... পুরোটা পড়লে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে

একদিন সবকিছু ফিরে আসবে – হারিয়ে ফেলা ঘুম, শান্তি, নিজের জন্য সময়। ফিরে আসবে অবাধ স্বাধীনতা, ফিরে আসবে নিশ্চিন্ত নিশি। কিন্তু যা কোনোদিনও ফিরে আসবে না, তা হলো তোমার এই ছোট্ট শৈশব।

আর সকাল সকাল উঠে তোমার ময়লা কাঁথা-চাদর ধোয়ার তাড়া থাকবে না। তোমার জন্য আর শখ করে নতুন খেলনা কেনা হবে না। তুমি আর দাঁতহীন হাসিতে আমার আঙুল কামড়ে ধরবে না, না-না বলার ভঙ্গিতে দুই মুঠো হাত দিয়ে আমার চুল ছিঁড়ে দেবে না। তুমি বাবার চুল ধরে টেনে দুষ্টুমি করে হাসবে না।

তোমার জন্য আলাদা রান্নার সেই ছোট ছোট পেরেশানিগুলোও আর থাকবে না। বাড়ির কোণে ছড়িয়ে থাকা খেলনাগুলো তুলে নিতে হবে না। নতুন খেলনা দেখলেই বাবার উচ্ছ্বসিত চোখের সেই ভালোবাসা আর দেখা যাবে না। এই হাতদুটো দিয়ে তোমাকে স্নান করিয়ে আদর করে মুছে দেবার মুহূর্তগুলো হারিয়ে যাবে। ভরা বুকের উষ্ণতায় তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্তগুলো ফুরিয়ে যাবে।

একদিন তুমি বড় হয়ে যাবে। আমার শরীরের ব্যথা, যন্ত্রণার ইতিহাস হয়ে যাবে। যে দিন প্রথমবার ছেঁড়া-ফাটা, সেলাই করা শরীর নিয়ে তোমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিলাম, সেই দিনটিও স্মৃতির পাতায় ঝাপসা হয়ে যাবে।

তারপর
দিন যাবে, মাস যাবে, বছর পেরিয়ে যাবে। তুমি আমার কোল ছেড়ে নিজের ছোট্ট দুনিয়ায় পা রাখবে। যে জড়তা মাখা ভাষায় তুমি আমাকে "মা" বলেছিলে, সেই ডাকের সরলতা হারিয়ে যাবে। তুমি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়বে তোমার নিজস্ব জীবন নিয়ে।

তখন আমাদের ড় মা-বাবার ড় সমস্ত ব্যস্ততা ছুটি পাবে। তুমি থাকবে ব্যস্ত, আর আমরা থাকবো অতীতের স্মৃতিতে হারিয়ে।

যে শৈশব তোমার মনে আবছা হয়ে যাবে,
সেই শৈশব আমাদের হৃদয়ে চিরকাল ঝকঝকে জ্বলবে।
কখনো একটিবার মনে পড়বে হয়তো–

তোমাকে ঘুম পাড়াতে, খেলনা গুছাতে, ভালোবাসায় ভিজিয়ে রাখার সেই সব দিনগুলো।

আর আমাদের মনে পড়বে –
তোমার ছোট্ট হাতের টান, দুধের গন্ধ মাখা শরীরের উষ্ণতা,
তোমার নির্ভরতা, তোমার অবুঝ ভালোবাসা।
সেই সব অনুভূতির কোনো বিকল্প আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।
কারণ, শৈশব একবারই আসে।
আর তা হারিয়ে গেলে, আর কখনও ফিরে আসে না।

– মায়ের ডায়েরি

আমেরিকায় নির্বাচনে সাধারণত দল ভিত্তিক প্রাথমিক নির্বাচন বা "প্রাইমারি" করা হয়। ধরো, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বা কোন শহরের মেয়র নির্বাচন, সেখানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কয়েকজন নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যে জিতবে সে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাবে। রিপাবলিকান পার্টিও একই ভাবে প্রার্থী ঠিক করবে।

নভেম্বরে নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র ইলেকশন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রাথমিক নির্বাচন করছে। ৬ জন প্রার্থী। নিউ ইয়র্কের একটা টিভি চ্যানেল তাদের মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করেছে। উপস্থাপক তাদের সবাইকে একটা প্রশ্ন করলো - নির্বাচনে জিতে মেয়র হলে তুমি সবার আগে কোন শহরে যাবে? পাঁচজন একে একে উত্তর দিলো, জেরুজালেম যাবে।

ইজরায়েলের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রদর্শন না করলে বড় পাবলিক পজিশনে যাওয়া খুব কঠিন, এতোটাই ইজরায়েলের প্রভাব।

অন্যান্য বছর এই ধরণের বিতর্কে এই প্রশ্নটা করার দরকার হয় নি, কারণ সবাই জানে ইজরায়েল বিরোধিতা করে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব না। কিন্তু এবার প্রশ্নটা করা হয়েছে একটা বিশেষ কারণে - ৩৩ বছরের এক যুবক প্রাথমিক নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, সে মুসলমান, সে সমাজতন্ত্রী এবং সে ইসরায়েল বিরোধী। তার নাম জোহরান মামদানি। পাঁচজনের ইসরায়েল-ভক্তিমুলক উত্তরের পর মামদানির উত্তর দেয়ার পালা। সে বলল, নিউ ইয়র্ক আমার শহর, আমি এই শহরের মানুষের সেবা করবো, আমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে কেন। উপস্থাপক এবার সরাসরি জানতে চাইলো, তুমি কি জেরুজালেম যাবে না? মামদানি বলল, না।

তেল আবিবের পর পৃথিবীর সব শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইহুদি আছে নিউ ইয়র্কে। মামদানির এমন একটা উত্তর নিশ্চয় তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করবে।

গতকাল নির্বাচন হয়েছে। মিলেনিয়াল ইহুদিরা দলে দলে তাঁকে সমর্থন করেছে। মামদানি বিপুল ভোটে জিতেছে। মামদানির বক্তব্য ছিল ইহুদীরা আমাদের কাজিন,

সবচেয়ে বড় কথা আমরা সবাই মানুষ, আমরা সবাই মিলে সব মানুষের ভালো করবো, কিন্তু অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে থাকবো।

কয়েক বছর আগে এমন কথা বলে নিউ ইয়র্কে কেউ জিতবে তা ভাবা যেতো না। সময় পালটেছে।

আর পৃথিবীর মুসলমান নেতৃত্ব? তোদের শুধু মামদানির নয়, যেসব ইহুদি মামদানিকে সমর্থন করেছে তাদের জুতো ধুয়ে পানি খাওয়া উচিৎ।

জোহরান মামদানির ছবি নেট থেকে নেয়া।

Housewife

আমাদের বাড়িতে নিচ তলায় একজন ভাড়াটিয়া আছে যারা নাকি হাসবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি করে। তাদের দুজন বাচ্চা একজন ছেলে আরেকজন মেয়ে। ওরা দুই ভাই বোন বাসায় একা থাকে সারাদিন।

আমি প্রতিদিন ক্যামেরায় ওদের দেখি মূলত ওদের আমি ফলো করি। গেইট দিয়ে আবার বের হয়ে যায় নাকি। ওরা সারাদিন আমাদের বাসার এই গ্যারেজেই বেশিরভাগ সময় থাকে। দুই ভাইবোন খেলে আবার গেইট ধরে অপেক্ষায় দাড়িয়ে থাকে, আবার সিড়িতে বসে থাকে আবার রুমে যায় আবার আসে। এমন করে ওদের সারাটা দিন কাটে।

আমি সারাদিন কাজ করি আর একটু পর পর ওদের দেখি মনিটরে। আমার খুব খারাপ লাগে ওদের জন্য সারাটাদিন কিভাবে একা পাড় করে দুটো বাচ্চা। বোনটা ছোট মাঝে মধ্যে কান্না করে তখন আবার ভাইটা কোলে নেয় বোনকে। হয়তো এই শহরে টিকে থাকার জন্য বাবা মায়ের দুজনের কাজ করতে হয়। এই শহরে আসলে টিকে থাকাও একটা লড়াই। এই জন্য চাইলেও হয়তো মা টা বাসায় বাচ্চা নিয়ে থাকতে পারছে না।

ঠিক এই কারনের জন্য নিজের ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা না করে আমি ফুল টাইম মাদার হওয়ার ডিসিশন নিয়েছিলাম। পড়াশোনা শেষ করে যখন দেখলাম আমার সাথের প্রায় সব বান্ধবীরা চাকরি ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবছে। ঠিক তখন আমি হয়ে গেলাম একজন ফুল টাইম মাদার।

আমার মনে হয়েছিল ক্যারিয়ারের চাইতে আমার জীবনে এখন আমার বাচ্চা বেশি জরুরি। সবাই আমাকে বলেছে এত পড়াশোনা করলা এখন কিছু একটা করো। হাসবেন্ড এর থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে শখ পুরন করার চাইতে নিজে কিছু করা ভালো না। আমি সবাইকে একটাই উত্তর দিয়েছি, না আমি মা হতে চাই আমার ক্যারিয়ার লাগবে না।

এই যে আমার বাচ্চার ছোটবেলার সময়টা আর জীবনে ফিরে আসবে না। বড় হলে ওর আলাদা জগৎ হবে তখন ওর এতটা মায়ের দরকার হবে না। কিন্তু এখন ও এক সেকেন্ড মা ছাড়া থাকতে পারবে না।

কয়েক মাস আগেও আমার শ্বশুর বেশ অপমানজনক ভাবে আমাকে বলেছিল পড়াশোনা করে জীবনে কি করছো কয়েক টাকাতো ইনকাম করতে পারো নাই। আমি চুপ হয়ে কোনো উত্তর দেইনি কারন সে আমার স্বামীর বাবা আর আমার শিক্ষায় তাকে উওর দেয়া চলে না। হয়তো অন্য মানুষ হলে আমি দারুন একটি উত্তর দিয়ে দিতাম।

যাইহোক এমন আরও হাজার হাজার বার আমি শুনেছি একটা জব করতে পারলাম না কি করলাম জীবনে আমি। আমি যা করেছি তা শুধু আমি জানি। আমি না খেয়ে বাচ্চা সামলেছি, রাতে না ঘুমিয়ে বাচ্চা পেলেছি, কুলে নিয়ে রান্না করেছি, খেতে বসে বার বার উঠেছি পটি ক্লিন করার জন্য, দু হাত পেতে বমি ধরেছি বাচ্চার। এই যে ছোট ছোট হাত দুটো আমায় এসে জড়িয়ে ধরে সারাদিন আমার সাথে লেপটে থাকে এটাই আমার জীবনের প্রাপ্তি।

আমি যদি অফিস করতাম এই বাচ্চাটাই অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকতো কখন আমি আসবো, সঠিক টাইম গোসল করতো না, হয়তো ময়লা জামা পড়তো বিনিময়ে আমি মাস শেষে কিছু টাকা পেতাম এইতো!

যে সব মায়েরা বাচ্চা রেখে জব করে তাদের আমি অনেক সম্মান করি, নিজের বাচ্চা বুক থেকে রেখে যেয়ে জব করা মুখের কথা না। হ্যাঁ আমার বাচ্চা একদিন বড় হবে আলাদা জগৎ, বিয়ে করবে সংসার করবে হয়তো এই গুলো মনেও থাকবে না ওর কিন্তু আমি যে ওকে আমার জীবনের পুরোটা সময় দিয়ে বড় করে তুলেছি এটাই আমার জীবনের এচিভমেন্ট। তার জন্য হয়তো দিন শেষে ইনকাম করিনা স্বামীর থেকে চেয়ে নিতে হয়। আমি এটা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি। কারন আমি মা হতে চেয়েছিলাম ক্যারিয়ার চাইনি।

লিখা: লাবণ্য

একজন আমেরিকান পর্যটকের চোখে ইরান

“ইরানে কয়েক মাস ধরে ঘুরেছি, থেকেছি। তেহরানে একটা ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়, যিনি আমাকে ঘর খুঁজতে দেখেছিলেন। আমাকে বাসায় ডেকে নেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে থাকি, প্রতিদিন একসঙ্গে খাই – এক টাকাও নিতে রাজি হননি। একদিন অসুস্থ হয়ে বমি করছিলাম, সবাই বাথরুমে এসে পাশে দাঁড়াল, মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, “আয়বি নাদারে” – লজ্জার কিছু না, ঠিক আছো।

ইরানের শহর থেকে শহর ঘুরেছি – প্লেন, ট্রেন, বাস, শেয়ার ট্যাক্সি। শেষে আর হোটেল বুক করতাম না, কারণ সবসময় কাউকে পেতাম – বাসে বা ট্রেনে – যারা বলত, "চলো, আমার বাসায় থাকো।" ইয়াজদের ইরান-ইরাক যুদ্ধের এক শহীদের পরিবার আমাকে নিয়ে গেল পাহাড়ে বারবিকিউ করতে। রাসতের এক ট্যাক্সিচালক সব হোটেল ভরতি দেখে নিজের ছোট্ট ঘরের মেঝেতে আমার ঘুমানোর ব্যবস্থা করল।

পুলিশ?

একবারই কথা বলেছে – তাও জানতে চেয়েছে, আমি ঠিক আছি তো?

কখনো একটুও অস্বস্তি লাগেনি। রাত হোক, দিন হোক – সব সময় যেন একটা অদৃশ্য ভালোবাসা আমাকে জড়িয়ে রেখেছে। ইরান শুধু একটা দেশ না, এটা এক বিশাল হৃদয়। পাহাড়ি রেইনফরেস্ট থেকে শুরু করে লবণাক্ত মরুভূমি পর্যন্ত – মানুষগুলোও তেমনই বৈচিত্র্যময়। কারো ভেতর ছিল প্রচণ্ড উদারতা, কারো ভেতর ধর্মীয় গাম্ভীর্য – কিন্তু সবার মধ্যে একটাই জিনিস ছিল – মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

এই দেশটা শুধু পাহাড়, মরুভূমি, আর পারমাণবিক শিরোনাম না।
এই দেশটা মানুষের, হৃদয়ের, ভালোবাসার।
ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির সীমা পেরিয়ে
তারা আমাকে শুধু আশ্রয় দেয়নি – মানুষ হিসেবে সম্মান দিয়েছে।
আজও মনে হলে লজ্জায় চোখ ভিজে যায়।"
- অধ্যাপক জনাথন এ সি ব্রাউন, জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়

শুভ জন্মদিন: প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। জন্মদিনের শুভেচ্ছা রইল।
জেনে নিন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বর্ণাঢ্য জীবনী.......
এই মুহুর্তে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান নোবেলজয়ী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হতে যাচ্ছেন। জেনে নেই তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন...

অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক। তিনি ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক। অধ্যাপক ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে এই পুরস্কার লাভ করেন। ইউনূস বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার সহ আরও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

জন্ম ও পরিবার

মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৪০ সালের ২৮ জুন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী দুলা মিয়া সওদাগর, এবং মাতার নাম সুফিয়া খাতুন। মুহাম্মদ ইউনূসের সহধর্মিনী ডঃ আফরোজী ইউনুস। ব্যক্তিগত জীবনে মুহাম্মদ ইউনূস দুই কন্যার পিতা। মুহাম্মদ ইউনূসের ভাই মুহাম্মদ ইব্রাহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং ছোট ভাই মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর একজন জনপ্রিয় টিভি ব্যক্তিত্ব।

শিক্ষা জীবন

তাঁর প্রথম বিদ্যালয় মহাজন ফকিরের স্কুল। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মুহাম্মদ ইউনূস মেধা তালিকায় ১৬তম স্থান অধিকার করেন এবং চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। কলেজে তিনি নাটকে অভিনয় করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা এবং আজাদী পত্রিকায় কলাম লেখার কাজে যুক্ত ছিলেন। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি বয়েজ স্কাউটসে যোগ দেন এবং বয়েজ স্কাউটসের পক্ষ থেকে মাত্র ১৫ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

কর্ম জীবন

১৯৫৭ সালে মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই বিএ এবং এমএ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি ব্যুরো অব ইকোনমিক্স -এ যোগ দেন গবেষণা সহকারী হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে ভেন্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৯৬৯ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি লাভ করেন। ইউনূস বাংলাদেশে ফিরে আসার আগে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের পক্ষে বিদেশে জনমত গড়ে তোলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদানের জন্য সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন।

ইউনুস দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম শুরু করেন ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের সময়। তিনি বুঝতে পারেন স্বল্প পরিমাণে ঋণ দরিদ্র মানুষের

জীবন মান উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে। সেই সময়ে তিনি গবেষণার লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রকল্প চালু করেন। ১৯৭৪ সালে মুহাম্মদ ইউনুস তেভাগা খামার প্রতিষ্ঠা করেন যা সরকার প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় অধিগ্রহণ করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৮৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন গরিব বাংলাদেশীদের মধ্যে ঋণ দেবার জন্য। তখন থেকে গ্রামীণ ব্যাংক ৫.৩ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করে। ঋণের টাকা ফেরত নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক "সংহতি দল" পদ্ধতি ব্যবহার করে। একটি অনানুষ্ঠানিক ছোট দল একত্রে ঋণের জন্য আবেদন করে এবং এর সদস্যবৃন্দ একে অন্যের জামিনদার হিসেবে থাকে এবং একে অন্যের উন্নয়নে সাহায্য করে। ব্যাংকের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে গরিবকে রক্ষা করার জন্য ব্যাংক অন্যান্য পদ্ধতিও প্রয়োগ করে। ক্ষুদ্রঋণের সাথে যোগ হয় গৃহঋণ, মৎস খামাড় এবং সেচ ঋণ প্রকল্প সহ অন্যান্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা। গরিবের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য উন্নত বিশ্ব এমন কি যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহকে গ্রামীণের এই মডেল ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে

Banker to the Poor:Micro-lending and The battle against World Proverty. (১৯৯৮)

Three Farmers of Jobra; Department of Economics, Chittagong University; (১৯৭৪)

সম্মাননা

ডঃ ইউনুস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৮টি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। শান্তিতে নোবেলজয়ী গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডাল গ্রহণ করেছেন। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে এই সম্মাননা দেয়া হলো ইউনূসকে, যিনি এই পদক পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি ও মুসলিম।

বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্পদশালী দুই শতাধিক ব্যক্তির সম্মেলনে নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। ২০১৩, ৫ মে বুধবার জাতিসংঘ ভবনে এ সম্মাননা জানানো হয়। জাতিসংঘে বিশ্বের সম্পদশালী ব্যক্তিদের এ সমাবেশের আয়োজন করে বিশ্ববিখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিন। একজন

সামাজিক উদ্যোক্তা হিসেবে ইউনূসকে এ ‘আজীবন সম্মাননা পুরস্কার’ প্রদান করা হয়।

পালিয়ে যাওয়া মেয়ের প্রতি বাবার চিঠি

মা’রে,

শুরুটা কিভাবে করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যেদিন তুই তোর মায়ের অস্তিত্ব ছেড়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলি সেদিন থেকে তোকে মা বলে ডাকতে শুরু করলাম। তোকে মা ডাকতে গিয়ে নিজের মা হারানোর ব্যথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তোর মাকেও কোনদিন মা ছাড়া অন্য নামে ডাকেতে শুনিনি।

বিদ্যালয়ে প্রথম দিন শিক্ষক তোর নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। তোকে মা বলে ডাকতে ডাকতে তোর ডাক নামটাও ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তোর নাম বলতে না পারায় সবাই আমাকে নিয়ে হাসতে ছিলো। তাই চিঠির উপরে তোর নামের জায়গায় মা লিখেছি। হঠাৎ করে তুই এভাবে চলে যাবি আমি তা বুঝতেই পারিনি।

ছেলেটা যেদিন বাইরে ব্যাগ হাতে তোর জন্য অপেক্ষা করছিল কখন তুই দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে আসবি? আমি তখন ভেতরে বসে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছিলাম আর কতটা ভালবাসতে পারলে তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি না। তুই ঘরে বসে ভাবছিলি আজ যেতে না পারলে ছেলেটার কাছে ছোট হয়ে যাবি। আর আমি ভাবছিলাম তুই চলে গেলে সমস্ত পিতৃজাতির কাছে কি করে মুখ দেখাবো?

জানিস মা, তুই তোর তিন বছরের ভালবাসা খুঁজে পেয়েছিস। কিন্তু আমার জীবন থেকে বিশ বছরের ভালবাসা হারিয়ে গেছে। মা’রে প্রত্যেকটা বাবা জানে রক্ত পানি করে গড়ে তোলা মেয়েটা একদিন অন্যের ঘরে চলে যাবে। তারপরও একটুও ক পণতা থাকেনা বাবাদের ভেতরে। বাবাদের ভালবাসা শামুকের খোলসের মতো মা,বাহিরটা শক্ত হলেও ভেতরটা খুব নরম হয়ে থাকে।

বাবারা সন্তানদের কতোটা ভালবাসে তা বোঝাতে পারেনা, তবে অনেকটা ভালবাসতে পারে। জানি মা, আমার লেখাগুলো পড়ে তোর খারাপ লাগতে পারে। কি করবো বল? তোরা তো যৌবনে পা রাখার পর চোখ, নাক, কান সবকিছুর প্রতি বিবেচনা করে প্রেম করিস। কিন্তু যেদিন জানতে পারলাম তুই তোর মায়ের গর্ভে অবস্থান করছিস সেদিন বুঝতে পারিনি তুই কালো না ফর্সা হবি, ল্যাংড়া না বোবা হবি,কোন কিছুর অপেক্ষা না করেই তোর প্রেমে পরেছিলাম তাই এতকিছু লিখলাম।

আমি জানি মা তোদের সব সন্তানদের একটা প্রশ্ন বাবারা কেন তাদের ভালো লাগা টাকে সহজে মানতে চায় না? উত্তরটা তোর ঘাড়ে তোলা থাকলো,তুই যেদিন মা হবি সেদিন নিজে নিজে উত্তরটা পেয়ে যাবি। তোরা যখন একটা ছেলের হাত ধরে পালিয়ে যাস তখন ওই ছেলে ছাড়া জীবনে কারও প্রয়োজন বোধ করিস না।কিন্তু

একটা বাবা বোঝে তার জীবনে নিজের মেয়েটার কতটা প্রয়োজন।

যেদিন তোর নানুর কাছ থেকে তোর মাকে গ্রহন করেছিলাম সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে,যদি মেয়ে হয় তাহলে নিজের মেয়েটাকে তার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে কণ্যা দানের দায়িত্ব থেকে নিজেকে হালকা করবো। তাই তোর প্রতি এত অভিমান। মারে বাবার উপর রাগ করিসনা।

তোরা যদি অল্প দিনের ভালবাসার জন্য ঘর ছেড়ে পালাতে পারিস, তবে আমরা বিশ বছরের ভালবাসার জন্য বেপরোয়া হবো না কেন? বাবারা মেয়ে সন্তানের জন্মের পর চিন্তা করতে থাকে নিজের মেয়েটাকে সুপাত্রের হাতে তুলে দিতে পারবে তো?আর যৌবনে পা রাখার পর চিন্তা করে কোনো প্রতারনার ফাঁদে পরে পালিয়ে যাবে না তো? তাই মেয়েদের প্রতি প্রত্যেকটা বাবার এতটা নজরদারি। যদি মন কাঁদে চলে আসিস বুক পেতে দেবো। হয়তো তোর মায়ের মতো তোকে পেটে ধরিনি, তবে পিঠে ধরার যন্ত্রণাটা সহ্য করতে পারছিনা।

ইতি
তোর জন্মদাতা "পিতা"

"কালেক্টর ম্যাডাম, আপনি মেকআপ করেন না কেন?"

কেরলের মলাপ্পুরম জেলার কালেক্টর শ্রীমতী রানী সোয়ামই... এক ঝাঁক কলেজ ছাত্রীদের সাথে কথা বলছিলেন।

মহিলার কবজিতে সামান্য একটা ঘড়ি ছাড়া অন্য কোন প্রসাধন নেই। ছাত্রীরা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যায়, যে ওনার মুখের ওপরে সামান্য ফেস পাউডারের স্পর্শ মাত্র নেই।

কথাবার্তা মূলতঃ ইংরিজিতেই হচ্ছিল। ভদ্রমহিলা দুই তিন মিনিট মাত্র কথা বলেছেন। ওনার প্রতিটি শব্দের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের স্পষ্ট আভাস।

কথপোকথন হচ্ছিল, – "আপনার নাম ম্যাডাম?"

– "আমার নাম রানী। সোয়ামই আমার পারিবারিক নাম। আমি ঝাড়খন্ড রাজ্যের মূল নিবাসী। আর কিছু জানতে চাও?"

ভিড়ের মধ্যে একটি মেয়ে হাত তোলে।

– "হ্যাঁ, বলো?"...

– "ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। আপনি মেকআপ করেন না কেন?"

প্রশ্ন শুনে কালেক্টর ম্যাডাম হঠাৎ-ই অস্বস্তি বোধ করেন। ওনার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। ছাত্রীরাও চুপ !

ম্যাডাম কালেক্টর টেবিলের ওপর রাখা বোতল থেকে অল্প জল খেয়ে মেয়েটিকে বসার ইঙ্গিত করেন। স্বল্পভাষী কালেক্টর ম্যাডাম বললেন, – "দেখ, তোমার প্রশ্নটা সত্যিই বেশ মুশকিলে ফেলেছে। দু'-এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য তোমাদের আমার জীবনের কিছু স্মৃতি ভাগ করে নিতে হবে। তার জন্য হয়তো তোমাদের ব্যস্ত সময়ের থেকে মিনিট দশেক লাগতে পারে। তোমরা কি দশ মিনিট ধৈর্য্য ধরতে রাজি আছ ?"

– "হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমরা রাজি আছি, আপনি বলুন।" মেয়েরা সমস্বরে বলে ওঠে।

-- "ঠিক আছে। আমার জন্ম হয়েছিল ঝাড়খন্ড রাজ্যের এক আদিবাসী পরিবারে।" কালেক্টর ম্যাডাম একবার তাঁর শ্রোতাদের মুখের পানে দৃষ্টি দেন। সকলে আগ্রহ ভরে তাকিয়ে তাঁর দিকে।

– "আমার জন্ম কোডারমা জেলার এক প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকার একটা ছোট্ট ঝুপড়ির মধ্যে। চারপাশে মাইকা-র খনি।

– "বাবা মা সেখানেই খনিকের কাজ করতেন। আমার চেয়ে বড় দুই ভাই ছিল, আর একটা ছোট বোন। আমরা সকলেই ঐ ছোট্ট ঝুপড়িটার মধ্যে থাকতাম। বর্ষায় ঝুপড়ির মধ্যে জল ঝরতো, শীতে শিশির। বাবা মা খুবই কম পয়সায় ঐ সব খাদানে কাজ করতেন, কারণ ও ছাড়া অন্য আর কোন কাজ তাঁরা জানতেন না। তবে কাজটা ছিল খুবই নোংরা।"

– "আমার যখন বছর চারেক বয়স, বাবা - মা, দুই ভাই, সকলেই কেন জানিনা কি এক অজানা অসুখে আক্রান্ত হয়ে বিছানা নিলেন। আচ্ছা, তখন ওঁরা নিজেরাও জানতেন না যে তাঁদের রোগের মূল কারণ হলো ঐ খাদানের বাতাসে মিশে থাকা মাইকা-র ধূলো। আমার বয়স ৫ বছর হতে না হতে এক ভাই মারা গেল রোগে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কালেক্টর ম্যাডাম চুপ করে থাকেন। রুমাল দিয়ে চোখের জল মোছেন। পুরোনো স্মৃতি সত্যিই কষ্টদায়ী।

– "বেশিরভাগ দিনই খাবার বলতে জুটতো একটা কি দুটো রুটি আর ভরপেট জল। রোগে ভুগে একসময় দুই ভাইয়েরই মৃত্যু হলো। তোমরা বলবে ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল। আমাদের গ্রামে ডাক্তার তো দূরের কথা, একটা স্কুল পর্যন্ত ছিল না। ছিল না কোন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নিদেনপক্ষে একটা শৌচাগার। বিদ্যুৎ তো ছিলই না। তোমরা কল্পনা করতে পার এমন একটা গ্রামের কথা?"

– "এর মধ্যেই একদিন বাবা হাড় চামড়া সার, অভুক্ত, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল টিনের চাদর দিয়ে ঘেরা একটা অভ্র খাদানে। পুরোনো আর গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদানটা বেশ বদনামও কুড়িয়েছে। লাগাতার খুঁড়তে খুঁড়তে তখন খাদানটা অতলান্ত গভীর। মাটির নিচে শত সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে

তার গভীর গহ্বরের জাল। আমার কাজ ছিল খনির ঐ ছোট ছোট গহ্বরের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে অভ্রের আকরিক তুলে নিয়ে আসা। দশ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েরাই পারে ঐরকম গভীর গর্ত থেকে অভ্রক তুলে আনতে।"

– "কাজের পর জীবনে সেই প্রথমবার আমি ভরপেট রুটি খেতে পেলাম। কিন্তু, অনভ্যস্ত পেটে সইলো না, ... আমার বমি হয়ে গেল।"

– "যে বয়সে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়াশোনা করার কথা, সেই বয়সে অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে অভ্রক তুলে আনছিলাম।"

– "বিষাক্ত ধূলোর মধ্যে বদ্ধ জায়গায় নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হচ্ছিলাম। কতবার অভ্রকের খনি ধ্বসে পড়েছে, ভেতরে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আটকা পড়ে মারা গেছে। না হলে দুরারোগ্য ব্যাধির কামড়ে মারা গেছে। সেটাই তাদের নিয়তি।"

– "দিনে আট ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করার পর একবেলা কোনরকমে খাবার জোটানোর মতো পয়সা পাওয়া যেত। নিত্য দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা আর বিষাক্ত ধূলোর মধ্যে শ্বাস নেওয়ার কারণে আমি ধীরে ধীরে অসুস্থ আর নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলাম।"

– "বছর ঘুরতে না ঘুরতে আমার ছোট বোনটাও এসে লাগে খাদানের কাজে। বাবার শরীর একটু জুৎ হতেই তিনিও জুটে যান খাদানের কাজে। এখন সকলে মিলে একসাথে কাজ করার ফলে কাউকেই না খেয়ে থাকতে হয়না।"

– "তবে কপালের লিখন কে করবে খণ্ডন? সেবার আমার ধূম জ্বর। আমাকে ঘরে রেখে মা বাবা বোন সকলেই গেছে কাজে। আচমকা মুষলধারে বৃষ্টি নামে। খনির ভেতরে শ্রমিকরা কাজ করছিল, জলের তোড়ে খনিতে ধ্বস নামার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক চাপা পড়ে মারা যায়। তাদের মধ্যে আমার মা বাবা বোন সকলেই ছিল। আমি পরিবারহারা হলাম।"

কালেক্টর ম্যাডামের দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। শ্রোতারা বাক্যহারা। অনেকেরই চোখে জল।

– "মনে রাখতে হবে আমি তখন মাত্র ছ'বছরের শিশু। শেষমেষ আমি গিয়ে পৌঁছই সরকারি অগাতি মন্দিরে। সেখানেই আমার শিক্ষার শুরু। যদিও আমার গ্রামেই আমার অক্ষর জ্ঞান হয়েছিল। আর আজ সেই অভ্রক খাদানের পরিবার - পরিজনহীন মেয়েটাই এখানে আপনাদের সামনে কালেক্টর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

– "বুঝতে পারছি, এখন তোমরা ভাবছ আমার জীবনের এই অতীতের সাথে মেকআপ ব্যবহার না করার কি সম্পর্ক থাকতে পারে, তাই তো?"

– "পরবর্তী সময়ে শিক্ষা গ্রহণের কালখণ্ডে আমি জানতে পারি যে ছোটবেলায় সেই বিপজ্জনক ছোট ছোট অন্ধকার গুহার ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যে অভ্রক আমি তুলে আনতাম সেগুলো আসলে মেকআপ সামগ্রী তৈরীর কাজে লাগে।"

– “অভ্রক আদতে মুক্তর মতো একটা খনিজ সিলিকেট। বড়ো বড়ো প্রসাধনী বস্তু প্রস্তুতকারী দেশী বিদেশী কোম্পানিগুলো তাদের প্রডাক্টের মধ্যে চামড়ায় একটা চমকদার জেল্লা বা ‘গ্লেজ্’ ফুটিয়ে তোলার জন্য মিশিয়ে থাকে। কসমেটিকস্ কম্পানিগুলোর ভাঁড়ারে নিয়মিত অভ্রকের যোগান দেয় ঐ আমার মতোই ২০,০০০ ছোট - ছোট বাচ্চা - বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। গোলাপ কোমল সেই শিশুদের ফুলের মত জীবনের রক্ত মাংস পাথরে থেঁতলে তবেই না অভ্রক মানুষের গালের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে !”

– “আজও আমাদের চামড়ার সুন্দরতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত ছোট ছোট বাচ্চাদের হাত দিয়ে তুলে আনা লক্ষ লক্ষ টাকার অভ্রকের ব্যবহার কসমেটিকস্ কম্পানিগুলো করে চলেছে।”

– “আমার যা বলার ছিল তোমরা শুনলে। এবার বলো তো আমি কি করে সৌন্দর্য্য প্রসাধনী ব্যাবহার করি ? বাবা মা ভাই বোন সকলকেই অভ্রকের খনি গ্রাস করে নিল। যে মায়ের গায়ে কোনদিন ছেঁড়া কাপড় ছাড়া অন্য কিছু দেখলাম না, তার স্মৃতি মাথায় নিয়ে আমি কি করে রেশমী শাড়ি পড়ে ঘুরি ?”

কালেক্টর ম্যাডাম রানী সোয়ামই নিজের কাজে চলে গেলেন। কলেজের ছাত্রীরা স্থানু হয়ে বেশ কিছু সময় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর তারাও নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। দিন মাস বছর ঘুরেছে। সেই কালেক্টর ম্যাডাম এখন ভারত গণরাজ্যের প্রথম নাগরিক।
মহামহিম রাষ্ট্রপতি
শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু।
ভারত গণরাজ্যের রাষ্ট্রপতি।

Steve Jobs

'I got fired from the very company I founded,, and it turned out to be the best thing that ever happened to me.'

When I was a child, my birth parents gave me up for adoption.

As far back as I can remember, I've carried the feeling of rejection.

My adoptive parents gave me love — real love — but deep down, I always wondered: Why wasn't I wanted?

That wound?
It became the fire inside me.
I became obsessed with proving my worth — with building something so impactful, the world couldnÕt ignore me.

At 20, I co-founded Apple in my parents' garage.
No money. No investors. No experience.
Just a vision,, and a hunger to change the world.

But the hardest blow came years later.

At 30, in a shocking move, the very board I had built kicked me out of the company I had started.
It felt like getting thrown out of your own house.

I spiraled into a deep depression. I felt lost. Betrayed. Worthless.
But I didn't stop.

I started over.
I built a new company — NeXT — and bought a tiny animation studio you might've heard of,, called Pixar.
And the irony? Apple eventually bought NeXT — just to get my operating system.

That's how I came back. This time, stronger.

I helped lead Apple's rebirth.
We launched the iMac. The iPod. The iPhone.
We didn't just sell products — we changed how people live, work, listen, and connect.

Behind every success was a guy who was adopted. Rejected. Fired.
And who never stopped.

Because the things that hurt the most,, are often the things that push us the furthest.

'Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith.

Because what feels like the end,, might just be the beginning of something greater.'

—Steve Jobs

দেওয়ালে হাতের ছাপ

বাবা বয়স্ক হয়েছেন। বাথরুমে যেতে প্রায়ই একটা সুন্দর রঙ করা দেওয়ালে হাত দিয়ে ফেলেন। ওটা ধরে হাঁটেন বলে হাতের ছাপ পড়ে যায়। হাত ময়লা থাকলে বা তেল থাকলে তো কথাই নেই।

আমার স্ত্রীর এটা অপছন্দ। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও। অনেক বলেছি, কিন্তু উনি মনে রাখতে পারেননা বা দেওয়ালটা না ধরে পারেন না। অল্পবয়সে পরিচ্ছন্ন মানুষই ছিলেন।

একদিন মাথা ধরেছিল বলে নিজে নিজেই কপালে তেল মালিশ করেছিলেন। সেদিন ছাপটা বেশী পড়ে গেল। স্ত্রী আমার ওপর চেঁচামেচি করলেন। আমিও কড়াভাবে বাবাকে বলে দিলাম ঐ দেওয়ালে হাত না ছোঁয়াতে। তাঁকে লজ্জিত ও বিমর্ষ লাগলো। দেখে আমার মায়া হল, তবে মুখে কিছু বললাম না।

বাবা ঐ দেওয়াল ধরা বন্ধ করলেন; একদিন পড়ে গেলেন। আর বিছানা থেকে উঠলেন না। কিছুদিন পরে গত হলেন।

রঙের মিস্ত্রি ডেকে বাড়ী রঙ করাতে গেলে আমার ছেলে দাদুর হাতের ছাপ লাগা অংশটা মুছতে বাধা দিল। সে তাঁকে খুব ভালোবাসত। মিস্ত্রি তার কাজে বেশ দক্ষ ও উদ্ভাবনী প্রতিভার ছিল। সে ঐ ছাপগুলো বাঁচিয়ে রেখে অপূর্ব একটা বৃত্ত এঁকে দিল। একটা ডিজাইনও করে দিল।

এরপর যত মানুষ আমাদের বাড়ী আসত, ঐ জায়গার শিল্পকর্ম দেখে খুব প্রশংসা করত।

কালের যাত্রায় আমিও একদিন বৃদ্ধ হলাম। হাঁটবার সময় একদিন আমারও দেওয়াল ধরার প্রয়োজন হল, কিন্তু বাবার সঙ্গে ব্যবহার মনে পড়ে যাওয়ায় নিজেকে সংবরণ করলাম। ছেলে ব্যাপারটা দেখে আমায় বারবার বলল দেওয়ালের সাপোর্ট নিতে--যাতে পড়ে গিয়ে কোনো বিপদ না ঘটাই। উপলব্ধি করলাম, ছেলে আমার পাশে আছে।

নাতনী ছুটে এসে ওর কাঁধে ভর দিতে বলায় আমার চোখে জল এসে গেল। আমি যদি এটা করতাম তাহলে বাবা হয়ত আর কিছুদিন বাঁচতেন।

নাতনী যত্ন করে সোফায় বসিয়ে ওর ড্রয়িং খাতা দেখাল যেখানে আমার বাবার হাতের ছাপের ঐ দেওয়ালটার স্কেচ এঁকে ও উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। মন্তব্য ছিল : " আমরা আশা করি প্রত্যেক বাচ্চা বড়দের এইরকম শ্রদ্ধা করবে।"

আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত হয়ে গেলাম ... এক অজানা অপরাধবোধে নিজেকে অপরাধী মনে হল।

একদিন আমরা সবাই বয়স্ক হব। এই বাচ্চাদের মত আমরাও যদি ওই দিনগুলোয় বড়দের যত্ন নিতাম তাহলে পৃথিবীটা কত সুন্দর হত।

মনসুর হেলাল, নি-হ-ত শিক্ষিকা মাহেরীন চৌধুরীর স্বামী

আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি তোমার নিজের দুই সন্তানের কথা একবারও ভাবলে না? সে বলেছিল, 'ওরাও তো আমার সন্তান। ওদের একা রেখে আমি কী করে চলে আসি'

মনসুর হেলাল, নি-হ-ত শিক্ষিকা মাহেরীন চৌধুরীর স্বামী

দৌড়াও, ভয় পেয়ো না। আমি আছি।

মাইলস্টোনের টিচার মেহরিন চৌধুরী নিজে ৮০% দগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু নিজের ছাত্রছাত্রীদের ফেলে বেরিয়ে যাবার মতো বুদ্ধিমতী ছিলেন না। শুধু বলছিলেন, দৌড়াও, ভয় পেয়ো না। আমি আছি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষিকা মেহরিনের সাহসিকতায় অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থীর প্রাণ রক্ষা সম্ভব হয়েছে।

উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া এক সেনা সদস্য বলেন, "ম্যাডাম ভিতরে ঢুকে গিয়ে বাচ্চাগুলারে বের করে দিছেন, তারপর উনিই বের হতে পারেন নাই।"

নিজের জীবন উৎসর্গ করে ২০টি তাজা প্রাণ বাঁচালেন এই মহীয়সী নারী।

বাংলাদেশ ধন্য সকল বাংলাদেশি ধন্য এমন একজন শিক্ষিকা তাদের দেশে জন্মেছে।

শত শত সালাম সেই মায়ের প্রতি যার গর্ভে মেহরীন চৌধুরী নামক রত্নটি জন্মেছে। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

এ জেড এম শামসুল আলম

এই মেধাবী ও সৎ লোকটি ইন্তেকাল করেছেন আজ ল্যাবএইড হাসপাতালে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ছিলেন তিনি সরকারের সাবেক সচিব। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাবেক রেক্টর, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। শত শত গ্রন্থের লেখক। বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্ণধার।

যারা জানেন না তাদের সাথে এই ঐতিহাসিক বিষয়টা শেয়ার করছি ঃ

তদন্ত

ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা এনে তা আত্মসাতের অভিযোগে।

আর এই অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন আমাদের বাল্যবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মাহমুদ , বিশিষ্ট মূকভিনেতা ও একাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের জিল্লুর রহমান জন ভাইয়ের আপন মামা, এবং কুমিল্লা বরুড়া উপজেলার কৃতি সন্তান জনাব এ জেড এম শামসুল আলম (CSP ও সাবেক সচিব)

বিস্তারিত

" প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিলেন।

ডাক্তার চৌধুরীর বিরুদ্ধে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা এনে তা আত্মসাতের অভিযোগ উঠে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য ক্রমাগত বিদেশী দূতাবাসের চাপ আসতে থাকে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র অফিসাররা বেশিরভাগই তখন সিএসপি অফিসার। এরা সবাই ষাটের দশকের তরুন। তাদের বেশিরভাগই বামপন্থী চিন্তার ধারক ও বাহক। তাদের মাঝে বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর এক ধরনের জনপ্রিয়তা রয়েছে।

অদৃশ্য শক্তি ডাক্তার চৌধুরীকে সাইজ করার জন্য উপযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তা খুঁজছিলেন। তারা খুঁজছিলেন একজন দাঁড়িওয়ালা -টুপিওয়ালা তদন্ত কর্মকর্তা।

নানামুখী চাপে তৎকালীন সংস্থাপন সচিব ৬২ ব্যাচের সিএসপি অফিসার এ জেড এম শামসুল আলম কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

তদন্তের নির্দেশনা পেয়ে এ জেড এম শামসুল আলম সংস্থাপন সচিবের কাছে একটি চিঠি লেখেন।

চিঠিতে তিনি বলেন "ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী একজন বামপন্থী সমাজকর্মী। আর আমি একজন ডানপন্থী সরকারি কর্মকর্তা। তার মত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার তদন্ত রিপোর্ট প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। আমি তদন্ত কর্মকর্তা থেকে অব্যাহতি চাই।"

এদিকে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী তার তদন্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে থাকেন। নানামুখী খোঁজ শেষে তিনি সংস্থাপন সচিবের নিকট একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী উল্লেখ করেন " এ জেড এম শামসুল আলম যদি আমার তদন্ত কর্মকর্তা হয়ে থাকেন তাহলে এই তদন্তে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এখানে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলে আমি যেকোনো শাস্তি মাথা পেতে নেব।"

তদন্ত কাজ শেষ হলো। তদন্ত কর্মকর্তা গোপনে রুমের দরজা বন্ধ করে তার তদন্ত রিপোর্ট লিখছেন। চারিদিক থেকে তদন্ত কর্মকর্তার উপর নজরদারি।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে বলাবলি হচ্ছিল এইবার ডাক্তার জাফরুল্লাহর আর রক্ষা নেই।

তদন্ত রিপোর্ট চূড়ান্ত করার এক পর্যায়ে তদন্ত কর্মকর্তা মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে একটু দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। বঙ্গভবন থেকে তদন্ত কর্মকর্তাকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়া হলো।

তদন্ত কর্মকর্তা প্রায় ঘন্টাখানেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি কে তদন্তের বিভিন্ন দিক অবহিত করলেন। এরপর রাষ্ট্রপতির হাতে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করলেন।

আশ্চর্য বিষয়! ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী শাস্তির পরিবর্তে কয়েকদিন পরে উল্টো মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হয়ে গেলেন!

জানা গেছে তদন্ত কর্মকর্তা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেছেন যে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

তিনি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্রের শিকার। বহুজাতিক কোম্পানি গুলো নিম্নমানের ঔষধ বানিয়ে সীমাহীন মুনাফা করছিলেন। তারা ঔষধ তৈরি করে এদেশের মানুষকে গিনিপিগ বানিয়ে ঔষধের প্রাথমিক পরীক্ষা করছিলেন। এ বিষয়ে জাফরুল্লাহ চৌধুরী পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছিলেন।

ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে শায়েস্তা করার জন্য সব ঔষধ কোম্পানিগুলো একজোট হয়ে মাঠে নেমেছেন। আর তাতে বিদেশি দূতাবাস গুলোকেও কাজে লাগানো হচ্ছিল।

ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী পরপারে চলে গেছেন। এ জেড এম শামসুল আলম সাহেবও আজ চলে গেলেন।থাকতেন তিনি রাজধানীর টিকাটুলি এলাকায় একটি ফ্লাটে খুবই সাধারণ ভাবে।

বামপন্থী এবং ডানপন্থী দুই ঘরানার দুই মহান দেশ প্রেমিকের বদান্যতায় আজ আমরা জাতীয় ঔষধনীতি পেয়েছি। আজ আমরা বিদেশে ঔষধ রপ্তানি করছি। বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানিগুলো একে একে পাততাড়ি গুটিয়ে এ দেশ থেকে চলে গেছে।

সেদিন এ জেড এম শামসুল আলম সঠিক দায়িত্ব পালন না করলে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী হয়তো থেমে যেতেন। নব্য ‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ রূপী বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানিগুলো আজও আমাদের শোষণ করতো।

একজন জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জন্ম না হলে আজ আমরা একটি প্যারাসিটামল ২০ টাকা দিয়ে কিনে খেতাম। এটি সফল জীবনের পরিসমাপ্তি।

এ জেড এম শামসুল আলম। সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাবেক রেক্টর, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। শত শত গ্রন্থের লেখক। বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্ণধার।

বাংলাদেশ : গণ অভ্যুত্থান ২০২৪ স্মরণে জুলাই ২০২৫

২১ ফেব্রুয়ারী, বিজয় দিবসে স্মরনে, উদযাপনে, আমরা ঘটনা বর্ননায় বলে থাকি ‘‘শহীদ রা সেদিন বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল’ অথবা ‘বুক ফুলিয়ে গুলীর সামনে দাঁড়িয়ছিলে’ এইসবের কোনটাই বাস্তবে ঘটেছে এমন দেখা যায় নাই, ইচ্ছা করে কেউ বুলেটের সামনে অবিচল থেকেছে অথবা পালিয়ে যায় নাই, এমন ঘটনা একটাও শুনি নাই। আমাদের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ এর বীরত্তের বিবরনেও এমনটা নেই।

“আয় দেখি, বাংলাদেশে আয়, কত বড় বাপের বেটা” তারা এসেছিল নাফ্ নদী নয় সমুদ্রের গর্জন হয়ে। “গুলী করি, মরে একটা, ওই একটাই যায়, বাকিডি যায় না স্যর” একটা মরে, শহীদ হয়, গর্জে উঠে এগিয়ে আসে হাজার তরুন, স্বৈরাচারের হাত কাপে টেলিফোনের তারে, কাপে সারা বাংলাদেশ। আমরা বিদেশে চোখের জল মুছি যখন সামনা সামনি গুলিতে পরে যায় সাইদ, পিছায় না, আহত বন্ধুকে ফেলে যায়না গুলীর মুখেও, পাশ দিয়ে হেটে যাওয় তরুন কে পুলিশ গুলি করে পিছন থেকে, জীবিত ঈয়ামীন কে রাস্তার পাশে ফেলে যায়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা হাজার তরুনের মাঝে হটাত একজনের মাথায় স্নাইপার গুলী, পাশের জন শুধুই একবার তাকায়, এগোয় সামনে, দেশের পশাক পরা জানোয়ার পুলিশ যখন লক্ষ লক্ষ গুলী ছুড়ে খুন করে করে ক্লান্ত। ঘুম ছুটে যায় নিষ্ঠুরত্ব বিস্তার দেখে। আশংকা আশায় রুপান্তর হয়, যখন সামনে পিছনে বই বেধে ছোট শিক্ষার্থী আগিয়ে যায়, যখন তরুনী সাইকেলে আগোয় ব্যগে লাঠি নিয়ে, লক্ষ জনতা যখন এগিয়ে আসে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, গ্রাম থেকে শহরে ধেয়ে আসে জনতা; দেশ রক্ষার সেনারা যেদিন তাদের কর্তব্য বুঝে, অন্যদাতা জনগনকে খুন করা তাদের কাজ নয়! সেদিন যে সত্য লুকিয়ে ছিল ভয়ের নিচে, সেই সত্যই বাংলাদেশের স্বর্বভৌমত্বের প্রান।

রাজনৈতিক কর্মীরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ‘ আসবে এমন দিন, সেদিন লুকাবার জন্য, ইদুরের গর্ত খুজে পাবেন না’ অথবা ‘একদিন বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে’। ক্লান্ত ভীত রাজনৈতিক নেতারা সব ছেড়ে দিয়ে, আপন জান বাচানোর প্রানপন চেষ্টায় ছিল, সেদিন তাদেরকে য়ার দেশ বাচাতে মানুষ এসেছিল মর্যাদার লড়াইয়ে, এটা সেই সময়, একবছর হল সেই সময়ের।

সেই শেহীদ দের জন্য দোওয়া করি যারা একটা ভালো স্বদেশের ভবিষ্যতের জন্য জীবনপণ করেছিল, কিন্তু দেখে যেতে পারে নাই। সেই পিতা মাতার জন্য দোওয়া করি যারা বুকে পাথর চাপা দিয়ে নিজ সন্তানের আত্মউতস্বররগ দেখেছেন, দেশপ্রেম দেখে বিহবল হয়েছেন, অবাক হয়েছেন।

এখন সেই সময় যখন স্বৈরাচারের নিষ্ঠুরতার নিকৃষ্টতম উদাহরনে ডুবছিল বাংলাদেশ, প্রতিটা মুহুর্তে যেন ধ্বংস হচ্ছিল শক্ত বাধনের মিথ্যা প্রাচীর, তবুও ভয় কাটছিল না, পুত্র কন্যারা যখন বাবা মা কে বাধ্য করেছে পথে নামতে, বুঝে আসছিল দিনশেষ মিথ্যুকের।

পানি লাগবে? পানি? হ্যা জীবন মান উন্নয়নে, স্বাধীনতা রক্ষায়, স্বচ্ছ, সুপেয় রাজনৈতিক পানি লাগবে বাংলাদেশের। যা লাগাম টেনে ধরবে দুর্নীতির, শাসনের নয় জনগনের ইচ্ছাকে প্রবাহিত করবে সরকার, ধুয়ে দেবে অসম্মান আর অসততাকে।

মানুষকে থাকতে দেবেঃ
ঝঞ্জার মত উদ্দাম, বিধাতার মত নির্ভয়, প্রকৃতির মত স্বচ্ছল
বন্ধনহীন,জন্ম স্বাধীন চিত্ত মুক্ত শতদল; হয়ে
আর হতে দেবে
শক্তি অটল মহীধর

যারা দেশকে রক্ষা করবে ভিতরের বিশ্বাসঘাতকদের থেকে এবং বহিরাক্রমন থেকে, যখনই আসবে ডাক আবু সাঈদ রা যেন আবার জেগে উঠে, মঞ্চ কাপিয়ে শ্লোগানে নিয়ে তরুন তরুনীরা জাগাবে দেশ বাসীকে অসত্যের বিরুদ্ধে।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর কল্যাণকর বড় যে কাজটি করেছেন সেটি হলো দেশের প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি রোধ করেছেন। কিন্তু মিডিয়া এ বিষয়টি জনগণের সামনে প্রকাশ করেনি। কেন করেনি?

ইন্টেরিম সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরপরই এক্সপার্টদের নিয়ে

চলমান ও ভবিতব্য সকল উন্নয়ন প্রকল্প পুনঃমূল্যায়ন শুরু করে। কোথায় কোন প্রকল্পে কত টাকা বাজেট ধরা হয়েছে, কেন এবং কত লুটপাট করা হয়েছে বা পরিকল্পনা ছিলোড় সবকিছুর ডেটা বিশ্লেষণ করে দ্রুত প্রতিকার নিয়ে সরকার বিশাল অংকের টাকা লুটপাট রোধ করে।

উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পুনঃমূল্যায়ন করে দেখা গেছে যে প্রায় সব প্রকল্পেই অযৌক্তিকভাবে দেড়গুণ-দুইগুণ এস্টিমেটেড ব্যয় বা প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছে। সরকার এই খরচ কমিয়ে এনেছে।

প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিবের তথ্য অনুযায়ী সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ উন্নয়ন কাজে ব্যয় সংকোচন হয়েছে প্রায় ১০ হাজার ৮৫৪.৩২ কোটি টাকা, সেতু বিভাগে ব্যয় সংকোচন হয়েছে ৭ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা, রেলপথ মন্ত্রণালয় ব্যয় সংকোচন হয়েছে ৮ হাজার ৩৬.৯০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিভাগে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলো থেকে ব্যয় সংকোচন করা হয়েছে প্রায় ৭ হাজার

৪৫৪.৩১ কোটি টাকা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রকল্পগুলো থেকে ব্যয় সংকোচন করা হয়েছে ১২ হাজার ৪২৫.৫১ কোটি টাকা।

পাঁচটি বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সবমিলিয়ে মোট প্রায় ৪৬ হাজার ৩০৮.০৪ কোটি টাকা ব্যয় সংকোচন করেছে এ সরকার। এই টাকাটা নিশ্চিতভাবে লুটপাট হতো, বিদেশে পাচার হতো।

আমার-আপনার, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় করা একেকটা উন্নয়ন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করা হতো। সে কারণে একেকটি উন্নয়ন প্রকল্পে এস্টিমেটেড ব্যয় ধরা হতো দুই-তিনগুণ বাড়িয়ে। ইউনূস সাহেব দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই এই জায়গায় হাত দিয়ে ৪৬ হাজার ৩০৮.০৪ কোটি টাকা লুটপাট থেকে উদ্ধার করে এই টাকাটা দিয়ে আমাদের জ্বালানি খাতের সমস্ত বকেয়া বিল পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে কোনো দেশের কাছে বিল বকেয়া নাই।

ইউনূস সাহেব দেশের রিজার্ভে হাত না দিয়েই সাত মাসের মধ্যে ২৪২ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছেন এই খাত, ঐখাত থেকে টাকা সেইভ করে। এটা সম্ভব হইছে গত ৫ দশক ধরে সারা দুনিয়ায় ঘুরে কাজের মধ্যদিয়ে গড়ে তোলা তার 'অসাধারণ' ব্রেইনের কারণে।

যে অবস্থায় তিনি দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তখন ইসলামি ব্যাংক ছাড়া বাকি সব ব্যাংকে তারল্য সংকটে বন্ধ হয়ে যাবে প্রায়ই, এরকম সিচুয়েশন থেকে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক করছে তার ক্যাবিনেট। একটি ব্যাংকও বন্ধ হতে হয়নি।

শেষ মরণকামড় হিসেবে মাফিয়ারা পালিয়ে যাওয়ার আগে ইসলামি ব্যাংকেও হানা দিয়েছিল। দুদক রিপোর্ট হতে জানা গেল, প্রায় ১ হাজার ১১৩ কোটি ৯৩ লাখ ৬৪ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছিল ইসলামি ব্যাংক থেকে। বাট তারপরও অন্যান্য ব্যাংকগুলো থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম অনেকটাই স্বাভাবিক ছিল ইসলামি ব্যাংকের।

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া অর্থনীতির চাকা পুনর্গঠন করতে সরকার যেসব স্ট্রেটেজিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেগুলো বেশি সাস্টেইন করছে, এ জায়গাটা সরকারের বড় এচিভমেন্ট। এটার সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি হবে নেক্সট সরকার।

ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতি রোধ ও অধিক সুফল নিশ্চিত করতে সরকার গত অক্টোবরে একটা পরিপত্র জারি করছে। এই পরিপত্রে বলা হয়েছে, কোনো প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির আগে প্রকল্পের সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং জনগণকে অনলাইনে মতামত দেওয়ার জন্য ন্যূনতম ২ সপ্তাহ সময় দিতে হবে।

জনগণের মতামত নিতে হবে প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পাঠানোর আগেই।

বাধ্যতামূলক জনসাধারণের মতামত নেওয়ার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য, যেমন: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি, যৌক্তিকতা, প্রকল্প এলাকা, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্য ফলাফল, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব, দুর্যোগের ঝুঁকি ও ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্লিয়ারভাবে উল্লেখ করে মতামত নিয়ে পাঠাতে অনুমোদন কমিশনের কাছে। কমিশন এক্সপার্টদের নিয়ে সকল ডেটা বিশ্লেষণ করে অনুমোদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রকল্প ব্যয়, ঠিকাদার, অনুমোদন কমিশন রিপোর্ট – সকল তথ্যই ওয়েবসাইটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

আমি ট্রুলি বিলিভ করি, হাসিনাগং পালিয়ে যাওয়ার পর যে অবস্থায় পড়ছিল দেশের অর্থনীতি, ঐ সিচুয়েশনে একমাত্র প্রফেসর ইউনূস ব্যতিত কারো পক্ষে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বেশিদিন রান করা সম্ভবপর হতো না। সম্ভবত এ একটি কারণে তার প্রতি আমাদের ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

Dr.Latifur Rahman fbw

নিখোঁজ নন, গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন জহির রায়হান

“জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বদর দস্যুদের মুখোশ উন্মোচন করুন”- প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও লেখক জহির রায়হানকে উদ্বৃত করে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১, দৈনিক ইত্তেফাক একটি সংবাদ প্রকাশ করে। আগের দিন প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে জহির এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন্‌ু শুধু আলবদর নয়, বুদ্ধিজীবি হত্যাকাণ্ডে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত। এ বিষয়ে একটি উচ্চপদস্থ তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য তিনি সরকারকে পরামর্শ দেন। এছাড়া দাবি করেন্‌ু সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তাঁর কাছে রয়েছে।

১৮ ডিসেম্বর জহির রায়হান কলকাতা থেকে ফিরে এসে জানতে পারেন, তাঁর সহোদর প্রখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারকে আরও বহু বুদ্ধিজীবির সাথে অপহরণ করেছে আলবদররা। রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে অনেকের ক্ষত বিক্ষত দেহ পাওয়া গেলেও শহীদুল্লাহ কায়সারের দেহ পাওয়া যায়নি। ভাইয়ের খোঁজ নেয়ার পাশাপাশি জহির কমিটি করে আলবদরদের অবস্থান জানার চেষ্টা করেছিলেন। এক সম্ভাব্য আলবদরকে ধরে নিয়ে এসে শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সারের সামনে হাজিরও করেন। পান্না চেহারা দেখামাত্রই চিনতে পারেন, খালেক মজুমদার! এই লোকটি তাঁর স্বামীর অপহরণে যুক্ত ছিল। খালেক জানায়ু সে শহীদুল্লাহকে হত্যা করেনি; ধরে নিয়ে আলবদরের অপারেশন-ইন-চার্জ চৌধুরী মাঈনুদ্দিনের হাতে

তুলে দিয়েছে। খালেককে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। পলাতক আলবদরদের ধরা এবং অপহৃত ভাইকে খুঁজে বের করার জন্য তৎপর থাকেন জহির রায়হান।

ঢাকার উপকণ্ঠ মিরপুর তখনও শত্রুমুক্ত হয়নি। পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণ করলেও প্রায় ২০ হাজার সশস্ত্র বিহারী তখনও মিরপুর দখল করে রেখেছে। এদের সাথে আছে আত্মসমর্পণ না করা একদল পাকিস্তানী সৈনিক এবং সারাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে আসা আলবদর ও রাজাকাররা। ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ মিরপুর তখন এক ক্যান্টনমেন্ট। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ অস্ত্র জমা দেয়া শুরু করে। কিন্তু কাদেরিয়া বাহিনী প্রধান কাদের সিদ্দিকী শর্ত দেন-বিহারীরা অস্ত্র সমর্পণ না করলে তিনি অস্ত্র জমা দেবেন না।

এই অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল এম এ জি ওসমানী ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শফিউল্লাহ বৈঠক করেন। সিদ্ধান্ত হয়, অস্ত্র উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হবে। ১৬ ডিসেম্বরের পর মিরপুরের নিরাপত্তায় থাকা ভারতীয় ১০ বিহার রেজিমেন্টের সাথে যোগাযোগ করলে তারা আশ্বস্থ করে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে বিহারীরা কোন বাধা দেবেনা, স্বেচ্ছায় অস্ত্র সমর্পণ করবে।

এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় অভিযানে নেতৃত্ব দিবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিয়াউল হক লোদীর নেতৃত্বে ৩০০ পুলিশ, সহায়তা করবে ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈনিক। সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন দ্বিতীয় বেঙ্গলের কমাণ্ডার মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। অপারেশনের তারিখ ও সময় নির্ধারিত হয় ৩০ জানুয়ারী সকাল ৭টা। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারী বিকেলে সৈনিকেরা মিরপুর যান। ভারতীয় রেজিমেন্ট তাঁদেরকে পজিশন বুঝিয়ে দিয়ে হেড কোয়ার্টারে ফিরে যায়।

৩০ জানুয়ারী ১৯৭২। সকাল ৭টা। অভিযান বহর প্রস্তুত। এসময় দুটি গাড়িতে এসে উপস্থিত হন জহির রায়হান সহ শহীদুল্লাহ কায়সার পরিবারের কয়েকজন। ভোরবেলা আসগর আলি মাস্তানা নামে ঢাকা চলচ্চিত্রের এক বিহারী অভিনেতা ফোন করে জানায় শহীদুল্লাহ কায়সারসহ কয়েকজন বুদ্ধিজীবি এখানে বন্দী আছেন। বেসামরিক ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে কমাণ্ডাররা খুবই বিরক্ত হন। জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত শুধু জহির রায়হানকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়, বাকি সবাইকে ফিরে যেতে হয়। জহির রায়হানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ল্যান্সনায়েক আমির হোসেন ও সিপাহি আকরামকে নিয়োজিত করা হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী পজিশন নেয় যেন কেউ অভিযানের সময় পালাতে না পারে। অস্ত্র তল্লাশীর মূল কাজ শুরু করার জন্য পুলিশও প্রস্তুত। মাইকে ঘোষণা শুরু হয় প্রত্যেকে যেন রাস্তায় এসে অস্ত্র জমা দিয়ে যায়। সব

ঠিকঠাক করে ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদকে ব্রিফিং দিয়ে মেজর মইন ফিরে যান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, দ্বিতীয় বেঙ্গলের অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারে। প্রথম কিছুক্ষণ সব শান্তিপূর্ণভাবে চলে।

সকাল এগারোটার দিকে হঠাৎ পাগলা ঘন্টির আওয়াজ শোনা যায়। সাথে সাথে সরু গলির দু'পাশের বাড়িগুলোর ভেতর ও ছাদ থেকে বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ! ভারী মেশিনগানের গুলির কাভারে বিপুল সংখ্যক বিহারী অস্ত্র হাতে বের হয়ে আক্রমণ শুরু করে। বাংলাদেশ বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ সামলে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার আগেই ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। সুবেদার মোখলেছুর রহমান ও ল্যান্সনায়েক নুরুল ইসলাম ঝিলপাড়ের অবস্থান থেকে এলএমজি ও এসএমজি ফায়ার করতে করতে পানির ট্যাংকের কাছে চলে আসেন। সেখানে গিয়ে দেখেন তাঁদের কেউ জীবিত নেই। দেয়ালের পাশে জহির রায়হান এবং রাস্তার অপর পাশে পুলিশের দলটি লুটিয়ে আছে।

উপায় না দেখে আগের অবস্থানে ফিরে আসতে গিয়ে শহীদ হন নুরুল ইসলাম। মোখলেছুর রহমান এবং বেঁচে থাকা অন্যরা তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। বেতার যন্ত্রগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে সময়মতো সংবাদও পৌঁছানো যায়নি। একসময় পুরো এলাকা বিহারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তারা তাদের আহত নিহতদের সরিয়ে নেয় এবং বাঙ্গালী আহতদের কুপিয়ে হত্যা করে লাশগুলো ফেলে দেয় কুয়া, ডোবা ও ঝিলে। বিকেলের মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারে বিপর্যয়ের সংবাদ পৌঁছে যায়। সন্ধ্যার পর শুরু হয় সেনাবাহিনীর মর্টার হামলা। সারারাত সেনাবাহিনীর সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ চলে বিহারীদের।

৩১ জানুয়ারি ভোরে মেজর মইন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ভারি অস্ত্রসহ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের পুরো ব্যাটেলিয়ন নিয়ে মিরপুর আসেন। কর্ণেল শফিউল্লাহ এবং কর্ণেল খালেদ মোশাররফও মিরপুর আসেন। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে মিরপুরের ১,২ ও ৬ নম্বর সেকশন শত্রুমুক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে দেওয়া হয় ১০, ১১ ও ১২ নম্বর সেকশনের দায়িত্ব। পূর্ণাঙ্গ কারফিউ জারি করে শুরু হয় "অলআউট কম্বিং অপারেশন"। টানা ১০ দিন তল্লাশির পর জব্দ করা হয় ১১ ট্রাক অস্ত্র। বিহারীদের প্রধান আখতার গুণ্ডা পালিয়ে পাকিস্তান চলে যেতে সক্ষম হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণাঙ্গন মিরপুরে শহীদ হয়েছিলেন প্রথম ওয়ারকোর্সে কমিশন পাওয়া সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সেলিম কামরুল হাসানসহ ৪১ জন সামরিক বাহিনীর সদস্য; অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিয়াউল হক লোদীসহ শতাধিক পুলিশ সদস্য; এবং জহির রায়হানু লেখক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা। ৪-৫ জন ছাড়া দেড় শতাধিক শহীদের কারোরই লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শহীদ জহির রায়হানেরও নয়।

তথ্যসূত্রঃ

১। দৈনিক ইত্তেফাক। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

২। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া শহীদজায়া পান্না কায়সারের সাক্ষ্য

৩। ল্যান্সনায়েক আমির হোসেনের সাক্ষাৎকার। 'নিখোঁজ নন, গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন জহির রায়হান'। জুলফিকার আলি মামুনের প্রতিবেদন। দৈনিক ভোরের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

৪। সুবেদার মোখলেছুর রহমানের সাক্ষাৎকার। জল্লাদখানা গণহত্যা, সত্যজিত রায় মজুমদার। জাগতিক প্রকাশন

৫। পিতার অস্থির সন্ধানে। অনল রায়হান (শহীদ জহির রায়হানের পুত্র)। সাপ্তাহিক ২০০০, ১৩ আগস্ট, বর্ষ ২, সংখ্যা ১৪

From Roots to White Coats: A Father's Silent Sacrifice and the Daughters Who Changed the World.

1985 — In a quiet village in East Africa, a man named Daniel stood barefoot with his three daughters. His wife had passed during childbirth the year before. He never remarried. He didn't have the time—or the heart.

He was a farmer, a builder, a father, and a dreamer—all in one.

Their home had no electricity. Some nights, dinner was just boiled roots and water. But what they had—what Daniel made sure they always had—was dignity.

Every morning before sunrise, he woke his girls and walked them two miles to the schoolhouse. He couldn't read or write himself, but he sat outside the classroom every day, waiting in the shade—just so they wouldn't have to walk home alone.

Sometimes he went without food so they could buy a pencil.
He sold his wedding ring to afford exam fees.
He worked three jobs during harvest season just to buy secondhand textbooks—many missing pages.
People laughed.
'They are girls,' they said.
'What future do they have?'
Daniel didn't answer.

He just kept walking beside them.
Years passed. One by one, they graduated.
One by one, they earned scholarships.
And one by one,, they crossed oceans.

2025 — Forty years after that photo was taken, the world saw something no one expected:
A new image of the same man, standing proudly—this time in front of a hospital—with his three daughters, all wearing white coats.
Doctors.
All of them.
When asked how he felt, Daniel cried softly and whispered:
ÒI never gave them the world.
I just never let the world take their hope away.Ó
He grew crops with his hands—
But he raised doctors with his heart.
And in the quiet shadow of a man the world never knew,
Three girls rose,, and changed it.

জেনারেল ডায়ের

জালিয়ানওয়ালাবাগ -এর সময় খান আব্দুল গফফার খান জেনারেল ডায়ের'কে বলেছিলেন যে "তুমি স্বাধীনতা সংগ্রামী একটাও মুসলিম লাশের পিঠে গুলি দেখিয়ে দাও, তাহলে আমি আজাদীর লড়াই থেকে দূরে সরে যাবো"।

টানা দু'দিন ধরে ৭৬ টি লাশের পোস্টমর্টেম চালিয়ে, একটি লাশেরও গুলি পিঠে লাগা বের হয়নি।তারা শহীদ হয়েছিল বুকে গুলি নিয়ে!

স্বাধীনতার পর তাঁর চিকিৎসার জন্য তৎকালীণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী তাঁকে ভারতে ডাকেন। প্রধানমন্ত্রী খোদ বিমানবন্দরে গিয়ে স্বাগত জানান।

হাতের ঝুলা (ব্যাগ) যখন ইন্দিরা নিজেই হাতে তুলে নিলেন তখন খান সাহেব বললেন সব তো নিয়ে নিলে মা, এটাও নিয়ে নেবে ?

এই শুনে ইন্দিরার দুটো চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

ভারত পাকিস্থানের বর্ডার পড়েছিল কিন্তু ভালবাসা আর আবেগে বর্ডার পড়েনি!

ভারতের এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী খান আবদুল গফফর খান, ৩৫বছর জেল খেটেছেন!ভারত ভাগের পর তার মাতৃভুমি খাইবারে থেকে যান!

এক মনেপ্রানে ভারতীয় এক রাতে হয়ে যায় পাকিস্তানী!

যারা কংগ্রেসের ইতিহাস জানেনা,যারা ভারতের ইতিহাস জানেনা,যারা জানেনা স্বাধীনতা আনতে কত তরতাজা প্রান গেছে,কত রক্ত দিয়েছে হিন্দু মুসলিম একযোগে,কত মায়ের কোল খালি হয়েছে,সেই ব্রিটিশের দালাল আরএসএস আজ

সার্টিফিকেট দেবে তোমাদের দেশভক্তির???তারা তোমাদের চোখ রাঙাবে???হিন্দু মুসলিম ভাগ করবে??না,এই দেশ রক্ত দিয়ে কেনা দেশ,দালালি বা বুটচেটে নয়!!সেটা ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বোঝানোর সময় এসে গেছে!

দূর্গা খাতুন

হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর পোস্টার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। একাধিক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিম নিহত হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালে খাজা সলিমুল্লাহের নেতৃত্বে ঢাকায় জন্ম হয় নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের। উগ্রবাদী হিন্দুদের নৃশংসতা দেখে আল্লামা ইকবাল বলেন,

উপমহাদেশের মুসলিমদের টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন আলাদা দেশের, দেশের সম্ভব্য নাম হবে পবিত্রদের ভূমি:পাকিস্তান।

কিন্তু এরপরেও পাকিস্তান আন্দোলন হালে পানি পাচ্ছিলো না কারন মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ক্যারিশমাটিক নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের সদস্য, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর পোস্টার।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের অখন্ডতা রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর প্রস্তাব দেন। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতকে একটা ফেডারেল স্টেট করার প্রস্তাব দেন। মোট প্রদেশ হবে ৫ টি এরমধ্যে ৩ টি থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আর ২ টিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ মন্ত্রণালয় থাকবে কেন্দ্রের অধীনে বাকী সব কিছু থাকবে প্রাদেশিক সরকারের অধীনে। দেশের নাম হবে ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া বা ভারত যুক্তরাষ্ট্র।

কংগ্রেস এই প্রস্তাব না মেনে উল্টো জিন্নাহকে প্রলোভন দেখায় তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে, তিনি হবেন পৃথিবীর বৃহত্তম গনতান্ত্রিক দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। দেরিতে হলেও বুঝতে পারেন হিন্দুত্ববাদীরা চায় 'অখন্ড ভারত' তত্ত্বের আলোকে ইংরেজদের রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যের নতুন সম্রাট হতে।

জিন্নাহ এবার রুখে দাঁড়ালেন। যোগ দেন মুসলিম লীগে। মুসলিম লীগ যেন যৌবন পায়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লেখেন,

মুসলিম লীগের আন্দোলন যেরূপ গদাই-লস্করী চালে চলছিল, তাতে আমি আমার অন্তরে কোন বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি। হঠাৎ লীগ নেতা কায়েদে আজম যেদিন পাকিস্তানের কথা তুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন -"আমরা

ব্রিটিশ ও হিন্দু ফ্রন্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব” সেদিন আমি উল্লাসে চীৎকার করে বলেছিলামু হাঁ, এতোদিনে একজন ‘সিপাহসালার’ সেনাপতি এলেন। আমার তেজের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠলো।

এর ধারাবাহিকতায় ১৯৩৩ সনের ২৮ জানুয়ারি, চল্লিশ বছর বয়েসি ক্যামব্রিজ গ্রাজুয়েট রহমত আলী, ক্যামব্রিজে বসে সর্বপ্রথম ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা নিরাপদ রাষ্ট্রের খসরা প্রণয়ন করেন, সে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য নামও প্রস্তাব করেন, আল্লামা ইকবালের বলা সেই নাম, পাকিস্তানড়্পবিত্রদের ভূমি। তিনি সেই খসরার উপসংহার টানেন এই বলে,

We shall not crucifz ourselves on a cross of Hindu nationalism.

হিন্দুত্ববাদীরা এবার জ্বলে উঠে। বেশ কয়েকজন মুসলমান নেতাদের নানান ভাবে প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানে। অন্য সবাইকে ‘ম্যানেজ’ করা গেলেও আলী জিন্নাহ কে টলানো গেল না।

এবার আগুন জ্বলে উঠে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের চিত্তে। আবার শুরু হয় দাঙ্গার নামে মুসলমান নিধন। কোন ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না ভারতভাগ। আমাদের নেতাও তার উপযুক্ত জবাব দেন,

A Muslim is not born to give up. If he is forced to be enslaved he will become Babur and he will emerge as Tipu Sultan. He can happily embrace martyrdom, but will never accept slavery.

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে জেগে ওঠে বাংলার মুসলিমরা। বাংলার মুসলিমরা পরিণত হয় পাকিস্তান আন্দোলনের ভ্যানগার্ডে। ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে একমাত্র বাংলা প্রদেশে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয় মুসলিম লীগ। যার ফলশ্রুতিতে আসে স্বাধীনতা, এই মানচিত্র এবং আমাদের দাদা-নানারা ফিরিঙ্গি রাজা জর্জের প্রজা থেকে নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেন...

আজাদি মোবারক

মুসলমান হওয়ার অপরাধে

এক সময় এই দেশে মুসলমানের ছেলেদের রাস্তা ছেড়ে দিতে হত।

শুধু মুসলমান হওয়ার “অপরাধে”।

বানিয়ে বানিয়ে বলছি না। কাছাকাছি ঘটনা পাবেন আবুল মনসুর আহমেদ এর “আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর” বইতে।

সেখানে আবুল মনসুর আহমদ এর বেয়াদবির জন্য উনার বাবাকে হিন্দু জমিদারের কাছে হাত জোড় করে মাফ চাইতে হয়েছিল।

৪৭ আপনাকে শুধু স্বাধীনতা দেয় নাই, ৪৭ আপনাকে দিয়েছে মানুষের মর্যাদা।

৪৭ আগ পর্যন্ত আপনি ছিলেন প্রজা।

আপনাকে জমিদারের কাছে যেয়ে তার দয়া ভিক্ষা করতে হত।

দশ হাত দূরে দাঁড়ানো লাগত।

এ দেশে মুসলমানরা লেখাপড়া করতে পারে নাই কেন জানেন?

বেশিরভাগ স্কুলে মুসলমানের বাচ্চাদের বসতে দেওয়া হত না।

অনেক স্কুলে ভর্তিই নিত না।

নাটোরের একটা এলাকায় গেলে দেখবেন মুসলমানের ছেলের নাম গোপাল।

কেন?

কারন ওখানে মুসলমানদের বাচ্চার নাম রাখার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। মুসলমানের ছেলে হলে সেই ছেলে কোলে নিয়ে দূরে দাঁড়াতে হত।

হিন্দু জমিদার নিজের ইচ্ছামতো নাম দিয়ে দিতেন।

পাকিস্তান হওয়ার পর এই এলাকাতে কাজী নাজির নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট যান।

তিনিই প্রথম একজনের নাম রাখেন আব্দুর রহমান।

তিনিই প্রথম মুসলমানের ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন।

তার আগ পর্যন্ত মুসলমানের ছেলে হলে স্কুলে জায়গা হত না। অশুচি হয়ে যায় তাই।

৪৭ আপনাকে আপনার নাম দিয়েছে।

৪৭ আপনাকে আপনার লেখাপড়ার সুযোগ দিয়েছে।

৪৭ এর ১৪ আগস্টের আগে আপনি ছিলেন একজন অশুচি প্রজা, ৪৭ এর ১৪ আগস্ট থেকে আপনি প্রজা থেকে নাগরিক হয়েছেন।

এই ইতিহাসগুলো কেউ আপনাকে বলবে না।

বাট আপনার জানতে হবে।

আপনার জানতে হবে, একটা পাকিস্তানের জন্য কেন আমাদের বাপ দাদারা ২০০ বছরের সংগ্রাম করলো?

আপনার দেখতে হবে আসাম, দেখতে হবে কাশ্মীর, দেখতে হবে গুজরাট।

তারপর আপনি বুঝবেন, স্বাধীনতা কত বড়।

আপনার দেখতে হবে আসামের সেই দলিতকে। গরুর মাংস বহনের অভিযোগে যাকে কিছুদিন আগে হত্যা করা হয়েছে।

জিন্নাহ আর শেরে বাংলারা শুধু আপনার নাম দেয় নাই, দিয়েছে আপনার খাওয়ার অধিকারও।

সেই তিতুমীর ,মজনু শাহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া। তিতুমীর রক্ত দিলেন। সেই রক্তে লাল হয়ে গেল বুড়ি গঙ্গার পানি।

দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়া হলো।

কোনভাবেই পাকিস্তান হইতে দেওয়া যাবে না।

অত্যাচার জুলুম করে জমিদারি চালানোর এই মজা কে ছাড়তে চায়?

মুসলমানের ছেলের নাম গোপাল রাখার মজা কে ছাড়তে চায়?

তাই বারবার বুড়ি গঙ্গা আর পদ্মার পানি লাল হয়েছে আমার বাপ দাদাদের রক্তে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আসলো।

আল্লামা ইকবাল পাকিস্তান নাম উচ্চারণ করে মারা গেলেন। বাট সেই মশাল নিয়ে সামনে চলে আসলেন নবাব সলিমুল্লাহ খান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, আর কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহরা।

জমিদারদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আমরা পেলাম নতুন পতাকা, নতুন মানচিত্র।

প্রজা থেজে আমরা হয়ে উঠলাম নাগরিক।

আমরা কথা বলতে শিখলাম, অধিকার চাইতে শিখলাম।

শুরুটা ৪৭ এই।

এরপর এলো ৫২।

এলো ৭১।

এলো ২৪।

বাট আগুনটা ঐ ৪৭ এর ১৪ ই আগস্টেই জ্বলেছিল।

আমাদের প্রথম স্বাধীনতা দিবস আজ।

আমাদের প্রজা থেকে নাগরিক হওয়ার দিন আজ।

আজকের পর থেকে সব স্কুলে আমরা ভর্তি হতে পেরেছি, আজকের পর থেকে নিজেদের খাবার খাওয়ার জন্য কোন জমিদারের পারমিশন আমাদের নিতে হয় নাই।

৪৭ এর স্বাধীনতার প্রতিটা যোদ্ধাকে আমি সালাম জানাই।

সালাম জানাই, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক আর কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে।

আজকের দিনটা আমাদের কাস্মীর না হওয়ার দিন।

আজকের দিনটা আমাদের আজাদীর দিন।

দিল্লির গোলামী থেকে মুক্ত হওয়া মাশরেক আর মাগরেবের সমস্ত সন্তানকে জানাই এই অসহ্য সুন্দর আজাদীর শুভেচ্ছা!!

মসজিদ তো ভাংচুর করছো মন্দিরের কথা কি ভাবছো?

*** ৭০০ বছর মুসলিমরা শাসন করে হিন্দুদেরকে মায়ের কোলে রেখে লালন করেছিলো। কখনো হিন্দু নিঃচিহ্ন করার কথা কেউ ভাবেনি।
** ভারতথআসলেথকাদের?? ভারতের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত পড়ুন!! ঘৌরি সাম্রাজ্য থেকে নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত ঘোরি কিংডম!!
** আমরা গর্বিত আমরা মুসলমান, আমরা মানুষ, আমাদের ধর্ম ইসলাম আর ইসলাম শান্তির,মানবতার ধর্ম।

১ = ১১৯৩ মোহাম্মদ ঘোরি
২ = ১২০৬ কুতুবুদ্দিন আইবেক
৩ = ১২১০ বাকি শাহ
৪ = ১২১১ ইলতুৎমিস
৫ = ১২৩৬ রকিনউদ্দিন ফিরোজ শাহ
৬ = ১২৩৬ রাজা সুলতান
৭ = ১২৪০ মোজাদ্দিন বাহরাম শাহ
৮ = ১২৪২ আল-দীন মাসউদ শাহ
৯ = ১২৪৬ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ
১০ = ১২৬৬ গিয়াসউদ্দিন বালবিন
১১ = ১২৮৬ ....
১২ = ১২৮৭ মসজিদের কাবাদন
১৩ = ১২৯০ শামসুদ্দিন কামার্স
মহান সাম্রাজ্যের সমাপ্তি
(সরকার থেকে -৯৭ বছর প্রায় দূরে।)
** সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্য
১ = ১২৯০ জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি
২ = ১২৯২ শিক ধর্ম

৪ = ১৩১৬ শাহাবুদ্দিন ওমর শাহ
৫ = ১৩১৬ কুতুবুদ্দীন মোবারক শাহ
৬ = ১৩২০ নাসিরুদ্দিন খুসরো শাহ
খলজি সাম্রাজ্যের সমাপ্তি
(সরকারী -৩০ বছর প্রায়)
** তুঘলক সাম্রাজ্য
১ = ১৩২০ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (প্রথম)
২ = ১৩২৫ মোহাম্মদ ইবনে তুঘলক (দ্বিতীয়)
৩ = ১৩৫১ ফিরোজ শাহ তুঘলক
৪ = ১৩৮৮ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (দ্বিতীয়)
৫ = ১৩৮৯ আবু বকর শাহ
৬ = ১৩৮৯ মোহাম্মদ তুঘলক (সোম)
৭ = ১৩৯৪ ....
৮ = ১৩৯৪ নাসিরুদ্দিন শাহ (দ্বিতীয়)
৯ = ১৩৯৫ নুসরত শাহ
১০ = ১৩৯৯ নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ (দ্বিতীয়)
১১ = ১৪১৩ সরকার
তুঘলক সাম্রাজ্যের সমাপ্তি
(সরকার -৯৪ বছর প্রায় দূরে।)
** সাদ ঝধববফ রাজবংশ *
১ = ১৪১৪ খেজুর খান
২ = ১৪২১ মুইজউদ্দিন মোবারক শাহ (দ্বিতীয়)
৩ = ১৪৩৪ মুহাম্মদ শাহ (চতুর্থ)
৪ = ১৪৪৫ আলম শাহ
সা'দ রাজ্যের সমাপ্তি
(সরকারী - ৩৭ বছর প্রায়)
** লোধি সাম্রাজ্য
১ = ১৪৫১ বাহলোল লোধি
২ = ১৪৮৯ লোধি (দ্বিতীয়)
৩ = ১৫১৭ আব্রাহাম লোধি
লোধি সাম্রাজ্যের সমাপ্তি
(সরকারী-৭৫ বছর প্রায়)
** মুঘল সাম্রাজ্য
১ = ১৫২৬ জহিরউদ্দিন বাবর
২ = ১৫৩০ হুমায়ুন

মুঘল সাম্রাজ্যের সমাপ্তি
** সুরিয়ান সাম্রাজ্য
১ = ১৫৩৯ শের শাহ সুরি
২ = ১৫৪৫ ইসলাম শাহ সুরি
৩ = ১৫৫২ মাহমুদ শাহ সুরি
৪ = ১৫৫৩ আব্রাহাম সুরি
৫ = ১৫৫৪ পারভেজ শাহ সুরি
৬ = ১৫৫৪ মোবারক খান সুরি
সুররিয়ান সাম্রাজ্যের সমাপ্তি
(সরকারী -১৬ বছর প্রায়)
** আবার মোগল সাম্রাজ্য
১ = ১৫৫৫ হুমায়ুন (আবার)
২ = ১৫৫৬ জালালউদ্দিন আকবর
৩ = ১৬০৫ জাহাঙ্গীর স্লাম
৪ = ১৬২৮ শাহ জাহান
৫ = ১৬৫৯ আওরঙ্গজেব
৬ = ১৭০৭ শাহ আলম (প্রথম)
৭ = ১৭১২ বাহাদুর শাহ
৮ = ১৭১৩ ফার্কুয়ারশিয়ার
৯ = ১৭১৯ রিফাদ রজত
১০ = ১৭১৯ ....
১১ = ১৭১৯ ....
১২ = ১৭১৯ মাহমুদ শাহ
১৩ = ১৭৪৮ আহমেদ শাহ
১৪ = ১৭৫৪ ....
১৫ = ১৭৫৯ শাহ আলম
১৬ = ১৮০৬ আকবর শাহ
১৭ = ১৮৩৭ সাহসী কিং জাফর
মুঘল সাম্রাজ্যের সমাপ্তি
(সরকারী -১১৫ বছর থেকে দূরে।)
** ব্রিটিশ রাজ *
১ = ১৮৫৮ লর্ড কিং
২ = ১৮৬২ লর্ড জেমস ব্রুস এলগিন
৩ = ১৮৬৪ লর্ড জে লরেন্স
৪ = ১৮৬৯ লর্ড রিচার্ড মায়ো

৫ = ১৮৭২ লর্ড নর্থবাক
৬ = ১৮৭৬ লর্ড এডওয়ার্ড ল্যাটিন
৭ = ১৮৮০ লর্ড জর্জ রিপন
৮ = ১৮৮৪ লর্ড ডাফারিন
৯ = ১৮৮৮ লর্ড হ্যানি লেসডন
১০ = ১৮৯৪ লর্ড ভিক্টর ব্রুস এলগিন
১১ = ১৮৯৯ লর্ড জর্জ করজিয়ান
১২ = ১৯০৫ লর্ড গিলবার্ট মিন্টো
১৩ = ১৯১০ লর্ড চার্লস হাড্‌র্জ
১৪ = ১৯১৬ লর্ড ফ্রেডেরিক থেকে এক্সিকিউয়ারে
১৫ = ১৯২১ লর্ড রাক্স আজাক রিদিগ
১৬ = ১৯২৬ লর্ড এডওয়ার্ড ইরউইন
১৭ = ১৯৩১ লর্ড ফারম্যান ওয়েলডন
১৮ = ১৯৩৬ লর্ড আলেজান্দ্রা লিনলিথগো
১৯ = ১৯৪৩ লর্ড অর্কিবল্ড হুইল
২০ = ১৯৪৭ লর্ড মাউন্ট ব্যাটন
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তি
** ভারত, প্রধানমন্ত্রী
১ = ১৯৪৭ জওহরলাল নেহেরু
২ = ১৯৬৪ গোলজারি লাল নন্দ
৩ = ১৯৬৪ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী
৪ = ১৯৬৬ গোলজারি লাল নন্দ
৫ = ১৯৬৬ ইন্দিরা গান্ধী
৬ = ১৯৭৭ মোরারজি দেশাই
৭ = ১৯৭৯ চরণ সিং
৮ = ১৯৮০ ইন্দিরা গান্ধী
৯ = ১৯৮৪ রাজীব গান্ধী
১০ = ১৯৮৯ বিশ্বনাথ রিটার্নস
১১ = ১৯৯০ চন্দ্রশেখর
১২ = ১৯৯১ পি.ভি. নরসিমা রাও
১৩ = ১৯৯২ অটল বিহারী বাজপেয়ী
১৪ = ১৯৯৬ চাদে গৌড়
১৫ = ১৯৯৭ আই.কে. গুজরাল
১৬ = ১৯৯৮ অটল বিহারী বাজপেয়ী
১৭ = ২০০৪ মনমোহন সিং

১৮ = ২০১৪ নরেন্দ্র মোদী

এক হাজার বছর ধরে মুসলমান রাজত্ব হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা ভারতে রয়ে গেছে। মুসলিম শাসকরা তাদের সাথে কখনই অন্যায় আচরণ করেনি। এইটাই আমাদের ধর্ম।

এই পোস্টটি অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করুন। কারণ আজকাল ৯০% লোকের এ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই - = (ভারতের ইতিহাস) =

বাবরী মসজিদ

বাবরী মসজিদ তথা অযোধ্যা মামলায় মুসলমান পক্ষের উকিল ছিল একজন হিন্দু! কিন্তু বিস্ময়কর তার যুক্তি :

ড. রাজীব ধবন একজন হিন্দু উকিল কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী মানুষ। বাবরি মসজিদ ও রাম মন্দির মামলায় রামকে বিপদে ফেলে দিয়েছিলো!

অযোধ্যা-মামলার শুনানীর সময় কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার জবাব সরকারী উকিলের কাছে ছিল না। কিছু প্রশ্ন ছিলো নিম্নরূপঃ

(১) একই সময়ে দু'রকমের মানুষ কি করে হতে পারে? এক ু পুচ্ছধারী, আর এক লেজবিহীন?
দু'ধরনের মানুষই মানুষের ভাষায় কথা বলে, দুইজনেরই পিতা রাজা,- এটা কি করে সম্ভব?

(২) ব্যাঙ থেকে মন্দোদরী কি করে হয়ে যায়/ কি করে জন্ম হতে পারে?

(৩) ল্যাঙটের দাগ ছাড়াতে গিয়ে কি করে অঙ্গদের জন্ম হতে পারে?
একটা পাখী কি করে মানুষের মত কাজ করতে পারে,- যেমন "গিধরাজ" - জটায়ু/গরুড়?

(৪) কোনো মানুষের দশটা মাথা হতেই পারে না। আজ পর্যন্ত ইতিহাস বা পুরাতত্ত্ব দিয়ে এটা প্রমাণ হয়নি যে কোনো মানুষের দশটা মাথা বা কুড়িটা হাত থাকতে পারে?

(৫) যে লঙ্কার কথা আপনারা বলছেন , তার নাম ইংরেজি ১৯৭২ সালে লঙ্কা হয়েছে। তার আগে ছিল সিলোন, আবার সিলোনের আগে ছিল সিংহলা, ইত্যাদি নাম ছিল। তো আসল লঙ্কা কোথায়?

(৬) একটা কলসী থেকে একটা মেয়ের জন্ম কি করে হতে পারে?
এক মাসের মধ্যে মকরধ্বজের কি করে জন্ম হতে পারে? এক মাসেই মকরধ্বজ পাতালপুরীতে চাকরি করতে লেগে গেল। এটা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে প্রমাণ করুন।

একটা মাছের থেকে মানুষ কি করে জন্মাতে পারে?

(৭) ৫০০০ সাল পুরানো দ্রাবিড় ভাষা তো কেউ পড়তে পারে না। তো, ৭০০০ সাল পূর্বে অঙ্গদের ভাষা কি ছিল?

(৮) সম্রাট অশোকের কালে অযোধ্যার নাম ছিল সাকেত। অযোধ্যার পরে সাকেত, সাকেতের পরে অযোধ্যা নাম কি করে হল?
পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে একটাও প্রমাণ যদি থাকে, তো বলুন যে রামরাজ্য ছিল!

(৯) সাত ঘোড়া নিয়ে সূর্য্য কি করে চলে? আপনার বইয়ে বলছে। যেখানে বিজ্ঞান বলছে সূর্য্য চলেই না।
রামের রাজ্যাভিষেক যখন হচ্ছিল, সুর্য্য এক মাসের জন্য থেমে গিয়েছিল,- আপনাদের বইয়ে লেখা আছে।
সূর্য্য যখন চলেই না। যদি সুর্য্য চলেই থাকে তো প্রমাণ করুন!

(১০) সূর্য্যকে হনুমান খেতে গেল, বগল দাবা করল, তো হনুমানের 'স্পীড' - গতি আর সাইজ কত বড় ছিল?
যে হনুমান সূর্যের আগুনে পুড়ে যেতে পারে না, সে লেজের আগুনে কি করে পুড়ে যায়?

(১১) বাল্মিকী রামায়ন বলছে যে চৈত্র-অমাবস্যায় রাবণ বধ হয়েছিল। আবার, তুলসিদাসী রামায়ণে লেখা, দশেরার দিন রাবণ বধ হয়। কোনটা সত্যি?

(১২) ৪০০০ বছর হল সোনা আবিষ্কার হয়েছে। তো, ৭০০০ বছর আগে সোনার লঙ্কা কোথা থেকে এল?
সোনার গলনাঙ্ক হল ৩০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি। তা হলে বলুন – লেজের আগুন এত বেড়ে গেল কি করে?
সোনার মহল ছিল, না সোনার লঙ্কা ছিল ?
৬০০০বছর আগে সবাই চামড়ার পোষাকই পড়তো, তো ৭০০০বছর আগে রাম কি করে কাপড়ের পোষাক পড়তেন?

(১৩) ব্রহ্মার মুখ থেকে যখন ব্রাহ্মণ জন্ম নিল, তো শুধু ভারতেই কেন জন্ম নিল? ব্রহ্মা যখন ব্রহ্মান্ডই বানিয়েছেন,

তখন - চীন, আমেরিকা, ব্রিটেন, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি দুনিয়ার বাকি দেশগুলিতে কেন ব্রাহ্মণ জন্মায় নি, বা জন্মায় না? আজও কি ব্রাহ্মণ মুখ থেকেই জন্মায়, না কি জননাঙ্গ থেকে?

(১৪) ওটা কি ধরণের সফটওয়্যার ছিল, যা দিয়ে জানা যায় যে, সীতা লক্ষ্ণন-রেখা পার করলে কিছুই হবে না, কিন্তু রাবণ পার হলেই জ্বলে ওঠে?

(১৫) যে ধনুকটা রাবণ উঠাতে পারেনি, সেই ধনুক উঠাতে যে পারে সেই সীতাকে রাবণ কি করে উঠিয়ে নিল?

এমন হাজারো প্রশ্ন করা যায়। অযোধ্যা মামলার শুনানিতে এই রকম প্রশ্ন উঠেছে, যার জবাব সরকার পক্ষ বা প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ দিতে পারেনি। আপনিও জবাব দিতে পারবেন না। মহাকাব্যের একটি চরিত্র রাম। তাকে সত্য ধরে মূর্খরা যা করছে তা লজ্জাকর।

ড. রাজীব ধবন বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে মুসলিম পক্ষের হয়ে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটি সবচেয়ে আলোচিত যুক্তি নিচে দেওয়া হলো–

- বাবরি মসজিদ ১৫২৮ সালে নির্মিত হওয়ার পর থেকে শত শত বছর মুসলমানরা সেখানে নামাজ আদায় করে আসছে।
- এত দীর্ঘকাল ব্যবহার ও দখলের কারণে এটি স্পষ্টতই ওয়াকফ সম্পত্তি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মালিকানায়।
- ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাবরি মসজিদে নিয়মিত নামাজ পড়ার সরকারি দলিল, নথি ও সাক্ষ্য আদালতে তুলে ধরেন।
- ১৯৪৯ সালে রাতে মসজিদের ভেতরে গোপনে রামলালা মূর্তি স্থাপন করার আগে পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই ব্যবহার হচ্ছিল।
- তিনি যুক্তি দেন, "কোনো জায়গা কেবল বিশ্বাস বা পুরাণে উল্লেখ থাকার কারণে মালিকানা হয়ে যায় না।"
- আদালতে স্পষ্ট করেন যে জমির মালিকানা আইনি প্রমাণের ওপর নির্ভর করবে, কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসে নয়।
- ১৯৪৯ সালে রামলালা মূর্তি গোপনে স্থাপনকে তিনি "অবৈধ ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ" হিসেবে দেখান।
- ১৯৯২ সালে মসজিদ ভাঙাকে তিনি "আইনের শাসনের চরম লঙ্ঘন" বলেন।
- তিনি যুক্তি দেন, ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।
- রাষ্ট্র বা আদালত কোনো একটি ধর্মবিশ্বাসকে অন্যটির ওপরে স্থান দিতে পারে না।
- তিনি জোর দিয়ে বলেন, হিন্দু পক্ষ কোনো সময় জমির বৈধ মালিক ছিল না।
- শুধু বিশ্বাস বা জনশ্রুতি দিয়ে প্রমাণ হয় না যে, সেই স্থানে রামের জন্ম হয়েছিল।

দীর্ঘদিন ধরে টানা যুক্তি উপস্থাপন করার জন্য তিনি বারবার শারীরিকভাবে ক্লান্ত হলেও মামলা থেকে সরে আসেননি। হিন্দু হয়েও মুসলিম পক্ষের হয়ে দাঁড়ানোয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ ও হুমকির শিকার হন। তাঁর যুক্তিগুলো মামলার

ইতিহাসে অন্যতম সেরা আইনগত ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা হয়। বিচারক স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাবড়ি মসজিদ কোনো মন্দিরের ওপর স্থাপনের কোনো প্রমাণ মিলেনি।

রুমিন ফারহানা লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি করেছেন। হাসনাত ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

রুমিন ফারহানার বাবা স্বাধীনতা পুরস্কারজয়ী একজন রাজনীতিবীদ, ভাষাসৈনিক ও লেখক। হাসনাত আব্দুল্লাহর বাবা একজন সাধারণ মানুষ। তার চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ। মুখে গ্রাম বাংলার হাসি।

হাসনাত তার বাবার মতো হননি। বাবার মতো হলে হয়তো এসএসসি পাশ করে মধ্যপ্রাচ্যে চলে যেতেন। হাসনাত হয়েছেন ঠিক সেটাই যেটা আল্লাহ তাকে বানাতে চেয়েছেন।

কৃষক ঘরের সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, ইংরেজিতে। বিসিএস দিয়ে বড় চেয়ারে বসে টেবিলের উপর নিচ দিয়ে সমানে টাকা কামাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সময়ের দাবি মেনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'উই আর ওপেন টু কিল্ড'। দেশ উদ্ধারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

রুমিন ফারহানাও তার বাবার মতো হননি। রুমিনের বাবা ছিলেন জাঁদরেল রাজনীতিবীদ। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। রাজনীতি করেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

অথচ ৭১-৭৪ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সেরা সময়ে তিনি আওয়ামী লীগ করেন নাই। মুজিবের সঙ্গ ত্যাগ করে যোগ দিয়েছেন মওলানা ভাষানীর সঙ্গে। শেখ মুজিবের বিরোধীতা করেছেন, গ্রেফতার হয়েছেন।

হাসনাত তার দাদার মতো হয়েছেন কি না জানি না; তবে রুমিন ফারহানা হয়েছেন হয়তো তার দাদার মতোই। রুমিন ফারহানার দাদা আবদুল ওহাব ছিলেন ব্রিটিশরাজের কর্মকর্তা। ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রারের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

একদিকে ব্রিটিশরা এদেশের বিপ্লবীদের ফাঁসি দিচ্ছে, গুলি চালাচ্ছে- যা দেখে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ নাইট উপাধি বর্জন করছেন। অন্যদিকে রুমিন ফারহানার দাদা সকাল বিকাল অফিস করছেন, ফাইল সামলাচ্ছেন, বেতন নিচ্ছেন।

যার দাদা ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্টার, বাবা স্বাধীনতা পুরস্কারজয়ী তার মেয়ে ব্যারিস্টার না হওয়াটা এক প্রকার অপরাধ; আবার যার দাদা একজন সাধারণ মানুষ, বাবাও

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তার দেশ নিয়ে ভাবা এবং দেশের ঘারে চেপে বসা ১৭ বছরের জঞ্জাল মুক্ত করাও এক প্রকার অপরাধ। আজ সেই অপরাধের শাস্তিই হাসনাতকে দেওয়া হচ্ছে।

রুমিন ফারহানা বনাম হাসনাত আব্দুল্লাহ

রুমিন ফারহানা হাসনাত আব্দুল্লাহকে ফকিন্নির পুত বলতেই পারেন। তার অর্থবিত্ত সাপেক্ষে আমি আপনি আমরা প্রায় সবাই ফকিন্নির পুত। হাসনাতকে বান্দির পুত বলতেই পারেন মেহের আফরোজ শাওন। তার অর্থবিত্ত সাপেক্ষেও আমরা সবাই প্রায় তাই।

কিন্তু, হাসনাত আব্দুল্লাহর ধারেকাছেও এরা দুই বড়লোকের পুত নাই। বাংলা ভাষায় যতদিন ইতিহাস রচিত হবে, ততদিন হাসনাত আব্দুল্লাহর অবদান লিখতেই হবে। এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নাই।

আরও লিখতে হবে, রুমিন ফারহানারা বড়লোকের বেটিলো হয়েও কিভাবে হাসিনার কাছে ফ্ল্যাট ভিক্ষা চেয়েছিল; যেখানে হাসনাতরা বলেছিল 'ত*র*বা*রি*র সাথে গর্দানের সংলাপ চলতে পারে না।'

রুমিন ফারহানা, মেহের আফরোজ শাওনের সঙ্গে হাসনাতের একটা মিল আছে। তারা কেউ জনতার ভোটে সংসদ সদস্য হন নাই। অমিলও আছে বহু।

তবে গুরুত্বপূর্ণ অমিল হলো, শাওন-রুমিনরা সিংহের ঘরে জন্ম নেওয়া সাধারণ প্রাণী। হাসনাত সাধারণ ঘরে জন্ম নেওয়া সিংহ। সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্ম নিয়েছে এক সাধারণ ঘরে। শ্রেষ্ঠ ঘরগুলোতে জন্ম নিয়েছে আবর্জনা। দেশের পরিবর্তন যে এসে গেছে তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন? ২৬ বয়সের হাসনাত ৬২ বছরের বুড়ো ধারীদের ঘাম ঝরিয়ে ছারছে?

রুমিন-শাওনদের যুগ শেষ, আমরা নতুন যে যুগে পা দিচ্ছি, তা কেবল হাসনাতদের।
লেখা- Muhammad Asadullah

হানাদার পাকিস্তানিরা যা করেছিলো

হানাদার পাকিস্তানিরা যা করেছিলো, আমরা কেন তা করতে পারলাম না ?

পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) আব্দুল মোনেম খানের উন্নয়নমূলক অবদান-

বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস যখন আলোচিত হয়, তখন সাধারণত আমরা শুনি শুধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ জিয়াউর রহমান, হুসেন মুহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার সরকারের উন্নয়নের কথা।

তবে নতুন প্রজন্মের কাছে কি কখনো প্রশ্ন জাগেনি, পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) কোন উন্নয়ন হয়েছিল কিনা ?

আসুন, একবার নজর দিই পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দিকে-

পূর্ব পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে আইয়ুব খানের সময়ে গভর্নর ছিলেন মোট ২২ জন।

তাদের মধ্যে শুধু জনাব আব্দুল মোনেম খান একাই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছিলেন তা যদি স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৪ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাসের উন্নয়নের সাথে তুলনা করেন তবে অবাক হতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য গভর্নররা প্রায়শই বরাদ্দ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফেরত পাঠাতেন, কিন্তু মোনেম খান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি বরাদ্দ আদায় করে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করেছিলেন।

উল্লেখ্য, মোনেম খান ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মোট ৬ বছর ৫ মাস গভর্নর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিলেন।

মোনেম খানের গভর্নরের সময়, পূর্ব পাকিস্তানে যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাজগুলো করা হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে-

১. নগর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা।
২. শেরে বাংলা নগর (আগে আইয়ুব নগর)।
৩. জাতীয় সংসদ ভবন।
৪. বাংলাদেশের সচিবালয়ের কয়েকটি উচ্চতলা ভবন।
৫. বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও মার্কেট।
৬. সুপ্রিম কোর্ট ভবন।
৭. বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন।
৮. সোনালী ব্যাংক (ন্যাশনাল ব্যাংক) ভবন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র-

৯. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১১. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভবন, নতুন কলাভবন, প্রশাসনিক ভবন।

১৩. বিভিন্ন হল ও ছাত্রাবাস : জিন্নাহ হল (বর্তমান সূর্যসেন হল), হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল, রোকেয়া হল, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ।
১৪. ঢাকা কারু ও চারুকলা কলেজ ভবন ও ছাত্রাবাস।

অবকাঠামো ও শিল্পায়ন-

১৫. কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন।
১৬. আন্তর্জাতিক মানের বিমান বন্দরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (পরবর্তীতে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর)।
১৭. জিপিও ভবন।
১৮. এটমিক অ্যানার্জি সেন্টার।
১৯. সাইন্স ল্যাবরেটরি।
২০. পিজি হাসপাতাল।
২১. ৭টি মেডিক্যাল কলেজ।
২২. ডি আই টি ভবনে প্রথম টেলিভিশন কেন্দ্র।

নগর উন্নয়ন ও পরিকল্পিত আবাসন-

২৩. বনানী, গুলশান, উত্তরা ও নাসিরাবাদ মডেল টাউন।
২৪. সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল।
২৫. জয়দেবপুর ধান গবেষণা কেন্দ্র।

শিল্প ও বিদ্যুৎখাত-

২৬. বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি।
২৭. গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ও অস্ত্র কারখানা।
২৮. চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা।
২৯. আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ প্রকল্প।
৩০. কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প।
৩১. ১০টি চিনিকল।
৩২. ১৬টি জুট মিল।
৩৩. দেশের শতকরা ৮০ ভাগ টেক্সটাইল মিল স্থাপন, রেশম ও তাঁত উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ।
৩৪. ঈশ্বরদীতে ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৩৫. ঘোড়াশাল সার কারখানা।
৩৬. প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ।
৩৭. ইস্টার্ন রিফাইনারি।
৩৮. বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট।
৩৯. টেলিফোন কারখানা।

৪০. চট্টগ্রাম বন্দর, ডকইয়ার্ড উন্নয়ন ও পৌরসভা আধুনিকীকরণ।
৪১. নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড।
৪২. নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল।
৪৩. খুলনা হার্ড কোর ফ্যাক্টরি।
৪৪. কর্ণফুলী পেপার মিল।
৪৫. ইস্টার্ন কেবলস।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ-

৪৬. রাজশাহী ক্যাডেট গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট।
৪৭. মির্জাপুর, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ।
৪৮. নাটোরের দিঘা পতিয়ার রাজবাড়িকে সংস্কার করে গভর্নমেন্ট হাউজ।
৪৯. শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর।
৫০. কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি।
৫১. ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (WAPDA) গঠন।
৫২. দেশের বিদ্যুৎ খাতে গতি সঞ্চারের জন্য ১৯৫৯ সালে ওয়াপদা গঠন করা হয়।
৫৩. কাপ্তাই থেকে সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত ২৭৩ কি.মি দৈর্ঘ্যের দেশের প্রথম জাতীয় পাওয়ার গ্রিড লাইন চালু।
৫৪. দেশের বিভিন্ন নগর অবকাঠামো ও শিক্ষা বিস্তার।
৫৫. জেলা শহর ও বিভিন্ন হাট-বাজারের উন্নয়ন।
৫৬. রাস্তা ও লিংক রোড নির্মাণ।
৫৭. ঢাকার মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণ।
৫৮. বিভিন্ন জেলার স্কুল-কলেজ সরকারিকরণ।
৫৯. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল সম্প্রসারণ।

এতো সবকিছুর পরও মোনেম খান এবং আইয়ুব খানকে অনেক বাঙালি “খলনায়ক” হিসেবে দেখে থাকেন।

তারা সাধারণত মিছিল, মিটিং করার অনুমতি দিতে চাইতেন না কেননা স্বভাবতই এর ফলে ভাঙচুর, অরাজকতা তৈরি হয়।

তারা বলতেন, “আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র।”

আমি ইতিহাস আশ্রিত মানুষ। সত্য, সুন্দর, নির্ভীক হওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে সত্যকে জানা।

পর্দার আড়ালে যারা সত্যকে চেপে রেখে মিথ্যার বেসাতি করে বেড়ায় তাদের জন্য এই লেখাটা এক চিলতে আলো দেখাবে, যদি তারা বুঝতে চায়।

ইতিহাস সাক্ষী তা ছাড়া পবিত্র কোরআন থেকেও জানা যায়- অধিকাংশ মানুষ অহংকার বা মূর্খতার কারণে সত্যকে মেনে নেয় না।

তবে বেশিরভাগ সময় অহংকারের কারণেই সত্য থেকে পিছপা হয়ে যায়।

এক গবেষণায় দেখা যায়, আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তির শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির উপরে গড়ে ওঠে (মানে আমরা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বা অন্যের চিন্তায় বিশ্বটাকে দেখতে শিখি) তাই ইতিহাস ও তথ্য-প্রমাণ অসহায় হয়ে যায়।

এখানে কোন তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তি থাকলে দয়া করে জানাবেন, মাথা পেতে নেব।

আজকের দিনে যখন হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে মাত্র ২/১ টি প্রকল্প করা হয় তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মোনেম খান একাই এতগুলো প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন ?

ইতিহাস সাক্ষী দেয় তখন টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, প্রকল্পের নামে অর্থ অপচয়, টাকা চুরি ইত্যাদি ছিলনা, লুটপাট, টাকা পাচার-এসবেরতো প্রশ্নই উঠেনা।

তাই টাকার বরকত ছিল এবং এই প্রকল্পগুলো করতে পেরেছিলেন (দয়া করে লেখাটির বহুল প্রচার আশা করি, যেন মানুষের ভুল ধারনা কিছুটা হলেও ভাঙ্গে।)

তথ্যসূত্র :

স্বৈরশাসক আইয়ুব খান : সংস্কার, শাসন ও উন্নয়ন, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮, লেখক : মাহমুদুল হাসান নিজামী।

ইনানি-কক্সবাজার ঘুরতে যাওয়া

ইনানি বে ওয়াচ হোটেল এবারের আশ্রয়স্থল।

বেওয়াচ সবধহরহম কি হতে পারে?ইধু ড়ভ ইবহমধষ সবধহং বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগর =বঙ্গ +উপ+সাগর।সে অর্থে বে ওয়াচ হোল উপসাগর পর্যবেক্ষণ।আমার হিসেবে বে ওয়াচ অর্থ সাগর দর্শন।১৩ তলা বিল্ডিং এর সী ভিউর বেলকোনি/ঘর থেকে তাকালে বীচ -সাগর -পাথর -ঢেউ সবই দেখা যায়।মন পরিবেশ থাকলে উপভোগ ও করা যায়।এটা আধুনিক ইনানী বীচের অন্যতম আকর্ষন।এক দুই কিলোমিটারের মধ্যে আছে অসংখ্য ক্যাফে রেস্টুরেন্ট।কোরাল স্টেশন বা পালঙ্কি এখন উচ্চ মার্কে আছে।

ইনানি বীচ (ওহধহর ইবধপয) :কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের সবচেয়ে সুন্দর ও ভিন্নধর্মী অংশগুলোর একটি। এটি কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় ২৫-২৭ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

ইনানির বিশেষত্ব

১. পাথুরে সৈকত – ইনানি বীচের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এখানে প্রচুর প্রবালখণ্ড ও প্রাকৃতিক পাথর আছে, যেগুলো বিশেষ করে জোয়ারের সময় মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি করে।

২. স্বচ্ছ পানি - এই অংশে সমুদ্রের পানি তুলনামূলকভাবে বেশি নীলচে ও স্বচ্ছ, যা পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়।

৩. শান্ত পরিবেশ - কক্সবাজার মূল সৈকতের তুলনায় ইনানি অনেক বেশি শান্ত, ভিড় কম থাকে, এখানে গিয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্য নিরিবিলিভাবে উপভোগ করা সম্ভব।৩ঙ সূর্যাস্ত - বিকেলের দিকে সূর্যাস্তের দৃশ্য এখানে অনন্য, যা ফটোগ্রাফির জন্য অসাধারণ সুযোগ তৈরি করে। – বিকেলের সূর্যাস্তের সময় আকাশ, পাহাড় আর সমুদ্র মিলে অনন্য দৃশ্য তৈরি করে। সৈকতের পাথরে বসে দৃশ্য উপভোগ করা যায়। চলে ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি।

কক্সবাজার গেলেন -ইনানি গেলেন না ভ্রমণ অসম্পূর্ণ!

ইনানি নামের উৎস

- "ইনানি" শব্দটির উৎস নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। ধারণা করা হয় এটি আরাকান (বর্তমান মিয়ানমার) ভাষা থেকে এসেছে।

  ব্রিটিশ আমলে এই অংশকে বিশেষভাবে নৌ-চলাচল ও পর্যটনের জন্য উল্লেখ করা হয়েছিল।স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সৈকত ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইনানি নামের উৎস সম্পর্কিত প্রচলিত মত

১. 'ইনা' নামের উপজাতি নারী।বলা হয়, বহু আগে এখানে আরাকান ও রাখাইনদের বসতি ছিল।এক সুন্দরী রাখাইন কন্যার নাম ছিল ইনা।সমুদ্রের ধারে ঘুরতে এসে সে জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়।তার স্মৃতিকে ধরে রাখতেই স্থানীয়রা এ সৈকতের নাম দেয় ইনানি।

২. পালি/আরাকানি শব্দমূলঙ কেউ কেউ মনে করেন, ইনানি শব্দটি পালি বা আরাকানি ভাষা থেকে এসেছে।এর অর্থ হতে পারে "পাথুরে সৈকত" বা "শৈলমালা", যা ইনানি বিচের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়, কারণ এখানে প্রবাল-পাথর ভরা সৈকত দেখা যায়।

৩. লোককথার ধারা-স্থানীয় জেলেরা বিশ্বাস করেন, ইনানি মানে এমন জায়গা যেখানে সমুদ্রের পানি ও পাথরের সংঘর্ষে বিশেষ শব্দ হয়।সেখান থেকেই ধীরে ধীরে নাম হয়েছে ইনানি।সঠিক উৎস নিয়ে ইতিহাসবিদরা

একমত নন, তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনি হলো ইনা নামের মেয়ের করুণ কাহিনি।

কক্সবাজারের বিবর্তনে ইনানির স্থান:

- আগে শুধুই কক্সবাজার মূল সৈকতে ভিড় হতো ।কিন্তু আজ কক্সবাজারের সৌন্দর্যপিপাসু পর্যটকদের কাছে ইনানি বীচ এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা– শান্ত, নিরিবিলি ও রোমাঞ্চকর ।ফলে কক্সবাজারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরতে ইনানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।"কক্সবাজার হলো বাংলাদেশের গর্ব, আর ইনানি হলো সেই গর্বের রঙিন রত্ন।"

4th year (1976?) এ প্রথমবার এসেছিলাম কক্সবাজারে। তখন কক্সবাজার ছিল একেবারেই সরল, শান্ত শহর। হোটেল-রেস্তোরাঁ খুব বেশি ছিল না, বিদ্যুৎ আর আধুনিক সুবিধাও সীমিত ছিল। সমুদ্র যেন তখনও কাঁচা স্বপ্নের মতোড় নিরিবিলি, শান্ত আর অপার সৌন্দর্যে ভরা ।ছিলাম শৈবালে ।শৈবালের বারান্দায় মতিনের সাথে ছবিটা খুঁজলে পেয়ে যাব ।সেই প্রথমবার সমুদ্রের ঢেউ দেখে পুলকিত হয়েছিলাম ।চাঁন্দের গাড়ীতে বন্ধুরা মিলে বালি আর পাথরে রাস্তা ফুঁড়ে ড্রাইভ(?) করেছি ।বোধকরি আজকের মেরিন ড্রাইভের কিছু অংশে আমরা গেছি। পরিবর্তিতে ইনানীতে এসেছি নেমেছি ছবি তুলেছি ।অবস্থান করি নাই ।অন্যান্য অনেকের মত কক্সবাজারের মূল সৈকতেই বেশিরভাগ মানুষ সময় কাটতো। সমুদ্রের ধারে হাঁটতে গিয়ে মনে পড়লো প্রথম সফরের কথা। তখন কক্সবাজার ছিল এক স্বপ্ন, আর আজ সেই স্বপ্ন আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভরে গেছে। আগে যে শহরটা ছিল শান্ত, এখন সেখানে পাঁচতারা হোটেল, রঙিন বাজার আর জনসমুদ্র ।আইল্যান্ড দিয়ে ফরারফব করা প্রশস্ত আধুনিক রাস্তা ।তবুও ইনানি এখনো তার প্রকৃতির আদিম সৌন্দর্য ধরে রেখেছে। ভাবুন সন্ধ্যার দিকে সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে। আকাশে লাল, কমলা আর সোনালি রঙের মিশেল। আপনি চুপচাপ বসে আছেন এক টুকরো পাথরের ওপর, ঢেউ আপনার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ছে ।হাত পাতলেন সূর্য এসে পড়লো তালুতে ।তালুবন্দি অস্তগামি সূর্যের অনবদ্য এ ছবি অনেকের কাছেই আছে। থাকার কথা।।

এভাবেই ইনানি বীচ কক্সবাজারের বিবর্তনের গল্পে হয়ে আছে এক অমলিন স্মৃতি – যেখানে একদিকে আধুনিকতার জোয়ার, অন্যদিকে প্রকৃতির শান্ত নির্জনতা।

বাস্তবতা-ইতিহাস

কথিত আছে যে, একজন রাখালের বিশ্বাসঘাতকতার পর যখন চে গুয়েভারা তার গোপন আস্তানায় বন্দী হন, একজন সৈন্য অবাক হয়ে সেই রাখালকে অবাক জিজ্ঞাসা করেছিল:

আপনি কীভাবে এমন একজন ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন যিনি আপনার এবং আপনার অধিকার রক্ষার জন্য তার পুরো জীবন ব্যয় করেছেন?!

রাখাল শান্তভাবে উত্তর দিল:

শত্রুদের সাথে তার যুদ্ধের জন্য আমার মেষরা ভয় পেয়েছিল !

অনেক বছর আগে মিশরে, মহান সেনাপতি মোহাম্মদ করিম নেপোলিয়নের ফরাসিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

যখন তাকে বন্দী করা হয়, আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়।

কিন্তু নেপোলিয়ন তাকে ডেকে বলেন:

আমি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য দুঃখিত যে সাহসের সাথে তার দেশকে রক্ষা করেছিল। আমি চাই না ইতিহাস আমাকে বীরদের হত্যাকারী হিসেবে মনে রাখুক। আমার সেনাবাহিনীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে আপনি যদি ১০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেন তবে আমি আপনাকে ক্ষমা করব।

মোহাম্মদ করিম হেসে বললেন:

আমার কাছে এত টাকা নেই, কিন্তু বণিকদের কাছে আমার ১০০ হাজার স্বর্ণমুদ্রারও বেশি পাওনা আছে।

নেপোলিয়ন তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন। সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে করিম বাজারে গেলেন, এই আশা করে যে যাদের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তারা তাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু কোন বণিক সাড়া দেয়নি। বিপরীতে, তারা তাকে আলেকজান্দ্রিয়ার ধ্বংস এবং তাদের সংকটের কারণ বলে অভিযুক্ত করেছিল।

তিনি হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। নেপেলিয়ন তাকে বলেন:

- আমি তোমাকে হত্যা করব না, যদিও তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে, বরং কারণ তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছিলে কাপুরুষ জনগণের জন্য, যারা স্বাধীনতার চেয়ে ব্যবসাকে বেশি ভালোবাসে।

মোহাম্মদ রশিদ রিদা এটিকে এভাবে সংক্ষেপে বলেছেন:

"যে ব্যক্তি অজ্ঞ জনগণের পক্ষে দাঁড়ায় সে তার মতো, যে অন্ধদের পথ আলোকিত করার জন্য নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়।"

সূত্র: টিডি পোর্টাল

বি:দ্র: বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, এত শহীদের রক্ত ও বীরদের অঙ্গহানী, ঐতিহাসিক বাস্তবতা মনে করিয়ে দিচ্ছে কি?

সারওয়ার আপনাকে মিস্ করি

১

চলে যাওয়ার দিন ঘটনাটা বলল সারওয়ার। জঅই-এর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অভিযান করে দেশজুড়ে প্রশংসা পেয়েছিল সে একসময়। কিন্তু এতে ক্ষুদ্ধ হয়েছিল শক্তিশালী দূর্নীতিবাজ চক্র। তার প্রমোশন আটকে দেয়া হয়, গুরুত্বহীন পদে বদলী করা হয় প্রবাসী মন্ত্রনালয়ে। মনমরা হয়ে সারওয়ার বসে থাকত তার কক্ষে।

কোভিডের শেষদিক তখন। মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া আটকে আছে কর্মীদের। ভ্যাকসিনের জন্য মরিয়া হয়ে তারা ঘেরাও করে মন্ত্রনালয়। তাদের বিভিন্নভাবে আশ্বাস দেয়া হয়। একপর্যায়ে সচিবও বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা নাছোড়বন্দা, কারো কথা বিশ্বাস করেন না তারা। শোরগোল ছাপিয়ে একটা কথা শোনা গেল অবশ্য। একজন বললে তার কথা বিশ্বাস করবেন প্রবাসগামী কর্মীরা। তিনি সারওয়ার!

অবশেষে সারওয়ারকে নীচে আসতে বলা হলো। তাকে দেখে কর্মীরা শান্ত হলো। সারওয়ার জানালো কবে তাদের ভ্যাকসিন দেয়া হবে। তার আশ্বাসে ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। কর্মীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে চলে গেল। মন্ত্রী-সচিব হাঁফ ছেড়ে বাচলো। সারওয়ার নিজ রুমে গিয়ে আল্লাহ্-র কাছে শুকরিয়া জানালো। এই ঘটনা বলার সময় চোখ মুছলো সে। আমরাও তাই করলাম।

২

সারওয়ারকে আমি প্রথম দেখি আলোচনার টেবিলে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব মাত্র নিয়েছি তখন। কন্সফারেন্স রুমে বিশাল লম্বা টেবিলে বসে আমি উত্তেজিতভাবে কি কি করতে হবে বলি। কারো মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। শুধু মাঝারি আকৃতির, আমারি মতো সাদামাটা একজন সারাক্ষন উৎসাহ নিয়ে মতামত জানাতে থাকে। সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই হবে আমার পিএস। অল্পদিনের মধ্যে বুঝতে পারি, এটাই হচ্ছে একসময়ের বিখ্যাত সারওয়ার।

তাকে তবু আমি বেশী স্নেহ করতে পারিনি, বকাবকিই বেশী করেছি। কাজ আগায় না এই হতাশা থাকে সারাক্ষন। তার উপর যাকেই কিছু জিজ্ঞেস করি, দেখি সারওয়ারই আগ বাড়িয়ে বলে দেয় সব। আর ছিল আমার জন্য তার বাড়াবাড়ি রকমের যত্ন। এয়ারপোর্ট যাবো, ফিরে আসবো, কতোবার তাকে বলি আপনাকে যেতে হবে না, যাবেই সে। বকাবকি বেশী করা হলে নিজেই মন খারাপ করতাম, দু- একবার বোধহয় সরি-ও বলেছিলাম তাকে।

সরকারী অফিসাররা সাধারনত কাজ করেন যান্ত্রিকভাবে। বাড়তি কাজ বা সংস্কার নিয়ে খুব একটা আগ্রহ নাই তাদের। তবু প্রধানত সারওয়ারের (এবং

আরো দুএকজনের) সার্বক্ষনিক সহায়তা আর সমর্থন নিয়েই কয়েকটা বড় কাজ আমরা করতে পেরেছি। যেমন: প্রবাসী কর্মীদের ছাড়পত্র দেয়ার বিষয়টা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ করেছি, মালয়েশিয়ায় শ্রমিক ভাইদের জন্য মাল্টিপল ভিসা করা গেছে, জাপান আর কোরিয়ার বাজার আরেকটু উন্মুক্ত হয়েছে, প্রবাসী লাউঞ্জ স্থাপন সহ প্রবাসী কল্যানে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

লক্ষ্য যা ছিল তার অর্ধেকের মতো মাত্র করেছি। এরমধ্যে একদিন এলো সারওয়ারের বদলীর খবর। সিলেটে সাদাপাথর বিতর্কের পর তড়িঘড়ি করে তাকে সেখানে ডিসি নিয়োগ করা হয়েছে। অবাক হয়ে দেখলাম, আমার সিলেটি বন্ধু আর পরিচিত মহলে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে আটকাই আর কোন বিবেচনায়!

৩

তাকে নিয়ে একটা দু:খ থাকলো অবশ্য। আমার সম্পর্কে নানান আজগুবী খবর আসে ফেসবুক আর ইউটিউবে। এগুলো অবশ্য অস্বাভাবিক না। আমার বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টরা আছে, উগ্রবাদীরা আছে, আছে ভিউব্যবসায়ীরা, আছে বটবাহিনী। কিন্তু আমাদের সরোয়ার...! রাজনীতির ধারেকাছে না থাকা আপাদমস্তক পেশাদার মানুষ সে। তবু তার বিরুদ্ধেও কালিমা লাগানোর অপচেষ্টা হয়েছে। আমি এর প্রতিকার করতে পারিনি পুরোপুরি। এই কষ্ট থাকবে আমার।

সারওয়ার আপনাকে মিস্ করি। দোয়া করি, জুনিয়র অফিসাররা শিখুক আপনাকে দেখে। শুধু সিলেট না, সততা, সাহস আর কর্মনিষ্ঠার জন্য সারাদেশের মানুষ ভালোবাসে আপনাকে।

আমাদের আশাবাদী থাকার এটাও একটা কারণ।

মানুষ কখনো ধর্ম নিরপেক্ষ হয় না

মানুষ কখনো ধর্ম নিরপেক্ষ হয় না। এটাই দেখিয়ে দিলেন জগন্নাথ হল এর বাম রামেরা। আমরা শুধু ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউড়াই। এখানে গতকালের ডাকসু নির্বাচনের রেজাল্টে তার প্রমান।

জগন্নাথ হলে শিবির কিংবা ইসলাম পন্থী কেউ ভোট পাবেনা এইটা জেনারেল কমনসেন্স সবাই জানে।

কিন্তু আলাপ টা অন্য জায়গায়, সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় মনে করেছে সাদিক কায়ম ফরহাদরা সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট এবং ভালো নেতা, তাই তাদের কে বিপুল ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছে, কিন্তু জগন্নাথ হলের প্রায় ৯৯.৯% স্টুডেন্ট বাকি হলগুলোর ৭০-৮০% মুসলিম ভোটারদের সাথে একমত হতে পারেনি। কেনো পারেনি? কি রিজন?

দেখেন এখানে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হইলো ধর্ম, দেশ সেরা বিদ্যাপিঠের ছাত্ররা সবাই সাম্প্রদায়িক, তারা শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মের হওয়ার কারনে এতো ভালো আর যোগ্য পার্থী সাদিক ফরহাদদের ভোট দেয়নি।

এই দেশে যদি কখনো ওমরের মত শাসকও আসে, এরা সেটাকে ভালো মনে করবে না, তারা সাইকোলজিকালি মেনে নিতে পারব না।

আমাদের দেশে বাঙ্গু সেকুলাররা সারাজীবন ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়িয়ে এদেশের মানুষরে শাসন করে গেছে, মুসলিম রা ধর্মনিরপেক্ষতা কে রাজনৈতিক রুপ দিয়ে দেশটারে গত ৫০ বছর খেয়ে যাচ্ছে। আজকে জগন্নাথ হল সেটার একটা বাস্তব উপলব্ধি করিয়ে দিলো, ধর্ম ছাড়া পৃথিবীর কোনো কিছুই নড়েনি কোনদিন, নড়বেও না।

দেশ সেরা বিদ্যাপিঠের ছাত্রদের কে এই সমাজ এই বিশ্ববিদ্যালয় অসাম্প্রদায়িক বানাতে পারেনি, আর বাকি মানুষদের কথা আলাপে আসারই কথা না, আর মুসলিম রা ধর্মনিরপেক্ষতা কে আপন করে নিয়েছেন, রাজনীতি করছেন। বাকিটা নিজ দায়িত্ব বুঝে নেন কার পারপাস সার্ভ করছেন।

আজকে সবচেয়ে বড় যে ভয়টা কাজ করছে সেটা হলো ভবিষ্যৎ, মিশরের কথা খুব মনে পড়ছে, ব্রাদারহুডের কথা মনে পড়ছে, প্রেসিডেন্ট মুরসির কথা মনে পড়ছে, এই দেশ যেনো মিশর না হয়, শিবিরের এই জয় যেনো ব্রাদারহুডের মত হারিয়ে না যায়।

হারাবেনা যদি দেশের মানুষ সেকুলারিজম কে সঠিক ভাবে শত্রু ভাবতে পারে, আর যদি রাজনীতি টা বুঝতে পারে।

সেকুলারিজম আর জাতিয়তাবাদ এই দুইটা রাজনীতিই হইলো একটা ইলুশান, ধোকা, হয় কমিউনিজম করেন, রাজনীতি হবে বৈশ্বিক, আর না হয় ধর্মীয়, এইটাও বৈশ্বিক। (কপি পোস্ট)
Courtesy of Mofakh Khirul Islam Salek

দুঃখজনক হলেও সত্য

জাপান - একটি দেশ, যাকে দুটি পরমাণু বোমা ধ্বংস করেছিল।
কিন্তু তারা কখনও ভিক্ষা চায়নি। কখনও দয়া ভিক্ষা করে হাত পাতেনি।
নিজেদের আত্মসম্মান ও অটল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তারা আবার গড়ে তুলেছে নিজেদের।
আজও ইতিহাসে কোথাও নেই যে, জাপান আমেরিকার কাছে ভিক্ষা চেয়েছে।

একজন ভারতীয়, যিনি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জাপানে বাস করছিলেন, একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন।

মানুষজন সদয়, ভদ্র, সাহায্যপ্রবণ।
কিন্তু একজনও তাকে বাড়িতে ডেকে এক কাপ চা খাওয়াল না।

তিনি অবাক ও কষ্ট পেলেন।
অবশেষে তিনি এক জাপানি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন:
"কেন?"

দীর্ঘ নীরবতার পর জাপানি বন্ধু বললেন:
"আমরা ভারতীয় ইতিহাস পড়ি... অনুপ্রেরণার জন্য নয়, সতর্কবার্তা হিসেবে।"

ভারতীয় হতভম্ব হয়ে বললেন: "সতর্কবার্তা?"

জাপানি উত্তর দিলেন:
"তুমি জানো, কতজন ব্রিটিশ ভারতে শাসন করেছিল?"
তিনি একটু ভেবে বললেন: "হয়তো ১০ হাজার?"
জাপানি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।
"আর ভারতের জনসংখ্যা? ৩০ কোটির বেশি, তাই না?"

"তাহলে আসল শাসক কারা ছিল? কে তোমাদের মারল, শোষণ করল, গুলি চালাল? কেবল ব্রিটিশ নয়। তোমাদের নিজেদের মানুষ।"

"যখন জেনারেল ডায়ার চিৎকার করে বলল 'ফায়ার', তখন কারা ট্রিগার টিপেছিল?
ব্রিটিশ নয় ড় ভারতীয় সৈন্যরা।
একজনও বন্দুক ফিরিয়ে অত্যাচারীর দিকে তাক করেনি।"

"দাসত্বের কথা বলছ? দাসত্ব ছিল দেহের নয়, আত্মার।"

জাপানি আবার বললেন:
"কতজন মোগল ভারতে এসেছিল? কয়েক হাজার মাত্র।
তবুও তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী শাসন করেছে। সংখ্যার জোরে নয়, তোমাদের নিজেদের দাসত্বের কারণে।
বাঁচার জন্য কিংবা রূপোর মুদ্রার জন্য, তোমরাই মাথা নোয়ালে।"

"তোমাদের নিজেদের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে।
নিজের ভাইরাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।
নিজেরাই তোমাদের বীরদের ধরিয়ে দিয়েছে।
চন্দ্রশেখর আজাদকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল।
ভগত সিংকে ফাঁসি দেওয়া হল, অথচ তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের মধ্যে একজনও এগিয়ে এল না।"

"তোমাদের শত্রুর দরকার নেই।

বারবার তোমাদের নিজেদের মানুষই বিক্রি করে দেয় ক্ষমতার জন্য, পদমর্যাদার জন্য, স্বার্থের জন্য।
এই কারণেই আমরা দূরত্ব বজায় রাখি।"

"যখন ব্রিটিশরা হংকং বা সিঙ্গাপুরে গিয়েছিল, স্থানীয়রা কখনও তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়নি।
কিন্তু ভারতে? তোমরা শত্রুর সেনায় যোগ দিয়েছিলে।
তাদের সেবা করেছিলে। তাদের পূজা করেছিলে।
নিজেদের মানুষ হত্যা করেছিলে তাদের খুশি করার জন্য।"

"আজও কিছু বদলায়নি।
একটু বিনামূল্যের বিদ্যুৎ, এক বোতল মদ, বা একটা কম্বলের জন্যড়
তোমাদের ভোট, তোমাদের মন, তোমাদের কণ্ঠ বিক্রি হয়ে যায় পাইয়ে দেয়া রাজনীতির পায়ের তলায়।
তোমাদের আনুগত্য দেশের প্রতি নয়, পেটের প্রতি।"

"তোমরা স্লোগান দাও। মিছিলে হাঁটো।
কিন্তু যখন দেশ তোমাদের চরিত্র চায়, তখন কোথায় থাকো?
তোমাদের প্রথম আনুগত্য আজও পরিবার ও ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি।
অন্য সবড়সমাজ, ধর্ম, দেশড়বিলীন হতে পারে।"

শেষে তিনি বললেন:
"যদি দেশ শক্তিশালী না হয়, তোমার ঘরও নিরাপদ হবে না।
যদি চরিত্র দুর্বল হয়, কোনো পতাকাই তোমাকে রক্ষা করবে না।"

শহীদ জিয়াউর রহমানের নৈতিকতাকে পছন্দ করে বিএনপি সমর্থন করতাম ছাত্র জীবনে।

রাজনীতি আমার কোন পেশা নয়, এই দেশটাকে ভালোবাসি এবং পলিটিক্যাল সাইন্সে পড়াশোনা আমার। তাই কিছুটা হলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষনে বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করি।

শেরেবাংলা তখন শিক্ষামন্ত্রী

শেরেবাংলা তখন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি লক্ষ্য করলেন মুসলমান শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় কিন্তু পাশ করে না। তিনি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন,কেন শিক্ষার্থীরা পাশ করছে না। তদন্তে বেরিয়ে আসলো হিন্দু শিক্ষকরা মুসলমান নাম দেখলেই ঘেচাং করে দিতেন। আর ফেল করেই তারা হারিয়ে যেতো। সে কারণেই উচ্চ শিক্ষায় মুসলিম শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া যেতো না। এভাবেই ইচ্ছা থাকা সত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে। শেরেবাংলা শিক্ষার্থীদের নাম বাদ দিয়ে নতুন

পদ্ধতিতে রুল নাম্বার দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এতে প্রত্যাশিত সাফল্য পাওয়া যায়। যা এখনও বহাল আছে।

নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম বছরেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন হুমায়ুন কবির, যিনি পরবর্তীতে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন।

শেরেবাংলা বাংলার কৃষকদের জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেছিলেন। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চালু করা মাইক্রো ক্রেডিট সিস্টেম বা সুদের ব্যবসা মাঠেমারা যায়।

তথ্যসূত্রঃ
রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িকতা।
লেখক- ফাহমিদ উর রহমান।
শেখ নজরুল

এই পোস্ট আপনার পড়া উচিত শেয়ার করা উচিত জানা উচিত

জামায়াতের শীর্ষ তিন নেতার সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ! এরা হলেন জামায়াত আমীর ডা. শফিকুর রহমান, নায়েবে আমীর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, এবং সেক্রেটারি মিয়া গোলাম পরোয়ার।

জামায়াতের আমীর ডাক্তার শফিকুর রহমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ দিক নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং 'মেধা ও অর্থের অপচয় হয়' এমন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরোয়ার বলেছেন, গ্রাজুয়েশন শেষে হলে একহাতে সার্টিফিকেট এবং অন্য হাতে কর্মসংস্থান দিবেন। যদি দিতে না পারেন তাহলে ভাতা প্রদান করবেন।

অন্যদিকে নায়েবে আমীর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের তার এক বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেছেন, জামায়াত নির্বাচিত হওয়ার পর প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসন চালায়, তাহলে তার মোকাবিলায় জামায়াত যথেষ্ট সুপরিকল্পিতভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

এই তিনটি বক্তব্য এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এখান থেকে স্পষ্ট হয়- জামায়াতে ইসলামী সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলোকে নিয়ে ভাবছেন এবং কথা বলছেন। কেবল ধর্মীয় বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ না থেকে এদেশের তরুণ সমাজ, এদেশের রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থা, বেকারত্ব এবং এদেশের

সার্বভৌমত্ব রক্ষার রূপরেখা নিয়ে তারা কাজ করছেন, স্বপ্ন দেখছেন এবং জাতিকে পথ দেখাচ্ছেন। – ---- ও ডাক্তার

এটা বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল এর একটি ওয়ার্ডের একরাতের দৃশ্য। বিছানা নাই, রোগী মাটিতে।

আসন সংখ্যার তিনগুন রোগী , ডাক্তার নার্স তো তিনগুন হ্য় না।

তাই রোগী যা পাবার কথা তার ৩ ভাগের ১ ভাগ পায়।

মেঝেতে রোগী, মেঝে পরিস্কার কিভাবে হবে?

সুইপারের কাজও হয় না।

৩ গুন সিরিঞ্জ , স্যালাইন সেট, ঔষধ লাগে।

তার মানে তিনদিনের সাপ্লাই একদিনে শেষ।

নার্সদের সংকট আরো বেশী। যা দরকার আছে তার ৩ ভাগের একভাগ । ৩ গুন রোগী এলে সেটা হয়ে যায় ৯ ভাগের ১ ভাগ।

মজার বিষয় হলো হাসপাতালের অধিকাংশ বিষয়ে ডাক্তারের কোন কর্তৃত্ব নাই।

তাই চিকিৎসা পরামর্শ দেয়া ছাড়া তার কিছু করার নাই।

হাসপাতালের প্রশাসনে তার ভূমিকা সীমিত।

এর জন্য ডাক্তার দায়ী না।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার গলদের দায় তার না।

এখানে রোগী ও চিকিৎসক দুজনেই ভিক্টিম।

একা ডাক্তার বসে থাকলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে না।

প্রত্যেক রোগীর বিছানা পাওয়ার অধিকার আছে। তেমনি বেড যা আছে তার চেয়ে বেশী রোগী ভর্তি করা রোগীর প্রতি অবিচার। তাকে অপ্রতুল চিকিৎসা না দিয়ে হাসপাতালের বেড বাড়াতে হবে। হাসপাতাল বাড়াতে হবে। এটা কার কাজ?

বিছানা ছাড়া চিকিৎসা দেয়া, মেঝেতে রাখা আর রাস্তায় রাখা একই কথা।

রোগীর প্রতি এই অবহেলা ও অবিচারের দায় কার? ১৬ কোটি মানুষের জন্য প্রতি ১০০০০ এ ০.৬ টি বেড বরাদ্দ আছে। তাদের মধ্যে ১% অসুস্থ হলে , রোগীর সংখ্যা ১০০. তার মানে প্রতি বেডে ৩ থেকে 8 জন রোগী থাকবেই ।বাকি রোগীরা হাসপাতালে এসে মেঝেতেও জায়গা পাবে না।

কার দোষ?

ডাক্তার থাকে না, ডাক্তারকে সাজা দিন।

বেড থাকে না, ওষুধ থাকে না। এটার শাস্তি কাকে দেবেন?

স্বাস্থ্য সেবা মানবাধিকার । এটা কোন রাজনৈতিক বিষয় না। এটা মানুষের প্রাপ্য।

তিনগুন রোগী দেখার ফলে ক্লান্ত চিকিৎসকের ভুল হলে তার দায় কার?

রোগী আর চিকিৎসক দুজনই মানুষ।

তারা দুপক্ষই অবিচারের শিকার।

ডাক্তারের ঘাড়ে দোষ দিয়ে , অদক্ষ স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা একধরণের প্রতারনা।

পোস্টটি সকলে শেয়ার করে দিন এবং স্বাস্থ্য খাতের আমুল পরিবর্তনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

তাসনিম জারা বাংলাদেশের ইতিহাসে ১ম মেয়ে

তাসনিম জারা বাংলাদেশের ইতিহাসে ১ম মেয়ে যিনি ২০১৬ সালে দাদীর একটা সুতির শাড়ি পরে কোন গয়না আর মেক আপ ছাড়াই খালেদ সাইফুল্লাহকে বিয়ে করেন। তাসনিমের সেই বিয়ের ছবি ভাইরাল হয়ে যায় এবং বিস্ময়করভাবে অধিকাংশ মেয়েরাই তাসনিমের এই গয়না আর মেক আপ বিহীন বিয়েকে স্টান্টবাজি হিসেবে সমালোচনা করেছিলেন।

পরবর্তীতে অবশ্য তাসনিম জারা বহুবার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে নারী হিসাবে পাহাড় সমান উচ্চতায় উঠতে মেধা আর যোগ্যতাই যথেষ্ট, মেক আপ লাগে না। তাসনিম এখনো কোন মেক আপ করেন না। আসলে করার প্রয়োজনই পড়ে না।

তাসনিম জারা ভিকারুননিসা - ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর ছাত্রী। ঢাকার অ্যাপোলো হাসপাতালে রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এভিডেন্স-বেইজড হেলথ কেয়ার বিষয়ে ডিসটিংশনসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেন। ২০২১ সাল থেকে তিনি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালসমূহে অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা বিষয়ে রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত। তাসনিম ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের প্রেস্টিজিয়াস গজঈচ ডিগ্রিও সম্পন্ন করেছেন।

জারা 'সহায় হেলথ' নামক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, যা বাংলাভাষী জনগণের জন্য প্রমাণভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা তথ্য প্রদান করে। ২০২৩ সালে জারা 'সহায় প্রেগন্যান্সি' মোবাইল অ্যাপের উন্নয়নে নেতৃত্ব দেন, যা গর্ভাবস্থার প্রতিটি সপ্তাহের জন্য তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে।

গবেষক হিসেবে তাসনিম জারা আন্তর্জাতিক পর্যালোচিত জার্নালে একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কোভিড-১৯ মহামারির শুরুতে তাসনিম

জারা বাংলাভাষায় স্বাস্থ্যবিষয়ক ভিডিও তৈরি করা শুরু করেন যা ফেসবুক আর ইউটিউবে প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়।

তাসনিম জারার কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, টিকা সংক্রান্ত সচেতনতা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতা নিয়ে ভিডিওগুলো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিবিসি, স্কাই নিউজ, আইটিভি এবং ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-এর মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে তার কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ২০২১ সালে, যুক্তরাজ্য সরকার তাকে বৈশ্বিক "ভ্যাকসিন লুমিনারি" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

তাসনিম জারার বয়স মাত্র ৩১ বছর। চাইলেই শুধু ডাক্তার হিসাবে কিংবা ফেসবুক, ইউটিউব কন্টেন্ট তৈরি করেই এই মেয়েটা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু উনি সবকিছু স্যাক্রিফাইস করে এসেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিকে বদলাতে, তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিতে আর পুরো বাংলাদেশের দায়িত্ব নিতে।

বিনিময়ে এই প্রচন্ড মেধাবী আর জ্ঞানী মেয়েটাকে আমরা কি দিলাম? যুক্তরাষ্ট্রের একটা এয়ারপোর্টে অশ্লীল গালাগালি আর অপমান!!

তাসনিম জারাকে অপমান করার অর্থ হল, বাংলাদেশকেই অপমান করা। কারণ এই মেয়েটা বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে।

যতই পাইক্কারা আসুক : ইন্দিরা

যতই পাইক্কারা আসুক, যত খাতির জমান, যতো ইচ্ছা রিসেট বাটন দাবান এঁকে মোছা যাবে না। এঁর কারণে তিরানব্বই হাজার সেনা নিয়ে আত্মসমর্পণ এঁর দৃঢ়তাও দূরদর্শিতায় জয় পেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ।

এই যে গাড়িতে পতাকা উড়িয়ে ঘোরেন,উপদেষ্টা হয়ে যা খুশি বলেন, জাতিসংঘে গিয়ে ভাষণ দেন তিনি পাশে না দাঁড়ালে পারতেন? পারতেন না, তখন বসকে পানি এগিয়ে দেয়াই হতো আপনাদের কাজ।

মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ যেমন সত্য, তেমনি সত্য তিনি। পুরো একাত্তর জুড়ে ধাত্রীর ভূমিকা পালন করেন এই মহীয়সী নারী।

কৃতজ্ঞতা বলে যে শব্দটি তা এখন প্রায় উধাও। আমাদের রাজনীতি পচে গলে এমন এক আকার ধারণ করেছে আমরা বন্ধু শত্রু কোনটাই চিনতে পারিনা। বর্তমানের নামে যারা সোনালী অতীত ভুলে বা তাকে মাটি চাপা দিয়ে আনন্দে থাকতে চায় তাদের বলি, এই দেশ , এই মাটি, এই পতাকা বহুকষ্টে পাওয়া।

আমাদের বিজয় মূলত তিনটি সেক্টরে যুদ্ধের ফলাফল ।রাজনীতির লড়াইটা ছিল আওয়ামী লীগ তথা বাঙ্গালি বনাম পাকিস্তানের। রনকৌশল ও রণাঙ্গনের যুদ্ধ ছিল

ভারতীয় বাহিনী মুক্তিবাহিনী বনাম পাকি বাহিনীর ভেতর। আর আন্তর্জাতিক লড়াইটা ছিল ভারত , রাশিয়া বনাম পাক মার্কিন চীনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে একজন নারী যদি সেদিন তাঁর প্রজ্ঞা আর মেধা দিয়ে ধীশক্তি দিয়ে লড়াই না করতেন আমরা জয়ী হতাম কি না বলা মুশকিল।

দুদিন আমেরিকা থাকার পর যখন তাঁকে উপযুক্ত প্রটোকল না দিয়ে আমেরিকা অপমান করেছিলো তিনি তাঁর জায়গা কোনটি বুঝে গিয়েছিলেন। ক দিন পর যখন তিনি মস্কো গিয়ে নামলে দেখেন প্রচন্ড শীতকে পাশ কাটিয়ে তাঁকে সাদরে বরণ করতে এসেছেন ব্রেজনভ কোসিগিনের মত নেতারা। সে শিক্ষা থেকে ভুল করেননি তিনি। এবং সে মৈত্রীই তাঁকে বিজয়ী করেছিল।আমাদেরও করেছিল বিজয়ী জাতি।

মনে রাখতে হবে তাঁর ভেতরের দুশমন ও কম ছিলোনা। অনেকে হয়তো জানেননা আমাদের স্বাধীনতার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল তখনকার মৌলবাদী দল জনসংঘ। আর যে মোরারজী দেশাই তাঁকে হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁকে পাকিস্তান দিয়েছিল সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব। কতটা পেয়ার থাকলে একজন ভারতীয় তা পেতে পারে?

সৌভাগ্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্বে ছিলেন তাজ উদ্দীন আহমেদ। ডি পি ধর, তখন এই কঠিন নারী নেতার সচিব, তিনি লিখেছিলেন তাজউদ্দীন সাহেব ব্যতীত আর কাউকে কোন তথ্য দিতে বা পরিকল্পনা জানাতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। এমনটি না হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কতদিন চলতো আর কি তার পরিণাম হতো ভাবা মুশকিল।

বলছিলাম ১ নং সফদর জং রোডের বাড়ীতে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম বৈকি। যে ডাইনিং টেবিলটির অতিথি তালিকায় চার্চিল থেকে আইনষ্টাইনের নাম আছে তার দৈর্ঘ্য প্রস্হে আমাদের ইউ পি চেয়ারম্যান ও খুশী হবেননা। মন্ত্রীরা তো বসবেন ই না সেই সাধারণ টেবিল চেয়ারে।

পরাজয়ের পর ভুট্টো গিয়েছিলেন সিমলা চুক্তি করতে। তাঁর কন্যা প্রয়াতা বেনজীরের খুব শখ ছিলো এঁকে দেখার। যার বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো একজন মহিলার কাছে হেরেছে তাদের বিশ্ব সেরা নামে পরিচিত বাহিনী। বেনজীর বলছেন. হেলিকপ্টারের বাতাসে উড়ে যাবার মত একজন ছিপছিপে রমণীকে দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। পরে আলাপ করে বুঝতে পেরেছিলেন কাকে বলে দৃঢ়তা আর কাকে বলে অমিত শক্তি ও তেজ।

প্লেইন লিভিং হাই থিংকস যুগের মানবী প্রিয় দর্শিনী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

তাঁকে শান্তি নিকেতনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পিতা নেহেরু। শান্তি নিকেতন গিয়ে দেখলাম কি সাধারণ একটি ছাত্রীনিবাসে সহজ ভাবে বড় হয়েছিলেন। কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথের, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে..উদ্বুদ্ধ করা জীবনে বহু অর্জনের পর দেশপ্রেমিক বীর জাতি শিখদের বিরুদ্ধে একটি ভুল সিদ্ধান্তে জীবন দিতে হয়েছিল তাঁকে।

মৃত্যুদিনে প্রণাম শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী প্রিয়দর্শিনী। আপনি না থাকলে আমেরিকা চীন মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া ছিল অসম্ভব।

স্মরণ করব বঙ্গবন্ধু এবং চার জাতীয় নেতা সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁরা না হলে পাকিদের চোখে চোখ রেখে গাওয়া হতো না,

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি....

অজয় দাসগুপ্ত

Can u judge who is the better person out of these 3?

Can u judge who is the better person out of these 3?

Mr A - He had friendship with bad politicians, consults astrologers, two wives, chain smoker, drinks eight to 10 times a day.

Mr B - He was kicked out of office twice, sleeps till noon, used opium in college & drinks whiskey every evening.

Mr C - He is a decorated war hero,a vegetarian, doesnÕt smoke , doesnÕt drink and never cheated on his wife.

You would say Mr.C

right?

But..

Mr. A was Franklin Roosevelt! (32nd President of the USA)

Mr. B was Winston Churchill!! (Former British Prime Minister)

Mr C Was ADOLF HITLER!!!

Strange but true..

Its risky to judge anyone by his habits !

Character is a complex phenomenon.

So every person in ur life is important ,donÕt judge them ,accept them.

Three beautiful thoughts

1. None can destroy iron, but its own rust can!

   Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can.

2. Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line even in an E.C.G. means we are not alive.
3. The same Boiling Water that hardens the egg, Will Soften the Potato!

It depends upon IndividualÕs reaction To stressful circumstances!

Enjoy the journey called life..

আগামীকাল আপনি মারা যাবেন

"আগামীকাল আপনি মারা যাবেন - এটা জানতে পারলে আপনি কি করবেন?", একটা ভাইভা বোর্ডের প্রশ্ন ছিল এরকম।

প্রার্থী জবাব দিল, বেছে বেছে আমার শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ করব।

উত্তর শুনে ভাইভা বোর্ডের সদস্যরা তো অবাক। একজন জানতে চাইলেন, কেন? আপনি এমনটা কেন করবেন?

জবাবে প্রার্থী বলল, যারা আমার আপনজন, তাদের ওপর আর মায়া বাড়ানোর মানে হয় না - তাতে তাদের আর আমার কষ্টই বাড়বে। এর বদলে আমার প্রতি যাদের রাগ, তাদের সাথে একটু ভালো ব্যবহার করলে শেষ সময়ে তারাও হয়তো আমার জন্য দোয়া আর আশীর্বাদ করবে।

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার সব কাজ যেন নিজের জন্য না হয়! কিছু কাজ শত্রুর কথা ভেবেও করুন, তাতে আখেরে আপনারই লাভ। যে লোকটা আপনার বানান ভুল ধরে, সে আপনার লেখার প্রশংসাকারীর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার ভয়ে সঠিক বানান লিখুন, আপনার লেখার মান বেড়ে যাবে।

প্রতিটা অর্জনের চেষ্টার পেছনে শত্রু থাকলে সেটা দ্রুত পাওয়া যায়। শত্রুদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কিন্তু তাদেরকে ঘৃণা করবেন না। একটা মানুষ যখন আপনাকে গালি দেয়, তখন সে আপনার কাছ থেকেও একটা পাল্টা গালি শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আপনি গালি দিয়ে দিলেন তো শেষ; ব্যাপারটা চূড়ান্ত নোংরামি হয়ে গেল আর তার উদ্দেশ্য সফল হল। আর যদি গালির জবাবে হাসিমুখে তাকে 'শুভকামনা' জানান, সে আপনাকে নতুন করে আবিষ্কার করবে। কাউকে তর্কে হারানো মানেই জয়ী হওয়া নয়, কখনো কখনো অন্যের যুক্তি মেনে নেওয়াই প্রকৃত বিজয়।

আমি যখন কিছু লিখি, তখন 'সহমত' কমেন্ট দেখলে খুশি হই। তবে কেউ যৌক্তিকভাবে দ্বিমত দিলেও অখুশি হই না। সমালোচকদের ভালোবাসুন; দিন

শেষে তারা আপনাকে নিয়ে ভাবতে বসে যাবে - এটা পরীক্ষিত সত্য। মনে রাখবেন প্রত্যেক শত্রুই আপনার জন্য এক একটা সতর্ক বার্তা। আর সতর্কতা সফলতার জন্য প্রচন্ড দরকারি! কেউ অমুকের ভাতিজা বলে পাওয়ার দেখালে, আপনি নিজেকে তমুকের ভাগ্নে হিসেবে পরিচয় না দিয়ে লোকটাকে সালাম দিয়ে চলে আসুন। এতে আপনি ছোট হবেন না; বরং বড় হবেন।

ভালো থাকুক চারপাশের মানুষগুলো। ভালোবাসার, ঘৃণার, কাছের, দূরের, সবাই।

জুলাই সনদ স্বাক্ষর

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস জুলাই সনদ স্বাক্ষর হওয়ার আগে তাঁর ফেসবুক পেজ থেকে ও জোরালো প্রচার চালিয়েছেন যে সকল ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যেন সরাসরি লাইভ সম্প্রচার করে সেই অনুষ্ঠান। তেমনি বলেছেন জুলাই সনদ জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকবে কলম সহ।

আফসোস আমরা বেশিরভাগ মানুষই তখন বুঝতে পারিনি তার কথার গভীরতা! অনেকেই ট্রল করেছেন, কেউ মন খারাপ করেছেন। আসলেই তো জুলাই সনদ এক প্রজন্মের যুগান্তরের ইতিহাস! এবং ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস কোন রাজনৈতিক দলের নয় তিনি সমগ্র বাংলাদেশ এর সকল সাধারণ জনগণের।

তাঁর এই বয়সে ক্ষমতার ও লোভ নেই কিন্তু তিনি চাচ্ছেন বাংলাদেশ কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে রাজনীতির মূল সমস্যার সমাধান করে। সকল রাজনৈতিক দল এবং জণগন কে সাথে নিয়ে। অহেতুক কিছু মানুষ শুধু শুধু ওনাকে দোষারোপ করছেন!

এখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ যে বুদ্ধি রাখেন সেই পরিমাণ বুদ্ধি ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস স্যার একা রাখেন! গ্লোবাল বিশ্ব এই রত্ন চিনেছেন কিন্তু আমরা এমনই এক অভাগা জাতি এখন পর্যন্ত চিনতে পারলাম না তাঁকে!

বিএনপি এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে তারা তো কোন ভুল করেননি বরং ইতিহাসের অংশ হয়েছেন! তার সুফল ও তাঁরাই ভোগ করবেন। এখন ঐ সনদের আইনি ভিত্তি দিতে পারলেই তো সকল সমস্যার সমাধান এবং জাতি ও পেতে পারেন এক নতুন বাংলাদেশ! সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন সকল রাজনৈতিক দল। কিন্তু যাদের আর তর সইছে না লুটেপুটে খাওয়ার জন্য তারাই কেবল বাগড়া দিচ্ছেন গণভোটে!

যেখানে স্বচ্ছতা নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিত থাকবে। ক্ষমতার দাম্ভিকতা থাকবে না কারণ সকলের মাথায় থাকবে মাত্র পাঁচ বছরের জন্য তারা ক্ষমতায় আছেন! বাংলাদেশ এর রাজনীতির ইতিহাসে নেই একই সরকার পর পর দুই বার সরকার গঠন করে দায়িত্ব পালন করেছেন। একমাত্র পতিত ফ্যাসিস্ট ছাড়া আর সেটা তো

দিনের ভোট রাতে করে।

এই জুলাই সনদ তো সকল রাজনৈতিক দলের জন্যই বড় ধরনের সমাধান এবং এক উপহার।প্রধান কারণ হলো ক্ষমতা শেষে কারো আর দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হবে না। হামলা মামলার ভয় থাকবে না! তেমনি সাধারণ জনগণের ও আর জীবন দিতে হবে না ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের জন্য!

গণভোট কি শুধু মাত্র এইবারই প্রথম দাবি করা হচ্ছে আমাদের এখানে! ১৯৭৭ সালের ৩০ শে মে যেমন হয়েছে বাংলাদেশে তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও রাজনৈতিক দলগুলো যখন ঐক্যমত হতে পারেন না সংবিধান সংশোধন বা সংস্কারে তখন সেই সব দেশে ও জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেমন:-

ফ্রান্সে ১৯৪৫ ও ১৯৫৮ সালে ,চিলিতে ১৯৮০ সালে,

মিশরে ১৯৫৬, ১৯৭১ ও ২০১৪ সালে, তুরস্কে ২০১৭, ফিলিপাইন্সে ১৯৭৩ ও ১৯৮৭ সালে,ইটালিতে ১৯৪৬ সালে, শ্রীলংকায় ১৯৮২ সালে, ভারতে ১৯৫৭ সালে গোয়ায়, ১৯৮০ সালে নেপালে সাধারণ নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে আমাদের দেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট হতে সমস্যা কোথায়??

যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণ গণভোটের পক্ষে!

যে সকল রাজনৈতিক দল এখন গণভোটের বিপক্ষে যাবেন সাধারণ জনগণ ও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। ৭২ এর সংবিধান তো আরো আগেই সংস্কার করার কথা।আর সেটা যদি করা হতো তাহলে স্বাধীনতার ৫৪ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এতো গুম খু* ন, অরাজকতা সৃষ্টি হতো না!

২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বিপ্লব ঘটেছে সেই বিপ্লবই আজ সুযোগ করে দিচ্ছে ৫৪ বছরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রাখা একটা রাজনৈতিক পটপরিবর্তন করা বা প্রথার বিলুপ্তিকরণ! তাই আমরা সকল সাধারণ জনগণ অবশ্যই গণভোটের পক্ষে সাধারণ নির্বাচনের আগে।

Sanjida Afrin

Chief Adviser GOB July Revolutionary Alliance - JRA #রাজনীতি #বাংলাদেশ #flowerseveryone #highlights-

আপনি আর বড়োজোর মাত্র ১ বছর বাঁচবেন

৫৩ বছর বয়সে, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটি, এই বাক্যটি শুনলেন – "আপনি আর বড়োজোর মাত্র ১ বছর বাঁচবেন।"

ব্যক্তিটির নাম জন ডেভিডসন রকেফেলার।

২৫ বছর বয়সে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো তেল-শোধনাগারের মালিক হয়েছিলেন।

৩১ বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর কোম্পানিটি পরিচালনা করেছিলেন।

৩৮ বছর বয়সে তার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের ৯০% তেল-সম্পদ।

তার প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত ছিল – সুপরিকল্পিত।

তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ ছিল – প্রভাববিস্তারী।

তার প্রত্যেকটা ডলার ছিল – আরও বৃহৎ কিছুর জন্য বিনিয়োগ।

৫০ বছর বয়সেই, রকেফেলার পৃথিবীর শীর্ষে উঠে এলেন।

ইতিহাসের প্রথম বিলিয়োনেয়ার। তার সেসময়কার সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য – ৩৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

টাকার খেলায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপরাজেয়।

কিন্তু, আয়ুর খেলার হে'রে বসলেন।

৫৩ বছর বয়সে, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটিকে তার চিকিৎসকরা নিশ্চিত করলেন যে, তিনি আর মাত্র এক বছর বাঁচবেন, বড়োজোর।

ক'মাস আগে থেকেই তার শরীর ভে'ঙে পড়ছিলো। য'ন্ত্র'ণা হচ্ছিলো শরীর জুড়ে। চুল পড়ে যাচ্ছিলো। খেতে পারছিলেন শুধু স্যুপ ও জাউ। অনিদ্রা-রোগে ভুগছিলেন। হারিয়ে ফেলেছিলেন উদ্যম। জীবনের অর্থই হারিয়ে ফেললেন তিনি।

ঐ সময়েই, অবিস্মরণীয় একটি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি! যে-ব্যক্তির সবকিছুই ছিল, অবশেষে অনুধাবন করলেন – এসবের কিছুই তার সাথে যাবে না।

সেদিনই তার অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও লইয়্যারদের ডাকলেন তিনি। নির্দেশ দিলেন – "আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে, হাসপাতাল, গবেষণা ও দাতব্য-সংস্থা সংগঠিত করো, দ্রুত।"

এভাবেই, ১৯১৩ সালে, তিনি গঠন করলেন – 'রকেফেলার ফাউন্ডেশন' এবং এটি বদলে দিতে শুরু করলো পৃথিবীর চেহারা!

এই ফাউন্ডেশনের অর্থের গবেষণায় আবিষ্কৃত হলো – পেনিসিলিন। লক্ষ প্রাণকে বাঁচালো যা। এগিয়ে নিয়ে গেলো বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থা, ও জনস্বাস্থ্যের গবেষণাকে বহুদূর।

যে-বছর তার ম'রে যাওয়ার কথা ছিল, সেটি এসে চলেও গেলো। তার মৃ'ত্যু হলো না। এবং এরপর, আরও ৪৪ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি – ৯৭ বছর বয়স পর্যন্ত।

শেষজীবনে এসে, রকেফেলার একটি অনুধাবনের কথা বলেছিলেন – "আমি জেনেছি – এ জগতে নিজের বলতে কিছু নেই।"

উপলব্ধিটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

জোহরান মামদানির বিজয়

জোহরান মামদানির বিজয় বাংলাদেশের তরুণ, প্রগতিশীল এবং বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্য একটি আলোকবর্তিকা হতে পারে। এটি দেখিয়ে দেয় যে আদর্শ, সাহস, এবং জনগণের সাথে সংযোগ থাকলে, যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা সম্ভব।নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র হিসেবে জোহরান মামদানি-এর বিজয় শুধু একটি স্থানীয় রাজনৈতিক ঘটনা নয় – এটি একটি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচক হতে পারে।

আমি প্রথম থেকেই তাকে অনুসরন করেছি, ৩৪ বছরের একজন যুবক পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট, সবচেয়ে অর্থবান, এবং শতশত বিলিয়নিয়ারের সরাসরি বিরোধিতাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়েছে।

আমার ধারনা জোহরান ব্যাপক গবেষনা করে সাধারন মানুষের প্রধান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলি বাস্তবয়নের যথাযথ প্রস্তাও মানুষের সামনে যথাযথ ভাবে বিশ্বস্ততার সাথে উপস্থাপনা করতে পেরেছিল। তার সবচেয়ে আকর্ষনীয় দিক একজন আকর্ষনীয় চেহারার সাহসী চৌকস বক্তা। যত ধরনের বিরোধী মত, দল, গোষ্ঠী আছে কারও সাথে বসতে অস্বীকৃতি করেনি, Fox News, Jews leaders, billionaire business men, etc সবাই তার সাথে কথা বলে তারপর বলেছে he is a talented, charismatic, honest leader. তারা সবাই বলেছে আমরা তাকে সমর্থন না করলেও তাকে অবিশ্বাস করি না।

একজন ঘোষনা করে বুক চিতিয়ে বলা anti Zionist, antiestablishment, pro Palestinian, Democratic socialist নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়েছে- কারন সে যেটা বিশ্বাস করেছে, সেটাতে প্রথম থেকেই অবিচলিত থেকেছে, এবং মানুষ তাকে বিশ্বাস করেছে। আপনারা হয়ত জানেন জোহরান ২২৫০ ডলারের ভাড়া বাসায় থাকে, ওর গাড়ি নাই, নাই মানে এটা নয় যে সে কিনতে পারে না!

তার নির্বাচনের সহযোগিতার জন্য এক লক্ষ নিবেদিত প্রান স্বেচ্ছাসেবক দিন-রাত কাজ করেছে। এগুলি সত্যিই ভাববার বিষয়।

জোহরান মামদানিকে ঠেকানোর জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, তার বিরুদ্ধে এমন কোন অপপ্রচার নাই যা করা হয় নি কিন্তু তার জনপ্রিয়তার কাছে সবাই হার মেনেছে। তিরিশ বছরের কম ভোটারদের ৮০%, আর ৩০-৪৪ বছরের ভোটারদের প্রায় ৭০% তাকে ভোট দিয়েছে, প্রায় ১ মিলিয়নের বেশী নিউ ইয়র্ক বাসি তার পক্ষে ভোট করেছে।

ডাঃ মাহাথিরের পূর্ব পুরুষ চট্টগ্রামের

ডাঃ মাহাথিরের পূর্ব পুরুষ চট্টগ্রামের: যিনি ছিলেন মালেশিয়ার সেরা প্রধানমন্ত্রী।

"রক্তের টেয়ি ছট্টগাং র রক্ত, শুটকি মাছ খেতি অইবই"।
রক্তে বহিছে চিটাগাংএর রক্ত শুটকী মাছ খেতেই হবে।
হ্যা পাঠকগন এই মহান নেতার প্রিয় খাবারের
প্রথম সারি শুটকী মাছ। বিশেষ করে লইট্টা।

১৮০০ সালের দিকের কথা, চট্টগ্রাম জেলার
উত্তরাংশে রাঙ্গুনিয়া উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা
ও কাপ্তাইগামী সড়কের সামান্য পূর্বে কর্ণফুলী
নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম মরিয়ম নগর।
উক্ত গ্রামের সুঠামদেহী নূর মোহাম্মদ নামক এক যুবক ছিলো।
সেই যুবকটি সর্বপ্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উক্ত অঞ্চল হতে
আন্দোলনের ডাক তুলেন। অল্পদিনেই যুবকটি ভিষন খ্যাতি
লাভ করেন। ব্রিটিশদের সাথে বহু সংঘর্ষে সেই যুবকটির
নেতৃত্ব বাহিনী ব্রিটিশদেরকে পরাহীত করে।
অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকার ঐ যুবকটিকে দেখা মাত্রাই হত্যার
হুকুম দিলো। যুবকটির বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিলো।
যুবকটি পালিয়ে পালিয়ে আন্দোলন চালিয়ে গেলো।
ঘনিষ্ট বন্ধুরাই ধীরে ধীরে যুবকটির শত্রূ হতে লাগলো।
উপায়ন্তর না পেয়ে যুবকটি জীবন রক্ষার্থে জাহাজের
কাজ নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমালো। বিদেশে একটি
বন্দরে জাহাজটি নঙ্গোর ফেললে। যুবকটি সেই বন্দরে
নেমে গিয়ে। তার স্থায়ী ঠিকানা গাড়লো।

বন্দরে কুলির কাজ শুরু করলো। বন্দরে আরেক কুলির

কন্যার সাথে বিয়ে হলো। তাদের কোল জুড়ে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিলো। নুর মহাম্মাদের ছেলে নাম রাখা হলোঃ ইস্কান্দার মোহাম্মাদ।

একদিন নুর মহাম্মাদ এবং তার স্ত্রী অসুস্থ্য হয়ে পড়ে।
বিনা চিকিৎসায় মৃত্যবরণ করে।
ইস্কান্দার, বাবার সেই কুলির কাজ শুরু করে।

ইস্কান্দার বড় ছেলের নাম মাহাথির মোহাম্মাদ।

ইস্কান্দার একদিন অসুস্থ্য হয়ে বিছানায় পড়ে যায়।
সাত-আট বছরের বয়সের বড় ছেলে মাহাথির সংসারের হাল ধরলো। কিন্তু অসুস্থ্য বাবার একটাই স্বপ্ন ছিলোঃ
"ছেলেটি বড় হয়ে ডাক্তার হবে। তার মা-বাবার মত দরিদ্র পরিবার যেনও বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।"

মাহাথির প্রতিদিন স্কুল শেষে বন্দরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁ/কফি/ভাঁজাপুরি বিক্রি করতো। কে জানতো এই ছেলেটি একদিন দেশসেরা চিকিৎসক বিশ্ববরেণ্য রাজনীতিবিদ হবে।
সৃষ্টি কর্তা এ মহামানব কে আরো দীর্ঘ হায়াত দান করুন।
আশরাফুল আলম

দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রফেসর

মুনির কুদ্দুস সাহেব আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডেইলি স্টার' এ একটি চমৎকার লেখা লিখেছেন। লেখাটির নাম 'দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রফেসর'। সেখানে তিনি একটি পুরোনো বই থেকে এমন এক ঘটনার কথা টেনে এনেছেন, যা শুনলে আপনার মনটা হঠাৎ করে কেমন যেন শান্ত হয়ে যাবে। মনে হবে, জটিল রাজনীতির মধ্যেও এমন সরল সত্য লুকিয়ে থাকে! ঘটনাটি হলো বাংলাদেশের একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট, জিয়াউর রহমান, এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে

"সেটা ছিল এপ্রিল মাসের এক তপ্ত শুক্রবার। দেশে তখন ভয়াবহ খরা চলছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর বিখ্যাত খাল খনন কর্মসূচি নিয়ে গ্রামে গিয়েছেন। অধ্যাপক ইউনূসকেও সেদিন তাঁর সঙ্গী হতে হয়েছিল। সাত মাইল পথ, তাও আবার সেই কাঠফাটা রোদে!

প্রেসিডেন্টের আশেপাশে লোকজনের ভিড় ।ইউনূস সাহেবও সেই ভিড়ের সঙ্গে হাঁটছিলেন। তবে একটা জিনিস খেয়াল করার মতো। জিয়াউর রহমান যখনই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখনই তিনি নিশ্চিত করছিলেন যে ইউনূস সাহেব যেন তাঁর একেবারে পাশে বসেন। হয়তো তিনি এই মানুষটির কোনো সরল সত্যের অপেক্ষায় ছিলেন।

সাত মাইল হাঁটার পর ইউনূস সাহেব যখন এক ফোঁটা শান্তি খুঁজছেন, তখনই প্রেসিডেন্টের লোকজন ছুটে এলো। "আপনাকে প্রেসিডেন্ট খুঁজছেন।" ইউনূস সাহেব তখনো হাঁপিয়ে উঠেছেন, শরীর ঘামে ভিজে জবজবে। তাঁকে প্রেসিডেন্টের বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। জিয়া তখন খাটে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি ইশারা করে ইউনূস সাহেবকে তাঁর খাটের পাশে একটি চেয়ারে বসালেন। এরপর জিয়া উপরের দিকে তাকালেন, যেন খুব সহজ একটি প্রশ্ন করছেন, "তো, কী ভাবলেন?" ইউনূস সাহেব প্রথমে হতভম্ব। ভাবলেন কীসের কথা বলছেন প্রেসিডেন্ট? খাল খনন, দেশের অর্থনীতি, নাকি দলের ভবিষ্যৎ? অতএব ,তিনি বিনয়ের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "কীসের ব্যাপারে, স্যার?" প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমার বক্তৃতার ব্যাপারে।" এবার অধ্যাপক ইউনূস ধীরে ধীরে কথা মাপলেন। এইখানে কোনো কূটনীতি চলবে না, চলবে কেবল সরল সত্য। তিনি বললেন, "আসলে মানুষ আপনাকে সরাসরি দেখে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছে। এটা খুবই ভালো দিক।" একটু থেমে তিনি আসল কথাটি বললেন, "তবে আমি একটি জিনিস বদলে দিতাম। মানুষ যদিও খরা নিয়ে কথা বলছে, কিন্তু আমরা যখন হেলিকপ্টারে নদী পার হচ্ছিলাম, দেখলাম নদীতে কিন্তু অনেক পানি। যদি সেই পানি খাল কেটে বা হাতে করে তুলে আনা যায়, তবে আমরা এই বাদামি মাঠের বদলে সবুজ মাঠ দেখতাম। আর এই কাজটি মানুষ চাইলে এখনই নিজে করতে পারে।" এরপর তিনি প্রেসিডেন্টের দিকে সোজা তাকালেন। তা ছিল এক অন্যরকম সাহস! ইউনূস সাহেব বললেন, "আপনি আপনার বক্তৃতায় বারবার বলছেন 'আমি তোমাদের জন্য কী করবো'। আমার মনে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজের কথা হবে যদি আপনি বলেন 'তোমরা নিজেরা কী করতে পারো'।"

আসলে কী জানেন? বড় বড় নেতারা সব সময় ক্ষমতা দেখান। বলেন, "আমি দেবো, আমি আনবো।" আর সেই মুহূর্তেই একজন অধ্যাপক এসে খুব শান্তভাবে বলে দিলেন, আসল শক্তিটা আছে মানুষের নিজের হাতে। সরকার নয়, মানুষই পারে নিজের ভাগ্য বদলাতে।

এই সামান্য কথাটিই কিন্তু বিরাট রাজনৈতিক দর্শনের জন্ম দিয়েছিল। শোনা যায়, জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচির মূল চিন্তাধারায় এই পরামর্শটি বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকেও একজন মানুষ মাটির কথা শুনতে চাইলেন, আর একজন সাধারণ মানুষ সেই সত্য কথাটি সাহস করে বলে দিলেন।

হায়দ্রাবাদ একটা মুসলিম রাষ্ট্র ঠিক কিভাবে

ভারতের অপারেশন পেলো নামে মুসলিম রাষ্ট্র হায়দ্রাবাদ দখল। হায়দ্রাবাদ একটা মুসলিম রাষ্ট্র ঠিক কিভাবে মাত্র ২০ দিনে অনেক হত্যা, রক্তে ভারত কেড়ে নিয়েছিল জানেন? না আছে কোনো পাঠ্য পুস্তকে হারিয়ে গেলো মিলিয়ে গেলো নাকি মিলিয়ে দেয়া হয়েছে ইতিহাস থেকে?

এই হায়দ্রাবাদে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে। তখন হায়দ্রবাদে যে পরিমাণ মুসলিম শিল্প সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটে তা সত্যিই অবিশ্বাস ছিল। ৮২ হাজার ৬৯৮ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল মুসলিম সংস্কৃতির মায়া জড়ানো ইতিহাস।

হায়দ্রাবাদের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা,লোহা, সোনা, হীরক ছাড়াও ছিল সম্পদের প্রাচুর্য। কৃষি ফসলের মধ্যে গম, ভুট্টা, চাল, জওয়ার,বজরা, ও তিল ছাড়াও অন্যান্য ফসলের প্রচুর ফলন হতো।

দেশটিতে ছিল নির্বাচিত গনতান্ত্রিক সরকার,আইন, আদালত বিচার ব্যাবস্থা। ছিল নিজস্ব মুদ্রা,সেনাবাহিনী

, হাইকোর্ট, শুল্ক বিভাগ। আরো ছিল নিজস্ব ভাষা, পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো জাতীয় সংগীত। দেশে দেশে ছিল রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘে ছিল নিজস্ব প্রতিনিধি।

১৯৪৭ এ দেশ ভাগের সময় ১৬ জুলাই ইংল্যান্ডের ভারত বিষয়ক সচিব লর্ড লিষ্টোয়েল বলেছিলেন হায়দ্রাবাদ ভারত পাকিস্তান কোনটিতে যোগ দিবে তার ইচ্ছা অথবা স্বাধীন সত্তা বজায় রাখবে তাও সম্পুর্ন তাদের ইচ্ছাধীন। বিট্রিশ সরকার এই বিষয়ে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না।

হায়দ্রাবাদ ভারত পাকিস্তান কোনোটিতেই যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকার সীদ্ধান্ত নেয়, দেশটি জাতিসংঘের

সদস্য পদের জন্যও আবেদন করেছিল। কিন্তু ভারতের নেতারা জোর করে দেশটিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেই ভারত অপারেশন পেলো নামের একটা সামরিক অভিযান চালায় ভারতীয় সেনাদের দিয়ে। ১৯৪৮ সালে সে অভিযানের মাধ্যমে অনেক হতাহত করে ২০ দিনে এই হায়দ্রাবাদকে জোর করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৮৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পুরোপুরিভাবে তাদের গর্বের স্বাধীনতার অবসান ঘটে।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক ডাঃ খাজা নাজিম উদ্দীন ১৯৫৪ সালে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন এবং বিসিপিএস থেকে ১৯৯২ সালে মেডিসিনে এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এবং ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত সৌদী সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সহকারী চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৯৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বারডেমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি

মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে বারডেম থেকে নিয়মিত ভাবে অবসর নেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ সায়েন্স (BIHS)-এ সংযুক্ত আছেন।

তাঁর সহধর্মিনী ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তাঁর তিন সন্তান। এক ছেলে দুই মেয়ে। সবাই ডাক্তার।

লেখকের অন্যান্য বই:

১. নিত্য দিনের ডাক্তারী